৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

অষ্টম বর্ষ—প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩২৭

সম্পাদক—শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌ ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

অষ্টম বর্ষ—প্রথম খণ্ড; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩২৭

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

ভাদ্র।

আশ্বিন।

কার্ত্তিক।

বহুবর্ণ চিত্র

আশ্বিন, ১৩২৭

়থম খণ্ড]　　অষ্টম বর্ষ　　[চতুর্থ সংখ্যা

মায়াবাদ ও IDEALISM বা বিজ্ঞানবাদ

[শ্রীস্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী]

.হ কেহ বৈদিক মায়াবাদকে Idealism বলিয়া থাকেন। স্তবিক, আচার্য্য শঙ্কর যে মায়াবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, ়হার সহিত ইয়োরোপীয় Idealismএর কোনও সাম্য সাদৃশ্য নাই। ইয়োরোপে প্লেটো (Plato), কাণ্ট Kant) হেগেল (Hegel) এবং বার্কলি (Berkley) ়ভৃতিকে Idealist বলা হয়। অবশ্যই ইঁহাদের ত্যেকের মতের পার্থক্য আছে। তাঁহাদের মতের সংক্ষিপ্ত . প্রদান করিলে ও তৎপার্শ্বে আচার্য্য প্রবর শঙ্করের মতবাদ পত করিলে, অনায়াসে মায়াবাদ ও Idealismএর র্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে।

প্লেটোর মতে নানাত্বের মৌলিক বস্তুই Idea .াইডিয়া)। এই Idea অতীন্দ্রিয়। ইহাই বাস্তব। ইহাতেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত। জাগতিক নানাত্বের মূলে এক। সেই মৌলিক একত্বের আদর্শেই নানাত্বের উদ্ভব। প্লেটোর ideaকে "archetype of the manifold varieties of existence" বলা যাইতে পারে। এই 'আইডিয়া' বহুতে এক, এবং বহুত্বের অতীত; সকল সৃষ্টিতে অনুস্যূত কিন্তু সৃষ্টির অতীত; সমস্ত পরিবর্ত্তনের অন্তরে বিরাজিত, কিন্তু বিকার-বর্জ্জিত। ইহা এক ও নিত্য স্থির। স্থির বলিয়াই, ইহাকে চিন্তা করিতে হইলে, ইহার বিপরীত "বহুর" চিন্তা ব্যতিরেকে ইহাকে চিন্তা করা যায় না। নানাত্ব হইতে আমরা একত্বের ধারণা করি। এই "আইডিয়া" বহুতে পরিব্যাপ্ত এবং বহুর অতীত। ইহা সত্তা মাত্র। সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত ও সৃষ্টি বা

পরিণামের অতীত। পরিবর্ত্তনের ভিতরে সম এবং পরিবর্ত্তনের অতীত। ইহা নিত্য ও শাশ্বত; ইহা স্থির। (১) ইহাই প্লেটোর 'আইডিয়া'। এই 'আইডিয়া'ই সত্যম—শিবম্ বা the Good। ইহা নিরঙ্কুশ। ইহা আইডিয়া-সকলের আইডিয়া—the idea of ideas the absolute idea। আইডিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। জাগতিক পরিবর্ত্তনের অতীত। কিন্তু বাস্তব। ইহার সত্তায়ই অন্যান্য বস্তু সত্তাবান্। প্রত্যেক বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও ইহার স্বভাব বিনষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক ব্যষ্টির বিশেষত্ব নিষ্কাশন করিলে যে এক অখণ্ড ব্যাপক জাতির উদ্ভব হয়, তাহাকেই 'আইডিয়া' বলা যাইতে পারে। ইহাকে genera or species বা অল্প কথায় universals বলা যায়। ইহাই বস্তুসকলের মূল সত্তা। ইহাই লক্ষ্য। ইহাই 'Essence and end'। সকল বস্তুর মূলীভূত principle ই আইডিয়া। প্লেটোর মতে সত্তা ও জ্ঞান অভিন্ন (Identity of Knowledge and Being)। প্রত্যেক ব্যষ্টি আইডিয়া এক মহান আইডিয়ার অন্তর্ভুক্তি। সকলে মিলিয়া একটী সংঘাত (system বা organism)। সত্য বা শিব স্বরূপ (the Good) (২) অন্য কিছুই নহে; ইহা জাগতিক শৃঙ্খলার মূল মাত্র। ইহা সৃষ্টির ও নৈতিকতার মূল—'the principle of the order of the universe, both in nature and in morality। সত্য-স্বরূপ সকল সত্তার সত্তা; সকল বস্তুর মূল ও লক্ষ্য। এই সত্য-স্বরূপের অনুসন্ধানেই আমরা ব্যষ্টি 'আইডিয়া'-গুলিকে অতিক্রম করিয়া এক অখণ্ড 'আইডিয়াতে' স্থিতি লাভ করিতে পারি।

ব্যষ্টির 'আইডিয়া' গুলিতে ব্যষ্টির মূল ও পরিণতি (essence and end) নিহিত। প্লেটোর মতে Number বা কালের (সংখ্যা) সাহায্যেই এক বহু হয়। বহুত্ব ও একত্বের মধ্যে (intermediate) এই সংখ্যা বা কাল বিদ্যমান। সত্তা ও জ্ঞান অভিন্ন। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞান আইডিয়া দ্বারাই সম্ভব। কারণ বহিঃ প্রত্যক্ষের স্থিরতা নাই। প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি স্থির নহে। কারণ, বিষয়গুলি সত্তা ও অসত্তার মধ্যবর্ত্তী (intermediate)। ইহারা আভাস মাত্র (only appearances)। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর স্থিরতা নাই। বিষয়গুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃত সত্তা-জ্ঞানের স্থিরত্ব নাই: বিষয়গুলি ছায়া মাত্র। অতএব 'আইডিয়া'গুলির জ্ঞান ও সত্য-স্বরূপের (the Good) জ্ঞানই স্থিরতর বা প্রকৃত জ্ঞান। এই সত্য-স্বরূপই সকল আইডিয়ার সমষ্টি রূপ (concentrated form)। এই সত্য-স্বরূপ আইডিয়াই (Idea) সূর্য্য-স্বরূপ। ইহার প্রকাশেই অন্যান্য বস্তুর প্রকাশ। এই সত্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ বস্তু সর্ব্বব্যাপী। ইহা জ্ঞানের বিষয় (object of knowledge)। ইহার সংযোগেই মানবীয় মন ইহাকে ও সকল বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কারণ মানবীয় জ্ঞান সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের অংশ। আমাদের শরীর যেরূপ বিশ্ব-শরীরের এবং মন যেরূপ বিশ্ব মনের অংশ, সেইরূপ জ্ঞানও সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানের অংশ। সংক্ষেপে 'আইডিয়া' সম্বন্ধে বলিতে গেলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে, Ideaই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কার্য্যের আধার বা আশ্রয় (Support) এবং স্থির জ্ঞানের কারণ। মৌলিক বিপরীত ভাবসমূহের (antitheses) সামঞ্জস্যে আমরা Ideas উপলব্ধি করিতে পারি। এই 'আইডিয়া'গুলির পরিণতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'আইডিয়ায়'। এই 'আইডিয়াই' the Good বা সত্য-স্বরূপ। ইহাই সকল সত্তা ও সকল জ্ঞানের সার (the principle)। ইহা হইতে নিয়মিতরূপে কাল (numbers) সাহায্যে সকল 'আইডিয়া' মানবীয় চৈতন্যে (৩) (Spirit) নিহিত। প্লেটোর মতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম হইতে বুঝিতে পারি যে, বহির্জগতের বাহিরে অস্তিত্ব নাই।

(১) "It is this one in and above the many, the Being in above Becoming, the identical in and above the changing, that which is one as being definite, cannot be thought without an 'other' a 'many or a not being."

(২) প্লেটোর 'The Good" এবং আমাদের দেশীয় "শিবম্" ঠিক এক কথা নহে। উহাতে পার্থক্য আছে। অন্য শব্দের অভাবে ঐ শব্দটী ব্যবহার করিতে হইল।

(৩) ইউরোপীয় spirit শব্দ ও আমাদের দেশীয় চৈতন্য একার্থক নহে। প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণ আত্মা ও মনের পৃথকত্ব দেখিতে পান নাই, তাঁহাদের Spirit তাই আত্মা ও মনের একত্ব। ভারতীয় মতে চৈতন্য আত্মার স্বরূপ; মন জড়।

হির্জগতের কতকগুলি মনোময়ী নক্সাই বাস্তব সত্য। ই মনোময়ী নক্সাগুলি এক অখণ্ড বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। াঁহার মতে নানাত্বের জ্ঞান নিবারিত হয় না। প্লেটোর তে দৃশ্য জগতের প্রত্যক্ষের স্থিরতা নাই; কিন্তু মনোময় গৎ স্থির। কিন্তু আচার্য্য শঙ্করের বৈদিক মায়াবাদ হা হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। ভগবান্ শঙ্কর দৃশ্য-জগতের ্যবহারিক সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন। যৎসাহায্যে এই শ্য জগৎ প্রত্যক্ষ করি, সেই মনকে মায়া বলিয়াছেন। নই মিথ্যা। "মনো মাত্র মিদং দ্বৈতম্" এবং "মন সোঽমনী াবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতো।" মন অমন হইলে দ্বৈত াকে না। বাহিরের জগতের সত্ত্বা অপহ্নব করেন নাই। কন্তু যাহার সাহায্যে বহির্জগৎ উপলব্ধ হয়, তাহাকেই মথ্যা রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। জগতের উপলব্ধি হয়; অতএব ইহা মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ অভাব বস্তুর উপলব্ধি হয় না। জগতের উপলব্ধি হয়। অতএব গৎ ব্যবহারিক হিসাবে মিথ্যা নহে। কিন্তু যে বস্তুর াহায্যে উপলব্ধি করি, তাহা মিথ্যা হইলে বহির্জগৎ আর তা বলিয়া প্রতিভাত হয় না। ব্রহ্ম সূত্রের ২ অঃ ২ পাঃ ৮ সূত্রের পর্য্যালোচনা করিলেই আমাদের বাক্যের ার্থকতা প্রতীয়মান হইবে। "না ভাব উপলব্ধেঃ" অর্থাৎ পলব্ধি হয়, অতএব জগতের অভাব হইতে পারে না। ব্রহ্ম-ত্রের ২।২।৩০ সূত্রে সূত্রকার শূন্যবাদ নিরসন করিয়াছেন, ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ" অর্থাৎ যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা াব-বস্তু নহে। জগতের ব্যবহারিক সত্ত্বা নিরসন করা ঙ্কর মতের তাৎপর্য্য নহে। ব্যবহারিক জগতের ত্ত্বা মন যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ থাকিবেই। মন যদি -মন হয়, তখনই জগতের জ্ঞান থাকিবে না। ভগবান্ ঙ্করের মতের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়াই নেকে ভ্রান্ত ধারণার বশে মায়াবাদ ও Idealismকে মানার্থক রূপে গ্রহণ করেন। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চার করিলে শঙ্কর-মতের যথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। প্লেটোর মনোময় জগৎ সৎ। কিন্তু শঙ্করের মনোময় গৎ মিথ্যা। প্লেটোর বহির্জগৎ ছায়া। কিন্তু শঙ্করের হির্জগৎ ব্যবহারিক রূপে সত্য। প্লেটো মন ও আত্মার থকত্ব দেখিতে পান নাই; তাঁহার Spirit মনের স্বচ্ছ বা র্মল অবস্থা ও আত্মার মিলন মাত্র। আত্মা ও মনকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। আত্মা ও মন যে পৃথক্, তাহা উপলব্ধি না করিয়াই মনোজগতের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপাদিত absolute idea বা সত্য স্বরূপ—(অবশ্যই তাঁহার absolute idea এবং বেদান্ত সত্য স্বরূপ এক বস্তু নহে) প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির মিলন মাত্র।

সকল বিকার-বর্জ্জিত ও এক বলাতেও প্লেটো নির্গুণ ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদ প্রপঞ্চিত করেন নাই। আত্মা অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব রহিত না হইলে নির্গুণ হইতে পারে না। বেদান্তে ঈশ্বরের মায়িক ভাব স্বীকৃত। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্ব স্বরূপে সর্ব্বদাই নির্গুণ। তাঁহার গুণময় ভাব আরোপিত বা মায়িক। কিন্তু দার্শনিক প্লেটোর মতে ঈশ্বর ideaগুলিকে তপস্যা দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাঁহার তপস্যা অবশ্যই মনোময়, বাহ্য-প্রচেষ্টা-বিরহিত। কবি যেমন তাঁহার আদর্শকে নিজ হইতে কল্পনা সাহায্যে প্রকাশ করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও আপনা হইতে নিত্য ও শাশ্বত নক্সাগুলি প্রকাশ করেন। দার্শনিক Erdmann প্লেটোর মত সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থক। তিনি লিখিতেছেন—"God contemplates the ideas, the external archetypes of things, but contemplates them as a poet does his ideals; i. e., generating them himself and then implants them into matter." মনোময়ী সৃষ্টি যখন মায়িক নহে, তখন absolute idea বা ঈশ্বর কখনই নির্গুণ হইতে পারেন না। ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ। জগৎ মায়াময় হইলে উপাদান কারণ হইয়াও নির্গুণ। কারণ, ভ্রান্তি-দৃষ্ট অভাব-বস্তুর সহিত ভাব-বস্তুর মিলন হইতে পারে না। মিথ্যা ত্রিকালেই মিথ্যা, সর্ব্বত্রই মিথ্যা। মিথ্যার সহিত সত্যের মিলন কিপ্রকারে সম্ভব? রজ্জুতে সর্পবোধ ভ্রান্তির ফল। রজ্জুতে সর্প কোনও কালেই নাই, ভ্রান্তিকালেও রজ্জুতে সর্প নাই। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিত্যমুক্ত। সৃষ্টি মায়িক বা ভ্রান্তি-দৃষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের কোনও হানি হয় না। জগৎ ব্রহ্মের limitation। জগৎ মিথ্যা হইলেই ব্রহ্মের নির্গুণত্ব সুস্থির হয়; অন্যথায় নহে। প্লেটোর মতে সৃষ্টি মায়িক নহে। অতএব ঈশ্বর বা absolute idea (the

good) নির্গুণ নহেন। আত্মা ও ঈশ্বরের অভিন্নত্ব প্লেটোর স্বীকৃত নহে। Ideaগুলির জ্ঞানকে প্রকৃত জ্ঞান বলায় নানাদের জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলা হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের মতে একত্ব জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। প্লেটোর প্রতিপাদিত absolute Being জ্ঞানের বিষয়ীভূত (object of Knowledge)। কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ইহা আদপেই স্বীকার করেন না। বাস্তবিক জড়বস্তুই চৈতন্যের object বা বিষয়। নিজের ঘাড়ে মনুষ্য শত চেষ্টা করিলেও নিজে উঠিতে পারে না। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না। সূর্য্য প্রকাশক। জড়বস্তু প্রকাশ্য। সূর্য্যরূপ আত্মাই জড়কে প্রকাশ করে। এস্থলেও প্লেটো প্রভৃতি ইয়োরোপীয় দার্শনিকগণ বুদ্ধি ও আত্মাকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্নরূপে গ্রহণ করিয়া এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়াছেন। "আমি বোধ" অর্থে "আমি"। এস্থলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য নাই। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পার্থক্য নাই। বোধও যাহা আমিও তাহা। "আমি" যদি জ্ঞানের বিষয় হই, তাহা হইলে বিষয়ী কে? একই বস্তু বিষয় ও বিষয়ী হইতে পারে না। অবশ্যই অধ্যাসে বা ভ্রান্তিতে সম্ভব। যেমন স্বপ্নাবস্থায় মনই দ্রষ্টা। মনই দৃশ্য। কিন্তু এ স্থলেও প্রণিধান করিলে দেখিতে পাই, আত্মাই সাক্ষী এবং মনই দৃশ্য বা বিষয়। অধ্যাসে আত্মধর্ম্ম মনে আরোপিত করি বলিয়াই আত্মধর্ম্ম মনে দেখিতে পাই। আত্মা ও মনের বা বুদ্ধির অধ্যাস লক্ষ্য করেন নাই বলিয়াই ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ জ্ঞানের বিষয়রূপে আত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাই তাঁহারা 'consciousness' ও 'self consciousness' প্রভৃতি পৃথক পৃথক ভাবের অঙ্গীকার করেন।

জড় কখনও আত্মাকে বা চৈতন্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। বুদ্ধি বা মন জড়। তাহারা কখনই আত্মাকে বিষয় করিতে পারে না। জ্ঞান আত্মার স্বরূপ। আত্মার সান্নিধ্য বশতঃই বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান। প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান বুদ্ধ্যাদির ধর্ম্ম বা স্বরূপ নহে। অতএব প্লেটোর Idealism ও আচার্য্য শঙ্কর প্রপঞ্চিত বৈদিক মায়াবাদ ভিন্ন জিনিষ। প্লেটো পরিণামবাদী, আচার্য্য শঙ্কর বিবর্ত্ত-বাদী। কোনও রকমেই প্লেটোর Idealismকে মায়াবাদ হইতে পারে না।

কাণ্টের আইডিয়া এবং Thing in themselves সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারি, কাণ্টের Idealis এবং মায়াবাদ এক বস্তু নহে। কাণ্টের মতের সংক্ষিপ্ত প্রদান করিলেই এ বিষয় প্রতীত হইবে।

"Reason" অর্থে কাণ্ট আমাদের জ্ঞানের সম বৃত্তিকে (The whole of our faculty of knowledg গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা "Reason"এর ব্যাপক অর্থ reasonএর * বিশেষ অর্থ-জ্ঞানের যে বৃত্তি স্বভাব অসীমাবদ্ধ সমন্বয় (Synthesis) সাধন করে, (o faculties of knowledge in its tendenc to perform unconditioned synthesis), আম প্রত্যক্ষের সাহায্যে সম্মুখ ঐন্দ্রিয়িক অনুভব বা আলোচনা (intellection) দেশ ও কালের ভিতর দিয়া ইন্দ্রি গ্রাহ্য রূপে গ্রহণ করি। বোধের (understanding সাহায্যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি বা বিষয়গুলিকে কার্য্য কার ও পরিমাণের (causality and quantity) ধারণা দ্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সাজাইয়া রাখি এবং বিশেষ Reason দ্বার এইগুলিকে নিরঙ্কুশ সমষ্টিতে (absolute totalities) পরিণত করি। 'Reason' অনাদি ও অনন্ত (demand absolute beginning and absolute limits to time and space)। 'Reason' মহৎ ও অণু (absolut maxima and minima) এবং সকল কারণের কারণ। ইহার কারণান্তর নাই। ইহাতেই সমাপ্তি (an absolute conclusion in a first cause to the causal series)। এই Reasonই Pure Reason, ইহাকে সহজ জ্ঞান বা বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। কারণ, এই জ্ঞানে (Reason) অভিজ্ঞতার (experience) কোনও আবশ্যকতা নাই। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও বোধের মূল ও পরিণতি এই বিজ্ঞান বা সহজ জ্ঞান (Pure Reason)। ইহার অনুবলেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান ও বোধের সমতাসাধক ও সংযোগকারক (co-ordinating and combining) ব্যাপার চলিতেছে। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়। যে সকল ধারণায় এইরূপ absolute সিদ্ধান্ত উপলব্ধ হয়, তাহাদিগকে Ideen অর্থাৎ Ideas বলা যাইতে পারে। ইহাই কাণ্টের অভিমত। প্লেটো যে অর্থে Idea শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন, কাণ্টও সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। 'Idea' শব্দের অর্থ এমন একটী চিন্তার বিষয়, যাহা অভিজ্ঞতায়

উপলব্ধ হইতে পারে না। কারণ, এই চিন্তার বিষয়টির স্বভাব নিরঙ্কুশ (absolute character)। প্লেটোর 'Idea' শব্দটী ব্যবহার সম্বন্ধে তাই কাণ্ট বলিয়াছেন—"Plato perceived very well, that our reason naturally raises itself to cognitions far too elevated to admit of the possibility of an object given by experience corresponding to them." কাণ্টের মতে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক 'আইডিয়া' আছে। তাঁহার মতে তিনটী আইডিয়া বিদ্যমান। অন্তঃকরণের (soul) আইডিয়া, জগতের আইডিয়া, এবং ঈশ্বরের আইডিয়া। আমরা অন্তঃকরণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্থিরতর জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক। ইহাই অন্তঃকরণের আইডিয়া। বাহিরের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে স্থিরতর জ্ঞান লাভ করিতে উৎসুক। ইহাই জগতের আইডিয়া। সকল সত্তার মূল উপাদান সম্বন্ধে সুস্থির জ্ঞান লাভ করিতে চাই। ইহাই ঈশ্বরের সম্বন্ধে আইডিয়া। এই 'আইডিয়া'গুলি আবিষ্কৃত জিনিষ নহে। ইহারা Reason বা সহজ জ্ঞান হইতে স্বাভাবিক ভাবে ও বিনা প্রচেষ্টায় অভিব্যক্ত Proceed from the very nature of reason itself)।

এই সহজ জ্ঞানের (Pure Reason) আলোচনার ফলে কাণ্ট দেখিতে পাইলেন যে, আমাদের চিন্তায় যে সকল আকার (Forms) ও Principles উদ্ভূত হয়, তাহা অভিজ্ঞতাজাত নহে। কিন্তু এই আকৃতি ও Principle-গুলির অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রকৃত প্রয়োগ হইতে পারে না। ইহাদের উৎপত্তির কারণ অভিজ্ঞতা নহে, কিন্তু অভিজ্ঞতার ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। প্রত্যক্ষ ও পদার্থের(৪) (categories) আকৃতির প্রয়োগে আমাদের অভিজ্ঞতা লাভ হয়। যাহাই আমরা জানি তাহাই কার্য্য মাত্র (phenomenon only)। Thing in itself অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিকে জানিতে পারি না। এই Thing in itself অথবা Thing-ishnessকে কাণ্ট 'noumenon' (কারণ), 'intelligible' বা transcendental object (জ্ঞানাতীত বস্তু প্রভৃতি নাম প্রদান করিয়াছেন। Thing in itself জিনিসটী কি? ইহার উত্তরে কাণ্ট বলিতেছেন, ইহা তিনি জানেন না, এবং জানিবার আবশ্যকতাও বোধ করেন না। কারণ, ইহা অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানা যায় না। অভিজ্ঞতার বিষয় কার্য্য মাত্র। অব্যক্ত প্রকৃতি (Thing in itself) আমাদের অন্তরে কি বাহিরে, তাহাও আমরা জানি না। এই অব্যক্ত প্রকৃতির ধারণা কেবল নিষেধ-মুখে সম্ভব (a limiting concept—a purely negative concept)। আমাদের জ্ঞানের condition-গুলির অন্বেষণ করিতে আমরা এই negative concept-এর নিকট উপস্থিত হই। conditionগুলিই এই নিষেধ-মুখ ধারণার (negative concept) সীমা। কাণ্ট এই অজ্ঞেয় বস্তুকে idealistic form রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে তিনি লিবনিজের (Liebnitz) পরমাণুর জগতের (world of monads) প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। লিবনিজ পরমাণুর সংঘাতকে intelligible world বলিয়াছেন। এই intelligible world বা বৈজ্ঞানিক জগৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ (sensible world) হইতে বিপরীত। কাণ্ট যদিও লিবনিজের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানবাদ (metaphysical idealism) দৃঢ়তার সহিত নিরসন করিয়াছেন; তথাপি এস্থলে তিনি লিবনিজের মতের অনুসরণ করিয়াছেন।

এই অব্যক্ত প্রকৃতির (Thing in itself) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কাণ্ট কখনও সন্দিহান হন নাই; তিনি প্রকৃতির নিরঙ্কুশ (absolute) বাস্তবতা মানিয়া লইয়াছেন। ইহা মানিয়া লইবার হেতুও কোনও কোনও স্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে কার্য্যাতিরিক্ত ও কার্য্য হইতে পৃথক বস্তু অবশ্যই আছে (That something other and something more than phenomena exists)। কাণ্টের মতে এই অব্যক্ত প্রকৃতি (Thing in itself) কেবল জ্ঞানের বস্তুর কারণ নহে (the cause of the matter of knowledge); পরন্তু এই matter বা বস্তু যে আকারে (forms) আমরা শ্রেণীবদ্ধ উপলব্ধি করি, সেই স্থিরতর আকারেরও কারণ। তাঁহার মতে matter অর্থাৎ বস্তু এবং forms অর্থাৎ আকার পৃথক্ জিনিষ। জ্ঞানের বিষয় (বস্তু) ও আকৃতি উভয়ই অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। যদিও অব্যক্ত প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানের বস্তু ও আকৃতির কারণ, তথাপি

(৪) পদার্থ ও categories শব্দ সমানার্থক নহে।

আমরা ইহার সম্বন্ধে সামান্যই জানিতে পারি। এ সম্বন্ধে আমাদের স্থিরতর কোনও জ্ঞানই নাই। বাস্তবিক ইহা একটা অজানিত বস্তু। ইহাই দার্শনিক কাণ্টের মতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। অবশ্যই কোন কোন স্থলে তাঁহার মতের অযৌক্তিকতা আছে, তাহা প্রদর্শন আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কেবল মায়াবাদ ও তাঁহার প্রতিপাদিত Idealism বা বিজ্ঞানবাদ যে একই বস্তু নহে, তাহা প্রদর্শনই আমাদের কার্য্য।

প্রথমতঃ কাণ্টের প্রতিপাদিত Pure Reason ও আচার্য্য শঙ্কর প্রতিপাদিত অখণ্ড জ্ঞান এক বস্তু নহে। বৈদিক আত্মজ্ঞান অখণ্ড, এক ও স্বয়ং প্রকাশ। অন্য কোনও বস্তু বা প্রকাশ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই জ্ঞানস্বরূপই সকলকে প্রকাশ করিতেছে, "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। কিন্তু কাণ্টের প্রতিপাদিত Pure Reason জ্ঞানময়। আইডিয়া দ্বারা আমরা সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি করি। তাঁহার মতে আইডিয়া একটা চিন্তার বিষয়; অর্থাৎ object of thought। যে ধারণা দ্বারা আমরা নিরপেক্ষ জ্ঞান উপলব্ধি করি, তাহাই আইডিয়া। অতএব কাণ্টের মতে আইডিয়া দ্বারা Pure Reasonএর উপলব্ধি হয়। কাণ্টের প্রতিপাদিত জ্ঞান সুতরাং সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ নহে। কিন্তু শঙ্করের প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান নির্ব্বিশেষ। কাণ্টের Pure Reason সগুণ। সে হেতু, সকল কারণের কারণ। কিন্তু শঙ্কর প্রতিপাদিত জ্ঞান মায়া-প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান মাত্র। সকল প্রপঞ্চের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইলেও, মায়িক সৃষ্টির অধিষ্ঠানই সৎ, এবং সৃষ্টি মিথ্যা। সুতরাং পারমার্থিক দৃষ্টিতে কাহারও কারণ নহে।

কাণ্টের Pure Reason প্রকৃত প্রস্তাবে নানাত্বের জ্ঞান। এ স্থলে কাণ্ট আত্মা ও বুদ্ধিকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বিশিষ্ট রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের মতে আত্মা ও বুদ্ধি পৃথক্। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। আত্মার ও অনাত্মার অধ্যাসেই বুদ্ধির ব্যাপার। বুদ্ধির বৃত্তি নানা। মূল অখণ্ড, জ্ঞান এক। বুদ্ধির সহিত অধ্যাসেই নানা বলিয়া বোধ হয়। ইহা ভ্রান্তির ফল। অতএব শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও কাণ্টের সিদ্ধান্ত এক বস্তু নহে। কাণ্টের idea বহু। অন্ততঃ তিনটী Idea তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর, অন্তঃকরণ ও জগতের "আইডিয়া"। এই 'আইডিয়া'গুলি দ্বারাই 'Pure Reason' উপলব্ধ হইতে পারে। নানাত্বের লোপ না হইলে একত্ব জ্ঞান অসম্ভব। কিন্তু কাণ্ট নানাত্বের জ্ঞান লোপ না করিয়া তৎসাহায্যেই একত্বের জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছুক। বিশেষতঃ "আইডিয়া"-গুলির সাহায্যে "Pure Reason" উপলব্ধ হইলে, Pure Reason conditioned অর্থাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশ। জ্ঞানের (Idea) সাহায্যে জ্ঞানের প্রকাশ—ইহার মূল্য আদৌ নাই; কাণ্ট Reasonএর unconditioned synthesis করিতে চেষ্টিত। সমষ্টিতে জ্ঞানের একত্ব স্থাপিত করিতে চান। কিন্তু সমষ্টি ও ব্যষ্টির অতীত একত্বই প্রকৃত জ্ঞান। সুতরাং কাণ্টের Pure Reason অখণ্ড জ্ঞান নহে। Thesis (ইতি) এবং Anti thesis (নেতি) উভয় এক অখণ্ড সমন্বয়ে (synthesis) পরিণত হইতে পারে না। জড় ও চৈতন্যে অখণ্ডত্ব অসম্ভব। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তু সমকালে এক বস্তুতে সমন্বিত হইতে পারে না। Higher Psychological synthesis মন ও আত্মার অভিন্নতা বোধে আপাতঃ মনে হয়। দার্শনিক হেগেল এইরূপ synthesis বা সমন্বয়ের পক্ষপাতী। বাস্তবিক কাণ্ট হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ আত্মা ও মনকে অভিন্ন মনে করিয়াই এইরূপ সমন্বয়ের পক্ষপাতী। সুতরাং কাণ্টের মতের সহিত শঙ্কর মতের সমানতা নাই। কাণ্টের সিদ্ধান্তে intelligible world স্থির বস্তু। প্রকৃতি স্থির। প্রকৃতির সত্তা আছে। প্রকৃতি মায়া নহে। কাণ্টের সহিত সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতির সাদৃশ্য আছে। সাংখ্যের অব্যক্ত প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য নহে। অব্যক্ত প্রকৃতির সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি না। এমন কি তন্মাত্রের জ্ঞানও যোগিগণের পক্ষেই সম্ভব। সাংখ্যের প্রকৃতি "কার্য্যানুমেয়া"। মূল প্রকৃতির জ্ঞান একমাত্র ধ্যান-বলেই সম্ভব হইতে পারে। কাণ্টের Thing in itselfএর সম্বন্ধেও স্থির জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কেবল কি প্রণালীতে Thing in itself কার্য্যরূপে পরিণত হয়, সেই প্রণালী সম্বন্ধে সামান্যাকারে জ্ঞান জন্মিতে পারে। সাংখ্য-মত হইতে কাণ্টের মতের সামান্য পার্থক্য আছে। সাংখ্যের প্রকৃতি জড়। কাণ্টের প্রকৃতি জড় ও চৈতন্যময়ী। কাণ্ট

matter অর্থাৎ বস্তু এবং আকৃতিকে (form) পৃথক্ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মনোরাজ্যে বস্তু ও আকৃতিকে পৃথক্ করিয়া ধারণা করা যায় না। বস্তুর বোধ আছে ও আকৃতির বোধ নাই, ইহা অসম্ভব। ধারণা শরীরী বস্তুর পক্ষেই সম্ভব। আত্মা বস্তু (object) নহে। আপনাতে আপনি স্থিতিই আত্মজ্ঞান। সে স্থলে আকার নাই। কিন্তু যতক্ষণ মনের মনন রহিয়াছে ততক্ষণ একটা আকার থাকিবেই, স্থূল হউক সূক্ষ্ম হউক আকার থাকিবেই। তাই বস্তু ও আকৃতিকে আমরা মনোজগতে পৃথক্ করিয়া বোধ করিতে পারি না। আকৃতি বা জাতিই সৎ। ব্যক্তিই মিথ্যা। আরও কাণ্টের মতে Transcendental object সৎ সুতরাং দ্বৈতরহিত। বেদান্তের মতে জীব ও ব্রহ্মের অন্তরালে মায়িক জগৎ। মায়াময় জগৎ ব্রহ্ম ও জীবের আপাতঃ ভিন্নতার সাধক। মায়িক জগতের ব্যকোপ হইলেই জীবও শিব অভিন্ন। এই অবস্থায় ত্রিপুটীর লয় হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ভেদত্রয়ের লয় হয়। এক অখণ্ড জ্ঞানের পরিস্ফুরণ হয়। কাণ্টের Pure Reason এর সম্বন্ধে matter বা বস্তু থাকায় জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা রহিল। ত্রিপুটির লয় হইল না।

সুতরাং কাণ্টের মত অদ্বৈতবাদ নহে, উহা দ্বৈতবাদ। বস্তু ও আকৃতিকে পৃথক্ বলিয়া গ্রহণ করিলেও, অসীম সমন্বয় (unconditioned synthesis) হইতে পারে না; কারণ, বস্তু (matter) জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করিবে। কারণ, কাণ্টের মতে আকার (form) Thing in itself বা transcendental object হইতে উৎপন্ন। বস্তুর (matter) কারণও এই Thing in itself বা অব্যক্ত প্রকৃতি। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, নানাত্ব বস্তুর ধর্ম্ম। বস্তু যখন সৎ, তখন নানাত্বও সৎ। নানাত্ব থাকিলে অসীম সমন্বয় সম্ভব কি? নানাত্বের সমন্বয় অসম্ভব। কাণ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের (Sensible world) অস্তিত্বের অপলাপ করিয়াছেন; বস্তুবৎ। কিন্তু আকার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ আভাস মাত্র। এ স্থলেও বেদান্তের সহিত পার্থক্য সুস্পষ্ট। বেদান্তের মতে বহির্জগতের ব্যবহারিক সত্তা আছে। মনের মিথ্যাত্বই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। কাণ্টের Thing in itself অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতি যখন সৎ, তখন বৈদান্তিক মায়াবাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। বরং সাংখ্য মতের সহিত কাণ্টের মতের সাদৃশ্য বর্ত্তমান। অতএব বৈদান্তিক মায়াবাদ ও কাণ্টের Idealism এক নহে।

মা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

(৫৮)

সিরুল্লা সাহেব ও বড় বিবির মৃত্যু হইয়াছিল। ছোট বিবি তাঁহার ছেলে-মেয়েদের লইয়া নিজের ভাইয়ের কাছে পুরে চলিয়া গিয়াছেন। খাঁ-সাহেবের অত বড় বাড়ীখানা খন কেবল রাবেয়া, হামিদ এবং উহাদের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র সির এই তিনজনের অধিকৃত। তসির এম-এ পাশ রিয়া ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটশিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত তেছিল। সম্প্রতি সেই পরীক্ষা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বস্থা এই রকমই হইয়া আছে যে, যদি তসির পরীক্ষায় তকার্য্য হইয়া চাকরী পায়, তা'হইলে ইহাদের সঙ্গে করিয়া থাই কর্ম্মস্থানে চলিয়া যাইবে। যদি না পায়, পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী করিমের তত্ত্বাবধানে ইহাদের এইখানেই রাখিয়া তাহাকে আরও একটা বৎসর কলিকাতায় ফিরিয়া আইন পড়িতে হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই ছোটখাট একটা বাদলার মত হইয়া ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। এখন বর্ষণ ক্লান্ত ভাঙ্গাচোরা মেঘ আকাশের চারিদিকে সসব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দামোদর এখান হইতে বহুদূর নহে; মেঘের ছায়ায় নদীজল কোথাও বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে; কোথাও বা মেঘাপসৃত রৌদ্র-সম্পাতে আগুনের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ইহার পর-পারবর্ত্তী বালুকার উপর রৌদ্র-ছায়ার যুগপৎ

সমাবেশ নিস্তরঙ্গ নদী-জলের উপর থাকিয়া-থাকিয়া মেঘজালের পরিব্যাপ্ত ছায়ায় মসী-কৃষ্ণ কালিমায় ঘনীভূত হওয়া, এবং উদ্যানে ঘনপল্লব বিপুলকায় নিম্বরক্ষের পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা, সমস্তই আসন্ন বর্ষণের সূচনা করিয়া আছে। ক্লান্তি অপনোদনকারী গুমোটফাটা অল্প বাতাসে স্নান আর্দ্র আষাঢ়-সন্ধ্যার সুবিপুল মেঘজালের ন্যায় নিতম্ব চুম্বিত দীর্ঘ কেশভার মেলিয়া দিয়া, শয়ন-গৃহের বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া, রাবেয়া একটা ভেলভেটের জুতায় ফিতার ফুল সেলাই করিয়া বসাইতে-বসাইতে, বারে বারে যেন উতলা হইয়া সেই দিগন্ত-প্রসারী মেঘের দিকে চাহিতেছিল; ভাবে বোধ হয় যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

দ্বারের বাহিরে মস্-মস্ শব্দ শোনা গেল। উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া সেলাই হাতে লইয়াই রাবেয়া ঘাড় ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। বোধ হইল, জুতার শব্দটা পাশের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তখন থাকিতে না পারিয়া সে ব্যগ্র হইয়া ডাকিল, "হামিদ!" শব্দ ফিরিল। "ওঃ! তুমি এইখানে!" হামিদের পরিবর্তে তসির আসিয়া ঘরে ঢুকিল দেখিয়া, নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া লইয়া, রাবেয়া আবার পূর্ব্বকৃত গোলাপি ফিতার পাপ্‌ড়ি সুতা পরানো ছুঁচের সাহায্যে অর্দ্ধ প্রস্তুত গোলাপফুলের অঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়া, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইল। গৃহ-প্রবিষ্ট তসির ইহা লক্ষ্য করিল। এই সুস্পষ্ট অবজ্ঞায়, তাহার বুকটা কে যেন দুই পা দিয়া মাড়াইয়া ধরিয়াছে, এম্‌নি একটা তীব্র ব্যথায় এক মুহূর্ত্তে তাহার হাসিমুখ বিবর্ণ পাংশু হইয়া আসিল। তথাপি আভ্যন্তরিক বেদনার কোন চিহ্নই বাহিরে প্রকাশ না করিয়া, অগ্রসর হইয়া গিয়া সে রাবেয়ার সম্মুখে অদূরে দাঁড়াইয়া, সংযত স্বরে কহিল, "আমি এসেছি বলে তুমি বিরক্ত হয়েছ, না?" রাবেয়া ফুলের মধ্যে পুষ্পরেণু তৈরি করিবার জন্য ছুঁচে হলদে রেশম পরাইবার জন্য জানলার সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, নত মুখেই উত্তর দিল, "হলেই বা উপায় কি?"

মুখের উপর এই উত্তরে আবার একবার তসিরের সুগৌর মুখমণ্ডল বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। সে ক্ষণকাল মাত্র নীরব থাকিয়া কাতর কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমার সেখানে কি সুখে দিন রাত কাটে, তা' কি একটুও ভেবে দেখবার বিষয় বলে তোমার মনে হয় না রাবেয়া?"

রাবেয়া এ কথার জবাব এড়াইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া হয়েছে?" তসির গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "হোক না হোক, তোমার তার জন্য কি আসে-যায়? এই তো মেস থেকে বাড়ী আসার জন্যই রাগ করেছ। দু'দিন পরে যখন—" আকাশ-ভরা মেঘের কাজলমাখা অন্ধকারে ঘরের মধ্যটা ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছিল, সূচীর সূক্ষ্ম রন্ধ্রের সন্ধান সন্ধ্যালোকে না পাইয়া, রাবেয়া তখন তাহাদের পরিত্যাগ করিবে কি না, এই কথাটাই ভাবিতেছিল,—তসিরের এই সাভিমান উত্তরে সে ছুঁচটা ভেলভেটে বিঁধিয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল; এবং অনতিকাল পরেই খাবারের প্লেট হাতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তসির তখনও ঠিক তেমনই করিয়া, সেই জায়গাটিতেই জানলার বাহিরে চোখের দৃষ্টি রাখিয়া, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখ দুইটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত, মুখখানাও তেমনি ম্লান। দেখিয়া, রাবেয়ার স্বাভাবিক মমতাপূর্ণ চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া, খাবারের থালাটা সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া, হাসিয়া বলিল, "থাক্, হয়েছে, আর রাগ করতে হবে না—এখন খাবে এসো দেখি।" তসির কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই।" "তা নাই থাক, কিছু তো খাও।" তসির পুনশ্চ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খাইতে বসিল; এবং ক্ষুধার জ্বালা কিয়ৎ-পরিমাণে প্রশমিত হইলে, অভিমানের যন্ত্রণাটাও সেই সঙ্গে সামান্য পরিমাণে কমিয়া আসিল। তখন নিজের খাদ্যশূন্য থালা এবং রাবেয়ার কৌতুক-হাস্যে বিমণ্ডিত মুখ দেখিয়া হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, যে, সে রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার ক্ষুধা নাই। লজ্জিত হইয়া সে হাত গুটাইতেছিল। আরও কিছু খাদ্য-দ্রব্য পাতে রাখিয়া দিয়া, রাবেয়া সহাস্যে বলিয়া উঠিল "তবে নাকি তোমার ক্ষিধে পায় নি?" তসিরও তখন লজ্জা চাপিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর পানের বাটা খুলিয়া রাবেয়া পান সাজিতে বসিয়াছিল। তসির আসিয়া কাছেই একটা বেতের মোড়া টানিয়া আনিয়া বসিয়া পড়িল; বলিল, "আজ তোমার সঙ্গে আমার গোটা-কয়েক কথা আছে। কথাগুলো আমায় একবার শেষ অবধি বল্‌তে দিও, প্রথম থেকেই তাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দিও না, দোহাই তোমার।" এই বলিয়াই সেই দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ টিপু সুলতানের বংশধর দুই হাত যোড়

রিল। মনে-মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইলেও, বাহিরে সেভাব যথাসাধ্য দমনে রাখিয়া, রাবেয়া কেয়াথয় চাহিতে-কুঁচাইতে সকৌতুকে হাসিয়া কহিল, "তোমার তো ই পচা পুরানো সলোমনের আমলের সেই একই কথা। রোজ-রোজ শুনতে ধৈর্য্য আর থাকে কই?" তসিরও কটুখানি রঙ্গের লোভ ছাড়িতে পারিল না;—হাসিয়া হাসিয়া কহিল, "ভাল কথা, উচিত কথা পচে না। দেখ্‌চো কোরাণ সেই কবে লেখা হয়েছিল,—আজও তার বয়েৎ মোসলেম-জগৎ মাথায় করে বইছে। যা' নিত্য নূতন, সেই ই র-পরিবর্ত্তিত।" "তুমি তা হলে আবার নূতন করে কোরাণের বাণী শুনাতে এসেছ? বেশ, শুনতে ধৈর্য্য কে, শুনবো। ঐ যা! বৃষ্টি এসে গেল। হামিদটা মনও বাড়ী ফিরলো না, এমন ছেলেটা হয়েছে।"

তসির সেই বড় বড় ফোঁটার দিকে চাহিয়া বলিল, বৃষ্টি তো সহজে ছাড়বে না। সে গেছে কোথায়?" মজিতদের ওখানেই হবে। অজিত প্রথম হয়ে পাশ হচে বলে, আজ ওদের বাড়ী তার বন্ধুদের নেমন্তন্ন ছিল না কি না। হামিদও যে এক দিন তার বন্ধুদের ফলাটল খাওয়াতে চায়,—আর দু'চারজনকে খাওয়াবেও বলছিল।" সির বলিল, "বেশ তো, কিন্তু তা'হলে আর দেরি করে জ নেই। আমাদের তো শীঘ্রই এখান থেকে যেতে হবে। ক দিনের মধ্যেই আমার খুলনায় পৌঁছান চাই।"

পান মুড়িতে-মুড়িতে, মোড়া বন্ধ করিয়া রাবেয়া বিস্মিত খে চাহিল। তাহার চোখের ঘন পল্লবের মধ্যে সে বিস্ময়-র্তা পাঠ করিতে গিয়া, তসিরের মুগ্ধ দৃষ্টি অকস্মাৎ আর রতে পারিল না। নির্জ্জন-কানন-বিহারিণী এই অপরূপ বনলতার অলৌকিক রূপের পরিমলে সে অন্ধ অলি গুণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, আকাশের যে ৎ মেঘের মধ্যে মুহূর্ত্ত চকিত হইতেছিল, তাহার সে লুকোচুরি বুঝি শুধু ইহাকেই মুখ দেখাইবার লজ্জায়! ও রাবেয়া তাহার সে দৃষ্টি অনুভব করিয়া সচকিতে নত করিয়া ফেলিল। গাঢ় রক্তে তাহার আলোটা ক কে যেন আপেলের মত রাঙ্গাইয়া দিল। মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইয়া এই কথা ভাবিল, যে, এ পোড়ার মুখে য যে কি ছাই খোদগারী করে রেখেছেন, তা নে। প্রকাশ্যে এই ভাবটাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য, নিজে তৎক্ষণাৎ কথা কহাইবার জন্যই তাড়াতাড়ি করিয়া কহিল "খুলনায় এখন কি করতে যাবে? সেখানে কে আছে?" তার পর হঠাৎ কি ভাবিয়া লইয়া, হাসিয়া বলিল, "বউ আনতে যাবে বুঝি?" তসিরের গম্ভীর মুখ অধিকতর গম্ভীর হইয়া আসিল। সে ব্যথিত ভৎর্সনার সহিত কহিল, "তোমার মুখে এ বিদ্রূপ সাজে না রাবেয়া!" রাবেয়া কহিল, "তা'ছাড়া আর কার মুখে মানায় তসির?" "তা আমি জানিনে; কিন্তু তুমি সব জেনে-শুনেও, নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত ওই তামাসা যখন তখন কি করে করো, বল দেখি? একটু দয়া-মায়াও শরীরে নেই কি আর?"

রাবেয়া কঠিন মুখে চাহিল; বলিল, "না, নেই। কি করে থাকবে? খোঁচায় খোঁচায় তুমিই যে আমার মনটাকে কড়া পড়িয়ে দিয়েছ। কোমল তো থাকতে দাও নি।" "আর আমার তুমি কি করেছ বলো দেখি?" "তোমার — তোমার আমি কি করেছি! কিছু না! ঈশ্বর আমায় তোমার চিতাকাঙ্ক্ষী ভগিনী গড়ে পাঠিয়েছেন, আমি আজও ঠিক তাই আছি। তুমি বুঝে উঠতে না পার, সে দোষ তোমার বিকৃত বুদ্ধির।"

তসির মাথা হেঁট করিল। তার পর মনে মনে কি গড়িয়া লইয়া, সহসা যেন একটা বলের সঙ্গে মুখ তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "সেব তোমার হিন্দু সংসর্গের ফল রাবেয়া —তা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিজেকে ভগিনী পদবীতে দাঁড় করিয়ে তুমি যখন তখন আমায় লজ্জা দিতে চাও, সে আমি কি বুঝিনে, মনে করো? কিন্তু আমাদের সমাজ ধর্ম্ম হিন্দুদের সঙ্গে ঠিক এক নয়, একথাটাই বা তোমার ভুলে গেলে চলবে কেন? বিধবা বিয়ে, আত্মীয় বিয়ে মুসলমান সমাজে নিন্দনীয় নয়, সে তুমিও তো জানো।"

"জানি বৈ কি। আত্মীয়-বিবাহ সম্বন্ধে আমি কোন দিন কোন কথা তোমায় তো বলিও নি। কিন্তু বিধবা বিয়ে তুমি যে বলো আমাদের সমাজে নিন্দনীয় নয়;—তা জিজ্ঞাসা করি তোমায়—আমায় বলো তো তুমি, সে সমাজটা কাদের নিয়ে? তুমি, কজন শাহজাদা, কজন বাদশার বেগম, কজন মৌলভীর স্ত্রী দুবার বিয়ে করেছে, শুনেছ?—ছি ছি, তসির, ছি ছি! তোমার লজ্জা করে না? আমি যে মনে হলে লজ্জায় মরে যাই! তুমি এসব কথা মুখে আনো কি করে? তোবা, তোবা, মানুষ কি ছাগল না ভেড়া? ছি ছি!"—

বলিতে-বলিতে গভীর লজ্জায় আকপোল কণ্ঠ অশীর-মাথা আরক্ত হইয়া উঠিল। মসলার কৌটার ঢাকনি বন্ধ করা ছাড়িয়া, দুই করতল দিয়া সে নিজের সেই লজ্জারক্ত মুখখানা ঢাকা দিল।

অকস্মাৎ তাহার ব্যবহারের অসঙ্গতিজনিত এই নিদারুণ লজ্জার গভীর ক্ষোভ ওসিরের মনের অঙ্গে যেন তপ্ত লৌহের চাবুক হইয়া ঘা মারিল। সহসা সেই চকিতে-দেখা লজ্জারুণ মুখের প্রদীপ্ত শিখা তাহার বুকের মধ্যে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া লজ্জার জ্বালা ধরাইয়া দিল। নিজের লজ্জায় তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়া, সে ঘরের হাওয়া, বাতাস শুদ্ধ যেন ভরাইয়া দিতেছে, এমনি তাহার মনে হইল। কতক্ষণই যে সে তাহার সঙ্গবর্তিনীর সেই তাহার লজ্জায় লজ্জিত মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, তাহার ঠিকানা নাই। অনেকক্ষণ পরে যখন চারিদিক হইতে মসজিদারায় নমাজীদের আজানের শব্দ ক্রমশঃ মন্দবেগ হইয়া অবশেষে শান্ত হইয়া আসিল, জন-বিহীন শুষ্ক পরীমধ্যে এক নিস্তব্ধ মুখর নীরবতা মাত্র বিরাজমান হইয়া রহিল, আকাশের মেঘস্তর ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া, তাহার মধ্য হইতে অবসান-বেলার পাণ্ডুর শেষ রৌদ্র এক ঝলক স্বর্ণ-বৃষ্টির মত সলিলোপরি গাছে, পাতায়, পথে প্রাসাদে সর্বত্র ঝলমল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—জীবনের সমস্ত ভ্রম-ভ্রান্তি চুকাইয়া দিয়া যেন অশ্রুধৌত নির্মলতার উপর দিয়া দেবতার সুপ্রসন্ন আশীর্বাদ প্রকাশিত হইল, তখন সহসা সে মুখ তুলিয়া চারিদিকে, এবং স্তব্ধস্থির ওসিরের অস্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চকিত কটাক্ষক্ষেপ করিয়া লইয়া, রাবেয়া ত্রস্ত ভাবে সাজা পানগুলা আজলা পুরিয়া ডাবরে ফেলিল, এবং মসলাপাতির কৌটাগুলা কম্পিত-হস্তে বাটায় ভরিয়া দিল। তার পর উঠিবার উদ্যোগ করিয়া, আর একবার সেই একই অবস্থায় অবস্থিত ওসিরের মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া, তাহার মুখের যথাপূর্ব বিহ্বল বিষণ্ণতায় ক্রুদ্ধ হইয়া, অত্যন্ত কঠিন তিক্ত স্বরে কহিয়া উঠিল,—"ওসির, তুমি আমি হাজারও ভুলে যাই, তবু ইতিহাসের ধারা বদল হবে না।... বংশের রক্ত থেকে ওই দেহটাকে যখন বঞ্চিত করা সম্ভবই নয়, তখন এই ছার জন্মটায় মনের মধ্যে যতবড় দানবকেই বাসা দিয়ে রেখে থাক,—বাহিরেও অন্ততঃ সেই রক্তের খাতিরটাও বজায় রাখতে চেষ্টা করো; আর যে খোদাতালা তোমায়-আমায় জোলা-মালার ঘরে না পাঠিয়ে, সুলতান বংশ-রক্তে জন্ম দিয়েছেন, তাঁকে গুণে হাজারবার করে অভিসম্পাতের পয়জার মেরো। কাজটা তিনি নিঃসন্দেহই ভাল করেন নি। আমরা যার ইজ্জৎ রাখবার যোগ্য নই, সেখানে আমরা যে কি করতে আসি, তা যিনি পাঠান, সেই তিনিই জানেন। কি দরকার ছিল এমন মর্যাদা দেবার, যা আমাদের পক্ষে পায়ের বেড়ি মাত্র হবে!"

বিদ্যুতের মত একটা অসহনীয় লজ্জার তড়িৎ ওসিরের পদ-নখ হইতে উঠিয়া মাথায় চুলের গোড়া পর্যন্ত বহিয়া গেল। সে আরক্ত মুখে,—"রাবেয়া"—বলিয়া কি বলিতে গিয়া, দ্বিগুণিত লজ্জায়, ভাষা হারাইয়া ফেলিয়া, স্তব্ধ হইয়া গেল। জ্ঞানের উন্মেষাবধিই তো সে এই জ্যোতির্ময়ীর পশ্চাতে উন্মত্ত ছুটিয়া ফিরিতেছে; অনেক উপদেশ, অনেক অনুনয়, অনেক ভৎসনাই ইহার মধ্য হইতে সে নিজেকে মহান্ত্রকারের পরিবর্তে ফিরিয়া পাইয়া 'দেওয়ানা' হইতে বসিয়াছে, তথাপি প্রাণের এ যে মহাতৃষ্ণা সে আশার নেশা তাহার ছুটে নাই। কিন্তু আজ অকস্মাৎ এতবড় লজ্জার বান কোথা দিয়া তাহার একনিষ্ঠ প্রেমের একটানা স্রোতের মুখে বাঁধা দিয়া ফিরাইল? সেখানে শুধু তরতরে নদীর জল ছিল, ঢেউএর পর ঢেউ সেখানে আঘাত দিয়া-দিয়া এ কি কর্দম বাহির করিল? সমস্ত জলটাই বুঝি ঘোলাইয়া উঠে!

রাবেয়া কিন্তু এ ভাবের কোন সন্ধানই পায় নাই। সে তাহার মুখে এমন আবেগরুদ্ধ গদ্গদ্ স্বর যে অনেকবারই শুনিয়াছে,—কেমন করিয়া অন্য প্রকার সন্দেহ করিবে? সে প্রচণ্ড ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বাধা প্রদান করিল—"হ্যা, কেনই যে শূকরের পায়ে মুক্তা তিনি পরিয়ে বসেন, এ যদি আমি কোন মতে বুঝ্‌তে পারি! যারা নিজের দেহ-মনটাকে প্রবৃত্তির স্রোতে ভেলার মতন ভাসিয়ে দেওয়াটাকেই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞান করে, দিলেই হতো তাদের ক্যাওরার ঘরে পাঠিয়ে। নিবৃত্তি বলে জগতে যে একটা শব্দ আছে, তা কাণেও কোন দিন শুন্‌তে পেতো না। যারা বোনের স্নেহ সেবা সব তুচ্ছ করে, তার দেহখানার দিকেই লোলুপ, হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, আমার মতে সেই রক্ত মাংসের

লাভে অন্ধদের বাব-ভাল্লুক হ'য়ে জন্মালেই সব চাইতে শোভা পেত। আজ যদি ইংরেজ রাজত্ব না হয়ে, মুসলমানের সেই বিগত গৌরব অতীতের কথা মাত্র না হতো,—আমাদের স্থান আজ সমাজের কোন্ স্তরে হ'তো তসির? সেখানে সেই হায়দ্রাবাদের রাজসিংহাসনের তলায় দাঁড়িয়ে তুমি তোমার বিধবা বোনকে নেকা করবার কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতে কি তসির? আজ মাথায় তোমার বা, সেই মায়ের বিয়ে সর্ব্বশরীর জরে গেছে, পঙ্গু হয়ে পথের ধারে পড়ে আছে, তাই না বুদ্ধিও অমন হীন হয়ে পড়েছে! যারা নিজের মর্য্যাদা হানি করে, পিতৃ পুরুষের মর্য্যাদা নাশ করে—"

"বাস্তবিকই তারা জাহান্নমে যাবার যোগ্য।—রাবেয়া! তাই তুমি শাহজাদি। আজ তোমার মর্ম্মঘাতী কথার ঘা দিয়ে আমি যেন পূর্ব্বপুরুষের অধিকৃত সম্মানের সেই ... সিংহাসন মনের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্চি; আর সেই গৌরব সিংহাসনে আসীনা দেখছি মহামহিমময়ী সুলতানা রাবেয়া রূপে তোমাকে। আমার মোহ যে আজ লজ্জায় মুখ লুকতে কোথাও আড়াল পাচ্চে না রেবা! এত দিন ত' এইটা দেখিয়েছি যে, সে সব কথার ক্ষমা চাইতে যাওয়া আজ ধৃষ্টতার মাত্রা কেবল বাড়িয়ে তোলা। শুধু এইটুকু বলেই শেষ করতে চাই যে, আজ থেকে আমি তোমার ভাই, তুমি আমার বোন। আর কোন হীনতা তুমি তোমার বংশের রক্তে দেখতে পাবে না।"

"তসির! সত্যি এ কথা?"

"আমারও শরীরে টিপু সুলতানের গায়ের রক্ত আছে যে রাবেয়া!" "তসির, ভাই, অনেক কটু কথা বলেছি,—তুমিও আমায় ক্ষমা করো ভাইটি আমার! তা'হলে ফুফুর হ'য়ে ছোটমার ভাইঝির সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক করতে ছোটমাকে চিঠি দিই?"

অত্যন্ত বিনম্র হাস্যে তসিরের কমনীয় মুখ প্লাবিত হইয়া গেল। "আর ত্বরা সইছে না? ওঃ, বুঝেছি! এখনও বুঝি আমায় ভাল করে বিশ্বাস করতে পারচো না, না? যা করলে আমি তোমার কাছে বিশ্বস্ত হ'তে পারি তাই হুকুম করো। আর আমার তো চাইবার বেশি কিছু নেই।"

"খোদাতালা নিশ্চয় তোমার ভাল‌ই কর্‌বেন তসির। আমাকে তুমি যে আজ কি যন্ত্রণা হ'তে মুক্তি দিলে ভাই, সে শুধু তিনিই জানেন। আমার জন্য তোমায় সর্ব্বদা অসুখী দেখে দেখে, সত্যি বলছি তোমায়, বাঁচতে আর আমার একদণ্ডও সাধ ছিল না।"

তসির উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, "এখন আবার সাধ হচ্চে বোধ হয়? না হ'লে নতুনবৌ ঘরে তুলবে কে? যা হোক, আমি ডেপুটি কালেকটরের পদ পেয়েছি,—সাত দিনের মধ্যে যেতে হবে, তার ব্যবস্থা করো।"

রাবেয়াও হাসিমুখে উঠিয়া পড়িল, "সত্যিই ত খুকু ছেলেমানুষ,—তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে গড়ে দেবার জন্যেও তো একজন সখী চাই।—কিরে হামিদ, এলি? ও হামিদ! হামিদ! শুনে যা, তসির পাশ হয়ে খুলনায় ডেপুটী হয়েছে।"

রেলগাড়ির বাঁশীর সুরে এক লম্বা আনন্দ চীৎকার ছাড়িয়া হামিদ আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"আমাকে তা'হলে এই মাসেই একখানা সাইকেল কিনে দিতে হবে। তুমি বলেছিলে দেবে।"

"এখনও তো দেবো না বলি নি। যাবার পথে কলকেতা থেকে কিনে নিস্। কেমন? খুসী?"

তসির হাসিয়া বিদায় হইল। রাবেয়ার কণ্ঠমধ্য হইতে একটা লঘু নিশ্বাস বহিয়া গেল।

(৫৯)

কলাবশেষ কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর চন্দ্রের ন্যায় ক্ষীণ ও প্রভাহীন মায়ের মুখে চোখ রাখিয়া অজিতের চোখের জল নিঃশব্দেই ঝরিতে লাগিল। ছেলের শুষ্ক, শীর্ণ, মলিন মুখ দেখিয়া মনোরমার আবেগও কোন বাধাই মানিতে চাহিল না। দুজনে দুজনের কণ্ঠলগ্ন হইয়া অনেক দুঃখ-বেদনা বিজড়িত, অশ্রুজলে গুরুভারাক্রান্ত উভয়ের হৃদয় ধৌত করিয়া দিল। মনোরমার শরীরে কিছুই নাই, শুধু একখানা পাতলা চামড়ায় ঢাকা একটি নরকঙ্কাল যেন বিছানায় মিলাইয়া আছে। এই শরীরে কেন তীর্থ করিতে বাহির হইলে?—এ প্রশ্ন অজিতের বুকফাটা রক্তের মত মুখ দিয়া অন্ততঃ হাজার বারও বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। না গেলেও কি মা তাহার বাঁচিতে পারিতেন? অজিতের অধঃপতন-কাহিনী, অজিতের নিরুদ্দেশ, তাঁহাকে যে এর

অনেক পূর্ব্বেই হত্যা করিয়া ফেলিত! কেন এই মাতৃঘাতী অজিত মায়ের কথা বিস্মৃত হইয়া, নির্ম্মম পিতার পশ্চাতে উন্মাদ হইয়া ছুটিয়াছিল! নিঃস্ব নির্ঝর ত্যাগ করিয়া মরীচিকার পশ্চাতে ছুটিলে এই রকমই দশা ঘটে। তাহার নিরুপায় অন্তরের সমুদায় ক্রোধের জ্বালা তাঁহার উপরেই পতিত হইল, যিনি নিতান্তই অনাবশ্যকে, হতভাগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেই যেন তাহাকে এ জগতে আনিয়া দিয়া সকল দায় মুক্ত হইয়াছেন! মূর্খ, উন্মাদ সে; তাই তাহার জন্মদাতা সেই জনকেরই জন্য নিজের সমস্ত জীবনের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, আশা আনন্দময় সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সবই নিঃশেষ করিয়াছে। অসহায় জীবন-তরীর একমাত্র কাণ্ডারী আজ এই যে বিশ্বজননীর চেয়েও অধিক বরেণ্যা, মূর্ত্তিমতী দেবী তাহার মা—সেই মাকেই সে হারাইতে বসিয়াছে, সেও তো সেই তাহারই জন্য।

তাহার এই চিরদুঃখিনী মায়ের প্রতিই বা তাঁহার কি ব্যবহার? পিতার আদেশ! যদি পিতৃবিদ্বেষী দুঃখীর মেয়েকে নিরপরাধে বিদায় দিয়া তিনি শ্রীরামচন্দ্রের মত তাঁহার স্মৃতির ধ্যানে জন্ম কাটাইতেন, নিশ্চয়ই তিনি আজ বিশ্বের বরণীয়, সাধারণের সকরুণ সহানুভূতির পাত্র, অজিতের ঈশ্বর। কিন্তু পিতার আদেশে তিনি কি করিয়াছেন? না অগ্নি দেবতা সাক্ষ্য, বেদমন্ত্রে গ্রহণ করা সাধ্বী সতীর মস্তকে বৃথা কলঙ্কের পসরা চাপাইয়া দিয়া, তাহাকে নিঃসহায় জলের মত ঠেলিয়া ফেলিয়া, সুন্দরী ধনী কন্যা বিবাহ করিয়া, পরম শান্তিতে জীবন কাটাইতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র যেমন লোকাপবাদে সীতাবর্জ্জন করিয়াছিলেন, হিরণ্ময়ী জানকী-মূর্ত্তি দ্বারা তাহার পরে তাঁহার প্রেম ও শ্রদ্ধা সহস্রগুণেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। আর ইনি? স্বার্থ,—আত্মতৃপ্তি,—এই কি ত্যাগের রূপ? এই অজিতের পিতা। এর চেয়ে মাতৃগর্ভে অজিত মরে নাই কেন?

নিতাই ঘোষের মা, ঘোষ-গৃহিণী মনোরমাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে যত্ন করেন। উঁহার পথ্য ও অজিতের জন্য ভাত লইয়া আসিয়া খাওয়াইয়া গেলেন। মনোরমাকে বলিলেন "এই তো মা, তোর ছেলে পেয়েছিস্। নে' এখন শীগ্‌গির করে ভাল হয়ে উঠে, ছেলে নিয়ে ঘর করনা কর।"

মনোরমার শীর্ণ অধরে অতিক্ষীণ হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। "আর আমি ভাল হয়েছি, মাসিমা। তা' না হলেও কোন দুঃখ ছিল না, যদি অজুর একটা কিনারা দেখে যেতুম।"

ঘোষ-গৃহিণী কহিলেন "বালাই, ষাট! ও কথা কি মুখে আনে মা! এত যে কষ্ট করে ছেলে মানুষ করলি মনো, তা ওর একটি বৌ' দিয়ে নাতির মুখটি দেখ,—অজিতের একটি ভাল চাকরী হোক। তবে তো তোর দুঃখ পাওয়া সার্থক হবে।"

মনোরমার চোখে জল আসিল "মরণ কি অত সুবিধে দেখে আসে মাসিমা; তার সময় হলেই সে টেনে নেবে। তা নিক মা, কিছু ক্ষতি নেই। তবে অজু যে আমার একেবারেই অনাথ হবে, এই ভেবে মরবার আনন্দেও আমার বাধা পড়ে।" মনোরমার গাল বাহিয়া ছোট দুইটি বিন্দু অশ্রু নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িল; সে তাহা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসিল।

অজিতকে মনোরমা এক সময় বলিল, "প্রয়াগে গিয়েই জ্বরটা খুব বাড়াবাড়ি হয়ে ওঠে। ডাক্তার আনালে তিনি বলে যান যে, হয় ত কোন্ সময় 'হার্ট ফেল' করবে। ওরা তোকে 'তার' করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তা অনর্থক কেন তোকে কষ্ট দেবো,—কলেজটাও কামাই হবে। একলা অত দূরে তুই যাবিই বা কি করে? এই সব ভেবে-চিন্তে আমিই বারণ করলুম। তা' সেখানে মলে তো খুবই ভাল হতো অজিত! কিন্তু, তোকে একটিবার চোখে না দেখে মরণও তো আমার হলো না। তাই আবার মরতে মরতেও এই অগঙ্গার দেশে ফিরে এলুম।"

অজিত কিছু না বলিয়া মা'র বুকে মুখ লুকাইয়া রহিল। বুকের মধ্যে তাহার কি অনুশোচনার আগুনই যে জ্বলিতেছিল! কেন সে মাকে দারুণ রোগ-শোকের মাঝখানে একা ফেলিয়া রাখিয়া বি-এ পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল! পূজার ছুটীতে আসিয়াও যখন মাকে ম্যালেরিয়া জ্বরের আক্রমণ-পীড়িত দেখিল, তখনও যদি নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়া, মাকে লইয়া কোথাও একটু স্বাস্থ্যকর স্থানে যেমন-তেমন একটা চাকরী লইয়া চলিয়া যাইত, তো, আজ সে মাতৃহীন হইতে বসিত না। তাহার এ দুঃখ যে লোক-সমাজে প্রকাশেরও অতীত।

ছেলের মুখ দেখিবার দুরন্ত লোভে যে শক্তি এই দুর্

রে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া, মনোরমা কষ্টবহুল দীর্ঘ পথ তিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ঈপ্সিত বস্তু লাভ করিতেই, া-শক্তির প্রবল উত্তেজনার বলে বলীয়ান চিত্ত তাহার কালেই যেন ততোধিক হাল ছাড়িয়া দিয়া, তাহাকে লে ভাসাইয়া দিল। মৃত্যুর ভীষণ আক্রমণ সে নিজের াস্ত দুর্ব্বল শরীরে একান্ত ভাবেই অনুভব করিয়া, সতৃষ্ণ েধ কেবল ছেলের মুখের দিকেই চাহিয়া থাকিল। আর একটা গোপন বাসনা অন্তরের অতি নিভৃত কন্দরে িহিত ছিল, সেই প্রবল ও একান্ত বাসনাবেগে তাহার স্পন্দিত হৃদপিণ্ড মধ্যে মধ্যে দুলিয়া-দুলিয়া উঠিতে লাগল।

অনেকক্ষণ নীরব দ্বিধায় কাটাইয়া, অবশেষে মনোরমা অজিতের কণ্ঠে নিজের বলহীন বাহু বেষ্টন করিয়া, হাতে তাহার চিবুক ধরিয়া, আনত মুখখানা তুলিয়া তে চেষ্টা করিয়া বলিল, "না, তুমি অমন করে থেকো না মণি! তোমার ওরকম মুখ আমি যে সইতে পারি নে। রে অজিত! আমি যখন চলে যাবো, বড্ড কি তুই তর হবি? না বাবা আমার, বেশি কান্নাকাটি করে রটাকে মাটি করিসনে ধন, কেই বা তখন দেখবে কে!—তাই ভাবি।"

অজিত আর পারিল না, মায়ের বুকে অবোধ শিশুর মুখ লুকাইয়া ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "বৃথাই এসময়ে এছিলাম মা! তোমায় শেষ পর্য্যন্ত শুধু ভাবালাম; কিছুই তোমার করতে পারলাম না।"

মনোরমা ধীরে-ধীরে অজিতের মাথায়, পিঠে, অঙ্গুল ইয়া দিতে-দিতে ধীরকণ্ঠে কহিল, "আমার জন্য কিছু তে চাস অজিত?"

চকিতে অশ্রু পরিপ্লুত মুখ উঠাইয়া, অজিত জিজ্ঞাসু মার পানে চাহিল,—"কি করবো, বলে দিন।"

মনোরমার ক্ষীণ কণ্ঠ বাধিয়া থামিয়া গেল। সচেষ্টায় সেই স্বর ফুটাইয়া তুলিয়া, ছেলের দৃষ্টি হইতে নিজের দৃষ্টি াহার করিয়া লইয়া মনো কহিল, "শেষ সময়ে একবার য় তাঁকে এনে দেখাতে হবে। আর একদিন তুই ার কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলি,—কিন্তু তখন ঠিক সময় ন,—এখন হয়েছে। পারবি, অজিত?"

অজিতের শিথিল, বিকল স্নায়ুতন্ত্রী উত্তপ্ত শোণিতের খরস্রোতোদ্দীপ্ত হইয়া অল্প নিমেষে সজাগ সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার বিশাল, কৃষ্ণ নেত্র তারকার মধ্য হইতে, কাল কয়লা যেমন অগ্নিবর্ণ হইয়া জ্বলিয়া উঠে, তেমনি করিয়া এক পশলা অগ্নিবৃষ্টি হইয়া গেল। মুমূর্ষু জননী একমাত্র সন্তানের হাতে ধরিয়া আগ্রহ ব্যাকুলকণ্ঠে মিনতি করিয়া বলিতেছেন "বল অজিত, কথোন শেষ একবার তাঁকে— আমার ইষ্টদেবকে এনে আমায় দেখাবি? আজ আঠারো বৎসর হয়ে গেল দেখি নি, শেষের দিনটা ওঁর পায়ে মাথা রেখে মরণটাকে সার্থক করে যাই। পারবি নে, বাবা!"

আসন্নবর্ষী ভীমকান্তি জলদমধ্য হইতে পতনোন্মুখ অশনি যেমন করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, তেমনি করিয়া এই মৃতকল্পার করুণ আবেদনের উত্তর আসিল "পারবো না, মা!"

আহত মরণাপন্নকে যদি তাহার আঘাত ক্ষতের উপর আবার কোন নির্ম্মম আঘাত করা যায়, তবে সে যেমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, ঠিক তেমনি মৃত্যুবিলাপের অর্দ্ধোক্তিতে মনোরমার মুখ দিয়া বাহির হইল "অজিত! অজিত!"

কিন্তু অজিত তখন মা হারানোর আসন্ন শোকে অকস্মাৎ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। পিতাকে তাহার মায়ের সকল দুর্দ্দশার মূল, এবং তাঁহাকে তাঁহার মাতৃঘাতী মনে করিতেই, তাঁহার উপরে নিদারুণ বিদ্বেষে সে যেন ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়া, চীৎকার করিয়া বলিল, "না মা, সে হবে না। কিসের জন্যে তাঁর পায়ে মাথা তুমি রাখতে যাবে? যিনি তোমার এই দশা ঘটিয়েছেন—তাঁকেই তুমি দেবতা বলে পূজো করো!"

সম্মুখে আবির্ভূত প্রেতমূর্ত্তির পানে আতঙ্কিত দর্শক যেমন চাহিতেও পারে না, এবং সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরানোও যেমন অসম্ভব হয়, তেমনি করিয়া প্রাণাধিক সন্তানের মুখের দিকে বিস্ময়াতঙ্ক নিবদ্ধ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া, বিহ্বল কাতর কণ্ঠে মনোরমা কহিল, "আমি ফিরে এসেই তোমায় দেখে বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার সে অজিত আর নেই। অজিত! দেবতাকে দৈত্য বল্লেই তাঁর দেবত্ব লোপ পায় না, নিন্দুকেই নিজে দুঃখ পায়।" অজিতের সর্ব্বাঙ্গে তখন বিদ্যুতের ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিয়াছে। দুই কর্ণ ভরিয়া শুধু প্রলয়ের ঝড়ের গর্জ্জন ব্যতীত আর কিছুই সে শুনিতে

পাইতেছিল না। তাহার দুই চোখের সম্মুখে মায়ের পাংশু বিবর্ণ মুখ, অতি-ব্যাকুলতা ভরা আহত দৃষ্টি,—সমস্তই যেন অন্ধের চক্ষে জগতের মত অন্ধকারের ঝাপসায় মিলাইয়া গিয়া, তাহার স্থলে অগ্নিময় লেখার অক্ষরে তাহার পিতৃগৃহের রাজৈশ্বর্য্যের মাঝখানে সম্পদ-স্বর্ণ প্রতিষ্ঠিতা বিমাতার মুখ ফুটিয়া উঠিয়া তাহার চোখ দুইটা দগ্ধ করিয়া দিতেছিল। যে মানুষ নিজের বিবাহিতা দুই স্ত্রীর মধ্যে এতবড় পার্থক্য রাখিতে পারে, দেবতার আসন আজ তাঁহারই প্রাপ্য! এতবড় ছলনার খেলা অজিত কেমন করিয়া খেলিবে? যিনি তাহার মায়ের মুখ চাহেন নাই, যাঁহার অবিচারের দণ্ড মাথায় বহিয়া, মা তাহার শুধু অম্বরেরই নয়, সাংসারিক দারুণ দৈন্যেরও আঘাতে-আঘাতে আজ এই অকাল মৃত্যুর দ্বারে সমাসীনা,—সেই তিনি দেবতা? অজিতের তিনি যত ক্ষতিরই কারণ হোন, অজিত তাহা ভুলিতে পারে; কিন্তু মায়ের এই অনাহারে মৃত্যু,—সে কি জীবনে কখনও ভুলিবার? উত্তেজিত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "কা'কে তুমি দেবতা বলো মা? আমি যে নিজের চোখে তাঁর সমস্তই দেখে এসেছি। তোমায় এমনি করে ডুবিয়ে দিয়ে, যিনি সুখৈশ্বর্য্যে অমন করে ডুবে আছেন, কেমন করে তাঁকে দেবতা মনে করবো আমি?"

"অজিত! দেবতাকে যে মাটি-পাথর দিয়েও গড়ে নে'ওয়া যায়; নির্ভর করে নিজের মনের নিষ্ঠায়,—বাবা!—বাইরের উপাদানে নয়। তুমি কাছে গিয়ে তাঁর বাইরের সম্পদটাই চোখে দেখতে পেয়েছ, কিন্তু অন্তরের শূন্যতাটা তো আর চোখ দিয়ে দেখা যায় না। আমি যে দিবারাত্রি ধরে তাঁর সেই নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ মর্ম্মব্যথা নিজের মনের মধ্যে অনুভব করছি! অজিত! অজিত! মরবার সময় তুই এমন করে আমার বুক ভেঙ্গে দিলি, এ আমি যে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি! বিশ্বনাথ! মা অন্নপূর্ণা! তোমাদের ছেড়ে আমি যে অঙ্ক থেকে মত্ত হয়ে ছেলের কাছে মরতে এসেছিলাম, এ তারি উচিত শাস্তি আমায় দিলে!"

একখানা ভাড়াটে গাড়ী হইতে নামিয়া মোটা রাঙ্গাপেড়ে সাড়ি-পরা, বিছানার চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত একটি নারী সেই জনবিরল অট্টালিকার প্রত্যেক গৃহে-গৃহে নিজের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিপাত করিতে-করিতে, শেষে এই করুণ দৃশ্যের মাঝখানে পৌঁছিয়া, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। গৃহ পূর্ণ-দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক, সজ্জাবিহীন; শয্যা মলিন, এবং তাহারই উপর সকাল বেলার ধূসর আকাশে নিষ্প্রভ নক্ষত্র-বিন্দুর মত জ্যোতিঃলেশহীনা অতুলনীয়া রূপসী নারীর নিষ্পন্দ বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া এক অসহায় বালক দুই হাতে তাহার মুখ ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে, আকুল ক্রন্দনে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া ডাকাডাকি করিতেছে—"মা, মাগো! ওমা! মা!—"

আগন্তুকা ক্ষণকাল বজ্রাহতবৎ নিশ্চল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। তার পর কাছে আসিয়া অজিতের হাত ধরিয়া, উহাকে উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন "অমন করে শুধু বুক ফাটিয়ে ডাকলেই মাকে জাগাতে পারবি বাবা! যা দেখি, একটু দুধ কি জল নিয়ে আয় দেখি।"

অজিত কাঁদিতে কাঁদিতে অনুজ্ঞা পালন করিয়া ফিরিয়া আসিল। দেখিল, অপরিচিতা চিরপরিচিতের মত তাহার মায়ের অবসাদ-জড়িত মস্তক নিজের অঙ্কে তুলিয়া লইয়া, মুখের উপর অঞ্চলের বাতাস দিতে-দিতে তাঁহার কাণের কাছে নত হইয়া প্রীতি-মধুর কণ্ঠে ডাকিতেছেন, "দিদি! ও দিদি!" অজিতের ভয়ার্ত্ত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"ভয় কি বাবা তোমার মার মূর্চ্ছা হয়েছে বৈ ত না! ও এক্ষুণি সেরে যাবে।"

এই বলিয়া তিনি নিজের সেবা কুশল ক্ষিপ্রতার সহিত অজিতের মার মূর্চ্ছাতুর অবসন্ন শরীরের প্রতি একান্ত মনোযোগ প্রদানপূর্ব্বক, অজিতকে চমৎকৃত, বিস্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিলেন।

ক্ষণপরে সুদীর্ঘ ক্লান্ত শ্বাস কষ্টের সহিত মোচন করিয়া, মনোরমা পাশ ফিরিয়া শুইল; এবং ইহারও আর একটু পরে, তাহার দলিত গোলাপ-পাপড়ীর মত শুভ্র অধরে ঈষৎ শোণিতাভা ফুটিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধস্ফুট ক্ষীণ স্বরে নির্গত হইল -"অজিত!"

"মা, মা, আর আমি কখনও আপনার মনে কষ্ট দেবো না মা, এইবার শুধু আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"—এই কথা বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, অজিত মায়ের অর্দ্ধ শীতল পা দুখানা চাপিয়া ধরিয়া, তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল। এ দৃশ্য দর্শনে অপরিচিতা নারী সহ

চ-মনে চমকিয়া উঠিয়া, সামনেঝে মুখ ফিরাইয়া ইলেন।

"দিদি! দিদি! আমি যে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত রতে এসেছিনুম,—তার জন্যে এতটুকু অবসরও আমায় মি না দিলে ভাই!"

"তোর তো কোন পাপ নেই, রাণি। প্রায়শ্চিত্ত তুই সের করবি! না—না, অমন করে কাঁদিসনে বোন,—মার মনে কোন ক্ষোভ নেই। তোর উপর—ঈশ্বর জানেন কোন দিনই আমি এতটুকু বিদ্বেষ করিনি। আজও এই ন্তিম আশীর্বাদ অন্তরের সঙ্গেই করে যাচ্ছি,—তুমি বিত্রীর সমান হও।"

ব্রজরাণী কাঁদিতে-কাঁদিতে সপত্নীর মৃত্যু-যাতনায় ক্লিষ্ট ষ্ক অধরে চামচে করিয়া জল দিল। কাঁদিতে কাঁদিতেই ল, "আমি বড় আশাতেই নিরাশ হলেম!—আমি আর বোব কি বলো দিদি, তোমার পায়ের ধুলো যেন একটু ই। উঁকে আমি কি আর এ আঘাতের পর বাঁচিয়ে খতে পারবো? তাঁর অন্তর যে তোমাতেই ভরা।"

"রাণি! বোনটি আমার! নিশ্চয় তাঁর ভালবাসার একটা তুমিই পেয়েছ। তিনি তো কারুর সম্বন্ধে বিচার করতে পারেন না ভাই!"

ব্রজরাণী দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিল। তার পর সহসা স্বরে, রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "দিদি, আজ বুঝলাম, মায়-আমায় প্রভেদ কোন খানে!—আজ আমি সর্বান্তঃকরণে বলছি ভাই, যদি ঈশ্বর থাকেন, পরলোক সত্য হয়, হলে জন্ম জন্মান্তরে বা লোক-লোকান্তরে তোমার স্বামী মার তোমারই থাকবেন। শতকোটী ব্রজরাণীর সাধ্য না যে, তাঁকে তোমার কাছ থেকে আর একচুল য়ে নেয়।—তা ভাই, আমার ভাগ্যে তাতে যা থাকে ক,—আমি যেন তোমার সঙ্গে স্বামী নিয়ে আর গাভাগি না করতে যাই,—এই বলো।"—বলিতে-বলিতে এই স্বামীগতপ্রাণা নারীর দু'চোখ দিয়া তপ্ত অশ্রু জলের ঝরণা বহিয়া পড়িল; এবং তাহার আত্মতৃপ্তিহীন শূন্য জীবনটাকে, যেন শুধু আজিকার মতই নয়, অনাগত সময়ের মহাকালটার জন্যই, গভীর অবসাদগ্রস্ত মহাশূন্যতায় শূন্যময় এবং একান্তই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। ইহার পর আর যেন তাহার ইহপরলোকে কোথাও কিছু বাকী রহিল না।

মনোরমার স্তিমিত নেত্র প্রদীপেও তাহার সেই বলিদান, ক্লিষ্ট মুখের মৃত্যু-পাণ্ডুতা প্রতিভাসিত হইল। সহানুভূতি ও স্নেহে পরিপ্লুত হইয়া তাহার প্রায় নিশ্চল হৃদ্‌তন্ত্রী আবার একবার নিজের সর্বশেষ শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রাণপণে বাজিয়া উঠিল। কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিয়া মনো কহিল, "কেন বোন, মনে তুমি কষ্ট রাখছো? এ জন্মে যা হবার সে তো হয়েই গেছে। এবার আমরা দুটি বোনে পাশাপাশি বসে যে তাঁর ওই চরণের সেবা করবো ঠিক করে রেখেছি। এখন এই বাকী দিন কটার জন্য এই নে ভাই, তোর ছেলেকে তুই একবার কোলে নিয়ে বোস, দেখে আমি চোখ মুদি।—অজিত, তোর ছোট মাকে প্রণাম করলি নি?"

পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত ও নির্বাক অজিত স্বপ্নাবিষ্টের মত নিকটে আসিতেই, তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া ব্রজরাণী কহিয়া উঠিল, "প্রণাম থাক, যদি তোমার এই রাক্ষসী মা'কে সত্যিই ক্ষমা করতে পেরে থাক, অজিত, তা'হলে একবারটী আমায় তুমি 'মা' বলে ডাকো। তোমার মুখে ঐ নাম শুনবার জন্যে সেই তোমায় প্রথম দেখার দিন থেকে আজ এই পাঁচ বৎসর ধরে আমি যে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি!"

তখন মাটিতে ব্রজরাণীর পদপ্রান্তে মাথা রাখিয়া গদগদ স্বরে অজিত ডাকিল—

"মা!"

সমাপ্ত

।। রক্ষণশীলের সাধের এপিগ্রামই এই যে, কোনো জই এ পৃথিবীতে এই সবে প্রথমবার করা হইতেছে, হইতে পারিবে না। গ্যালিলিওর দূরবীণ দিয়া কেহই খিতে রাজি হইল না, ডারউইন্ উন্মাদ পাগল, ক্লিনেষণ বাজে, যত নূতন ব্যারাম সব কাল্পনিক, মাবিশ্লেষণ দুর্নীতিমূলক, 'ঘরে-বাইরে' বীভৎস, টল্ বিল্ সর্বনেশে,—কারণ কি, যা' কিছু নূতন, যা' ছু সবুজ, তা'ই যূথ সংস্কারের সঙ্গে চালে-তৈঁতুলে। পর্যাপ্ত-না নব অভিজ্ঞতা যৌথ মতজালের মধ্যে কালে-লে অঙ্গীভূত হইয়া যায়, সেই পর্যান্ত নূতনের এই দশা। নীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য এবং সর্ব্ববিধ সাধারণ য্য সম্বন্ধীয় সপক্ষ আর বিপক্ষ যত মতামত আছে, ই এই যূথ সংস্কারের দ্বারা নিয়মিত হয়। যতই তর্ক ক, কেহই বিষয়ের অপর দিকটা ত' দেখিবে না। ভাবগ্রায় বিচারকে স্থগিত রাখাই নিরুপদ্রব ; এক-কা একটা মত প্রকাশ না করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ঈদৃশ সংস্কার এতাদৃশ সুবিবেচনার পরিপন্থী। বরঞ্চ া যায়, সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি, যতই দিন যায়, আপন সের অনুকূলে আরও যুক্তি লাভ করে ; এবং তা'র দম বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতে থাকে। অর্থাৎ বিশ্বাস স আগে, বিশ্বাসের হেতু-প্রদর্শক যুক্তিজাল আসে । সমুদায় বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মূলে এই ারটি রহিয়াছে। একে বাংলায় "যুক্তি-যোজন" ationalisation) বলিতে পারি। অবশ্য বৈজ্ঞানিক ার অনুকূলে ও প্রতিকূলে দুই ভাবেই এর ব্যবহার ।

তা' হইলে প্রশ্ন এই, আমাদের কোনো একটা বিশেষ র যৌক্তিকতার কষ্টি-পাথরটা কোথায় ?

যদি দেখি যে, আমাদের মতটা এমন একটা মনোবেগের দাঁড়াইয়া আছে যে, মনে হয়, এতৎ-সম্বন্ধে অধিক ন্ধান অনাবশ্যক, নিরর্থক ও বাজে,—আর এ-ছাড়া রকম মত পোষণ করা বোকামি, স্বদেশদ্রোহিতা ও গুতা, তা' হইলেই বুঝিব যে গলদ আছে। আর, যদি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই ক্তিসঙ্গত।

কেবল বুদ্ধি-বৃত্তির উপরে নয়, নীতির উপরেও এই সংস্কারের প্রভাব। যখন মানুষ এমন একটা কিছু করে, যা' সে জানে যে তার বন্ধুদের মনোমত হইবে না, তখন তার মনে নির্ব্বাসনের অস্বস্তির মত একটা ভাবের উদয় হয়। এই এক রকম পাপ-বোধ। আর যখন জানে, এ-কাজে লোকের প্রশংসা পাইবে, তখনই উল্লাস। এই নীতি-বোধের গোড়া,—এরই সঙ্গে বিবেকবাণীর অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অযথবদ্ধ একক প্রাণী যে, সে যা' খুসি তা' করিতে পারে ; নিজের ছাড়া আর তা'র কা'র তোয়াক্কা ?

ব্যক্তির আত্মরক্ষা, শরীর-পোষণ ও মৈথুনের সহজ সংস্কারের সঙ্গে এই যূথ সংস্কারের একটা মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ গুলো ভিতর হইতে একটা ক্ষণিকের উত্তেজনায় ঘটে ; আর এ বাহির হইতে বাধার মত কার্য্য করে,—এইখানেই সংযমের সূত্রপাত। দুধের শিশু যে, সে অপরের সুবিধা অসুবিধা দেখিয়া আপন দুরন্ত ইচ্ছা দমাইতে শেখে, পেটুক হইবে না, স্বার্থপর হইবে না।

তার পর কালে-কালে যখন মনে যৌন বাসনা জাগে, তখন সে দেখিতে পায়, অতি কড়া সব অনুশাসন-জাল ;—তখন দশাজ্ঞা পালন করাই তা'র সংস্কার দাঁড়ায়। এই সব বাসনাকে ত থামাইতে হইবেই ; তার যোনি-মণ্ডলকেও দেখিতে দিতে হইবে না, ও-সব সম্বন্ধে কথা বলিবে না।

বাৎস্যায়ন পড়িবার জন্য শব্দর কায়া-পরিবর্ত্তন করিবেন। অর্থাৎ যা' কিছু যৌন ব্যাপার, সব আক্ ঢেকিয়া রাখিতে হইবে ; এই জন্যই মনোবিশ্লেষণের এই দুরবস্থা। স্ত্রী রোগ-বিজ্ঞানেরও কিছুদিন পূর্ব্বে এই অবস্থা ছিল।

আসল কথা, সহজ-সংস্কারই আমাদের সমুদয় মনোজীবনের রাজা। প্রফেসার ইউং মনের যে শক্তিকে "horme" আখ্যা দিয়াছেন, তা' এই সহজ-সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। যৌন-সংস্কার সম্পর্কে যে ব্যাপারটাকে "libido" বলা হয়, তা'ও এই "horme"। আমাদের ভাষায় ও জিনিসটিকে আমরা "কাম" বলিতে পারি ;—কেন না, সংস্কৃত শাস্ত্রে কামের একটা প্রশস্ততর মানেও আছে।

যেমন জড়-শক্তি কখনও গতি, কখনও শব্দ, কখনও উত্তাপ, কখনও আলো, কখনও বিদ্যুৎ, কখনও বা রাসায়নিক ক্রিয়ার আকারে আপনাকে প্রকাশ করে, তেমনি

প্রতি মানবের চিৎ-জগতে যে কাম-পুঞ্জ—যে "horme" আছে, সে কখনও চুপ করিয়া নাই; সে কখনও এদিকে কখনও ওদিকে তার কাজে চলিয়াছে। এ কখনও হ্রাস পায় না। কখনও যদি কোনো লোকের ভিতরকার এই চিচ্ছক্তির খানিকটা অংশ হারাইয়া গেছে বলিয়া মনে করার কারণ ঘটে, তবে সেই হারানো অংশ খুঁজিয়া বাহির করা একান্ত দরকার।

সংস্কারগুলির মধ্যে অনবরত একটা খেলা চলিয়াছে। যেমন উপলক্ষ ঘটিতেছে—একটা আসিতেছে, আর একটা যাইতেছে। কিন্তু যখন মুখ্য সংস্কার দ্বারা অনুপ্রেরিত কোনো একটা আবেগ অপর কোনো সংস্কারের দ্বারা পরাভূত ও বিদূরিত হইবার উপক্রম হয়, তখনই বিরোধের সূত্রপাত। তখনই মানব জীবনের সমস্যা উপস্থিত হয়। প্রেম এবং কর্ত্তব্যের চিরন্তন দ্বন্দ শিল্প-সাহিত্যের সনাতন উপজীব্য। কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরাজয়, অর্থাৎ—যা একই কথা—মুখ্য সংস্কারের পরাভব যদি ঘটিল, তখনই আহত বিবেক-বুদ্ধিকে শান্ত করার জন্য কোনো উপায় বাহির করার দরকার উপস্থিত হয়।

বিরোধের সমাধান চার উপায়ের এক উপায়ে হইতে পারে।

এক,—মুখ্য সংস্কারের প্রভাব স্বীকৃত, কিন্তু স্বেচ্ছায় অবমানিত, হইতে পারে;—অবাধ্য ব্যক্তি ঘোষণা করিবে যে, তা'র যা খুসি করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। মুখ্য সংস্কার এত বলবান যে এই প্রণালীটি সর্ব্বদাই অতি শক্ত; কিন্তু কে না জানেন যে, ঈদৃশ অবিবেকী জবরদস্ত আদমির অসদ্ভাব নাই।

দুই,—"যুক্তি-যোজন"এর দ্বারা মনকে চোখ-ঠারা যাইতে পারে। দোষী ব্যক্তি বলিবে,—আমি এমন লোকটা মন্দ না ত। নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিকের ত্রুটি করি নে, দানধর্ম্ম আছে, রোজ গীতাপাঠ করি, হরিসভায় যাই।

তিন,—যতই দিন যায়, অস্বস্তির অনুভূতিটি মৃদু হইতে-হইতে লোপ পাইতে পারে। লোকটি অন্য-অন্য নানা কাজের মধ্যে আপনাকে ব্যাপৃত করিয়া ফেলিবে। ঠিক যেমন, প্রিয়বন্ধু আজ মারা গেলে কাল দু'দিন। শোকের তীব্রতার উপশম যে প্রণালীতে ঘটে, এ প্রণালীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

চার,—জাগ্রত চৈতন্যের মধ্যে ব্যাপারটার পরিপাক হয় ত হইবে না। স্মৃতিটা তাই চৈতন্য-লোক থেকে এক রকম নির্ব্বাসিত, কিন্তু মন থেকে বিদূরিত নয়। মানে এই ব্যাপারটাকে মনের এমন এক নিভৃত কোঠায় ঠেলিয়া ঠাসিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়, যেখানকার অন্ধ-কারাগার থেকে তা'র আর সংবিদের খোলা আলোয় ফিরিয়া আসার উপায় থাকে না।

এই নিষ্পেষণের ঠাসাঠাসি কিন্তু মধ্যে-মধ্যে ফাঁসিয়া যায়। তখন চাই-কি লোকটা বেফাঁস বকিতে পারে।

আর তখন ব্যাপারটা যে আসলে কি ঘটে, তাই আমরা ক্রমশঃ দেখিতে চেষ্টা করিব।

ঈমানদার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

নিতান্ত অধৈর্য্য উৎকণ্ঠিত অবস্থায় কোন মতে রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কাটাইয়া, রাত্রি থাকিতেই উঠিয়া, ফৈজু চটির দিকে চলিল। পিতা বাড়ীতে ছিলেন না। নজিরুদ্দীনের পুত্রটি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে মারা গিয়াছিল। নজিরুদ্দীনকে পাওয়া যায় নাই, কাযেই, শিশুর সৎকারের জন্য তিনিই লোক সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। পিতার সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষায় ফৈজু বসিয়া থাকিতে পারিল না। বিদায়ের সময়ে, সে স্ত্রীকে বলিয়া গেল, সে এখন আর আসিবে না,—জয়দেবপুরের সমস্ত কাজ গুছাইয়া, একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া কিছুদিন পরে বাড়ীতে আসিয়া বাস করিবে।

নির্জ্জন পথ, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রি। ঝোঁপ ঝাঁপের পাশ, জলাভূমি, ও বড়-বড় মাঠ পার হইয়া লাঠি

ও কৈজু দ্রুতপদে চলিল। এমন কত অন্ধকার রাত্রে, সব অতি নির্জ্জন পথে, এমন ভাবে একলা যাতায়াত রয়া, তাহার সাহস ক্রমশঃ খুবই বাড়িয়া গিয়াছিল। নিত্য নস্ত, একান্ত সরল পথের মতই, সে অতি সহজে সেই জন পথে নির্ভয়ে চলিল।

চটি পৌঁছিতে আর প্রায় আধ পোয়া পথ বাকী, এমন র সামনের দিক হইতে সহসা উৎকট সুরাগন্ধ য়ার ভাসিয়া আসিয়া কৈজুর চমক ভাঙাইল! বিস্মিত য়া কৈজু চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কেহ কোথাও নাই! জু সিদ্ধান্ত করিল, চটির কাছে যে মদের ভাটি আছে, হয় বা তাহারই কোন ক্রিয়া কলাপের সৌগন্ধ কোন রূপে তাসে ভাসিয়া আসিয়া থাকিবে। তবু সাবধানের বিনাশ ই,— লাঠিটা সে দৃঢ় হস্তে চাপিয়া ধরিয়া, সতর্ক ভাবে দিক ওদিক চাহিতে-চাহিতে চলিল। রাত-বিরাতে এ-সব থ আনাগোনা করিতে হইলে, মাঝে-মাঝে দু'একটা ভীষণমূর্ত্তি নিশাচর চোখে পড়িয়া থাকে,—কৈজুরও ড়য়াছিল। দু'একবার প্রথামত আলাপ পরিচয়ের উদ্যোগও য়াছিল; কিন্তু, কৈজুর লাঠির বিক্রমে, পরাহত প্রতিদ্বন্দ্বীর , বন্ধুদের আদব-কায়দা দেখাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে ফিরিয়া গিয়াছে। মদের গন্ধ পাইয়া কৈজুর একটু শঙ্কত হইল, আজও বুঝি বা তেমনি করিয়া কেহ 'দোস্তি রতি' পাতিতে আসে!

কৈজু যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, মদের গন্ধ ততই ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। কৈজুর সংশয় ক্রমে শ্বাসে পরিণত হইল, নিশ্চয়ই তবে এইখানে কেহ কাছা-াছিই আছে।

হঠাৎ নির্জ্জন পথ চমক-মুখর করিয়া, স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাসে স্ফুসিত কৈজু উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিল, 'বদ্‌তেরা সমোঝারে ওয়া!'

পরক্ষণে অদূরে ঝোপের ভিতর হইতে নিরেট বাঁশের াউড়া বাড়ি' ছুটিয়া আসিয়া কৈজুর পায়ের কাছে পড়িল! াক্রমণকারীর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, হয় তাহার হাতের াষে, নয় তাহার চোখের দোষে; নচেৎ এ লাঠির তাক্ ক হইলে কৈজুর পা ভাঙ্গিয়া যাইত।

এক পা পিছু হটিয়া দাঁড়াইয়া, রূঢ় স্বরে কৈজু বলিল, 'কাই দুস্‌মন্ হ্যায় রে?"

সঙ্গে তাহার পাশের ঝোপ হইতে দুইজন মুখস্-পরা, পাগড়ীওয়ালা লোক এক-যোগে লাফাইয়া পড়িয়া,—দুইখানা গুপ্তি খুলিয়া, একসঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করিল। কৈজু আর এক পদ পিছু হটিয়া লাঠি উঠাইল। একজন নিজের মাথা বাঁচাইবার জন্য গুপ্তিখানা মাথার উপর আটক রাখিয়া সভয়ে পাশ কাটাইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি কৈজুর হাত লক্ষ্য করিয়া গুপ্তিখানা দূর হইতেই ছুটিয়া মারিল! এবারও তাক্ ফস্কাইল! হাত বাঁচিল; কিন্তু, কাঁধের উপর দিয়া, জামা কাটিয়া, খানিকটা চামড়া আঁচড়াইয়া, ছুরিখানা পিছনে গিয়া পড়িল।

আঘাতটা মনোযোগ দিবার মত মোটেই কৈজুর বোধ হইল না। সে স্বচ্ছন্দেই আত্ম-সংযম করিয়া, স্থির-লক্ষ্যে লোকটার মাথায় লাঠি বসাইল! আর্ত্তনাদ করিয়া লোকটা সশব্দে ধরাশায়ী হইল। সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সঙ্গীটা একলাফে পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া পড়িয়া উদ্ধশ্বাসে ছুট দিল!

পিছনে আর একটা লোকের দ্রুত পদশব্দ পাইয়া, কৈজু তীরবেগে ফিরিতে না ফিরিতে,— বাম কাঁধের পিছু হইতে পিঠ ও পাঁজর চুম্বন করিয়া, আর একখানা শাণিত ভোজালীর তীক্ষ্ণ স্পর্শ,— পিছলাইয়া চলিয়া গেল! জামা ছিঁড়িয়া, চামড়া মাংস কাটিয়া, এবার খরস্রোতে রক্ত-ধারা ছুটিল। এবারের আঘাত কৈজু অগ্রাহ্য করিতে পারিল না। সরোষে উত্তেজিত হইয়া ক্ষিপ্তের মত লাঠি তুলিয়া সজোরে ছুঁড়িল। কিন্তু এ ব্যক্তি তাহার সঙ্গীদের মত অশিক্ষিত নয়। কৌশলে হেট হইয়া সে লাঠির পাল্লা এড়াইল,— লাঠি মাঠে পড়িল! আততায়ী ভোজালী তুলিয়া পুনশ্চ আক্রমণে উদ্যত হইল!

লাঠি হাত-ছাড়া হইয়া মাঠে গিয়া পড়িয়াছে,—কৈজু এবার নিরস্ত্র! পায়ের কাছে সেই 'কাউড়া-বাড়িটা' পড়িয়া ছিল,—নিরুপায় কৈজু সেইটা তুলিয়া সজোরে ছুঁড়িল। সে আঘাত ব্যর্থ হইল না,—লোকটার হাতে লাগিল,— অস্ত্রখানা মুষ্টি-চ্যুত হইয়া অদূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল! সঙ্গে-সঙ্গে লোকটাও পথের পাশে একটা ডোবার মধ্যে নামিয়া পড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইল!

পথ মুক্ত পাইয়া কৈজু, এক লাফে মাঠে নামিয়া পড়িয়া, দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত ছুটিয়া, প্রথমেই নিজের লাঠিটা কুড়াইয়া লইল। তার পর আশ্বস্ত ভাবে, সোজা হইয়া বুক

চিতাইয়া দাঁড়াইয়া, সজোরে শ্রান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, পিছন ফিরিয়া চাহিল—প্রতিদ্বন্দ্বীরা কেহ আক্রমণ করিতে আসিতেছে কি না।

আর কাহারো দেখা নাই। ফৈজু স্থির ভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষতস্থান হইতে দর-বিগলিত ধারে রক্ত ঝরিয়া, গা বহিয়া মাটীতে পড়িতে লাগিল,—ফৈজুর ভ্রূক্ষেপ নাই। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কে কি ভাবে আসিয়া এবার আক্রমণ করিবে,—শুধু তাহারই প্রতীক্ষায় সতর্ক ভাবে চারিদিকে চাহিতে লাগিল।

কিন্তু আশা ব্যর্থ হইল,—প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাহাকেও আর দেখা গেল না। চারিদিক ভীষণ স্তব্ধ! কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির অন্ধকার, চতুর্দিক আচ্ছন্ন করিয়া, স্তম্ভিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।

প্রচুর রক্তপাতে ফৈজুর দেহ ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। স্খলিত চরণে ধীরে-ধীরে পিছু হটিয়া গিয়া, সে একটা ঝোপের আড়ালে বসিল। শারীরিক অবসাদ এবং মানসিক উত্তেজনা,—দুই বৈপরীত্যের যুগপৎ সংঘাতে স্নায়ু তন্ত্রীগুলা বিকল হইয়া যেন ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। ফৈজুর ভয় হইল, মনের জোরে নিজেকে আর ঠিক রাখিতে বুঝি পারে না,—নিস্তেজ শরীরটা এবার এইখানেই বুঝি তাহাকে মাটী লওয়াইতে বাধ্য করিল।

কিছুক্ষণ পরে উত্তেজনার ঝোঁকটা একটু কাটিলে, অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইয়া ফৈজু আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পা কাঁপিতেছিল,—তবু সে টলিতে টলিতে আবার চলিল। ক্ষত মুখের রক্ত-নির্গমন-বেগ তখন মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। স্থানে-স্থানে রক্ত জমাট বাধিয়া,—ছিন্ন শিরার মুখও বন্ধ করিয়াছে। ভিতরে যন্ত্রণাও হইতেছে যথেষ্ট। কণ্ঠতালু শুকাইয়া গিয়াছে, একটু জলের জন্য বড় কষ্টও হইতেছে। কিন্তু জলাশয় নিকটে কোথাও নাই, একেবারে সেই চটির কাছে পুষ্করিণী। সমস্ত যন্ত্রণার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া, দৃঢ় পদে ফৈজু চটির দিকে চলিল। এই পথের মাঝে রক্তসিক্ত বেশে এলাইয়া পড়িলে, এখনি লোক-চক্ষে ধরা পড়িবে,—চারিদিকে বিষম হৈ-চৈ বাধিয়া যাইবে, জয়দেবপুর গমনের পথে কাঁটা পড়িবে! কিন্তু সে ক্ষতি সহ্য করা যে ফৈজুর সাধ্যাতীত! যতক্ষণ একবিন্দু ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ সে কোন প্রয়োজনের সামনে,—অক্ষম বলিয়া পরিচিত হইতে রাজী নয়! সকল বাধা ডিঙ্গাইয়া তাহাকে চলিতেই হইবে!

মাঠে মাঠে, কতকটা পথ অতিক্রম করিয়া ফৈজু আবার উঁচু পাকা রাস্তায় উঠিল। পিছনে চাহিয়া দেখিল, দূরে সুরঙ্গ-মঞ্চটা বাঁকের মোড়ে অদৃশ্য হইয়াছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, অগ্র পশ্চাতের সমস্ত পথটা ভাল করিয়া দেখিল,—জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই। যে লোকটা লাঠি খাইয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অবস্থাটা কি হইল,—একবার গিয়া দেখিয়া আসিতে ফৈজুর বড়ই ইচ্ছা হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার পলাতক সঙ্গী দুইটার, অন্ততঃ একটার, কথা মনে পড়িতেই, সে সঙ্কল্পে সে নিরস্ত হইল! সে লোকটা নিশ্চয়ই এমন আহাম্মক হইবে না, যে, ধরা পড়িবার জন্য সঙ্গীকে আহত অবস্থায় পথে ফেলিয়া পলাইবে! আহত সঙ্গীর প্রাণের জন্য দরদ না হইলেও, নিজেদের প্রাণের গরজে তাহারা সঙ্গীকে দেখিতে বাধ্য হইবে, ইহা সুনিশ্চিত।

মাথা হইতে পাগড়ীটা খুলিয়া, নিজের ছিন্ন ভিন্ন রক্তাক্ত পরিচ্ছদের উপর ঢাকা দিয়া, উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে, ফৈজু ধীর-মন্থর গমনে চটির দিকে চলিল। ভোর বেলার উন্মুক্ত মেঠো হাওয়া তাহার শরীরকে অনেকটা স্নিগ্ধতা দান করিল,—আপনা হইতেই জলতৃষ্ণা দূর হইল। ফৈজু অনেকটা সুস্থ বোধ করিয়া, ক্রমশঃ সতেজ হইয়া, গতিবেগ বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিল।

চটিতে ঢুকিবার পথেই চন্দ্র সেনের সহিত তাহার দেখা হইল। আলো হাতে লইয়া ঠিকা-গাড়ীর আড্ডা হইতে সে বাহিরে আসিতেছিল,—ফৈজুকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "আপনি নিজেই এলেন! আমি গাড়ী ঠিক করে নিয়ে আপনার জন্যে তেজপুর যাচ্ছিলুম যে!—যাক, এসে পড়েছেন, বেশ হয়েছে, চলুন গাড়ীতে ওঠা যাক্।"

উষার আলো তখনও ভাল করিয়া ফোটে নাই। তবুও লণ্ঠনের আলোর সামনে নিজের পরিচ্ছদটা ঢাকিবার জন্য ফৈজু একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এদিক-ওদিক চাহিয়া, বস্ত্রাদি সংযত করিয়া বলিল, "চলুন যাচ্ছি,—কিন্তু আপনাকে একটু কষ্ট না দিয়ে ছাড়ছি না মশাই,—আলোটা নিয়ে একবার পুকুর-ঘাটে চলুন তো!"

চন্দ্রসেন আগ্রহের সহিত বলিল, "চলুন, চলুন,—এ আর কষ্ট কি?"

[ঐ] ঘাটে উপস্থিত হইয়া কৈজু একবার চারিদিকে চাহিল। [তা]র পর চন্দ্র সেনের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যে বলিল, [প]থে আস্‌তে আস্‌তে আজ একটা গুরু বিপদ,—ঠিক [মা]থার ওপর না হলেও, পিঠের ওপর দিয়ে বটে—কেটে [গে]ছে! তিনজনে পথ আগ্‌লেছিল,—ব্যাটাদের কাছে [ছো]রাছুরি ছিল,—একটা বেয়াদব পিছন থেকে পিঠ জখম [ক]রে আমায় ভারী বেকুব বানিয়ে দিয়েছে,...... ব্যাপারটা [আ]পনাকে সাম্‌লে নিতে হবে সেন মশাই। আমি কাপড়টা [ছিঁ]ড়ে পটি পাকিয়ে দিচ্ছি,—আপনি চটপট ঘায়ের মুখে [ঠে]কিয়ে পাঁচ কসে দিন তো! তার পর গাড়ীর ভেতর [গি]য়ে বসলে আর আমায় ধরে কে? আপনি গাড়োয়ানটাকে [ব]ল্‌বে দেবেন, আমার পিঠে ফোঁড়া হয়েচে, বুঝলেন।"

কৈজু গাত্রবস্ত্র উন্মুক্ত করিতেই, চন্দ্র সেন আতঙ্কে [শি]হরিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! এ যে ভয়ানক কাণ্ড!—কে [এ]ন কায কর্‌লে?"

কৈজু শান্ত ভাবে বলিল, "চুপ করুন। আমি এখন বেশ [সা]মলে গেছি,—লোক-জানাজানি করবার দরকার নাই,—[তা]হলে আমাদের বড় লোকসান হবে,—আজ আর জয়দেব-[পু]রে যাওয়া ঘটবে না।"

হতবুদ্ধি চন্দ্র সেন বিস্ফারিত চক্ষে বলিল, "বলেন কি [আপ]নি,—এই অবস্থায় জয়দেবপুরে যাবেন? তা কি হয়? [স]াংঘাতিক ব্যাপার,—দাঁড়ান, আমি ডাক্তার ডাকি,—[এই] কাছেই একজন আছে,—তা'পর পুলিশে একটা [খব]র দিয়ে—"

বাধা দিয়া দৃঢ় কণ্ঠে কৈজু বলিল, "একটু মাংস চামড়ার [লোক]সানের শোকে অত কাণ্ড করবার কিছু দরকার [নেই]। জয়দেবপুরে আমাদের বড় জরুরী কায পড়ে আছে মশাই, এখন জলপটি লাগিয়ে চলুন তো আগে সেখানে [যাই], তা'পর ধীরে সুস্থে বিশল্যকরণী খুঁজে ব্যবস্থা করা [যাবে]। ডাক্তারের দরকার নাই, আমার রক্ত খুব তাজা রক্ত,—এই 'ছুরের-ঘা' শুখুতে পনের দিন লাগবে [কি না] সন্দেহ। আপনি কেন ভয় পাচ্ছেন,—মনটাকে শক্ত [করুন], আমি তো সাম্‌লে নিয়েছি!"

[আ]র্ত্ত চন্দ্র সেন উদ্বেগভরে বলিল, "আপনি সাংঘাতিক [লোক] মশাই, আপনার সাহসও সাংঘাতিক! কিন্তু [এখ]ন যদি আপনার পিঠের অবস্থাটা,—উঃ, এ রকম দেখেই যে আমার মাথা ঘুরছে!—এই তো মশাই, আপনার হাত-পাগুলোও কাঁপ্‌ছে!"

ধীর কণ্ঠে কৈজু বলিল, "ওটা দুর্ব্বলতার জন্যে। মন কিন্তু আমার ঠিক তাজা আছে। নেন, আপনি বাঁধুন,—সকাল হয়ে যাচ্ছে,—এখুনি লোকজন ঘাটে এসে পড়বে।"

অগত্যা চন্দ্র সেন রক্ত ধুইয়া বস্ত্রখণ্ড জড়াইতে বসিল। তার পর বাঁধিতে-বাঁধিতে সহসা কি যেন মনে পড়ায়,—মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "এ যে বিষম আঘাত মশাই! এ কি পেশাদার ঠেঙাড়েদের কায? উঁহুঁ! এটা নিশ্চয় কোন " চন্দ্র সেন বাকী মন্তব্যটা জিহ্বার মধ্যে আট্‌কাইয়া লইয়া অদ্ভুতভাবে থামিল।

নিশ্চিন্ত হাস্যে কৈজু বলিল, "যে মহাত্মাই হোন, কিন্তু মানুষের মত মানুষ কেউ ছিল না। পথেকার ছুটো তো আস্ত আনাড়ীর সর্দ্দার! বেচারাদের সখ হয়েছে ওস্তাদী দেখাবার,—কিন্তু লাঠি তুলেই বুঝলুম, তাদের সাকরেদী করবার জন্য ডেকে নিমন্ত্রণ করাই ঠিক! আমাদের হরু সর্দ্দারের কাছে দিনকতক শিখিয়ে দিলে, তাদের মন্দ সুবিধে হোত না,—শেষেরটার শয়তানী বুদ্ধি খুব, কিন্তু সাহস মোটেই নাই। মারতে গেলে মার খাবার ভয় রাখতে নেই। উজবুক সেটা শেখেনি,—নইলে, অমন বেকায়দায় পেয়েও আমায় কায়দা করতে পারলে না!" কৈজু হাসিতে লাগিল।

চন্দ্র সেন সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িয়া, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, "ব্যাপারটা আপনি যত সহজ মনে করছেন, তত সহজ নয়। আচ্ছা, ঠিক করে বলুন দেখি,—আপনি দলের একটা লোককেও চিনতে পারেন নাই? আপনার পেছুতে অনেক শত্রু লেগেছে,—তাদের একজনকেও অন্ততঃ?"

কৈজু বিস্মিত নয়নে একবার চন্দ্র সেনের মুখপানে চাহিল। তার পর মাথা নাড়িয়া শান্ত ভাবে বলিল, "না, কাউকে না। শত্রু যত বেশীই থাক, কিন্তু জান নেবার জন্যে রুখে উঠে এতদূর পর্য্যন্ত ছুটে আসবে,—এত মাথা ব্যথা কার হবে সেন মশাই?"

চন্দ্র সেন ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "কেন, হরিহর গোয়ালা! সে আজ রাত দুটোর সময় এই চটি থেকে একখানা গাড়ী নিয়ে গেছে। চটির সমস্ত গাড়ীর মধ্যে যে গাড়ীর বলদ-যোড়া সব চেয়ে ভাল ছিল, আমি সেইটাই আমাদের জন্যে ঠিক করে রেখেছিলুম। ব্যাটাচ্ছেলে রাত

ওটোর সময় এসে সেই গাড়ীখানা জোর করে বের করে নিয়ে গেছে।"

বিস্মিত নয়নে চাহিয়া ফৈজু সংশয়ের স্বরে বলিল, "কে বল্লে আপনাকে এ কথা ?"

চন্দ্র সেন বলিল, "শঙ্করপুরের বাবুদের হরিহর—নামজাদা হরিহর! একজন গাড়োয়ান তাকে চিন্‌তে পেরেছিল, কিন্তু ভয়ে কিছু বলে নি। এখন গাড়ী তৈরী কর্তে গিয়ে দেখি, গাড়ী নেই। জিজ্ঞাসা পড়া করে ধমক দিতেই, গাড়োয়ানরা ভয়ে বলে ফেলে। তার সঙ্গে আপনাদের তেজপুরের আর একটি ছোকরা ছিল,—কি তার নামটা বলে ভুলে গেছি,—সেও গয়লা,—"

উৎকণ্ঠিত হইয়া ফৈজু বলিল, "ভুবন কি ?"

চন্দ্র সেন আগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ ভুবন! আরো লোক ছিল। সে বাইরের অন্ধকারে মুখ ঢাকা দিয়ে বসে ছিল। তাকে কেউ চিনতে পারে নি। তার পর তারা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে, শুঁড়ীখানা থেকে ক'বোতল মদ নিয়ে তারপর কোন্ পথে গেছে, কেউ জানে না। আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে, এরাই আপনাকে—" সে থামিল।

ফৈজু গুম্ হইয়া বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। চন্দ্র সেন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হরিহর আজকাল বাউল সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেটা আমি আগেই শুনেছিলাম একবার,—বিশ্বাস করি নি। আজ এদের কাছেও শুনলাম, সে বাউল সেজে এতদিন তেজপুরের ঠাকুর বাড়ীতে লুকিয়ে ছিল,—আজ এখানেও বাউল সেজে এসেছিল।"

উত্তেজিত হইয়া, সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ফৈজু বলিল, "কি বল্লেন! বাউল সেজে ঠাকুরবাড়ীতে ছিল, হরিহর! সে কি!"

চন্দ্র সেন ভয় পাইয়া নিম্নস্বরে বলিল, "সত্যি-মিথ্যা জানি না সাহেব,—আজ তাই তো শুন্‌ছি। চটিতে চলুন না, গাড়োয়ান দুটো এখনো বোধ হয় আছে—"

ফৈজু বসিয়া পড়িল! কয় মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত নির্ব্বাক থাকিয়া, সহসা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "হাঁ ঠিক! সেই বাউলই হরিহর বটে! আমি গাধা,—হাতে পেয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তাকে দেখেই আমার মনে ধাঁধা লেগেছিল; কিন্তু তার সাজটার খাতিরে কিছু বলতে পারি নি।—উঃ, কি ভুলই করেছি! হরিহর আচ্ছা ধড়িবাজ বটে! আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে! সেন মশাই,—তা'হলে এ ছোরার ঘা বোধ হয়—"

চন্দ্র সেন উগ্র হইয়া বলিল, "বোধ হয় কি মশাই! আমি চোখ বুজে বল্‌ছি,—এ তারই কায। চলুন, আমরা এখনি তেজপুরে যাই।"

শুষ্ক হাস্যে ফৈজু বলিল, "তাকে এখন তেজপুরে পাবেন কোথা মশাই! সে এখন গাড়ী নিয়ে বহুদূর চলে গেছে। কিন্তু—কিন্তু তাই যদি হয় সেন মশাই,—তাদের চেষ্টা যদি কোন দিন সফল হয়,—আমারো যদি নিয়তি পূর্ণ হয়ে থাকে,—তাদের ছুরির মুখেই যদি মরি,—তবে দেখ্‌বেন, একা ফৈজুর মরণেই যেন সব শেষ হয়ে না যায়!"

ফৈজু উত্তেজিত হইয়া উঠিতে উঠিতে, সহসা আত্মদমন করিয়া লইল। বিনয়ের সহিত চন্দ্র সেনের হাত ধরিয়া, নম্র-কোমল কণ্ঠে বলিল, "একটা আর্জ্জি দোস্ত,—যদি আমি মরি, তবে জয়দেবপুরের মালিকের নিমকের মান আপনি রাখ্‌বেন। যে দুসমন উঁচু মন আর বড় সাহস নিয়ে হকের জন্যে লড়্‌তে আসে, সে দুসমনের জুতো আমি মাথায় করে বইতে রাজী আছি। কিন্তু লোভী, হিংসুটে জানোয়ারের শয়তানী চাল, ওকে আমি ঘা দেব, ঘা দেব—তাতে ঘা খেয়ে মরি, সেও ভাল! আপনি কাম বুঝে তৈরী হয়ে দাঁড়ান। কে জানে, যদি হঠাৎ আমার মেয়াদ ফুরোয়, তবে, জয়দেবপুরের জন্য,—আপনার কথা ভেবে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে ছুটি নিতে পারি,—এইটুকু করবেন।"

চন্দ্র সেন স্তম্ভিত নয়নে ফৈজুর মুখপানে চাহিয়া রহিল! এই অতি-সাধারণ চালের,—অত্যন্ত সাধারণ জীব ফৈজু, ইহার অভ্যন্তরে এমন মৃত্যু-নির্ভীক তেজস্বিতা! দেহের মাঝে এমন অত্যদ্ভুত, আশ্চর্য্য মহত্ত্ব, শক্তি! তাহার ইচ্ছা হইল, সে হেঁট হইয়া মানুষটার পায়ের ধুলো মাথায় তুলিয়া লয়। ক্ষুদ্র মানুষের বৃহৎ মনুষ্যত্ব-গৌরবের সামনে নত হইয়া গৌরবের সম্মান জ্ঞাপন করে!

স্তম্ভিত-প্রায় চন্দ্র সেনের উজ্জ্বল শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া, ফৈজু নিজের আচরণে নিজে একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। দৃষ্টি নত করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আমি আজই ভেবেছিলাম সেন মশাই, যে, জয়দেবপুর কায়দা হয়ে গেছে,—আর ওখানে আমার দরকার নাই। এবার নায়েবীর কামে আপনাকে

কা করে বসিয়ে দিয়ে। আমি অন্য কাযে লাগ্‌ব। কিন্তু বন আর এটা কারুর হাতে দিতে আমার সাহস নেই। বে আপনাকে তৈরী হয়ে থাকতে বল্‌ছি, মনীবদের কাযে ন লোকসান না হয়, এটা দেখবেন, চলুন।"

রক্তাক্ত বস্ত্রাদি কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া, নিজের গড়ার কাপড় খুলিয়া পরিধান করিয়া, ফেজু চন্দ্রসেনের দ হইতে তাহার উড়ানীখানি টানিয়া গায়ে জড়াইয়া অতি ল ভাবের পরিহাসময় কণ্ঠে বলিল, "এটা আজকের মত র নিলুম দোস্ত, কিছু মনে করবেন না। আজকের এই রাছুরি খায়ের কথাটা আপনার আর আমার মধ্যেই পা থাক। যদি কোন দিন তাদের ধরতে পারি, তবে কথা আবার ওঠান যাবে। নইলে,—পিঠে ফোঁড়া য়ছল, তার ওপর ঘুম চোখে আসতে-আসতে রাস্তায় লায় মস্ত এক আছাড় খেয়েছি এই খবরই রইল,—লেন!"

ফেজুর মুখের দিকে চাহিয়া চন্দ্রসেন সংযত স্বরে বলিল, "তাই হবে মশাই। কিন্তু আপনি আমার মাথা ঘুলিয়ে দিচ্ছেন! আপনি মানুষটি তো এই সামান্য,—কিন্তু আপনার মনের জোর এত বেশী। আশ্চর্য্য শক্তি আপনার!"

স্মিত হাস্যে ফেজু সবিনয়ে উত্তর দিল, "এই ছুরির ঘা-ই আমার জোর বাড়িয়ে দিলে মশাই! এ উপসর্গটা মাঝখানে না জুটলে, আমি কাল থেকেই, চাকরীতে ইস্তফা দেওয়ার ব্যবস্থায় লাগতুম! কিন্তু সে কথা থাক, এখন মনীবদের মান বাঁচিয়ে চলতে হবে মশাই। আমার ছেলের জন্যে আমার বড় ভয় হচ্ছে। সে টের পেলে আর রক্ষা থাকবে না! চলুন, জয়দেবপুর পৌঁছে, কালই তাকে কাশী পাঠিয়ে দিই,—কি বলেন? সে জানবার আগেই তাকে সরিয়ে দেওয়া ভাল নয় কি?"

চন্দ্রসেন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "খুব ভাল, চলুন।"

(ক্রমশঃ)

নারী-সমস্যা

[শ্রীসত্যবালা দেবী]

াই জগদ্বিকাশের আদিরূপা। ভারতের রক্ষণশীলতা যে অমোঘ প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সে নারী হৃদয়েই আপন দুর্গ সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠ করিয়া লইতে য়াছে বলিয়াই। যেদিন ইহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তন বে, সেদিন সমস্ত নূতন মূর্ত্তি ধরিবেই ধরিবে; কেহই রোধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। যাহা আছে, দের অবলম্বন করিয়াই আছে। আবার ইহাদেরই স, শৈথিল্য, আশা, আকাঙ্ক্ষার রূপান্তর-গ্রহণ, সমস্তই স্থরিত করিয়া নূতন অঙ্গ, পরস্পরের আবির্ভাব অনিবার্য্য া তুলিবে, সে নিশ্চয়ই। নারীত্বের মহিমার প্রতিবাদী যে এ কথা অস্বীকার করিতে চাহে, সে সংসার-জ্ঞানহীন নীন, অথবা বালক—আর কিছুই নহে। প্রতিদিনের ষ্ট-প্রত্যক্ষ এই সংসার-প্রতিষ্ঠান জিনিষটাকে যে ঠিক তে জানে, সে জানেই—এঞ্জিনের অভ্যন্তরস্থ বাষ্পশক্তির মত অন্তরের মর্ম্মে-মর্ম্মে, কতখানি শক্তির প্রয়োগ নিত্য উদ্বোধিত রাখিয়া, নারীই এটার সজীবতার কারণ স্বরূপ হইয়া বসিয়া আছে;—একেবারে অটুট, সমাধি-মগ্ন হইতে দেয় নাই।

আবার একথাও ভুলিবার নয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলি অসংখ্য বলিয়া বৈচিত্র্যের প্রকাশভূমি। ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাত অনিবার্য্য। এইগুলিকেই নিরাপদ করিবার জন্য কেন্দ্রীভূত শক্তির আর একটা আধার গড়িয়া মানুষ পরিপোষণ করে। যাহার নাম রাষ্ট্র। এই আধার আমাদের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমাদের শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া দূরের কথা, বিস্ফুরিত হইতেও পারে না। অথচ উহার দ্বারা সম্পাদ্য কাজটাও নিত্য আবশ্যক, না হইলে চলিবার নহে। বিদেশীর চেষ্টায় গড়াইয়া লইয়া, তাহার পরিপুষ্ট হইবার খোরাক যোগাইয়া, আমাদের কাজ আদায়

করিয়া লইতে হইতেছে। দিন দিন কাজের মজুরীর হার এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, আমরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতেছি; তথাপি নাচার। আজ নিজেদের বাঁচাইবার জন্য, বৃহৎ গোষ্ঠী জাতি কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত অপর একটা জাতির সমস্তটাকে নাচাইবার পরিশ্রমে, আমরা রুদ্ধশ্বাস, মরণোন্মুখ হইয়াছি। তাই মনে হইতেছে, মেনে ত' মরিবই অমনে মরিতেই বা হানি কি?

হানি এই,—মরিবার পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত মানুষ মরিতে চায় না। আর মরণটা ত' জীবনে উদাসীন হওয়ারই শাস্তি। —আমরা জীবন-সত্রই বাহির করিব। তাহাকেই অবলম্বন করিব, মরিব না। কেন্দ্রীভূত শক্তির আধার গড়িবই গড়িব। শক্তিকে বিচ্ছুরিত, কেন্দ্রাতিগ করিবই করিব। নারীর অন্তঃসলিলা কর্ম্মচেষ্টাই যখন সংসার প্রতিষ্ঠানের প্রাণ, তখন অজ্ঞতার আর প্রয়োজন নাই। তাহার কর্ম্মচেষ্টা এখানে কিছু করিতে পারে কি না, দেখিতেই হইবে।

পারে বৈ কি। নারীর অন্তঃসলিলা কর্ম্মচেষ্টাই ত পুরুষের বহিঃপ্রকাশিত কর্ম্মপ্রবাহের প্রধান স্রষ্টা, সহায়, সকলক্ষেত্রেই। এই কেন্দ্রের অভিমুখে নারীর কর্ম্মচেষ্টা ছুটে না, আধার সেই জন্যই নির্ম্মিত হয় না। ছুটিলে, সংসার-প্রতিষ্ঠানের মত এটাও সাকার, সজীব, সচল ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইত। জাতীয় জীবন গঠনের উদ্দেশ্য বুকে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ এটা খুবই বোধগম্য হইতেছে। যাত্রা স্থগিতপ্রায়, আমরাও চিন্তিত।

এই চিন্তাটুকুরই অভিব্যক্তি আজ বর্ত্তমান সাহিত্যের ধারা। সাহিত্যের দিক দিয়া,—বুদ্ধি এবং হৃদয়ানুভূতি-প্রয়োগে নারী-প্রকৃতির সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পুরুষ জাতি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এই উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী অস্পষ্টতার কুজ্ঝটিকাজাল অপসারিত করিয়া, পরস্পর মানস-অনুভূতি বোধগম্য করিয়া, প্রকৃতির সত্য পরিচয় লাভার্থই উপন্যাস-রাজ্যে আজকাল প্রেমযজ্ঞের মহাধূম বাধিয়া গিয়াছে।—কিন্তু এই যজ্ঞকুণ্ড হইতেই জাতির পরিণতি সর্ব্বসৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিবার অমৃত দেবতা দিবেন, এ আমার কেমন মনে লাগে না। এ টুকু ত মনস্তত্ত্বের দিককার কাক, ক্রান্তি, তিল, দাগের হিসাব লইয়া মাথা ঘামান হইতেছে। টাকা অনেক দূরে। আর গোটা টাকাটা পাইলে, তবেই পাওয়া হইবে।

দেখিবার কথা বটে, পুরুষ এবং স্ত্রী একই গ্রহলোকে একই সমাজে, একই আহার্য্য-পানীয়-জলবায়ু-পুষ্ট হইয়া দেহ ধারণ করিতেছেন; অথচ দুয়ে পার্থক্য দিবস-রাত্রির মত—দূরত্ব আকাশ-পাতালকে ছাপাইয়াও। আর ইহারই জন্য একের অবদান অপরের সম্পূর্ণ মঙ্গলে নিযুক্ত হইতে পায় না। আমরা কেহই কাহাকেও জানি না, চিনি না; অথচ কাহাকেও কাহারও না পাইলে চলিবার যো নাই। একের দ্বারা অপরের অনেক কাজ করাইয়া লইবার আছে। পরস্পর অজ্ঞাত মনোরাজ্যে অন্ধকারে হাতড়াইতে দৈব-ঘটিত স্পর্শ-লাভটুকু,—এ এক অপূর্ব্ব প্রহসন।

চকিতে আবছায়ার মত প্রেমের তড়িদ্বিকাশে এই অস্পষ্টতার কুজ্ঝটিকাজাল ক্ষণিকের জন্য না কি অপসারিত হয়। কাহার কি গৌরব,—চিত্তের পুণ্য আলোক-স্নাত চক্ষু তখনই কেবল দেখিতে পায়; দরাদরি, টেনাটানি একাকার হইয়া থাকে।

কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু আমার চিন্তার বিশেষত্ব এই যে, এই দরাদরি, টেনাটানিই কি সবটা?—না, সবটা ইহাদের সার্থকতাটুকু? সেই সার্থকতার স্বরূপ ও উপায়-নির্দ্ধারণের আলোচনা কতটা হইতেছে? নারী প্রকৃতি ততটা জানিব বা জানিতে চেষ্টা করিব, যতটায় তাহাদের পাওয়া সম্ভব হয়,—এ ত' অংশ-জ্ঞানের চেষ্টা। পূর্ণজ্ঞান তাহাই, যাহার দ্বারা নারী-প্রকৃতির মধ্য দিয়া সাহিত্য একটা নারীর-জাতিত্ব গঠন করিতে পারিবে। চরিত্রলাভ সাধনার পথ-নির্দ্দেশে সমর্থ হইবে। সেই creative সাহিত্য যাঁহারা গড়িবেন, তাঁহাদেরই সাহিত্য-সাধনা সিদ্ধকাম,—ফলপ্রসূ।

জাতি বলিতে কি বুঝায়, সে যাহারা জানেন, জীবন-সংগ্রামের ঠিক-ঠিক অবস্থাগুলি যাহাদের পরিচিত, তাঁহাদের ধারণা গতানুগতিক হইতে একটু বিভিন্ন হইবেই। বর্ত্তমানে নারী যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থাটা তাঁহাদের অভিমত-বিরুদ্ধ,—অন্ততঃ আংশিক ভাবেও,—হইবেই। তাঁহারা যাইতে চাহিবেন অভিজ্ঞতা ও আদর্শ এতদুভয়কে লইয়া গঠিত একটী নূতন পথে। লক্ষ্য হইবে,—নারীর পরিবর্ত্তন;—অবস্থার নহে, স্বভাবের। স্বভাবটাকে গড়িয়া না তুলিয়া, বাহিরের দিক হইতে কেবল ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের দ্বারা কাহারই কখনও অবস্থার চিরস্থায়ী

বর্ত্তন হয় নাই। নারীরও অসম্ভব। নারী না উন্নত ল নারীর অবস্থারও উন্নতি হইবে না।

বাংলার নবজাগরণের প্রথম দিন হইতেই অগ্রবর্ত্তী যাঁগুলি স্ত্রীজাতির উন্নতির কল্পনা পরিপোষণ করিতে া। করিতে যে হইবেই। এক পাখায় ভর দিয়া উড়া না, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাতে, মনোরাজ্যে উড়িবার নাপাত হইলেই, নীড়ের পাখী তাহা বুঝিতে পারে। না কার্য্যে যে পরিণত হইতে পাইতেছে না, আকাশের বায়ুর সেবনাভাব ক্লেশে প্রাণ যে বন্ধন-যাতনায় ছট্‌ফট তেছে,—কাহার দোষ? বাধা কাহার? পুরুষের দোষ বিশেষ বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অপর সম্প্রদায় সে বাধা কাটাইয়াও অগ্রসর হইতে, প্রয়োজন ল দ্বন্দ্ব সংঘাতেও প্রস্তুত, তখন জাতি হিসাবে দের দোষ দেওয়া অবিচার। যখন ভালমন্দ য় উপাদানই আছে, তখন ভালটার উপর সমগ্র কার পাইলে, তাহাতে তৃপ্ত হইলে, মন্দ দিকটা ই বলুক, করুক,—সে দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না য়া, আপনাতে প্রতিষ্ঠিত অটল অটুট হওয়া ত অসম্ভব।—আর তাহাই ত বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রেয়ঃ। আপনার তর অনুকূল আবহাওয়ায় পরিবেষ্টিত হইয়া, সমগ্র শক্তি আত্মানুশীলনে ঢালিয়া দিয়া প্রাণপাত তপস্যা করিয়া দিলে নারীত্বের সেই লুপ্ত গৌরবময় স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হইতে কয়দিন লাগে? প্রধান বাধা, নারী নার দিক্ হইতে এখনও এ কথা বুঝিতে পারে নাই; াহারা চোখে এখনও বেশই ঝাপ্‌সা দেখে। উন্নত ার ইচ্ছা জাগিবার মত উপযুক্ত মানসিক অবস্থা ও তাহারা লাভ করে নাই। সে নিজের দিক হইতেই াকে তুলিবার, তাহাকে সবল স্বচ্ছন্দ করিয়া দিবার চেষ্টাকেই প্রতিরোধ করিতেছে। সে রক্ষণশীল। দিকে জীবন-সমস্যা তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইয়া, আমা- সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, কালোপযোগী করিয়া গড়িয়া ত, প্রচণ্ডবেগে তাগিদ করিতেছে; অপর দিকে নারীর সমাজের রক্ষণশীলতার অবস্থান-দুর্গ হইয়া, আমাদের খুবড়িয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে। সমাজ অচল—নারী ার চরণের শৃঙ্খল বলিয়া। সমাজ নিস্পন্দ—নারী তাহার জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়া আছে বলিয়া!—

এত অস্বাভাবিকতা প্রকৃতির অসহ্য। স্বাধীন, উন্নতচিত্ত পুরুষের কাছে বিবাহিত জীবনটাই অশ্রদ্ধার বস্তু—ইহাই আজ সমাজ বিপ্লবের সুস্পষ্ট পূর্ব্বলক্ষণ।—এ সব সমস্যার মীমাংসা আপনা হইতে করিয়া না লইলে, আপনা-আপনি হইয়া যাইবেই,—সেই জন্যই আমার এত আকুলতা। ইচ্ছার কি সত্যই কোনও মূল্য নাই?

পুরুষের গোঁড়ামীকে চোখ রাঙ্গাইয়াও হইবে না। নারীর জড়ত্বকে ধিক্কার দিয়াও হইবে না। এ সামাজিক সমস্যার সমাধান সমাজকেই করিয়া লইতে হইবে; অর্থাৎ, শুদ্ধমাত্র মঙ্গল-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া পুরুষ ও নারী উভয়কেই সমভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, নারীর অধীনতায় পুরুষ যে কেবল কতকগুলি অপ্রতিহত অধিকার ভোগ করিতেছে,—যোল-আনাই যে তাহার সুবিধা,—সে ঠিক্ নহে। অধীন থাকিয়া, সর্ব্বপ্রকারেরই দায়িত্ব ও ভারমুক্তা নারী পুরুষের ঘাড়ে বিলক্ষণই ভার চাপাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। দুর্ব্বলচিত্ত অক্ষম নরনারী মাত্রেই আজ পরিবর্ত্তনের নামে যে উচ্চ চীৎকার করিয়া উঠে, তাহার মনস্তত্ত্ব, এই দিককার সকল কথা অভিনিবেশপূর্ব্বক বুঝিলেই, স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কতকগুলি অধিকারের মোহে পুরুষ অর্দ্ধাঙ্গের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি-সংস্রবহীন জীবন-সংগ্রামে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াও যখন মরুভূমের উঞ্ছবৃত্তিতে পরিতৃপ্ত;—স্বেচ্ছা-প্রবৃত্তা নারীও যখন আলস্য, অবসর, নিশ্চিন্ততার কামনায় মনুষ্যত্বের রাজ্য হইতে চিরকাল গলাধাক্কা খাইয়া বাহিরে থাকিতে প্রস্তুত,—তখন আমাদের এত কোমর বাঁধিয়া কোন্দলের প্রয়োজন ছিল না। কেবল প্রয়োজন এইজন্য যে, সমাজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে?—দেশ যে যায়! এতটা সচেতন হইয়া চক্ষে দেখা সহ্যাতীত।

জীবন-সংগ্রামে মানুষ কখনই হারে না, যদি তাহার চরিত্র সুগঠিত হয়। চরিত্রের মধ্যে ফাঁকির নামই যোগ্যতার অভাব। ভারতবর্ষ আজ যে আপনার মহিমময় অতীতের সুপ্রতিষ্ঠিত সেই গৌরব-অচলের শিখরাসন হইতে ভূপতিত হইয়াছে, তাহার হেতু কি আত্মপাপ নহে?—জাতীয় চরিত্রের বিকৃতি নহে? মোগল-ইংরাজ ছলনা-শাঠ্য যেমন করিয়াই ভারতকে জয় করুক, আপনার পাপ না থাকিলে ভারত কখনই পরাজিত অবস্থায় এমন করিয়া

পড়িয়া থাকিতে পারিত না। পদতলে পড়িয়া, পাদুকা-নিষ্পিষ্ট হইয়াও যখন মানুষ বাঁচিয়া থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে, তাহার ভিতরকার প্রভু মানুষটা মরিয়া গিয়াছে,—দাস মানুষটাই এখন তাহার ভিতরকার পদার্থ। যাহাকেই দোষ দিই, যেমন উচ্ছ্বসিত হৃদয়েই গুমরিত হইয়া মর্ম্মান্তিক উত্তেজিত হইতে থাকি,—আত্মপাপের নীরব প্রায়শ্চিত্তে প্রক্ষালন ভিন্ন অবস্থা-পরিবর্ত্তনের অন্য কোনও উপায় নাই। পুনরুত্থান অন্য পথে অসম্ভব। এই পথই চাই। চরিত্রের সকল ফাঁকিগুলিই বিনা ভজুগে, ঘরে-ঘরে অনুশোচনার সাধনচক্র বসাইয়া, আমাদের ভরাইয়া লইতে হইবে। যোগ্য হইয়া উঠিতে হইবে। যতদিন অযোগ্য থাকিব,—সকল স্ফূর্তি, গৌরবের বক্ষস্পন্দন স্থগিত রাখিয়া, সকল লোভ দমিত রাখিয়া, কেবল ঐ একটী মন্ত্রই আবৃত্তি করিতে হইবে—ভরান চাই! ভরান চাই!

ভারতে পুরুষের যেমন পূর্ব্ব-গৌরবের আকাশ-ছোঁয়া শির লুণ্ঠিত, সে অপমান-অধোগতির পাতাল-গহ্বরে মুখ লুকাইয়া, শশকের ন্যায় নীরব এবং, নারীরও তেমনি। ইতিহাস নাই। নাই বা রহিল। প্রকৃতিমধ্যে বহুদিনের সুশৃঙ্খল-বিন্যস্ত গঠন-পারম্পর্য্য বেশই দেখা যাইতেছে। পুরাণে, বেদে, শাস্ত্রে সে গৌরব ও গৌরব-দিনের ম্লান-পরিম্লান ধ্বংসাবশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় বৈ কি! মোট কথা, উভয়েরই আত্মশক্তি, আত্মশ্রদ্ধা, আত্মবিশ্বাসহীন এই মেরুদণ্ড ভগ্ন নৈতিক জীবন আগন্তুক ও অস্বাভাবিক।—কাহারই স্বরূপ নহে। দূর করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব।

সম্ভব, সে আমরা উভয়েই জানি;—পথও অপ্রত্যক্ষ নহে। কথাটা,—কি হইয়া উঠিতেছে না।—যে বাধা আমাদিগকে সঙ্কুচিত করিতেছে, এখনও ভিতরের দিকে টানিয়া রাখিতেছে, তাহাকেই অপসারিত করিয়া দিবার জন্য এই নূতনের অভিযান। সহস্র জড়তার আবরণে আচ্ছাদিত চৈতন্য আজ স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া উপরে আরোহণ করিতেছেন;—অভিযান ইহারই নাম। অন্তরে স্পন্দানুভূতির গভীর গহ্বর হইতে ধীরে ধীরে স্থূল কর্ম্মপ্রবৃত্তির নিয়ামক শক্তির স্তর পর্য্যন্ত সত্যের উপলব্ধি ইহাই তাহার কাজ। এই বিজয়-যাত্রার সেনা সংস্থান, মানচিত্র সহযোগিনী বিদেশিনী Besant এর ভাষায় শুনাইতেছি,—"First of all, the reviving of true spirituality, of true religion, of the vital understanding of the profoundest truths of all existence, then, after that had made its way to an appreciable extent, must come the training, the culture, the guidance of the intelligence, so that a wisely planned and wisely guided Education might train the future workers of the land,—ভাবার্থ, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাবের, ধর্ম্মের, অর্থাৎ সত্যের যে ভঙ্গীবিশেষ অবলম্বনে সমস্ত প্রকাশিত তাহার উপলব্ধি। ঐ রূপে ভাবের দিক দিয়া সিদ্ধরূপ গড়িয়া লইয়া, তাহাকে প্রতিমা দান করিতে হইবে—অনুশীলনের দ্বারা বুদ্ধির পরিচালনের দ্বারা যথাযথ শিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বনে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইয়া।

আরম্ভ হইয়াছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণে সরল, হৃদয়গ্রাহী উপায়ে সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভূতির পথ নির্দ্দেশ; বিবেকানন্দে ভারতের জড়তা মেঘাবৃত জ্ঞান-সূর্য্যকে, অসীম অদম্যবলে মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া বিশ্বের দিগন্ত-বিস্তৃত আকাশতলে প্রকাশিত করিবার প্রয়াস,—সমস্তই এক অতীন্দ্রিয় হস্তের কর্ম্ম বলিয়া অনুভূত হয়। সে হস্তের কাজ চলিতেছে। থামিয়া নাই। প্রকাশ দেখিবই। প্রতিদিনের আচারে ব্যবহারে অতীতের ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডটুকুও বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া এতদিন আমরা পড়িয়া আছি,—আর সম্ভব নহে। উঠিতেই হইবে। গা ঝাড়া দিতেই হইবে। যাহার আদেশ, সে করাইয়া লইবেই। যে উদ্দেশ্য লইয়া এতদিন আমরা পড়িয়া ছিলাম, তাহারই যে চরিতার্থতার কাল উপস্থিত। যে পড়িয়া-পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে, সে উঠিবে না বটে,—কিন্তু জীবনের এতটুকু স্পন্দনও যাহার মধ্যে আছে, অমৃতের ডমরুধ্বনি শ্রবণে তাহাকেই উঠিতে হইবে। অগ্রসর হইতে হইবে। মৃতের শব-সংকার নিমিত্ত ফিরিয়া চাহিতে হইবে না! শ্বেত, পীত, লোহিতাভ, দেশী-বিদেশী অনেক ফেরুপালই ভারত-শ্মশানে কিলিবিলি করিতে আসিয়া জুটিয়াছে। জাতির আবর্জ্জনা-গুলির মেদলিপ্ত অস্থি-চর্ব্বণ-লালসায় তাহাদের সৃক্কণী-প্লাবিত লালাস্রাব—সে কি দেখিতে পাইতেছ না!'

কেন যে আমরা রক্ষণশীল হইয়াছিলাম, সে ত জানা কথা। কেন যে রক্ষণশীলতার অবসান-যুগ আসিয়াছে,

তাহাও প্রত্যক্ষ। স্বার্থের হীনবৃত্তির সহিত সত্যের আপোষ হয় না। নবজীবনোল্লাস মরণের আলস্য-মেদভারাবসাদগ্রস্ত নিশ্চেষ্টতাকে আলিঙ্গন করিতে পারে না। ভুল বুঝিয়া প্রবোধ মানা নূতনের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া আমাদের আদর্শকে ভুলাইতে পারে, বিশ্বের অপরাপর জনরাজ্যে ততবড় গহ্বর আজ অস্তিত্বাভাব। আজই ত নির্ভয়ে বাহির হইবার দিন। এখন আর কেন? আর যাহার বিশ্বাস, যেখানে আপোষ করিয়া আপনার পার্থক্যকে জিয়াইয়া রাখিতে পারে, সে সেখানে কেন পড়িয়া থাকিবে? যেটা আমাদের মূল, যেটা আমরা, সেটা আজ সকলকেই বুঝিতে দাও। সকলের উদ্ভব-স্থান আর অমন অস্পষ্ট প্রহেলিকার ধূম-পরিবেষ্টনীর মধ্যে রাখা কেন?

ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজা কম্বল গায়ে জড়াইয়া বাঁচিয়াছিলাম বলিয়া, রৌদ্রের সময়েও কি, তাহা গায়ে শুকাইতে হইবে? পরাজয়ের দুঃসহ অপমান দিনে আত্ম-বিস্মৃতি সব জ্বালা জুড়াইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া কি সেই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা? তখন জগৎ প্রবৃত্তির বিষে জরিয়া গিয়াছিল। সে তীব্র জ্বালায় আমাদের শান্ত, শুদ্ধ আত্ম-স্বভাব আপন বীর্যের অটুটতায়, আত্মপ্রভাবের শক্তিতে হয় ত আপনাকে অক্ষম বলিয়া বুঝিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, জগতের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তাহাকে বুঝি বা মরিতে হইবে। তাই জন্যই হয় ত আমরা আবার ভবিষ্যতে পুনরুজ্জীবনের আশা হৃদয়ে পুষিয়া, এই আত্ম সঙ্কোচের মরণকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, স্রোতে ভাসিব না, যেমনই হইয়া যাই, যে খুঁটি জড়াইয়া পারি, আজ আত্মরক্ষা করিয়া লই। সব স্রোতে ভাটা আসে—এ স্রোতে আসিবেই। সেদিন কূলে উঠিব। যদি মরিয়া যাই, সেও স্বীকার, তবু আমরা যা তাহাই থাকিব, বাঁচিবার জন্যও স্বভাবের অপলাপ করিব না। "Leave the Hindu untouched by foreign thought and do not destroy a type which, just because it is unique would leave less full by its disappearance the chord of humanity."—ভাবার্থ। "হিন্দুত্বকে সর্ব্ব বাহ্য প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখ। এ আদর্শকে ধ্বংস করিও না। ইহার যে তুলনা নাই। ইহার অবসানের সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্ব বীণার একটী তার ছিঁড়িয়া যাইবে। একটী অপরূপ সুর আর বাজিবে না।" ইহাই ত আমাদের আত্ম-সঙ্কোচের প্রকৃত কারণ। মূল উদ্দেশ্যকে যখন বুঝিব, তখন ত গোঁড়ামী থাকিবে না। ইহার অতীত হইয় বিজাতরীকে কতটা করিবার কাজ ছিল, সে দেখিতেই ত পাইব। এই গোঁড়ামীর বিরোধী যে আজ আমায় সাজিতে হইয়াছে, সে ত তাঁহারই প্রেরণা যিনি এক দিন আপন আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য জাতিকে গোঁড়া সাজাইয়াছিলেন। যে উদ্দেশ্য লইয়া সাজাইয়াছিলেন, তাহাকেই ত সিদ্ধ করিতে আমার মধ্যে নূতনের বান ঢাকাইয়াছেন। আমি যে গোঁড়ামীরই ঈপ্সিত পরিণাম—তাহারই বিবর্ত্তন!

আপনাকে চিনিয়া, আত্মস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বাড়িয়া, দিন-দিন বাড়িয়া উঠাই জীবন। আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া অস্তিত্ব রাখা আত্মরক্ষা,—সে ক্ষণিকের জন্য হইতে পারে, কিন্তু সেরূপ থাকার মধ্যে যখন স্বাস্থ্যহানির প্রচুর সম্ভাবনা, তখন চিরকাল তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? তাই বলিতেছি, আত্মরক্ষা বাঁচা না। বৃদ্ধি জীবন,—তাহারই বিকাশ চাই।

যে অভাবে জাতি পিছনে সরিয়া পড়িয়াছিল, সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিয়া নূতন হাত ধরিয়া তাহাকে গন্তব্যপথে দ্রুতবেগে ছুটাইয়া লইয়া যাইতে চায়। পরাজিতকেই সে জয়ী করিতে চায়। সে দিনের সঙ্কুচিত হইবার পর্য্যাপ্ত সঞ্চারী মনস্তত্ত্ব আজিকার এই প্রসারণশীল মনস্তত্ত্বকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে, সে প্রয়াসে বুদ্ধি থাকিতে পারে, সৌন্দর্য্য কিছুই নাই। সে দিনের আত্ম সঙ্কোচের বিরাট আত্মহত্যা মধ্যে রাজপুতের জহর ব্রতের মত সৌন্দর্য্যের মহিমাসন সুপ্রত্যক্ষ,—বুদ্ধির দোকানদারীর অস্তিত্বাভাব। আজিকার নূতন যাহার সহিত সংগ্রাম করিতে-করিতে অগ্রসর হইবে, সে হিন্দুর বৈশিষ্ট্যলোপী, আততায়ী। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য ও হিন্দুর আত্মস্বভাবের বিপরীত বুদ্ধি লইয়াই সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাই নূতনের বাঁশি হাতে করিয়া অভিযানের পথটী মাড়াইতেই, সমস্ত হৃদয় অট্টহাসে ভরিয়া উঠিতেছে,—স্বভাবকেই অস্বভাবের আপাতঃ প্রতীয়মান বেশে তোমাদের বিস্মিত চোখে কি চমকই না লাগাইতে হইবে। যাহার প্রতীক্ষায় তোমাদের উৎসবহীন হৃদয় ভবনে সিংহাসন শূন্য

পড়িয়া আছে,—দ্বারের দ্বারী সংস্কারকে ভুলাইয়া আজ লইতে হইবে তারই প্রবেশাজ্ঞা!

আসল কথা এই যে, ভিজা কম্বলের জল গায়ে বসিয়া-বসিয়া, আমাদের অঙ্গ-সন্ধিগুলি বাতে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গেই অসাড়তা। মানসিক জড়ত্বের জন্য আমরা এমন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, কিছুই ভাবিতে পারি না। প্রবৃত্তি হয় না। যদি ভাবিয়া দেখিবার মত শক্তি থাকিত, নবাগত জীবন-সংস্থাগুলিকে অগ্রসর হইয়া স্পর্শ করিবার মত স্থিতিস্থাপকত্ব মনের থাকিত, তবে আমরা আমাদের ঘর, আমাদের কোট্ সর্ব্ব-প্রকার উপদ্রবশূন্য রাখিতে পারিতাম। বাহিরের জগৎ এমন হুড়মুড় করিয়া ঘাড়ে পড়িতে পারিত না। কোটের বাহির হইতেই তাহাকে দূর করিয়া দিতাম।

আজ এই জড়ত্বের অবসান করিতেই হইবে। মনের রক্তবহা ধমনীগুলি মুমুক্ষুত্বের সঞ্জীবনী তড়িৎ স্পর্শ শিহরে পুলকোল্লাসে উল্লসিয়া উঠুক। উপরের স্তর হইতে চমকে-চমকে প্রতিফলিত জ্ঞানালোক প্রাণের সকল কোষ ভরিয়া দিক। আমরা আমাদের বাসনা, জগৎ, আদর্শ, তিনের সামঞ্জস্যে নবীন জগৎ গড়িয়া লই। আমরা এমন হইয়া দাঁড়াই, যাহাতে আমাদের আর কেহ পদদলিত করিতে না পারে। আমাদেরও জীবন-রাগিণী সেই পর্দায় চড়ুক,—যে পর্দার ব্যবহার জয়ধ্বনির জন্য।

চিন্তার কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। প্রকৃতিকে বাঁধিবারও কোনও শৃঙ্খল নাই। আমরা শ্রেয়ের ধ্যানমূর্ত্তি, বহু বহু অতীত যুগে যে দিন সে আমাদের ঘরে আবির্ভূত হইয়াছিল, সে দিনের তার ব্যবহৃত তৈজস-দ্রব্যাদি দেখিয়াই অঙ্কিত করিতে প্রচেষ্টা পাইয়াছি।—ব্যর্থ প্রয়াস।—ভুল স্বীকার করিতে লজ্জা কি? ভুলকে যে ভাঙ্গিতেই হয়। হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া সেত ধরিয়া রাখিবার নয়। তাই বলিতেছি, প্রকৃতি আপন পথে ছুটিবেই। চিন্তাকে তাহার সহিত অবাধে ছাড়িয়া দাও। তোমার বৈশিষ্ট্য, হিন্দু, তুমি নিজেই। আত্ম-বিস্মৃত থাকিবার অনিবার্য্য বিষময় ফল আত্ম-অবজ্ঞা তোমার কি একেবারেই সর্ব্বনাশ করিয়াছে! বিশ্বাস। বিশ্বাস। বিশ্বাস কর। শ্রদ্ধায় দৃঢ়চিত্ত হও। তোমায় রক্ষা করিতে সমর্থ তুমি,—স্বয়ং। আবার কে?

সকলকেই মনের জড়ত্ব ভাঙ্গিয়া, জীবন ও জগৎ উভয়টাকেই বুঝিতে হইবে! তার পর কোথাও বিক্ষিপ্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আপনাতে তলাইয়া গিয়া আপনার মধ্যেই আপনার বৈশিষ্ট্য খুঁজিলেই দেখিবে, তাহা পরিস্ফুট, প্রত্যক্ষ। সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত মূর্ত্তিকে আপন বিরাটরূপে বিনা বাধায় যদি বিকশিত হইয়া উঠিতে দাও, হে চলচ্চিত্ত হিন্দু, দেখিয়ো, জগৎ তোলপাড় করিয়া বেড়াইলেও, সে বিনষ্ট হইবার নহে।

এ কি হাসির কথা নয়? হেঁসেলটা, ভাঁড়ারটা, একাদশীটা এগুলাকেই চিনি,—আপনাকে চিনি না! এগুলা কি আপনার জন্যই নয়? আপনারই জন্য এগুলা, আর আপনি বলিতে এইটা,—এই ভাব, এই আশা, এই রুচি, এ যখন হৃদয়ঙ্গম হইবে, তখনই ঘর করা সার্থক হইবে। আপনারই জন্য প্রাণেশ্বরের পাতিয়া দেওয়া আমার এই চির-আপন ঘরে, যেথায় তিনি আমায় গৃহিণী রূপে দেখিতে চান, সেথায় ভূতগ্রস্তার মত দাসীপনা করিয়া মরিতেছি।—এ কেমন সংসার? কাহার মনোরঞ্জন?

নারী-সমস্যার সমাধান সেই দিনই হইবে,—নারীর জীবনে একটা স্বাধীন ব্রতের স্বাধীন অনুষ্ঠান সেই দিনই হইবে, যে দিন নারী বুঝিবে আপনাকে সমগ্ররূপে;—পাইবে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে। ইহারই নাম প্রকৃত স্ত্রী স্বাধীনতা। নারী সমস্যার সমাধান-চেষ্টা যতদিন গোঁজামিল ব্যাপার, সমাধান ফলও ততদিনই অশ্বিনীর ডিম্ব-প্রসব। সব মিথ্যা, সব হুজুগ। স্থায়ী ফল আকাশকুসুম।

হে সংস্কারক! নারীর জাগরণের পক্ষপাতী! তুমি যুগধর্ম্মে সহযোগিনী রূপে নারী চাও,—সত্য? তবে আপনার অহঙ্কার বৃত্তিকে স্তম্ভিত রাখিয়া, প্রকৃতির হাতে গড়িয়া উঠিতে দাও নারীর অন্তর্লোক। প্রতিযোগিতার সর্ব্ব-সংস্কার-শূন্য হইয়া তোমার ওই সবল বাহু দুইটা সাহায্যার্থ প্রসারিত করিয়া দাও বহির্জ্জগতের তাহার আশ্রয় নির্ম্মাণে। তার পর চাহিয়া দেখ,—অধীনা রূপে যে জাতি যুগ-যুগান্ত এমন চমৎকার দাসীত্ব করিল, স্বাধীনা তাহারা, তোমায় কতখানি সাহায্য করিতে পারে তোমার জাতি-গঠনে!

শুনিয়া চমকিলে কি? অতৃপ্ত হৃদয় কি উপবাসের ভয়ে শিহরিয়া উঠিল? মা ভৈঃ! অমৃত-কলস করচ্যুত হইবে না! তোমার দিক হইতে অহঙ্কারের বাঁধন শ্লথ হইলেই নিস্তার ভাবিয়ো না। প্রকৃতি তখন স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিবেন। দেখিয়ো, তাঁহার হাতের বাঁধা বাঁধনে, নারী তোমাদের হাতে আরও দীনা, সহায়হীনা—বরং শতগুণেই তোমাময়-জীবিতা।

মিলনে

[শ্রীতরুলতা দেবী]

শুনেছিনু উপকথা নির্জ্জন কানন
সুদূর সাগর তীরে। কত অগণন
অস্ফুট নলিনী-দল সরসীর বুকে
চেয়েছিল ফুটিবার অবসর সুখে!
তীরে শ্বেত সোপানের শুভ্র উচ্চ ধারা
সমুচ্চ প্রাসাদ দ্বারে হইয়াছে হারা!
জনহীন প্রাসাদের কক্ষ আলো করি'
রাজকন্যা নিদ্রামগ্ন শিথিল কবরী
হাস্যমুখ স্বপ্নে হারা; নিকটে তাহার
স্বর্ণময় পাত্র হ'তে ধূপ-ধূম্রভার
ধীরে, অতি ধীরে, লঘু বাষ্প-রেখাধারে
আকাশে উঠিতেছিল। মণিময় হারে
সজ্জিত স্বর্ণের পাত্র; কুবলয় আর
অশোক-মঞ্জরীরাশি তারি একাধার
শোভায় ভরিয়াছিল। পুষ্পহীন বন—
সহসা কাঁপিল; ধীরে দক্ষিণ পবন
সাগরের পার হ'তে কোন্ বার্ত্তা নিয়া
রাজপুরী-বাতায়নে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দেওদার কুঞ্জ মাঝে লুটাল আবেশে;
দীপ্ত শুভ্র শ্বেত অশ্বে রাজপুত্র এসে
টানিল অশ্বের রজ্জু প্রাসাদের দ্বারে
অর্ঘপাত্র হ'তে সেই মণিময় হারে
সুপ্তোত্থিতা কুমারীর কণ্ঠে দিল মালা;
হাসিল বিস্ময়সুখে তৃপ্ত রাজবালা;
অশোক-মঞ্জরী আর কুবলয় দুটি
রাখিল চরণে নারী; কোথা হতে ছুটি'
এল ঘন গন্ধবহ বসন্ত সমীর—
কাঁপাল মিলন-হর্ষে দুইটি প্রাণীর
চিরযুগ প্রতীক্ষায় করি অবসান—
বন্দীশালে নহবৎ মিলাইল তান!

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ]

দ্বিতীয় ভাগ

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চারিজন যুবা ভাগীরথী-বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় বসিয়া ছিল। ভাগীরথীর স্রোত মন্দ,—ক্ষুদ্র নৌকা অতি ধীরে-ধীরে পূর্ব্বদিকে ভাসিয়া চলিয়াছিল। নৌকার আরোহিগণ তাহার গতি পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিতেছিল না। নৌকার উপরে একটি ক্ষুদ্র বীণা আর একটি ক্ষুদ্র মৃদঙ্গ পড়িয়া ছিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিমে পর্ব্বত-প্রান্তে অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম আভা তরু-শির ও গৃহ-শির ঈষৎ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছে; এবং জাহ্নবীর শুভ্র বারিরাশি তাহার প্রতিচ্ছবি ধারণ করিয়া পাটলবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন দেখিতে পাইল যে, দূরে তীর হইতে এক ব্যক্তি তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। সে তাহার সঙ্গীদিগকে কহিল, "দেখ, তীরে দাঁড়াইয়া এক ব্যক্তি বোধ হয় আমাদিগকে ডাকিতেছে।" তাহা শুনিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "শাহজাদা! নৌকা কি তীরে লাগাইব?" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "আমাদিগকে কি জন্য

ডাকিবে বুঝিতে পারিতেছি না। প্রভাতে পাটনায় সওয়ার পাঠাইয়াছি, তাহার ত এখনও ফিরিবার সময় হয় নাই।" প্রথম নৌকারোহী কহিল, "যে কারণেই হউক, যখন ডাকিতেছে, তখন যাওয়া উচিত।"

তৃতীয়। তবে নৌকা ফিরাও।

দ্বিতীয়। সকলেই দাঁড় ধরিতে হইবে; কারণ স্রোত মন্দ হইলেও, অনেকটা উজান বাহিয়া যাইতে হইবে।

চতুর্থ নৌকারোহী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিল, সে এই সময়ে বলিয়া উঠিল, "উজান বাহিবার প্রয়োজন কি? নৌকা যেখানে লাগিবে, সেখান হইতে হাঁটিয়া গেলেই হয়।" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "সুদর্শন, তুমি বাদশাহের উজীর হইবার যোগ্য। আজি হইতে তোমার দানেশমন্দ্ খাঁ খেতাব হইল।" চতুর্থ কহিল, "জাঁহাপনা যখন বাদশাহ হইবেন, তখন দানেশমন্দের উজীরীর হুকুমটা যেন স্মরণ থাকে।" "দেখ দানেশমন্দ্, আমীর উল্ সামানের দ্বিতীয় পুত্র যেদিন রক্ত প্রস্তরনির্মিত শাহজহানাবাদের রক্তবর্ণ দেওয়ান-ই-খাসের [illegible] ময়ূরের [illegible] পথে তখৎ-তাউসে উপবেশন করিবে, সেইদিন হইতেই তোমার উজীরী সনদ।"

নৌকা তীরে লাগিল। যে ব্যক্তি তীর হইতে ইঙ্গিত করিতেছিল, সে নৌকার নিকটে আসিল। তাহাকে দেখিয়া [illegible] বলিয়া উঠিল, "এই যে [illegible]" [illegible] কহিল, "[illegible] ঠাকুর, বিবাহের রাত্রিতে কোথায় পলাইয়া গিয়াছিলে?" তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "[illegible]" আগন্তুক কহিল, "আমি শ্মশানবাসী সাধক, [illegible], তোমরা শীঘ্র আইস। একজন মুসলমান অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমাদের সন্ধান করিতেছে।" তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া প্রথম ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বল, তুমি বিবাহই বা করিলে কেন, আর পলাইলেই বা কেন?" আগন্তুক কহিল, "সে কথা পরে বলিব; এখন তোমরা শীঘ্র আইস।" "তুমি না বলিলে আমরা কিছুতেই যাইব না।" "ভাল [illegible] করিতে শিখিতে পার! দেখ সুদর্শন ভট্টাচার্য্য, এই কারণে জীবনে তোমার আর উন্নতি হইবে না।" দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "দেখ ঠাকুর, চলিয়া আসিলে আসিলে। বীর-পুরুষের মত স্ত্রীলোকের অঙ্গে পদাঘাত করিয়া আসিলে কেন?" আগন্তুক ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "অসীম রায়, তোমার এখনও বালকত্ব ঘুচে নাই। বিষধর সর্প দেখিলে লোকে দংশন করিবার পূর্ব্বেই আঘাত করে কেন?" "বিষের ভয়ে।" "রমণীমাত্রেই কালসাপিনী। সেইজন্য, আমার এই নূতন কালসাপিনী দংশন করিবার পূর্ব্বেই, তাহাকে আঘাত করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি।" "ছিঃ ঠাকুর, এই তোমার শিক্ষা?" আগন্তুক হাসিয়া কহিল, "যে শিক্ষার কথা তুমি বলিতেছ, সে শিক্ষা অনেকদিন পূর্ব্বে ভুলিয়া গিয়াছি। কালসাপিনী যে শিক্ষা দিয়াছে, কেবল তাহাই স্মরণ আছে। বিলম্ব হইয়া যাইতেছে, তোমরা শীঘ্র চল।" সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের বিলম্ব হইয়া যাইতেছে ঠাকুর, আবার কি তোমার বিবাহ উপস্থিত না কি?" ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল, "হইলে মন্দ হয় না; কারণ, টাকা কয়টা ফুরাইয়া গিয়াছে। তোমরা এখন শীঘ্র চল।" ফররুখসিয়র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ দিকে যাইতে হইবে?" ব্রাহ্মণ কহিল, "পাটনার পথে।" "আমরা ত সেই দিকেই যাইতেছিলাম। চল, তুমি পথ দেখাও।" "বাদশাহী সড়ক এখান হইতে অধিক দূর নহে; কিন্তু শাহজাদা, আপনার ত কষ্ট হইবে? কারণ, মাঠ ভাঙ্গিয়া একক্রোশ দক্ষিণদিকে গেলে তবে সড়ক পাওয়া যাইবে।" "বিশেষ কষ্ট হইবে না। তবে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, আর একদণ্ড পরে কিছুই দেখা যাইবে না। রায়জী, কোথাও হইতে একটা মশাল সংগ্রহ করিতে পার?" অসীম কহিলেন, "হুজুর, নিকটে নিশ্চয়ই কোন গ্রাম আছে। সেখানে গেলেই মশাল পাওয়া যাইবে। এখন যতক্ষণ পথ দেখা যায়, ততক্ষণ দ্রুতপদে চলুন।"

সকলেই দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে-দেখিতে অন্ধকার হইয়া আসিল। তাহা দেখিয়া ফররুখসিয়র কহিলেন, "আর ত চলা যায় না।" অসীম কহিলেন, "আপনারা এই স্থানে বিশ্রাম করুন,—আমি মশালের সন্ধানে চলিলাম।" অসীম এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অবশিষ্ট চারিজন সেইস্থানে উপবেশন করিলেন।

বহুকাল পূর্ব্বে সেইস্থানে একটি পুষ্করিণী ছিল। পুষ্করিণীর চারিদিকে চারিটি ঘাট ছিল; এবং পূর্ব্বদিকের ঘাটের উপরে একটি মন্দির ছিল। পুষ্করিণীর জল শুকাইয়া গিয়াছে; মন্দির ও ঘাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; এবং নিকটে

মানবের বসতির চিহ্নমাত্র নাই। ঘাটের সোপানের একখানা বৃহদাকার প্রস্তরখণ্ডে উপবেশন করিয়া, আগন্তুক অপর সকলকে বসিতে অনুরোধ করিল; এবং ফররুখ্‌সিয়রকে লক্ষ্য করিয়া, অবিমিশ্র পারসীক ভাষায় কহিল, "রাজপুত্র, তোমাকে একটা কথা বলিয়া দিতে ভুল হইয়াছিল, সেইজন্য এতদূর আসিতে হইয়াছে। দূত সংবাদ লইয়া লাহোর হইতে আসিয়াছে। সে সংবাদ শুভ মনে হইলেও, জানিও, তাহা প্রকৃত পক্ষে শুভ নহে। গ্রহের ফলে বিষম অশুভ হইতে তোমার শুভের উৎপত্তি হইবে। পাটনায় অশুভ সংবাদ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যতক্ষণ অশুভ সংবাদ না পাইবে, ততক্ষণ পাটনা পরিত্যাগ করিও না। জানিও, সেই অশুভ সংবাদই তোমার শুভদিনের আরম্ভ।" আগন্তুক যতক্ষণ পারসীক ভাষায় কথা কহিতেছিল, ততক্ষণ সুদর্শন অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলেন। তাহার কথা শেষ হইলে সুদর্শন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, তুমি ফারসী শিখিলে কবে?" ব্রাহ্মণ কহিল, "আর জন্মে।" সুদর্শন বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিল, "বিস্মিত হইলে? আমি এই এক দেহ লইয়া দুই জন্ম কাটাইয়া দিলাম।" সুদর্শন অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে আবার কি রকম কথা?" ফররুখ্‌সিয়র এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি সুতীর উদ্যানে আমাকে যাহা বলিয়াছিলে, তাহাও বুঝি নাই,—এখন যাহা বলিলে, তাহাও বুঝিলাম না। আমাকে কি করিতে হইবে, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দাও।" "যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা দুঃসংবাদ না শুনিবে, ততক্ষণ তুমি পাটনা পরিত্যাগ করিও না। ইহার অধিক তুমি কিছু বুঝিতে পারিবে না।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। শাহজাদা মনে করিয়াছিলেন যে, সে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে; এবং সে যেদিকে চলিয়া গিয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়া ছিলেন। বহুক্ষণ পরে অসীম মশাল-হস্তে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সকলে তাম্বুতে ফিরিয়া চলিলেন। পথে যাইতে-যাইতে অসীম জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাহজাদা, আপনার জ্যোতিষী কোথায় গেল?" ফররুখ্‌সিয়র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন,—তিনি অসীমের প্রশ্ন শুনিতে পাইলেন না। তাহা দেখিয়া অসীম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাহজাদা, সেই উন্মাদ ব্রাহ্মণ কোথায় গেল?" ফররুখ্‌সিয়র সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি কিছু জিজ্ঞাসা করিলে রায়জী?" অসীম অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিতেছিলেন বুঝিতে পারি নাই, শাহজাদা,—গোস্তাকী মাফ করিবেন।" "গোস্তাকী কিছুই হয় নাই। তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?" "জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আপনার নিকট যে পাগল ব্রাহ্মণকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে কোথায় গেল?" "তুমি ফিরিবার পূর্ব্বেই, সে হাওয়া হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।" "আমি মনে করিয়াছিলাম যে, তাহাকে লইয়া গ্রামে ফিরিয়া যাইব।" পরে শিবিরের আলোক দেখা গেল। একজন আহদী আসিয়া শাহজাদাকে অভিবাদন করিল, এবং তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। মশালের আলোকে পত্র পাঠ করিয়া শাহজাদা কহিলেন, "শাহ্‌-আলম বাদশাহ মরে গিয়েছেন।" আনন্দেই হউক বা ভয়েই হউক, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাটনা সহরের এক প্রান্তে ভদ্র-পল্লীর মধ্যে এক বৃদ্ধা গণিকা বাস করিত। তাহার নাম মতিয়া। সে গণিকা হইলেও, পল্লীর সকলেই তাহার উপর সদয় ছিল। কারণ, তাহার গৃহে অসদাচরণ দেখিতে পাওয়া যাইত না। যৌবনান্ত হইবার পূর্ব্বেই মতিয়া গণিকাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল; কিন্তু তথাপি মুজরা করিত। প্রায়াতিক্রান্ত যৌবনা নর্ত্তকীর সমাদর বর্ত্তমান সময়ে নাই—তখনও ছিল না। মুজরা যখন জুটিত না, তখন মতিয়া গণিকা-সমাজে নৃত্যগীত শিক্ষা দিত। পাটনার অধিবাসিগণ মতিয়া বাঈজীকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সকলেই মতিয়া ওস্তাদনীকে জানিত। তাহার যৌবন একেবারে অস্তমিত হইবার পূর্ব্বে, একজন পাঠান আহদী প্রৌঢ়ার প্রেমে মজিয়া, তাহারই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; এবং বৃদ্ধ বয়সে মতিয়া ওস্তাদনী এক কন্যা প্রসব করিয়াছিল। লোকের নিকট মতিয়া পরিচয় দিত যে, পাঠান তাহাকে নেকা করিয়াছে; কিন্তু পাঠানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবজ্ঞার সহিত নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিয়া কহিত, "কসবীকে নেকা? তোবা, তোবা!" তথাপি বৃদ্ধ পাঠান মতিয়াকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না।

মতিয়ার কন্যার নাম মনিয়া। মনিয়াকে দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, সে গণিকার কন্যা; সকলেই কহিত, "গোময়ে পঙ্কজিনীর আবির্ভাব সম্ভব নহে।" মতিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিল; এবং সে অতি যত্নে কন্যাকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দিয়াছিল। প্রথম যৌবনে রূপসী কলাবতী মনিয়া পাটনা নগরের সকলেরই প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মনিয়া অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে; এবং মাত্র এক বৎসর মুজরা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে দিন ফররুখ্‌সিয়র বাদ্‌শাহ্‌ শাহ্‌আলমের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহার পরদিবস অপরাহ্ণে সেই বৃদ্ধ পাঠান মতিয়ার গৃহের দুয়ারে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। মতিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্তা ছিল; এবং মনিয়া একটি সারেঙ্গী লইয়া গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছিল। এই সময়ে একজন সুসজ্জিত, সম্রান্ত মুসলমান এক্কা হইতে নামিয়া পাঠানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি মনিয়া বাঈজীর গৃহ?" পাঠান বিরক্ত হইয়া কহিল, "এই গৃহ মতিয়া বাঈজীর; তবে মনিয়া এখানে থাকে বটে!" আগন্তুক কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিল, "আমি মনিয়া বাঈজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" পাঠান অধিকতর বিরক্ত হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "মনিয়া তওয়াইফ্‌ বটে, কিন্তু সে ভদ্রলোকের কন্যা, কসব করে না। তোমার যদি খুবরু কঞ্চনীর প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে চৌকে বহুৎ মিলিবে।" আগন্তুক কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিল, "আমার অপরাধ মাফ্‌ করিবেন। শাহ্‌জাদার দরবারে মুজরা করিবার জন্য মনিয়া বাঈজীকে বায়না দিতে আসিয়াছি।" পাঠান একটু দমিল; কিন্তু তখনও অপ্রসন্ন ভাবে কহিল, "বায়না দিতে আসিয়াছ, টাকা দিয়া চলিয়া যাও।" "বাঈজীর চেহারা না দেখিয়া বায়না দিব কেমন করিয়া?" "চেহারার সহিত মুজরার সম্পর্ক কি?" "অনেক সম্পর্ক! মুজরা ত কেবল গাহিবার নহে!"

আগন্তুক সহজে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে দেখিয়া, পাঠান মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, "আরে মতিয়া, এ মতিয়া, ইধার আ!" মতিয়া তখন সম্মার্জ্জনী হস্তে উঠানের আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিতেছিল। সে পাঠানের আহ্বান শুনিয়া, সেই অবস্থাতেই গৃহের দুয়ারে উপস্থিত হইল। আগন্তুক তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। মতিয়া বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতা না হইয়া আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; এবং সে শাহ্‌জাদার নিকট হইতে আসিতেছে শুনিয়া, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। আগন্তুক তাহার অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া মনিয়াকে দেখিতে চাহিল। মনিয়া আসিল, এবং নমুনা স্বরূপ একটা গান গাহিল। তখন আগন্তুক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দুই আসরফী বায়না দিয়া চলিয়া গেল।

পাটনা সহরের প্রান্তে, এক বিস্তৃত আম্রকানন মধ্যে শাহ্‌জাদা ফররুখ্‌সিয়রের উর্দ্দু পড়িয়াছে। তাহার মধ্যস্থলে এক বিস্তৃত সামীয়ানার মধ্যে নাচের আয়োজন হইয়াছে। তখন মনিয়া বাঈয়ের মরসুম পড়িয়াছে। শাহ্‌জাদার সঙ্গের লোক ত আসিয়াছে,—পাটনা সহরের অর্দ্ধেক লোক সেই আম্রকাননে সমবেত হইয়াছে। সন্ধ্যা হইল,—শিবিরে অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিল। সামীয়ানার নিম্নেও অসংখ্য বহুবর্ণের কাচপাত্রে গন্ধদীপ জ্বলিতে লাগিল। মনিয়া, তাহার মাতা মতিয়া তবল্‌চী সারেঙ্গীওয়ালা সঙ্গে লইয়া গো-শকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাহ্‌জাদা ফররুখ্‌সিয়র আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মনিয়া পেশোয়াজ পরিয়া আসরে নামিল। এক প্রহর ধরিয়া শিবিরের লোক, সহরের লোক মনিয়ার নৃত্য-গীতে চক্ষু ও কর্ণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করিল। দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে শাহ্‌জাদা ফররুখ্‌সিয়র অর্থকৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও, মুষ্টি-মুষ্টি সুবর্ণ পুরস্কার দিয়া মনিয়ার মাতাকে তুষ্ট করিয়া, আসর পরিত্যাগ করিলেন। মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। সহরের লোক উর্দ্দু ছাড়িয়া সহরের দিকে ফিরিয়া চলিল; এবং শিবিরের লোক শিবির ছাড়িয়া নিজ নিজ তাম্বুতে ফিরিয়া গেল। মনিয়া অন্য তাম্বু হইতে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিতেছে, এমন সময়ে একজন দীর্ঘাকার মুসলমান তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। মনিয়ার মাতা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সে আগন্তুককে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু আগন্তুকের ইঙ্গিতে পশ্চাৎ হইতে একজন সৈনিক আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। ভীতা, চকিতা মনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আগন্তুক তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, "মনিয়া বাঈ, তুমি পাটনা সহরের গুলাব। তুমি যে আমাদের উর্দ্দুতে

আসিয়া অমনি চলিয়া যাইবে, ইহা কি আমার প্রাণে সহে? আমি সামান্ত ব্যক্তি;—তবে আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, তোমার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গুলাবের মত অঙ্গের জন্য গুলাবের শয্যা পাতিয়া রাখিয়াছি। তোমার নীল নয়ন দুটি তোমার গুলাব-বর্ণ দেহে মানাইতেছে না বলিয়া, তাহা রক্তাভ করিবার জন্য ইরানী আরক আনিয়া রাখিয়াছি। সুন্দরি! তোমার জন্য যে তাম্বু সাজাইয়া রাখিয়াছি, তাহাতে একবার পদার্পণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবে চল।"

মনিয়া যদি গণিকা হইত, তাহা হইলে এই চিরন্তন প্রেম সম্ভাষণে সে হাসিয়া ফেলিত; কিন্তু গণিকাপুত্রী হইলেও, তাহার সুন্দর দেহ তখনও কলুষিত হয় নাই, সুতরাং সে না হাসিয়া, ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল। আগন্তুক তখন তাহার শরাবের উত্তেজনায় উন্মত্ত, সে তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিল না। সে অগ্রসর হইয়া মনিয়ার হস্তধারণ করিল। মনিয়া তাহাতে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক কহিল, "মনিয়া, তুমি স্বর্গের পরী, তুমি দুনিয়ায় কেন আসিয়াছ? এই কঠিন দুনিয়ার স্পর্শে তোমার কোমল চরণে যে আঘাত লাগিবে! তুমি এই কঠিন দুনিয়ায় পদক্ষেপ করিও না, আমি তোমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া যাইতেছি।" আগন্তুক এই বলিয়া মনিয়াকে ক্রোড়ে উঠাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু সে চীৎকার করিয়া দুই পদ পশ্চাৎ হটিয়া গেল। তাহা দেখিয়া হতাশাবিজড়িত কণ্ঠে আগন্তুক বলিয়া উঠিল, "জানি, তুমি ভয় পাইতেছ জানি? আমি যে তোমার গোলাম জানি! তুমি যখন তোমার স্বর্গীয় রূপরাশি লইয়া সামীয়ানার নীচে পরীরাজ্যের অদ্ভুত নৃত্যকৌশল দেখাইতেছিলে—যখন গুলাবের পল্লবের মত কোমল তোমার পদাঙ্গুলিগুলি সতরঞ্চের উপর বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়াইতেছিল,—তখন আমার মন ভ্রমর হইয়া তাহার চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। জানি, আমার ছাতি অনেক তলোয়ারের চোট খাইয়া পাথর হইয়া গিয়াছে; সেইজন্য বোধ হয় তুমি সে ছাতি স্পর্শ করিতে ভয় পাইতেছ। ভয় কি জানি? আমি রাশিরাশি গুলাব আনিয়া তোমার পথে ছড়াইয়া দিতেছি।"

মনিয়া এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে এইবার সাহসে ভর করিয়া কহিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও, তুমি মেহেরবাণ, আল্লা তোমার মঙ্গল করিবেন। আমি কসবী নহি, আমাকে ছাড়িয়া দাও।" সুরাবিজড়িত কণ্ঠে আগন্তুক কহিল, "তুমি কসবী, কোন্ শয়তান এমন কথা বলে? তুমি পরী। জানি, তুমি যে আমার কলিজা, জান্ থাকিতে কেমন করিয়া ছাড়িয়া দিব জানি? অমন কথা বলিও না জানি! চল, আমি তোমাকে লইয়া যাই।" এই বলিয়া সে মনিয়ার দিকে অগ্রসর হইল, এবং উভয় হস্তে তাহাকে চাপিয়া ধরিল। মনিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন বলবান্ দৃঢ়মুষ্টিতে আগন্তুকের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। সে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া মনিয়াকে পরিত্যাগ করিল। মনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। নবাগত আগন্তুকের গ্রীবা পরিত্যাগ করিলে, সে মুক্ত তরবারী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। নবাগত অনায়াসে তাহার তরবারী ছিনাইয়া লইয়া কহিলেন, "আফ্‌রাসিয়ব খাঁ, তোমার অত্যাচারে শাহ্‌জাদা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তুমি এখন হইতে সপ্তাহকাল মজলিসে আসিতে পাইবে না।" শাহ্‌জাদার নাম শুনিয়া আফ্‌রাসিয়ব খাঁর মত্ততা দূর হইল। সে বেত্রাহত কুক্কুরের মত সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। আগন্তুক অচৈতন্য মনিয়ার দেহ উঠাইয়া লইয়া শিবিরাভ্যন্তরে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যূষে পাটনার দুর্গের নিম্নে ভাগীরথীতীরে সিক্ত সৈকতে বসিয়া সুদর্শন আপন মনে ভৈরবী ভাঁজিতেছিলেন; এমন সময়ে দূর হইতে তাঁহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেদিকে ফিরিয়া চাহিলেন; কিন্তু উত্তর দিলেন না। যে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, সে অন্ধ; কিন্তু সে সুরের শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার দিকে আসিতেছিল। সুর থামিয়া গেলে, সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল; এবং ডাকিল, "দাদা, ও বড়দাদা! এই যে ছিলে, আবার কোথায় গেলে?" ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যমের বাড়ী! তোদের জ্বালায় আমার যমালয়ে গিয়াও নিষ্কৃতি নাই! শেষ রাত্রিতে পলাইয়া আসিয়া একটু আলাপ করিতেছি, অমনি আসিয়া জ্বালাতন আরম্ভ করিয়াছিস?

আচ্ছা, তোকে কে বলিল যে, আমি গঙ্গার ধারে আসিয়াছি? লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার!" অরু হাসিয়া কহিল, "আমি যে তোমার সুর ধরিয়া এতদূর চলিয়া আসিলাম। তুমি যখন আলাপ আরম্ভ কর, তখন কি লোকের বুঝিতে বাকী থাকে যে, তুমি কোথায় আছ?" "ওরে হনুমান, এ পাটনা সহরে দশ হাজার লোক এ ভৈরবী আলাপ করিতে পারে। তুই কেমন করিয়া জানিলি যে, এই কেল্লার পাশে, গঙ্গার ধারে বসিয়া, সুদর্শন ভট্টাচার্য্যই ভৈরবী আলাপ করিতেছে?" অরু অধিকতর উচ্চ-হাস্য করিয়া কহিল, "সেটা কি বড় কঠিন কথা সুদর্শন দাদা? পাটনা সহরে যত হাজার কলাবৎই থাক, আমার সুদর্শন দাদার গলার মত গলা একজনেরও নাই।"

ব্রাহ্মণ প্রশংসা শুনিয়া প্রসন্ন হইয়া হাসিয়া ফেলিলেন, এবং অরুর দিকে অগ্রসর হইয়া, হাসিয়া কহিলেন, "যা' বলিয়াছিস্ ভাই! এদেশের লোকের আওয়াজ মিঠা নহে। দেখ্ ভূপেন, অনেকদিন তুই সঙ্গৎ করিস্ নাই,—একটু বসিবি?" "এখন বসিবার সময় নহে দাদা, তুমি শীঘ্র এস।" "কেন রে! তুই একটা আস্ত হনুমান।" "হনুমানই হই আর যাই হই, তুমি এখন শীঘ্র এস। মেজদাদা কোথা হইতে একটা স্ত্রীলোক লইয়া আসিয়াছে; এবং তাহাকে আনিয়া অবধি তোমার জন্য ছটফট্ করিয়া বেড়াইতেছে।" "সে কি রে, অসীম কি বিবাহ করিয়া আসিল না কি! মেয়েমানুষ আনিল কোথা হইতে?" "না, তা কেন, এ যে বাইজী! বোধ হয় কাল যে শাহ্‌জাদার মজলিসে মুজরা করিতে আসিয়াছিল সেই; কিন্তু আমি ত চোখে দেখিতে পাই না; আর সে ও আসিয়া অবধি মুখ খোলে নাই।" "সে মাগী কোথায়?" "আমার তাম্বুতে।" "আর অসীম?" "আমার তাম্বুর বাহিরে।" "ভাল কথা, চল যাইতেছি। হাঁ রে ভূপেন, অসীম বাইজীটাকে তাম্বুতে আনিল কেন?" "তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব দাদা?" "বলি, ফুস্-ফুস্, ফিস্ ফিস্ কিছু শুনিতে পাইলি?" "সে আবার কি?" "তুই একটা আস্ত বাঁদর! বলি, প্রেমে পড়িলে নায়ক নায়িকা যেমন অস্পষ্ট স্বরে কথা কয়, অথচ অত্যন্ত অধিক কথা কয়, সে সব কিছু শুনিতে পাইয়াছিস্?" "প্রেমে পড়িলে নায়ক-নায়িকা বুঝি অস্পষ্ট স্বরে কথা কয়? তাহা আমি কেমন করিয়া জানিব? বলি, বড়দাদা, তুমি কি তবে বৌদিদিকে ভালবাস না?" "ভাল জ্বালা! ইহার মধ্যে বৌদিদিকে টানিয়া আনিলি কেন?" "তুমি ত বৌদিদির সঙ্গে ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কও না? তোমরা যখন আলাপ কর, তখন গ্রামের লোকে বুঝিতে পারে যে, সুদর্শন দাদা বৌদিদির সহিত কথা কহিতেছে।" "ওরে হনুমান, মানুষ যখন প্রথম প্রেমে পড়ে, তখন ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহে। তোকে সে কথা আমি কেমন করিয়া বুঝাইব?" "কই, তোমাকে ত কখনও বৌদিদির সহিত ফিস্-ফিস্ করিয়া কথা কহিতে শুনি নাই?" "ওরে বাঁদর, আমি এই বিশ বৎসরের মধ্যে প্রেমে পড়িয়াছি মোটে একবার!" "কবে?" "যেদিন তোর বৌদিদি নিজ হাতে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন।" "বটে, এত বড় কথা! আমি আজই বৌদিদিকে বলিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণ একেবারে জল হইয়া গেল; এবং অত্যন্ত বিনীত ভাবে কহিল, "লক্ষ্মী দাদাটি আমার, এমন কাজ করিও না। এমনিতেই মাগীর গলার আওয়াজে বাড়ীতে কাক চিল বসিতে পায় না, তাহার উপর আবার যদি এ কথা শোনে, তাহা হইলে, চীৎকার করিয়া গগন বিদীর্ণ করিবে। তুমি এমন কাজ করিও না ভাই! তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।" "ভাল কথা, এমন গোস্তাকী কিন্তু বারবার করিও না। তুমি শীঘ্র চল, দাদা তোমার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন।" উভয়ে ভাগীরথীতীর পরিত্যাগ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং দ্রুতপদে শাহ্‌জাদার শিবিরের দিকে চলিলেন। শিবির দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শাহ্‌জাদার প্রকাণ্ড বিচিত্র বস্ত্রাবাস এবং তাহার চারিদিকে মুসলমান সেনাপতি ও সৈন্যগণের তাম্বু। দ্বিতীয় ভাগ আয়তনে বৃহৎ ও উহা হিন্দু সৈনিকগণের আবাসে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগের এক কোণে গঙ্গাতীরে দুইটি প্রকাণ্ড তাম্বু। তাহার একটির বহির্দ্দেশে, ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে বসিয়া, এক ব্যক্তি আলবোলায় ধূমপান করিতেছিল। ভূপেন দূর হইতে তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "নবকৃষ্ণ, বড়দাদা আসিয়াছেন।" নবকৃষ্ণ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া, আলবোলার নল ফেলিয়া দিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং সুদর্শনকে কহিল, "এই যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আসিতে আজ্ঞা হয়। এইমাত্র একজন খওয়াস্ আসিয়া হুজুরকে

তলব করিয়া লইয়া গেল।" সুদর্শন ব্যগ্র হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি নব, সে ছুঁড়ীটা কোথায় গেল?" নবকৃষ্ণ হাস্যের প্রবল বেগ অতি কষ্টে দমন করিয়া কহিল, "কোন্ ছুঁড়ীটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়?" সুদর্শন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "বখ্রা পাইয়াছিস্ বুঝি?" নবকৃষ্ণ দন্তে দন্ত পেষণ করিয়া দ্বিতীয়বার হাস্য গোপন করিল; এবং অতি ধীরে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি পরগণে কঙ্কণপুরের বন্দোবস্তের কথা রূপকচ্ছলে ব্যক্ত করিতেছেন?" ভূপেন এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অম্বরী তামাকের গন্ধ আসিতেছে কোথা হইতে?" সুদর্শন পাছে ভূপেনকে বলিয়া দেয় যে, নবকৃষ্ণ চন্দনকাষ্ঠের চৌকীর উপরে বসিয়া সোনার আলবোলায় ঢাকাই কান্নার সট্‌কায় ধূমপান করিতেছিল, সেইজন্য সে অতি কাতর ভাবে বাক্যহীন বিনয়ে সুদর্শনকে তুষ্ট করিতেছিল। সুদর্শন কিন্তু সহজে তুষ্ট হইবার পাত্র নহেন। তিনি নয়ন ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না মিলিলে, সুবর্ণের এখনই হইতে ধূমোদ্গীরণের কারণ ব্যক্ত হইয়া যাইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া নবকৃষ্ণ অস্ফুটোচ্চারিত ভাষায় কহিল, "বাগের ভিতরে।" ভূপেন উত্তর না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া সুদর্শনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়দাদা, দেখ না অম্বরী তামাকের গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে?" নবকৃষ্ণ ফাঁপরে পড়িল। সুদর্শনও উত্তর না পাইয়া দীর্ঘ রুক্ষ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে চক্রীর চক্রে নবকৃষ্ণ বাঁচিয়া গেল।

নিকটের বস্ত্রাবাসে একটা বহুমূল্য রেশমের পর্দ্দা সরিয়া গেল। নূপুর-বলয়নিক্কণে নীরব বনস্থলী মত্ত হইয়া উঠিল। কোমলাঙ্গের আবরণ ইতস্ততঃ ঘর্ষণে যে শব্দ হইয়া থাকে, তাহা জানাইয়া দিল যে, একটা বহুমূল্য পেশোয়াজ দ্রুতবেগে আবর্ত্তিত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে বীণানিন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "বাবু সাহেব!" প্রশ্নকর্ত্রীকে দেখিয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া, সুদর্শন ভট্টাচার্য্য স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি দীর্ঘ তৈলহীন কেশরাশির মধ্যে রহিয়া গেল। নবকৃষ্ণ আভূমি-নত হইয়া একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া ফেলিল। ভূপেন কিছু দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

রমণী কিন্তু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। সে উচ্চতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু সাহেব কাঁহা গেয়ে?" নবকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "জী, হুজুর,—তোবা, তোবা, রাধেকৃষ্ণ! বিবি সাহেব, কেয়া হুকুম ফরমাইয়ে?" ভূপেন রমণীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি কিছু আবশ্যক আছে বাইজী?" "না, ভাইসাহেব, কেবল জিজ্ঞাসা করিতেছি, বাবু সাহেব কোন্ দিকে গেলেন?" বাইসাহেব সম্বোধনে ভূপেন শিহরিল। নবকৃষ্ণ কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে বাধা দিয়া ভূপেন বলিয়া উঠিল, "দাদার দরবারে তলব হইয়াছে; বোধ হয়, আসিতে বিলম্ব হইবে। আপনার যদি কিছু আবশ্যক থাকে বলুন।" রমণীর মুখে ক্ষীণ বিদ্যুল্লেখার ন্যায় ঈষদ্ধাস্যের রেখা গোলাপবর্ণ ওষ্ঠে মিলাইয়া গেল; ঈষদভিমানে ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইল। রমণী কহিল, "নেহি ভাইসাহেব, আপ্‌লোগ্‌কো বহুৎ শুক্রী আদা করতা হুঁ, মেরি কুছ্ ভি জরুরৎ নেহি।"

বস্ত্রাবাসের ঘন যবনিকা পড়িয়া গেল। কোমলাঙ্গে লাগিয়া বহুমূল্য বস্ত্রের পেশোয়াজ মৃদু শব্দ করিল। হেনার ক্ষীণ গন্ধ গঙ্গাবারিকণাসিক্ত শরৎ পবন বহুদূর বহিয়া লইয়া গেল। সুদর্শন হতাশ সহসা ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল এবং ললাটে করাঘাত করিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ!" ভূপেন ক্রুদ্ধ হইল। রমণী তাহাকে ভাই সম্বোধন করায় সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। এখন সুদর্শনের কাতরোক্তি শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বড়দাদা, কি কর! মেজদাদা তেমন লোক নহেন।" নবকৃষ্ণ এই অবসরে সট্‌কা ও আলবোলা লইয়া দ্বিতীয় তাম্বুতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে রৌদ্র উঠিল। সুদর্শন ভূপেনকে ডাকিয়া তাঁহার পার্শ্বে শিশিরসিক্ত শষ্পশয্যায় উপবেশন করাইলেন; এবং তাহার পৃষ্ঠে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন, "ভূপ, ভাই, কথাটা আমার বড় সোজা ঠেকিল না। ছোট রায় নির্ব্বোধ নহে বটে, তবে কি জান—ওর নাম কি, যৌবনকাল—এই; তা না—তবে কি না, প্রথম উন্নতির মুখ—ঐ লোকে বলে, কাঁচা পয়সা আর কাঁচা বয়স—" ভূপেন্দ্র অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, "বড়দাদা, তুমি কি পাগল হইলে না কি! অসীম রায় বেশ্যা-কন্যার রূপে মুগ্ধ হইবে? যে দিন হইবে, সে দিন

এই অন্ধ নয়ন দুইটা উপাড়িয়া ফেলিব।" সুদর্শন দুই-তিনবার শুষ্ক বায়ু গলাধঃকরণ করিয়া অতি ধীরে ধীরে কহিলেন, "না, তা কি জান-সে কথা বলি নাই-তবে ওর নাম কি জান, রমণী-রূপ, প্রখর খর যৌবন, প্রবল বন্যা, প্রায় একই প্রকার। তুমি ত দেখিতে পাও না ভাই--" সুদর্শনের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল,--বস্ত্রাবাসের বহুমূল্য ঘন-নীল যবনিকা দ্বিতীয়বার অপসারিত হইল। দ্বিতীয়বার কুসুম-পেলব অঙ্গ-স্পর্শে আন্দোলিত পেশোয়াজ মৃদু শব্দ করিয়া উঠিল। পবন হিল্লোল হেনার ক্ষীণ গন্ধের সহিত সুবাসিত কেশতৈলের গন্ধের আভাস বহন করিয়া আনিল; বলয়-কঙ্কণ-নূপুর-শিঞ্জন নিস্তব্ধ বনস্থলী মুখরিত করিয়া তুলিল। অদূরে বৃক্ষশাখায় একটা কাক তাহার কর্কশ রবে সুপ্ত জগতের সুষুপ্তি ভঙ্গ করিতেছিল,--সে যেন ভয়ে নীরব হইল। বীণানিন্দিত কণ্ঠ হইতে দ্বিতীয়বার উচ্চারিত হইল, "বাবু সাহেব!" ভূপেন্দ্রের দীপ্ত ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। সে কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তোমার বাবু সাহেব এখনও ফিরেন নাই নর্ত্তকী! উতলা হইতেছ কেন? রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে মধ্যে মধ্যে নায়ক নায়িকাকে বিস্মৃত হইয়া থাকে!" ঘন নীল যবনিকা সহসা পড়িয়া গেল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

১৭১২ খৃষ্টাব্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় বৎসর। এই এক বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মান্ধ বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব আজীবন যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের বর্ষীয়ান্ পুত্র যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন হইতেই প্রবল ভ্রাতৃ-বিরোধের সূচনা হইয়াছিল। বাদশাহ্ শাহ্ আলম যদি দৃঢ়তার সহিত, এই ভ্রাতৃবিরোধ অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই, কঠোর ভাবে নিষ্পেষিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয় ত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই মোগল-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ বিদেশীয় বণিকের কর-কবলিত হইত না। কিন্তু শাহ্ আলম্ চিরদিন উদারনৈতিক। তিনি কখনও রাষ্ট্রনীতির কঠোর শাসন গ্রাহ্য করেন নাই। পিতার জীবদ্দশাতেই দাক্ষিণাত্যে মারাঠা যুদ্ধে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন।

বাদশাহের অন্তিমকাল যে অতি নিকটবর্ত্তী, তাহা সাম্রাজ্যের প্রধান তোরণ লাহোর সহরে কাহারও অবিদিত ছিল না। সকলেই জানিত যে, অচিরে প্রবল রুধির ধারা প্রবাহিত হইবে,--সপ্ত ভ্রাতৃরক্তে অভিষিক্ত হইয়া শাহ্ আলমের চারি পুত্রের মধ্যে একজন ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন। কিন্তু হিন্দুস্থানে বা দক্ষিণে কেহ কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, অলস, চপলচিত্ত, বিলাসপ্রিয় জহান্দার শাহ্ একদিন ময়ূর-সিংহাসন লাভ করিবেন। সকলেই জানিত যে, শাহ্ আলমের দ্বিতীয় পুত্র ধীমান্, কার্য্যদক্ষ, রাষ্ট্রনীতি-কুশল আজীম-উশ্-শান্ পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিবেন। আজীম-উশ্-শান্ পিতার প্রিয়পাত্র, অপরিমিত ধনশালী এবং পিতার জীবদ্দশাতেই প্রকৃত সম্রাট্ ছিলেন। অন্যান্য ভ্রাতা অপেক্ষা তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা, কামান ও গোলন্দাজ অধিক ছিল। সাম্রাজ্যের প্রধান মনসব্‌দারগণ কেবল তাঁহারই বাধ্য ছিলেন। মুরশিদাবাদ হইতে বীজাপুর পর্য্যন্ত এবং কাবুল হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত সমস্ত সুবাই তাঁহার মনোনীত সুবাদার কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছিল। সুতরাং তাঁহার সিংহাসন লাভ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না। অদৃষ্টচক্রের অদৃশ্য-হস্ত-চালিত ভাগ্যচক্রের অভাবনীয় বিপর্য্যয়ে শাহ্ আলমের মৃত্যুর সপ্তাহকাল মধ্যে গতযৌবন, বিলাসী জহান্দার বিস্তৃত মোগল-সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। আর প্রবলপরাক্রান্ত হস্তী চেতনাহীন আজীম্-উশ্-শানের দেহ বহন করিয়া ইরাবতীর জলরাশিতে আত্ম-বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে দারা, সুজা ও মোরাদের পরিণাম হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

শাহ্ আলম্ যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অনুচরবর্গের মধ্যে লাহোরের সঙ্কীর্ণ রাজপথ সমূহে প্রতিদিন সংঘর্ষ উপস্থিত হইত। মুমূর্ষু সম্রাট্ ক্ষীণ দেহের সমস্ত বল একত্র করিয়াও, পুত্রগণকে বিবাদ হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। সেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যের সমস্ত আমীর-ওমরাহ্ ও মনসবদার আত্মরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল এক ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিল। সেও অতি বৃদ্ধ—আলম্-গীর-ই-আমলের নেতা। বৃদ্ধ সম্রাটের বৃদ্ধতর মন্ত্রী মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর আশদ্ খাঁ।—সেও জানিত যে, তাহার মন্ত্রণা ব্যতীত বৃদ্ধ বা বালক যে-কেহ ময়ূর-

সিংহাসনে উপবেশন করিবে, তাহার পক্ষে সাম্রাজ্য শাসন অসম্ভব হইবে। ইরাবতী-তীরে অসংখ্য সুন্দরী নর্ত্তকী-পরিবেষ্টিত সুদূর-গত-যৌবন বৃদ্ধ আশদ্ খাঁ যখন নিজ ভবিষ্যৎ বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত করিতেছিলেন, তখন অদৃষ্টচক্রী অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি অদৃষ্টচক্রে অর্পণ করিয়া অশান্ত হাস্যে দিগন্ত-বিস্তৃত নীল গগন পরিপূর্ণ করিতেছিল।

বাদশাহ্ শাহ্ আলমের মৃত্যু হইলে, তাঁহার চারি পুত্র জহান্দার, আজীম্ উশ্-শান, আজম্ ও রফী-উশ্-শান্ নিজ নিজ শিবিরে নিজের সিংহাসন লাভ ঘোষণা করিলেন। তাহা শুনিয়া লাহোরের অধিবাসিগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। জহান্দার জ্যেষ্ঠপুত্র। উত্তরাধিকার মতে সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি দুর্ব্বল। মনে দুর্ব্বল, বলে দুর্ব্বল, চিত্তে চঞ্চল। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে বৃহৎ সাম্রাজ্য পোতের কর্ণ ধারণ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব জানিয়া, বুদ্ধিমান ওমরাহমাত্রেই তাঁহার শিবির পরিত্যাগ করিল, পারিল না কেবল একজন। আজীম-উশ্-শানের শিবিরে ওমরাহমাত্রেই আদৃত হইল; কেবল একজন প্রত্যাখ্যাত হইল,—সে প্রবল পরাক্রান্ত প্রধান উজীর আশদ্ খাঁর একমাত্র পুত্র জুল্‌ফীকর খাঁ।

কি কারণে জুল্‌ফীকর খাঁ আজীম উশ্-শানের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় নাই। মোগল ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, আমীর উল্-ওমরা সাম্রাজ্যের প্রধান বখ্‌শী জুল্‌ফীকর খাঁ মুরাদৎ খাঁকে পাঠাইয়া শাহ্‌জাদা আজীম উশ্-শানের কৃপাকটাক্ষ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মুরাদৎ খাঁর দৌত্যের ফলও শুভ হয় নাই। শেখ্ কুদরৎ উল্লাহ্ নামক সামান্য কর্ম্মচারী তাঁহাকে অনুপযুক্ত ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং সেই অপমানের জন্য জুল্‌ফীকর খাঁ আজীম-উশ্-শানের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। একথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যে আজীম-উশ্-শান্ তখন প্রবল পরাক্রান্ত, এবং যাঁহার সিংহাসন-লাভ তখন নিশ্চিত ছিল, তাঁহাকে জুল্‌ফীকর খাঁর ন্যায় পদস্থ কর্ম্মচারী যে এই সামান্য অপমানের জন্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। বহু উচ্চপদস্থ মোগল কর্ম্মচারী অতি সামান্য অপরাধে, এমন কি বিনা অপরাধেও, অবমানিত, লাঞ্ছিত ও পদচ্যুত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কখনও এই সামান্য কারণে বাদশাহের প্রিয় পুত্রের বিপক্ষাচরণ করিতে ভরসা করেন নাই।

যে কারণেই হউক, প্রধান উজীর আশদ্ খাঁর পুত্র প্রধান বখ্‌শী জুল্‌ফীকর খাঁ সম্রাট্ শাহ্ আলমের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা আজীম উশ্-শানের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই; এবং তাঁহার জন্যই জহান্দার শাহ্, জহান্ শাহ্ ও রফী উশ্-শান্ একত্র হইয়া আজীম-উশ্-শানকে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। জুল্‌ফীকর খাঁর বলে, কৌশলে ও মন্ত্রণায় অসহায়, বুদ্ধিহীন নিষ্কর্ম্ম জহান্দারের অষ্টশত অশ্বারোহী অল্পকালে বিংশতি সহস্রে পরিণত হইয়াছিল। জুল্‌ফীকর খাঁর কৌশলে আজীম-উশ্-শান্ একক ভ্রাতৃত্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলেন এবং দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যদি ভ্রাতৃত্রয়কে একত্র মিলিত হইতে না দিয়া, স্বয়ং তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে হয় ত পঞ্চচত্বারিংশৎবর্ষ পরে ফিরিঙ্গী বণিক মোগল সাম্রাজ্যের পঞ্চমাংশ বিনাযুদ্ধে অধিকার করিতে পারিত না। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়; অতএব অতুল বলসম্পন্ন আজীম উশ্-শান্ স্বেচ্ছায় বিনাশের পথ অবলম্বন করিলেন। দুর্গমধ্যে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কিছুদিন বসিয়া থাকিয়া আজীম-উশ্-শানের অনুচরগণ একে-একে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল এবং অবশেষে বলহীন আজীম উশ্-শান পরাজিত হইলেন। শেষদিনের যুদ্ধে তিনি আহত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার আহত হস্তী প্রভুর দেহ পৃষ্ঠে লইয়া ইরাবতী নদীতে লম্ফ দিয়াছিল, ইহাই ইতিহাস। শফর মাসের নবম দিবসে ১১২৪ হিজরায়, তাঁহার পিতার মৃত্যুর বিংশতি দিবস পরে আজীম-উশ্-শানের মৃত্যু হইয়াছিল।

ইহার পরে চক্রী জুল্‌ফীকর খাঁ প্রথমে জহান শাহ্‌কে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করেন। আজীম-উশ্-শানের মৃত্যুর দশ দিবস পরে জহান্ শাহ্ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন এবং তাহার পরদিবস শাহ্‌জাদা রফী উশ্-শান্ মুষ্টিমেয় প্রভুভক্ত অনুচর-পরিবেষ্টিত হইয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই আজীম উশ্-শানের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ করীম

দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন; এবং লাহোরে এক তন্তুবায়ের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে অন্নাভাবের জন্য আশ্রয়দাতা তন্তুবায়ের হস্তে একটি বহুমূল্য রত্ন দিয়া তাহাকে তাহা বিক্রয় করিতে অনুরোধ করায়, সে প্রাণভয়ে তাহার অতিথির পরিচয় ব্যক্ত করিয়া ফেলে; এবং মহম্মদ করীম জহাঁদার শাহের অনুচরগণ কর্তৃক ধৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ঘটনার দুইদিন পরে হতভাগ্য শাহজাদা দিবসত্রয়ব্যাপী উপবাসের পর জুলফীকর খাঁর হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন। তিনি যে সময়ে অতি কাতরভাবে একখণ্ড রুটি ও এক গণ্ডূষ জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে জুলফীকর খাঁর আদেশে তাঁহার অনুচরবর্গ শাহজাদা মহম্মদ করীমকে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়াছিল।

পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তির একবিংশ দিবস পরে, ১১২৪ হিজরার শফর মাসের উনবিংশ দিবসে ফররুখসিয়র পাটনায় পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরাজয় ও মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দিল্লীতে জনরব উঠিয়াছিল যে, ফররুখসিয়র পাটনা হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা দেশাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ফররুখ্‌সিয়রের সে উদ্দেশ্য ছিল কি না বলিতে পারা যায় না। তিনি তাঁহার মাতার প্ররোচনায় মাত্র চারিশত আহদীর ভরসায় পাটনা নগরের প্রান্তে আফ্‌জল খাঁর উদ্যানে আপনাকে বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর রূপে ঘোষিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে সৈয়দ হুসেন্ আলি খাঁ পাটনার সুবাদার। ফররুখ্‌সিয়র যে সময়ে তাঁহার পিতার সিংহাসন-লাভের সংবাদ ঘোষণা করিয়া পাটনায় উৎসব করিতেছিলেন, হুসেন্ আলি খাঁ সে সময়ে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; কিন্তু ফররুখ্‌সিয়রের অভিষেক কালে তিনি কোথায় ছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। (ক্রমশঃ)

বঙ্গ-বন্দনা

[শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ]

জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা ;—

শীর্ষ উজ্জ্বল রাজে শুভ্র তুষার-ভার,
বক্ষে শোভিছে শুভ গঙ্গা যমুনা-হার,
সিন্ধুনীলাভ জল চুম্বে চরণতল
উন্মল প্রীতিরাগছন্দা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা!

কুঞ্জকানন ঘিরি গুঞ্জরে শত পিক,
নন্দিত কল-গানে ঝঙ্কৃত দশদিক,
পুষ্পিত তরুদল শঙ্কিত ভূমিতল
অক্ষয় কুসুমমধুগন্ধা।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা।

কর্ম্মদণ্ড করে ভাস্বর মহীয়ান—
নিত্য প্রভাতে আসি জাগ্রত করে প্রাণ,—
অন্তরে বহি প্রীতি মন্থরে আসে নিতি
ঝিল্লীমুখর মধুসন্ধ্যা।
জয় বঙ্গ জননী চিরবন্দ্যা!

রুদ্র বৈশাখে হেরি দীপ্ত আলোর খেলা,
মুক্ত বরষাধারে সিক্ত চিকুর মেলা,
শান্ত শরতে একি উৎসব সাজে দেখি—
সর্ব্ব বেদন শোকহন্ত্রী।
জয় বঙ্গ-জননী চিরবন্দ্যা!

শিল্প কৌশল শিক্ষা ও বাণিজ্যের সহায় সকল আয়ত্ত করাই এক্ষণে 'অধিকন্তু ভাবাং'। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় এক্ষণে আলোচনা করিব।

আধুনিক বাণিজ্য ও তৎ-শিক্ষা-প্রণালী

আধুনিক বাণিজ্যে কোন্ জাতি প্রবৃত্ত আছে? পাশ্চাত্য জাতি-সমূহ ও এসিয়া খণ্ডের জাপানী জাতি। ভারতবর্ষ এই পরহস্তগত বাণিজ্যের শুধু উপাদানই এতকাল যোগাইতেছে। অধিকাংশ 'মহাসিন্ধুর ওপারেই' যাইতেছে। সেকথা থাকুক।

এক্ষণে দেখি, এ বাণিজ্য কি পদ্ধতিতে চলিতেছে। আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষার ভারতীয় একটি প্রণালী আছে বটে; কিন্তু পরদেশীয়েরা ভারতের সহিত এই বিশাল বাণিজ্যে নিজ দেশের প্রণালীই অবলম্বন করিতেছে। ইহাই উহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এক্ষণে আমরা কি প্রণালী মতে হিসাব রক্ষা বা ব্যবসায় চালনা করিলে বিদেশীয় জাতির সহিত ব্যবসায় চালাইয়া সুকৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব?

আমাদের হিসাব-রক্ষার (Accountancy) ও ব্যবসায় চালনার (Business method) প্রণালী বিদেশীয়ের অনুকরণেই হওয়া উচিত। কারণ, বিদেশীয়েরা ভারতীয় প্রণালী অবলম্বন করিবে না। আমাদিগেরও বিদেশীয় জাতিদের সহিত ব্যবসায় চালাইতেই হইবে।

এই প্রসঙ্গে বলিতে হইবে যে, নূতন ধরণের ব্যবসায় সকল (যথা Joint Stock Company) আমাদের দেশীয় প্রণালী মতে চলিবে না। Joint Stock Company বা যৌথ কারবার এক্ষণে অনেকই হইতেছে। এইরূপে ব্যবসায় সংক্রান্ত হিসাবাদি রক্ষা এদেশের বর্ত্তমান রাজবিধি অনুসারে বিদেশীয় ধরণেই করিতে হইবে।

এই সব ব্যবসায়ের প্রণালী সর্ব্বদাই 'কৃতকর্ম্মা' (Practical) লোকের অবলম্বিত উপায়ের মত হওয়া উচিত। যে উপায়ে সহজে নিভুল রূপে কাজে চলে, তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। জটিল ভাবে হিসাব রাখিলে, বা কার্য্যাদি সংক্রান্ত পত্র বা নিদর্শনাদি বিশৃঙ্খল ভাবে রাখিলে ব্যবসায় বিনষ্ট হইবেই। একটি শুদ্ধ সরল ও কার্য্যকরী প্রণালী এক্ষণে অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাই ইংরেজী প্রণালী (English System of Accountancy) বটে।

এই ইংরেজী প্রণালীটি বাঙ্গালীরা বিশেষ ভাবে শিখিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণেও ইংরেজ বণিকের অধীনে কাজ করিয়া এই শিক্ষা পাইতে হইতেছে। এইরূপে শিখিলে বৃথা অনেক সময় নষ্ট হয়। মূল্যবান যৌবন সময় 'অনাবে অরণ্যে' নষ্ট হয়; বিদ্যালয়ে সুচারুরূপে এই শিক্ষা হওয়া উচিত। তবেই আমাদের স্বদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়িগণ অল্প সময়েই পরদেশীয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

বঙ্গীয় ব্যবসায়িগণ বিদেশীয় হিসাব রক্ষার বিদ্যা অবশ্যই শিখিবেন। তবেই তাঁহারা স্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন। এই ইংরেজী প্রণালীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বণিক ও তৎসহযোগী যন্ত্র-চালিতের ন্যায় নিজের মহা জটিল সমস্যাসকলের সরল মীমাংসা করিতে পারিবেন। অনুমান আন্দাজের পথে চলিতে হইবে না। চাক্ষুষ বা স্পষ্টভাবেই সকল বিষয়ের তথ্য তিনি জানিবেন। জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহের ও লাভালাভের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ধার তিনি অতি সহজেই করিতে পারিবেন। বণিক বা ব্যবসায়ী তবেই নিঃশঙ্ক বা নিঃসন্দেহ চিত্তে ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন। তিনি লাভের আশার কুহকে নিজের অজ্ঞাতসারে সর্ব্বনাশের পথে যাইবেন না। দিনের পর দিন তিনি নিজের ব্যবসায়ের ক্ষতি বৃদ্ধির, লাভালাভের প্রকৃত তথ্য জানিবেন। কিছুই অজ্ঞাত বা অনিশ্চিত থাকিবেক না। এই হচ্ছে ইংরেজী প্রণালীর* হিসাবের প্রধান উদ্দেশ্য।

বস্ত্র সমস্যা

[শ্রীনীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি-এল]

কয়েক মাস পূর্ব্বে বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত বস্ত্র সমস্যা প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেকেই সেই প্রবন্ধ মনোযোগ সহকারে পড়িয়া থাকিবেন। দিন দিন যেরূপ বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, ইহাতে ভূমিবিহীন শ্রমজীবী ও চাকরীজীবী অল্প বেতনের মধ্যবিত্ত পরিবারের উৎসন্ন যাইতে বড় বেশী বিলম্ব নাই, —অচিরে ইহার প্রতিকার আবশ্যক। আমি আমার জীবনের বাল্যকালে একটাকা চারি আনায় বা ১।০ এক মণ চাউল খরিদ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু এখন টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায়, পাটের চাষের আধিক্য হওয়ায়, এবং ধান্য জমির চাষ সে পরিমাণে বৃদ্ধি না পাওয়ায়, বৈদেশিক রপ্তানী এবং অন্যান্য কারণে একমণ চাউলের দাম ১০ টাকা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমার বয়স ৫৪ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। বস্ত্রের অবস্থাও অতি শোচনীয়। গত পাঁচ বৎসরে বস্ত্রের মূল্য প্রায় তিন গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অথচ সাধারণতঃ লোকের আয় সে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই। প্রত্যুত, বহু লোক কর্ম্মাভাবে অলস ভাবে বসিয়া থাকিতে বাধ্য আছে। দেশে অন্নবস্ত্রের জন্য হাহাকার দেখা দিয়াছে। কোন-কোন স্থানে লোকে লজ্জার ও কষ্টের হাত এড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে। সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে বস্ত্র অভাবে বিশেষ কষ্ট হইয়াছে—সংবাদপত্রে এরূপ কাহিনী আমরা বহুবার পাঠ করিয়াছি। শুধু বক্তৃতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া দেশের কাজ করার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগের নিজেদের, আমাদের দেশের ভাই-ভগিনীদিগের লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে ও ক্ষুধার জ্বালা এড়াইতে হইলে, আমাদিগকে বীরের মত কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে। গৃহস্থ যাহাতে সাধারণ প্রয়োজনীয় বস্ত্রের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের ঘরে বসিয়া বস্ত্র-বয়ন পূর্ব্বক নিজ-নিজ পরিবারস্থ লোকের লজ্জা নিবারণ করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য আমাদের যত্নবান হইতে হইবে। বঙ্গদেশে এমন এক সময় ছিল, যখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী কাপা-

---

* বিদ্যোৎসাহী, দানশৌণ্ড কাশিমবাজারের মহারাজা এই প্রণালী শিক্ষাদান কল্পে বহরমপুর কলেজে এই প্রকারের একটী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন।

সর বীজ ছাড়াইবার কল, সুতা-কাটার কল এবং বস্ত্রবয়নের তাঁত ছিল। পরে বস্ত্রবয়নের ভার তাঁতী ও জোলার হস্তে অর্পিত হইলেও প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে সুতা-কাটার কল বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক গৃহস্থ নিজ-নিজ তৈয়ারী সুতা জোলা ও তাঁতীকে দিয়া নিজ-নিজ ইচ্ছামত বস্ত্র বয়ন করাইয়া আনিত। বেশী দিনের কথা নহে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, ইয়োরোপীয় কলের প্রতিযোগিতায় এই সুতা-কাটা ব্যবসায় বঙ্গদেশ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। কেবল তসর ও গরদের সুতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে বলিয়া ঐ ব্যবসায় এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশে, উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ স্থলে এবং কোচবিহারে এণ্ডি কাপড়ের বহু প্রচলন ছিল। ঐ কাপড় প্রস্তুত করিতে এণ্ডি পোকার চাষ হইত। এখন সে চাষ হয় না। ইহা আমার নিজের জানা। আসাম প্রদেশে এখনও এণ্ডি চাষ ব্যবসায় চলিতেছে। সেখানে অধিকাংশ পরিবার এণ্ডি মুগা প্রভৃতি বস্ত্রবয়ন করিতে পারে। গৃহকার্য্যের অবসর সময়ে তাহারা এ কার্য্য করে। কুমারীদিগের বিবাহের পূর্ব্বে বস্ত্রবয়ন শিল্পে অভিজ্ঞতা আছে কি না, তদ্বিষয়ে পাত্র-পক্ষ হইতে প্রশ্ন ও পরীক্ষা হইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে যেমন কুমারীর হস্তাক্ষর পরীক্ষা হয়, আসাম দেশে তেমন কুমারীর কৃত রুমাল, চাদর সাড়ী প্রভৃতির পরীক্ষা করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে বস্ত্র যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমি আশা করি যে প্রতি পল্লীবাসী গৃহস্থ নিজ নিজ প্রাঙ্গণে কার্পাস বৃক্ষ রোপণ করিবেন এবং বীজ হইতে তুলা বাহির করার কেরকী এবং সুতা কাটার চরকা কল তৈয়ার করিবেন এবং সেই সুতার দ্বারা বস্ত্রবয়ন করিবার জন্য তাঁত রাখিবেন এবং আপাততঃ কিছু কিছু কার্পাস খরিদ করিয়া বস্ত্রবয়ন-শিল্প অধ্যবসায়ের সহিত আরম্ভ করিবেন। এই রূপ দেশে পুনরায় যাহাতে বস্ত্রবয়ন-বিষয়ক প্রাচীন প্রথা প্রচলিত হইয়া বস্ত্র-কষ্ট দূরীভূত হয় এবং বস্ত্রের জন্য গৃহস্থের ব্যয় কমিয়া যায় ও যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল হয়, সকলেরই সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

গত ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে রংপুর জেলার অন্তর্গত বরবন্দ পরগণার লোকদিগকে এবং নিজ আত্মীয়দিগকে এ সম্বন্ধে বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের সম্পূর্ণ চৈতন্য হয় নাই। বরবন্দের কোন-কোন প্রজা সামান্যমত কিছু কার্পাস বীজ লইয়াছে; এবং কোন কোন স্থানে কার্পাস বৃক্ষ হইয়াছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা উৎকৃষ্ট কার্পাস-বীজ বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন, শ্রীরামপুরে বয়ন-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বয়ন-শিল্পের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাধারণতঃ দেশবাসীদের আলস্য ও শিথিলতায় গভর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। উত্তর পশ্চিম (অধুনা যুক্তপ্রদেশ) প্রদেশের কানপুর নগরে মুদ্রণ ও রঞ্জন (dyeing and printing) বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে: কিন্তু তাহাতে প্রচুর শিক্ষার্থী জুটিতেছে না। যুক্তপ্রদেশ ভিন্ন অন্য স্থানের শিক্ষার্থী সম্বন্ধে অতিরিক্ত কি ধার্য্য হওয়াও তার সংখ্যা কম হওয়ার অন্যতম কারণ বটে।

এক সময়ে দেখিয়াছিলাম, চরকা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে অনেক লেখা-লেখি হইয়াছিল। কেহ বলেন, চরকা আর পুনঃপ্রচলিত করা যায় না। কলকারখানায় সস্তায় সুতা প্রস্তুত হওয়ার দরুণ চরকা আর চলিতে পারে না। এই ধারণা যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা না হয় দেশের মঙ্গল সাধনের জন্য যৌথ কারবার সংগঠন করিয়া সুতা-কাটার কলকারখানা স্থাপন করুন। এ দেশে লক্ষাধিক জোলা ও তাঁতি এখনও রহিয়াছে;—সহজে সুতা পাইলে তাহারা কাপড় বুনিয়া দিতে পারিবে। আর যাঁহারা বিশ্বাস করেন চরকার উপযোগিতা এখনও এদেশে আছে, তাঁহারা চরকার প্রচলনে মনোযোগী হউন; ইহা আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। যেমন মোটরকার হওয়ায় গোশকট উঠিয়া যায় নাই, ষ্টিমবোট হওয়ায় দেশের ছোট নৌকা একেবারে যায় নাই, এবং নদীমাতৃক স্থানে এখনও বহু নৌকা চলিতেছে, সেরূপ সুতা-কাটার কলকারখানা নির্ম্মিত হওয়ায় দেশের চরকা একবারে উঠিয়া যাইতে পারে না। বঙ্গের কয়েকটী প্রধান লোকের সঙ্গে আমি বস্ত্র সমস্যা বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহারা সকলেই সুতা কাটা ও কাপড়ের কলের জন্য যৌথ কারবার খোলা সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। কারবারি লোক এবং ইঞ্জিনিয়ারদিগের নিকট হইতে আমি অনেক আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। অন্যূন পনর লক্ষ টাকা মূলধন হইলে যৌথ কোম্পানি গঠন পূর্ব্বক সুতাকাটা ও বস্ত্রবয়ন যন্ত্রের একটী কল কলিকাতার অনতিদূরে স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহাতে দেশের কল্যাণ ও প্রচুর লাভ হইতে পারে। আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে উৎসাহী এবং উদ্যোগী হইলে, সহজে কল স্থাপিত হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার Mr. D. B. Meek এ বিষয়ে অনেক আবশ্যক সংবাদ আমাকে দিয়াছেন এবং আবশ্যক মত সাহায্য করিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন। ঢাকা নগরী এক সময়ে তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকার মসলিন এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখনও ঢাকায় অনেক তাঁতি-বংশ সম্ভূত বড়লোক বাস করেন। তাঁহারা চেষ্টা করিলে ঢাকা নগরের নিকটেও একপ একটী যৌথ কারবার অল্প আয়াসেই স্থাপন করিতে পারেন। বঙ্গদেশের ভূম্যধিকারীগণ যদি নিজ-নিজ এলাকায় কার্পাসের উপযোগী উচ্চ ভূমিতে কার্পাস চাষের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারেন ও নিজেরাও লাভবান হইতে পারেন। প্রত্যেক জেলাবোর্ড ও প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি একজন করিয়া ম্যাট্রিকিউলেশন পরীক্ষোত্তীর্ণ কর্ম্মী ছাত্রকে শ্রীরামপুর বয়ন-বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া, উন্নত প্রণালীর বয়ন-শিল্প শিক্ষা করাইয়া আনিয়া, বয়ন-শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে পারেন এবং সাধারণের ও প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণভাজন হইতে পারেন। উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, নচেৎ ভবিষ্যতে গুরুতর কষ্ট হইবে।

সামুদ্রিক ইতিহাস

[শ্রীবসন্তকুমার রায়]

"প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং"—সেই এক কাল, যখন স্থাবর-জঙ্গমাদি অনন্ত পদার্থ প্রলয় পয়োধির ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ-বিক্ষোভিত হইয়াছিল, তখন নারায়ণ রাজর্ষি সত্যব্রতের নিকট একখানি বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করেন। অধুনা পৌরাণিক বিষয়ে সকলের আস্থা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। পৌরাণিকী কথা অলীক বলিয়া সকলেই সহাস্যে উড়াইয়া দেন। নোয়াস্ আর্ক বলিলে কেহ অবিশ্বাস করিবেন না; কারণ উহা পাশ্চাত্যানুমোদিত খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থমূলক। হিন্দুর ধর্ম্ম-গ্রন্থমূলক যাহা কিছু সকলই অবিশ্বাস্য, অলীক। যাহা হউক, বিষয়ান্তরের অবতারণা করি। একটা কথা আছে পরের রুচি অনুসারে কার্য্য করাই বিধেয়। অতএব আমরা সাধারণের বিশ্বাস-যোগ্য নোয়াস্ আর্ককে কাণ্ডারী করিয়া সমুদ্রপথে অবতরণ করি।

জলযানের সমসাময়িক ইতিহাস হইতে অ্যাটলাণ্টিক টেলিগ্রাফ পর্য্যন্ত এবং নোয়াস আর্ক হইতে টিটানীয় অর্ণবপোত নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত সলোমনের জাহাজ অফিরের সহিত বাণিজ্য করিতে যাইত,—সেই এক সময়কার বাণিজ্য সম্বন্ধীয় ইতিহাস, আর আজ-কালকার অপার পারাবারের বক্ষে ভাসমান বাষ্পীয় জলযানগুলির কর্ণস্বর বংশীধ্বনির মহিমা—সেই এত কাল পরে সাগর তরণ বিষয়ক ইতিহাসের উন্নতি। যখন গ্রীক নাবিকগণ দিবাভাগে উপকূল দিয়া গমনাগমন করিত এবং দিবাবসানে বিচক্ষণতার সহিত নঙ্গর করিয়া অবস্থান করিত; আর এখন বাষ্পীয় জলযান প্রজ্ঞাসম্পন্নের ন্যায় মানব সাহায্যকে কথঞ্চিৎ উপেক্ষা করিয়া স্ফীতবক্ষে অনন্ত সাগরের তরঙ্গ রঙ্গে নৃত্য করিয়া বিচরণ করে—এই সকল বিষয়ের চমৎকারিত্ব এবং মন-মাতান প্রসঙ্গ বিষয়ান্তরে লাভ করা সুদূর পরাহত। পাঠক ইহা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন, অসীম পারাবার পূর্ব্বে মানবের নিকট কিরূপ ছিল এবং অধুনা কি হইয়াছে - "ভোল বদল"।

অতীব প্রাচীন কালে আদিম অধিবাসিগণের নিকটে অসীম সাগর অজ্ঞাত ছিল। মেডিটারেনিয়ন সমুদ্রের তীরবর্ত্তী যে সকল প্রদেশে লোকে বাস করিত, সেই সকল স্থানের আংশিক ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই অপার পারাবার অ্যাটলাণ্টিক প্রভৃতি মহাসাগরের বৃত্তান্ত তাহাদের প্রতি বিষয়ের বহির্গত ছিল—চাক্ষুস দর্শন ত দূরের কথা। যে সকল স্থল-সংলগ্ন সলিল-বিস্তৃতি আদিম মানবগণের পদপ্রান্তে প্রবহমান ছিল, তাহা রহস্য বিজড়িত এবং লোমহর্ষণ বিচিত্র কাহিনীপূর্ণ। যাহারা সাহস করিয়া সলিল-বক্ষে অবতরণ করিত, তাহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষীভূত অলৌকিক দৃশ্যের গল্প করিত, এবং কতদূর জীবন সংগ্রামে পতিত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিত। হোমারের বীরগণ ইথাকাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কুহকিনীগণের সঙ্গীতালাপ এবং বিপুলকায় দৈত্যগণের নৃশংস অত্যাচার-কাহিনীর সরস বর্ণন করিয়া সকলের কৌতূহল উৎপাদন করিয়াছিল। আরগোনট জাহাজস্থ নাবিকগণ সমুদ্রের মধ্যে ঘূর্ণায়মান পর্ব্বত দেখিয়াছিল, যাহা নাবিকগণকে নিকটে আসিতে বারণ করিয়া দিত। সলিল সম্বন্ধীয় বিচিত্র গল্প যেমন নানা রসসিক্ত ছিল, তেমনি সলিল-পারের দেশগুলিকেও তাহারা বর্ণনা-চাতুর্য্যে মনোরম করিয়া তুলিত। ককেসস্ পার্ব্বত্য প্রদেশকে তাহারা কুহকিনী রমণীগণের, অগ্নি উদ্গীরণকারী বৃষের এবং একপ্রকার অদ্ভুতাকৃতি মানবগণের আবাসে গল্পের আকর করিয়াছিল। আদিম অধিবাসিগণ পৃথিবীর আকৃতির বিষয় অনভিজ্ঞ ছিল সমুদ্রের সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই এই অনভিজ্ঞতার মূল। তদানীন্তন ভৌগোলিকগণের এবং দার্শনিকবৃন্দের ইয়োরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাপ্রদেশের অভিজ্ঞান আংশিক ভাবে থাকাতে, তাহারা এই ভূমণ্ডলকে ক্রমান্বয়ে নানা আকৃতি বিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল—সাগরাম্বরা সমতল ভূমিবৎ, উষ্ণাবৎ, থালার ন্যায় গোলাকার কখনও বা লম্বা চোঙ্গার ন্যায় বর্ণনা করিত। এই সকল অলৌকিক গল্প স্থলভাগকে অলৌকিক দৈত্যের আবাস এবং জলভাগকে ভীতিজনক করিয়া তুলিয়াছিল।

তৎপরবর্ত্তী সময়ে কাল-গতির উন্নতির সাহচর্য্যে ভ্রমণ-প্রীতির উত্তেজনায় অথবা বাণিজ্য অনুরোধে যখন নাবিকগণ মেডিটারেনিয়ন হইতে পিলার্স অব হারকুলিস ভেদ করিয়া অ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং যখন অসীম জলরাশির কথঞ্চিৎ অনুভূতির বীজ মনোমধ্যে উপ্ত হইল যাহা ইতিপূর্ব্বে তাহাদের জ্ঞানকে স্থল মেখলাকৃত সাগর সীমার দ্বারা সঙ্কীর্ণ করিয়া বাঁধিয়াছিল, তৎপরে মহাসাগর তাহাদের নিকট গম্ভীর ভীতি সঞ্চারের আধার হইয়া উঠিল। এই অসম সাহসিক সমুদ্র তরণের পর সৌভাগ্যবান পুরুষগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অলৌকিক গল্প করিলেন। তাঁহারা বলিতেন নব নব দৃশ্যগুলি যাহা তাঁহাদের চক্ষের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহাদের কল্পনার রাজ্যে একটা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। পাইথিয়স মার্সিলেসের উপকূল দিয়া তাঁহারা সেটলণ্ড দ্বীপপুঞ্জে উপনীত হইয়াছিলেন, তথায় "নর্থ সি" উত্তর সাগরের দারুণ হিমময় অনন্ত সলিলরাশির বিভীষিকা দর্শন করিয়া স্বদেশে আগমন করিলে পর, গল্প করেন যে, একটা বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ শম্বুক তাহার গতি রোধ করে। শম্বুক শূন্যে দোদুল্যমান এবং তথায় অর্ণবপোত আবদ্ধ হয়। মানবগণের শ্বাস-ক্রিয়া তথায় প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। দক্ষিণ সাগরের ভীতিবিহ্বলতা উক্ত সাগর অপেক্ষা নিদারুণ। কথিত আছে যে যদি কেহ বিষুব-রেখা লঙ্ঘন করিয়া সূর্য্যালোকে গমন করিতে সাহস করে, তাহা হইলে সে অসীম সাহসিকতার দণ্ড স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রির আকৃতিতে পরিণত হইবে। এই জলরাশি তখন দুস্তর ছিল, এইরূপ বর্ণিত আছে। মধ্যযুগের মানচিত্রে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের উপর একটী ভীষণাকার দৈত্যের আকৃতি চিত্রিত আছে। এই দৈত্য একটী বৃহৎ গদা ঘুরাইয়া, যে সকল জলযান পূর্ব্বদিক হইতে আগমন করিতেছে, তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে গমন করিতে নিষেধ করিতেছে। এই অদ্ভুত মানচিত্রের উপর সামুদ্রিক বিভীষিকাময় রাক্ষস, ইউনিয়ারণ নামক সিংহবিশেষের

কাল্পনিক আকৃতির দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে। ইহারা জলে গমনাগমন করিয়া নাবিকগণকে আক্রমণ করে। কলম্বসের সময় ইয়োরোপীয় অর্ণবপোতে দিক্‌দর্শন যন্ত্র ব্যবহারের প্রচলন হয়। তখনও কাল্পনিক সামুদ্রিক বিভীষিকা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও হ্রাস হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই যে, আরবজাতি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ছিল, তাহারাই শয়তানের অগ্নিময় হস্ত, তিমির সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণন করে। এই আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরকেই তাহারা তিমির-সমুদ্র নামে অভিহিত করিত। এই হস্ত সর্ব্বদা দাম্ভিক নাবিকদিগকে আক্রমণ করিয়া সাগরগর্ভে সমাধি প্রদানে সতত লালায়িত। কলম্বসের নাবিকগণ সরাগসের সমুদ্রে উপনীত হইয়াছিল, তথায় সামুদ্রিক শৈবাল এত অধিক বিস্তৃত ছিল, যদ্দারা তাহাদের গতিরোধ হইয়াছিল। এই স্থানে আসিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, তাহারা পৃথিবীর শেষ সীমায় আসিয়াছে এবং এই স্থানেই নাগাসের চরম স্থান। পঞ্চবর্ষ পরে "ডিগামার" নাবিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ লঙ্ঘন করিলে পর, টেবলক পর্ব্বত সংলগ্ন ভীষণ মেঘপুঞ্জের মধ্যে একটা ভূত তাহাদের জাহাজকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছে পাছে কেহ তাহার এই ঐশ্বর্য্যশালী রাজ্য আক্রমণ করে সেই জন্য গর্জ্জন করিতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়া অনুমান করে। আমাদের সাহিত্যে বরুণদেবের উল্লেখ আছে যে, তিনি মেডিটারেনিয়ন সাগরের সঙ্কীর্ণ জলপ্রবাহে আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেন; এবং পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তাঁহার ক্রোধ একটী দেবতা বলেন তাঁহার ধীর কোমল এবং সুন্দর আকৃতি সমুদ্রের প্রতিহিংসা জনিত একাধিপত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। মধ্যযুগের ভৌগোলিকগণ এবং ইতিহাসজ্ঞেরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এক্ষণে কলম্বসের দ্বারা পশ্চিম মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। "ডিগামা" ইষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগামী জলপথের প্রদর্শক, মেজিলেন ভূ প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর মণ্ডলাকৃতি সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং পূর্ব্বদিক হইতে "পাইস" দ্বীপপুঞ্জে আগমন করেন। বহুশতাব্দী হইতে ইদানীন্তনকাল পর্য্যন্ত এই দুইটী মহাসমুদ্র অত্যাবশ্যক গৌরবভিত্তানের রাজ্যস্থল ছিল। প্যাসিফিক বা প্রশান্ত সাগরের বিশাল স্রোতে একটী একটী করিয়া গ্রীষ্মপ্রধান দ্বীপপুঞ্জে আবির্ভাব যেন নাবিকদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য হইয়াছে। অথবা সমাজচ্যুত ব্যক্তিগণকে স্নেহালিঙ্গন দিবার জন্য স্পেনীয়েরা নৃশংসতার এবং পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তির বলে তাহাদিগের প্রসিদ্ধ ম্যানিয়ো জেলিয়ন এবং একাপুল্কো নামক জাহাজগুলিকে সমরলব্ধ লুণ্ঠিত পণ্যসম্ভারে এবং বাণিজ্যের সুজাত ফলে সুশোভিত করিয়াছিল। ইংরাজগণ ঐ জাতিকে বিরক্ত করিবার জন্য—যদিও তাহার সহিত বিরোধ ছিল না, তথাপি যে সম্ভব ছিল তাহাও নহে—তাহাদিগের স্বর্ণময় নৌসাধনের বিপক্ষে "ড্রেবে" এন্‌সন্‌" এবং হাকিম নামক জলদস্যুগণের নৌবহর প্রেরণ করিয়াছিল। বহু বৎসর ধরিয়া সমুদ্র বক্ষে কাহারও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না,—বাণিজ্য পোতগুলি সশস্ত্র হইয়া গমনাগমন করিত, যুদ্ধোপকরণ সুসজ্জিত কর্তৃপক্ষের জাতীয় অর্ণবপোতগুলি তখন দস্যুর জাহাজে পরিণত হইল। পর্টুগীজ এবং ডাচেরা ভারতীয় উপকূল এবং দ্বীপপুঞ্জগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করিল। স্পেনীয়গণ করটেজ এবং পিজারোকে মেকসিকো এবং পেরু নামক দেশে প্রেরণ করিল এবং কুজ্ঝটিকাময় সমুদ্রের পরপারে জলকষ্ট মাউথ নামক সহরে পিউরিটান্‌দিগকে বিতাড়িত করিয়া দিল। বাণিজ্যের উৎকর্ষ পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল, সভ্যতা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বিজন গহন ও মরুস্থলে প্রচারিত হইল। আরও দুই শতাব্দীর প্রবীণত্ব এবং বাষ্পের কার্য্যকারিতা আটলাণ্টিক মহাসাগরকে মার্কিনীর স্রায় সুগম করিয়া তুলিল; ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ এক্ষণে সহস্রশত মাইল পরিসর লবণাম্বুরাশিকে যেন একটী গণ্ডীর মধ্যে একসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে, যাহা "সেক্সপীয়রেরা" আর চক্ষুর নিকট স্বতঃ ব্যক্ত হইয়াছিল; এবং "পাক" যাহার পরিণতিতে প্রতিশ্রুত ছিল, ইদানী অতলস্পর্শে টেলিগ্রাফ তার পরিণতি লাভ করিয়াছে, "নিউজারনিস" হইতে "সিবাসটাপুল" পর্য্যন্ত সুগম হইয়া দাঁড়াইল।

পূর্ব্বাপর

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, এম্‌-এ]

(১)

গোলাসুন্দর চক্রবর্ত্তী বি-এ-'ফেল'; মরালগঞ্জ হাইস্কুলের ৩য় শিক্ষক। তিনি পড়াতেন বেশ ভালো,—তবে হাস্‌তেন না মোটেই। গোঁড়া হিন্দু, মাথায় একটী 'শিখা' ছিল। মোটের উপর ভালমানুষ, কিন্তু ইস্কুলে সেটা কারু বুঝা কঠিন হ'তো।

নেপাল সান্যাল খুব চালাক্‌ ছোক্‌রা; বয়স কতই আর,—সেই ৫ম শ্রেণীতেই তো পড়ে; এই ১২।১৩ বছর বয়স হবে আর কি। কিন্তু এ-রি মধ্যে সে ভারি 'বে-আড়া' হ'য়ে প'ড়েছে। ক্লাশে 'গোল' করা, বই দেখে পড়া বলা, আবার বই ধ'রে অপরকে পড়া ব'লে দেওয়া প্রভৃতি

ব্যাপারে সে এমন অশান্তি সৃষ্টি ক'রতো যে, বগলা মাষ্টারকে তার শাসন-প্রণালী উদ্ভাবনের জন্য মাঝে মাঝে বিলক্ষণ ভাবনায় প'ড়তে হতো।

(২)

বগলা বাবুর একটা 'অভ্যাস' ছিল ছেলেদের বলা,—"আদবে কথা কইতে পাবে না,—কথা কইতে দেবো না।"

ক্লাশে কোনো রকম একটু শব্দ হ'লেই বগলাবাবু গম্ভীর ভাবে, চোখ্-মুখ ঘুরিয়ে, এই আদেশ প্রচার করতেন।

তখন ছেলেরা কাঁদ্‌বে কি হাস্‌বে, তা বুঝ্‌তে পারতো না,—তবে তাদের কান্না বা হাসি কিছুতেই যেন ভরসায় কুলো'তো না। ক্লাশের সময় বগলাবাবুর হাতে বেতখানি সর্ব্বদাই থাক্‌তো!

(৩)

সে দিন টিফিন্ ঘণ্টা হ'য়ে যাবার পর বগলাবাবুর ঘণ্টা। ছেলেরা এসে ব'সেছে; বগলাবাবুকে হেড্‌মাষ্টার কি জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন,—তাঁর আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'চ্ছে।

নেপাল সান্যাল গিয়ে একটা চাবুক হাতে নিয়ে,—একটুক্‌রো 'পাট' মাথায় 'শিখার' মতন ক'রে বেঁধে নিয়ে,—মাথা ঝুঁকিয়ে-ঝুঁকিয়ে ব'ল্‌ছে,—"আদবে কথা কইতে পাবে না, কথা কইতে দেবো না।" ছেলেরা সব হেসে কুটপাট্ হ'চ্ছে।

—এ রি মধ্যে স্বয়ং বগলাবাবু এসে উপস্থিত!

(৪)

সে-দিন বেত্রাঘাতে নেপালের পিঠের চামড়া দেহেই লেগে ছিল, না-কি দেহ ছেড়ে উঠে' গিয়েছিল,—তা নেপালই জান্‌তো, কিন্তু তবু তার চোখে জল নেই! বগলা মাষ্টার তাকে শাস্তি দিলেন,—৩ ঘণ্টা বেঞ্চের নীচে 'আটক্'; চোখ্ দিয়ে জল বেরুলে তবে ছুটী!

তখন বেলা প্রায় ২২টা; ইস্কুলের ছুটী একটু পরেই হবে; তবু নেপালের চোখে জল নেই। সে একরকম খুসীই ছিল,—কারণ, সে-দিন আর কারু কাছে তাকে 'পড়া-টড়া' দিতে হ'লো না।

বগলার পরে এক মাষ্টার গেলেন, তার পর ফের বগলার ঘণ্টা; সে ঘণ্টাও প্রায় শেষ হ'চ্ছে। বগলা ভাব্‌লেন,—কোনো রকমে এবার ছোঁড়াটাকে ছেড়ে দিতে পার্‌লে হয়! নচেৎ সে হয় তো রাত্তির পর্য্যন্ত তাঁকে স্কুলে বসিয়ে রাখ্‌বে—অথচ অতগুলো ছেলের সাম্‌নে কেমন ক'রেই বা যেচে গিয়ে তা'কে বলেন,—"তোর ছুটী।"

নেপালের একবার মনে হ'লো,—চোখের জল তো আর বেরুবেই না,—না-হয় বগলা মাষ্টারকে আজ রাত পর্য্যন্ত ইস্কুল ঘরে পাহারায় বসিয়ে রাখা যাক্।

—তার পর কিন্তু,—ক্ষিদে পেয়েছে ব'লেই হোক্, আর যে-কারণেই হোক্,—সে বুদ্ধিটে নেপাল ত্যাগ ক'রলে। তাই বগলার ভাগ্যি!

(৫)

সেই পাটের টুক্‌রোটুকুন নেপালের কাছেই ছিল। সে তা দিয়ে আবার ভালো ক'রে মাথায় একটা 'টিকি' বাঁধ্‌লে; মুখ থেকে 'জল' বের ক'রে তা'-দিয়ে চোখের ধারে রেখার মত এঁকে দিলে; তার পর উঠে এসে মাথাটা ঝুঁকে' ঝুঁকে' বগলাবাবুকে ব'ল্‌লে,—"সার্, দেখুন, আমার চোক্ দিয়ে জল বেরিয়েছে, এখন বাড়ী যাই?"

বগলাবাবুর তখন তাকে ছেড়ে দেবারই মতলব। তিনি ব'ল্‌লেন, "যা যাঃ—।"

নেপালের মাথার 'টিকি' নাড়া দেখে এবার ছেলেগুলো সব হেসে উঠ্‌লো, নেপালেরও হাসি-মুখ।

বগলা নেপালের মাথার দিকে তাকান্ নাই; মুখের দিকে চেয়েছিলেন; তাই ব'ল্‌লেন,—"হাস্‌ছিস যে?"

নেপাল ব'ল্‌লে,—"সার্, আমার মুখখানাই 'হাসি-হাসি'; আপনার বিশ্বেস না হয় সবাইকে জিজ্ঞেস্—"

আবার সবাই হাস্‌লে।

বগলা বল্‌লে, "যা, যা,—আর জিজ্ঞেস্ ক'রতে হবে না কাউকে।" বগলারও মনের ভিতর বুঝি কি যেন একটা আঘাত লেগেছে!

(৬)

সেই রাত্রিতে বগলাবাবুর খুব জ্বর হ'লো। ছয়-সাত দিন জ্বর। নেপাল গিয়ে প্রাণপণে শুশ্রূষা ক'রলে। বগলার বাড়ীতে আর কেউ ছিল না।

একদিন ঘোর বিকারের অবস্থায় বগলা বল্‌লেন,—"নেপাল, বাবা, তোর গায়ে তো লাগে নি রে? তোর পিঠে খুব্‌ বড্ড লেগেছে বাবা!" বগলার ছেলে-পিলে নেই!

নেপাল কি ব'ল্‌বে?

সে-দিন স্কুলে বেত্রাঘাতে পিঠের চামড়া উঠে যাবার মতন হ'য়েছিল, তবু সে কাঁদে নাই, আজ বগলাবাবুর কথায় নেপালের চোখে 'বাণের জল' ডেকে উঠ্‌ছিল।

কান্নায় নেপালের কণ্ঠ রুদ্ধ! সে কিছুই ব'লতে পারলে না।

*　　*　　*　　*

চারি বৎসর পরে এণ্ট্রান্‌স্ পরীক্ষা দিতে যাবার সময়, সমস্ত মাষ্টার পণ্ডিত থাকতে নীচের ক্লাশের বগলা মাষ্টারের পদধূলি নিয়ে নেপাল সান্যাল পরীক্ষা দিতে গেল।

সেবার নেপাল ময়ালগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয় হ'তেই সমস্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান নিয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হ'লো।

সকলের অপেক্ষা বেশী গর্ব্ব হ'লো বগলা মাষ্টারের। তিনি ব'ল্‌লেন,—"আমি পূর্ব্বাপরই জানতুম, এই ছেলেটার অসাধারণ ক্ষমতা!"

ছাড়াছাড়ি-তে—

[শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

(রাজসাহীর চাষার ভাষায়)

(১)

বুক-ফাটা আজ মনের দুঃখু বোল্‌বো আমি কাক্‌!
পা'লাম নারে ঢের দিনেকার ভালোবাসার তাক্‌!
কতো ভালোবাসিছিলাম, কত স্নেহ কুড়াচ্ছিলাম,
একেবারে সব আশারে পুইড়া হোলো ছাই!
ভাব্‌তে গেলে আমার ভিতর আর তো আমি নাই!

(২)

দিনের পরে দিন যা'বে রে, মাসের পরে মাস!
তাক্‌ ছাড়া হায় বাঁচ্‌বো কিসে, গলায় দিব ফাঁস!
দেয়া এখন ডাক্‌লে জোরে, চক্ষু জলে আসে ভোরে,
সত্যি রে ভাই সত্যি আমি বেহুস্ হো'য়া পড়ি!
ক্যামন্ কো'রা থাক্‌বো একা ভাইবা ক্যাবল মরি!

(৩)

জোলাই যদি মর্‌বো তবে দেখিছিলাম ক্যান্!
দিন রাত্তির কোর্‌লাম মিছা তার চেহারা ধ্যান্!
কত রকম মধুর আশা, বাঁধিছিল বুকে বাসা,
আচমকা এক তুফান আইসা ভাইঙ্গা দিল সব!
সেই থাইকা রে মনের ভিতর উঠ্‌লো কলরব!

(৪)

প্রাণখানি তার আমার প্রাণের মানিছিল পোষ!
তার তো কোনো দোষ নাই রে, সব কপালের দোষ!
বাপ মা'রা তার কত কইলো, শেষে আবার শত্তুর হৈলো,
তাই হামাদের সারা জীবন এখন কাঁদার পালা!
বিরহের এক বিষম বিষে শরীল হৈলো কালা!

(৫)

এখন মিছাই চাঁদ ওঠে রে মিছাই ফোটে ফুল!
আমার কাছে এখন ও-সব আগা গোড়াই ভুল!
বিরহের এক ঠাটা পৈড়া, যৌবন আমার গেছে মৈরা,
জ্বৈলা পুইড়া গেছে প্রাণের ফুল-বাগিচাখানি!
এখন মিছাই বাঁইচা আছি, চোখেৎ আসে পানি!!

হায়দরাবাদ-ভ্রমণ

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল]

(২)

হায়দরাবাদ সহরের ৫ মাইল পশ্চিমে ইতিহাস প্রসিদ্ধ গোলকুণ্ডা। নিজাম রাজধানীতে আসিয়া অনেকেই গোলকুণ্ডার গিরি-দুর্গের ভগ্নাবশেষ দর্শন করা কর্ত্তব্য মনে করেন। এই দুর্গ অতি প্রাচীন-কালে কোন হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ওয়ারাঙ্গলের কাকতীয় বংশের অভ্যুদয়ের সময় গোলকুণ্ডা তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত হয়। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে, গুলবার্গের বাহমনী বংশীয় সুলতান মহম্মদ শাহ্, ওয়ারাঙ্গলের তদানীন্তন অধিপতির নিকট হইতে সন্ধি-সূত্রে এই দুর্গ গ্রহণ করেন। বাহমনী রাজ্যের পতনের পরে, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে কুতবসাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান-কুলী কুতব-উল-মুল্ক্ গোলকুণ্ডায় তাঁহার রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজধানী হায়দরাবাদে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু রাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কুতবসাহী রাজগণ হায়দরাবাদ ত্যাগ করিয়া সপরিবারে গোলকুণ্ডার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয়-গ্রহণ করিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে, ভারতবর্ষে গোলকুণ্ডার ন্যায় সুদৃঢ় গিরি-দুর্গ আর ছিল না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন মোগলের সহিত কুতবসাহী বংশের সপ্তম সুলতান আবদুল্লার বিরোধ উপস্থিত হয়, আওরঙ্গজেব তখন দাক্ষিণাত্যের সুবাদার। সম্রাট সাজাহানের আদেশে, আওরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদ গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন, এবং আওরঙ্গজেবও তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। আবদুল্লা কুতবসাহ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়া, সুলতান মহম্মদের সহিত জ্যেষ্ঠা-কন্যার বিবাহ দেন, এবং আওরঙ্গজেবকে নগদ এক কোটী টাকা দান করেন।

দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা-আক্রমণের ছল খুঁজিতেছিলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার মুয়াজ্জমের সহিত অসংখ্য সৈন্য লইয়া গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন। সুলতান আবদুল্লার তৃতীয় জামাতা আবুল হাসান তানা শাহ তখন গোলকুণ্ডার সুলতান। আওরঙ্গজেব সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু ক্রমাগত ৮ মাস অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও, এই দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে, আবদুল্লা খাঁ নামক একজন আফগান-সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় মোগল-সৈন্য রাত্রিযোগে খিড়কি দ্বার দিয়া দুর্গে প্রবেশ করে। এইরূপে গোলকুণ্ডা-দুর্গের ধ্বংস হয়। কুতবসাহী-বংশের শেষ সুলতান তানা শাহ বন্দী-অবস্থায় দৌলতাবাদে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। এইখানে তাঁহার একটি পুত্র হয়; তাহার নাম "বন্দী সুলতান"; এই বালকের পরিণাম অজ্ঞাত।

কিন্তু, ইতিহাসে গোলকুণ্ডার বিবরণ পাঠ করিবার বহু পূর্ব্ব হইতে হীরকের আকর বলিয়াই গোলকুণ্ডার নাম আমার নিকট পরিচিত ছিল। শৈশবে যখন পদ্যপাঠে পড়িয়াছিলাম -"গোলকুণ্ডা প্রদেশের হীরক-আকর," তখন গোলকুণ্ডা বিশাল ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে অবস্থিত, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লার-খনির ন্যায় গোলকুণ্ডায় যে সত্য-সত্যই হীরকের খনি আছে, সে সম্বন্ধে আমার শিশু-হৃদয়ে কোনই সংশয় ছিল না। কাব্য ও সাহিত্যে গোলকুণ্ডার হীরকের উল্লেখ দেখিয়া সে বিশ্বাস পরে আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। কিন্তু পরিণত বয়সে একদিন যে আমি সেই গোলকুণ্ডার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইব, তাহা কখনো কল্পনা করিতেও পারি নাই।

কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া একদিন প্রাতে গোলকুণ্ডা দেখিতে বাহির হইলাম। সহরের বাহিরে মুক্ত-প্রান্তরের মধ্য দিয়া ঘোড়ার-গাড়ীতে এক ঘণ্টার মধ্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা গেল। উচ্চ পাষাণ-প্রাকার দ্বারা গোলকুণ্ডা বেষ্টিত—উহার পরিধি প্রায় ৪ মাইল। স্থানে-স্থানে প্রাচীরগাত্র-সংলগ্ন প্রকাণ্ড গ্রেণিট্ পাথরের বুরুজ; উহাদের উপরে এক সময়ে সারি-সারি কামান সজ্জিত ছিল—এখনও

দুই-চারিটা অব্যবহার্য্য কামান বিদ্যমান আছে। দুর্গের চারিধারে যে পরিখা ছিল, উহা কালক্রমে ভরিয়া গিয়াছে। দুর্গের প্রবেশ-দ্বার চারিটি; আমরা প্রধান দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে নিজামের সেনানিবাস, বাজার, দুই-চারিখানি ছোট দোকান, মস্‌জিদ এবং কতকগুলি পুরাতন গৃহ দেখিতে পাওয়া গেল। এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া আমরা পর্ব্বতমূলে "বালা-হিসার" দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাহাড়টি ৪০০ ফুট উচ্চ পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। এই দ্বার ব্যতীত উপরে উঠিবার অন্য পথ নাই। দ্বারে সশস্ত্র প্রহরা;—কিল্লাদারের অনুমতি ভিন্ন কাহাকেও এই পাহাড়ে উঠিয়া প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেওয়া হয় না। আমার বন্ধুগণ কিল্লাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অনুমতি-পত্র লইয়া আসিলেন। তখন একজন প্রহরীকে পথি-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে লইয়া আমরা পদব্রজে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। দ্বার পার হইয়াই বামে একটি তৃণগুল্মাচ্ছাদিত বৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইলাম;—এটি 'শিলাখানা' বা অস্ত্রাগার। ইহাতে রাশীকৃত ভাঙ্গা বন্দুক পড়িয়া রহিয়াছে। দরবার-কক্ষ, অশ্বশালা, তোপখানা, বাগান ইত্যাদি দেখিয়া আমরা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া ক্রমশঃ "বালা হিসার" অর্থাৎ 'উপর কেল্লার' দিকে উঠিতে লাগিলাম।

পর্ব্বত-শিখরে, অজ্ঞাতনামা হিন্দু-রাজার গঠিত আদিম দুর্গ। পর্ব্বতগাত্রে প্রাচীরের আকারে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিলা স্থাপিত করিয়া, পাহাড়টিকেই দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হইয়াছিল। অর্দ্ধপথে হনুমানজীউর মন্দির, ও গিরি-শিখরে পাহাড়ে খোদিত একটি দেব-মন্দির, অতীত যুগের হিন্দু-রাজত্বের স্মৃতি এখনও লুপ্ত হইতে দেয় নাই। শুনিলাম, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী পর্ব্বত-শিখরস্থ মন্দিরে বাস করিতেন; বিল্বমঙ্গলের সাধকের মত, তিনি নাকি পুলিসের উৎপীড়নে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান রাজগণ যে বংশানুক্রমে এই দুর্গের অভ্যন্তরদেশে হিন্দু-মন্দির ও দেবালয় রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কুতবসাহী রাজগণ 'বালা-হিসারে' একটি দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং জলাভাব মোচনের জন্য বৃহৎ কূপ খনন করিয়াছিলেন। এই কূপের গর্ভে নামিবার জন্য পাথরের সিঁড়ি আছে। পর্ব্বত কাটিয়া ভাণ্ডার-গৃহ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় গৃহাদিও তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখন সে সমস্তই ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

গিরিশিখরে যে দ্বিতল গৃহটি বর্ত্তমান আছে, উহা একেবারে ফাঁকা—কিন্তু পরিষ্কার; উপরে উঠিবার একটি অপ্রশস্ত সিঁড়ি। আমরা পর্ব্বতারোহণ-শ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলাম,—'বালা-হিসার' প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া শীতল সমীরণস্পর্শে সুস্থ হইলাম। এই পরিত্যক্ত পাষাণ-প্রাসাদে বসিয়া আমার "ক্ষুধিত-পাষাণে"র কাহিনী মনে পড়িল। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে, একদিন হয়তো এই 'বালা-হিসারে' "স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত, এবং সেই শীকর-শীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্ম্মর-খচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্ম্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্ব্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল গান করিত।"—সৌভাগ্য বশতঃ এখানে আমাদের কাহারও ত্রিযামা যাপন করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না—নতুবা পাষাণ-রাক্ষসীর মোহে পড়িয়া কি দশা হইত, কে জানে! শেষকালে হয় তো পাগলা মেহের-আলির মত—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও; সব ঝুট্‌ হায়" হাঁকিয়া প্রত্যহ গিরিশিখর প্রদক্ষিণ করিতে হইত।—

"দোহাই, কল্পনা তোর, ছিন্ন কর্ মায়া-ডোর
কবিতার'পরে মোর নাহি কোন দাবী।"

দ্বিতীয় তলের ছাতে একটি পাথরের বেদী আছে। উপরে বসিয়া গোলকুণ্ডাধিপতি চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত দৃশ্য নিরীক্ষণ করিতেন; এবং যুদ্ধের সময় এইখান হইতে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা হইত। জুতা খুলিয়া রাখিয়া সসম্ভ্রমে এই বেদীতে আরোহণ করিলাম। এই উচ্চ স্থান হইতে হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের বৃক্ষান্তরালোত্থিত সৌধচূড়া ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি সুদূর-প্রসারিত চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; এবং নগরের বহিঃপ্রাচীরের পরিধি, অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নস্তূপ, ও দুর্গ-সীমার বাহিরে সারি-সারি সমাধি-মন্দিরের গুম্বজ দেখিয়া গোলকুণ্ডার অতীত সমৃদ্ধি কতকটা কল্পনায় উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

গোলকুণ্ডার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ছোট একটি পাহাড়ের উপরে "নয়া-কিল্লা"। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীরে ঘিরিয়া ইহাকে মূল-দুর্গের অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে, প্রায় আধ মাইল দূরে, উদ্যান-শোভিত গ্রেনিট্ প্রস্তরের সমাধি-মন্দিরশ্রেণী। ইহার প্রত্যেকটি মন্দির নির্ম্মাণে লক্ষ-লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। শতাব্দার পর শতাব্দী, কালের ও মনুষ্যের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া এখনও ইহারা বিগত গৌরবের সাক্ষ্য দান করিতেছে। নিজাম গবর্ণমেণ্ট সমাধি মন্দিরগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইগুলি দর্শন করিবার জন্য কাহাকেও অনুমতি-পত্র লইতে হয় না। একমাত্র অষ্টম ও শেষ সুলতান তানা শাহ ব্যতীত, কুতবসাহী বংশের সকল সুলতানের সমাধিই এখানে বর্ত্তমান। হতভাগ্য তানা শাহ নিজের জন্য যে সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

তানা শাহের জীবন-কাহিনী বৈচিত্র্য পূর্ণ। সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহের পুত্র-সন্তান ছিল না—তিনটি মাত্র কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের পুত্র সুলতান মহম্মদের এবং কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে আবুল হাসান তানা শাহের বিবাহ হয়। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে সুলতান আবদুল্লার মৃত্যুর পরে মন্ত্রী মীরজাফরের সাহায্যে তানা শাহ রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু রাজ্য-শাসনকার্য্য আদৌ তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী ছিল না। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ চারি সমান অংশে ভাগ করিতে বলেন; এক ভাগ দরিদ্রদিগকে বিতরণ ও এক ভাগ সৈন্যগণকে অগ্রিম বেতন স্বরূপ দান করিয়া, এক ভাগ নিজ ব্যয়ের জন্য ও অন্য ভাগ ভবিষ্যতে রাজ্যসংক্রান্ত ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য রাখিয়া দিতে আদেশ করেন। মন্ত্রী এই ব্যবস্থায় অনেক প্রতিবাদ করেন, ও মোগলের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের সম্ভাবনা স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু তানা শাহ তাঁহার উপদেশ উপেক্ষা করিয়া, সংসার-বিরাগী তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় বলিয়াছিলেন—"এ টাকা-কড়ি কিছুই তো আমার সঙ্গে যাইবে না; তবে আর মায়া করা কেন?"

১৪ বৎসর পরে, যখন একদা নিশীথকালে শত্রুসৈন্য গোলকুণ্ডা দুর্গ দখল করিল, তানা শাহ তখন আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হইয়া নিয়মিতরূপ ভোজনে বসিলেন। মোগল-সেনাপতি ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিকারচিত্তে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি বলেন—"ছিলাম ভিখারীর ছেলে; বাদশাহ হইয়া এতদিন রাজত্ব করিয়াছি। আজ খোদা বাদশাহী কাড়িয়া নিলেন বলিয়াই কি রাগ করিয়া উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিতে পারি? কাল আদৌ অন্ন জুটিবে কি না, জানি না; এ রাজ-ভোগ ত আর জুটিবেই না। তবে এই অন্নের অপমান করি কেন?" তানা শাহের রাজ্য-পরিচালনে যতই ত্রুটি থাকুক না কেন, এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সময় তিনি প্রকৃত রাজার ন্যায় অসামান্য ধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

এদিকে বেলা অতিরিক্ত বাড়িয়া যাইতেছিল—এবং "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা," তিনি আমাদিগকে উহা স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন। অগত্যা তাড়াতাড়ি গোল-কুণ্ডা দর্শন শেষ করিয়া আমরা গৃহে ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। খাদ্য এবং পানীয় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া আমার তরুণ বয়স্ক সঙ্গিগণ দোকান হইতে কিছু চীনা-বাদাম এবং কয়েক বোতল লেমনেড সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। এই লেমনেড সম্ভবতঃ কুতবসাহী আমল হইতেই ক্রেতার পথ চাহিয়া এখানে পড়িয়া ছিল, সুতরাং স্বয়ং নীলকণ্ঠ ভিন্ন অন্য কাহারও উহা পান করিবার সাধ্য ছিল না। এই অবস্থায়, চীনা-বাদাম দ্বারাই আমাদিগকে 'জলযোগ' সম্পন্ন করিতে হইল।

দুঃখের বিষয় এই যে, গোলকুণ্ডায় আসিয়া হীরকখনির কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না; এমন কি, হীরকের সগোত্র কয়লা একখণ্ডও দেখা গেল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, এখানে কোন দিনই হীরকখনি ছিল না। তবে, কুতবশাহী বংশের সুলতান ইব্রাহিম কুলীর রাজত্বে (১৫৫০-১৫৮০ খৃঃ অঃ), বর্ত্তমান নিজামরাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে, পরতিয়াল নামক স্থানে একবার হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কুতবসাহী সুলতানগণের আমলে, হীরকের বাণিজ্যক্ষেত্র-রূপেই গোলকুণ্ডা দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, গোলকুণ্ডাকে হীরক-'আকর' না বলিয়া হীরক-'নিকর' বলিলেই ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।—সুলতান আবদুল্লার বিদ্রোহী মন্ত্রী মীর জুম্‌লা গোলকুণ্ডা হইতে বিখ্যাত 'কোহিনূর' লইয়া গিয়া দিল্লীর সম্রাট

গোলকুণ্ডা দুর্গের সম্পূর্ণ দৃশ্য

দুর্গের দৃশ্য—দূর হইতে

গোলকুণ্ডার স্তূপ

গোলকুণ্ডার রাজগণের সমাধির দৃশ্য
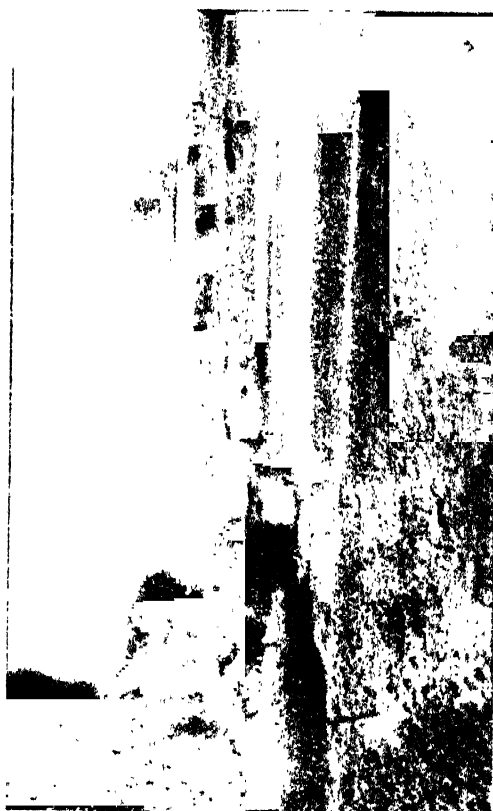
সাজাহানকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন, এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন্ খনিগর্ভ হইতে এই মণি কোন্ সময়ে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই। সুলতান আবদুল্লার রাজত্বকালে (১৬২৬-১৬৭২ খৃঃ অব্দ) ফরাসী মণিকার ট্যাভার্নিয়ে গোলকুণ্ডা আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, গোলকুণ্ডার সুলতানের ন্যায় এত বহুমূল্য মণি-মাণিক্য তৎকালে ভারতবর্ষে অন্য কোন রাজার ছিল না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা দুর্গ হইতে আওরঙ্গজেব মণিরত্নাদি ব্যতীত নগদ প্রায় ৭ কোটী টাকা লইয়া গিয়াছিলেন।

দেওয়ালের উপরিস্থিত পিত্তল-নির্ম্মিত কামান

গোলকুণ্ডা পতনের পর আওরঙ্গজেবের আদেশে তানা শাহ যখন বন্দী অবস্থায় দৌলতাবাদে নীত হইতেছিলেন, তখন পথে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক গ্রাম্য ভিস্তির নিকট জল যাচ্ঞা করেন। ভিস্তি তাঁহাকে চিনিত না, কিন্তু সযত্নে তাঁহাকে জল পান করিতে দেয়। তানা শাহ জলপানে পরিতৃপ্ত হইয়া ভিস্তিকে কিছু পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করেন, এবং সঙ্গে অর্থ না থাকায়, একখণ্ড হীরক দান করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রস্তরখণ্ডের মূল্য সম্বন্ধে ভিস্তির কোনই ধারণা ছিল না। পরে জহরীগণ উহার মূল্য ৫০ হাজার টাকা নির্দ্ধারণ করেন। কালক্রমে এই ঘটনা আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ভিস্তিকে মাত্র দুই হাজার টাকা দিয়া হীরকখানি হস্তগত করিয়াছিলেন। এই গল্পটি কতদূর সত্য, তাহা অবশ্য আমি বলিতে পারি না।

গোলকুণ্ডার পরিত্যক্ত পুরীতে কুতবশাহী রাজগণের এই মহাশ্মশানে ভ্রমণ করিলে, পার্থিব সম্পদের নশ্বরতা দেখিয়া মনে স্বতঃই একটা বিষাদময় বৈরাগ্যের উদয় হয়—

যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক গতোত্তর কোশলা!

শিশু মঙ্গল

পূতনার অত্যাচার*

[শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি]

পূতনা রাক্ষসী গ্রামে-গ্রামে নবজাত শিশু হত্যা ক'রে শিশুকুল নির্ম্মূলপ্রায় করেছে। ঘুরে-ঘুরে একদিন এক পরমা সুন্দরী সেজে নন্দালয়ে এসে উপস্থিত। ঘরের ভিতর প্রবেশ করে দেখে ছোট বিছানায় সেই ছোট ঠাকুরটী শুয়ে আছেন, যার জন্ম এতদিন ঘুরে বেড়াচ্চে। কাছে গিয়েই তাড়াতাড়ি ছেলেটীকে কোলে করে বিষ মাখান স্তন মুখে দিয়েছে। ছেলেটী ত আর যেমন-তেমন নয়। মাড়ীর চাপ ও বজ্র টান, আর—সঙ্গে-সঙ্গে রাক্ষসীর আকাশফাটা "ছাড় ছাড়" শব্দ। যমের মুখে পড়েছে,—আর কি ছাড়ে? ক্রমশঃ রাক্ষসীর ভাটার মতন চোখ দুটো ঠিক্‌রে

* টাউনহলে শিশুমঙ্গল প্রদর্শিনী উপলক্ষে মহিলাদের সম্মিলনীতে বক্তৃতা ও ছায়াবাজি প্রদর্শন।

়িয়ে পড়েছে; হাত-পায়ের ঘন ঘন আছাড়ে পৃথিবী ়েপে উঠেছে; আর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কলসী কলসী ঘাম গড়িয়ে কটা প্রকাণ্ড নদী হয়েছে। তার বিকট শব্দ শুনে মনে চ্ছিল বুঝি বজ্রের আঘাতে কোন পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। াক্ষসী মরণ নিকট দেখে আপনার আকার ধারণ করলে। ার বিশাল দেহটা ছয় ক্রোশ জুড়ে যখন প'ড়ে গেল, ার সঙ্গে কত বাড়ী-ঘর গাছ-পালা একেবারে চুরমার। োপ গোপিনীরা এসে দেখলে, ঐ বিকট-আকার াোকটার নাকের ছেঁদা যেন দুটো পাহাড়ের গহ্বর, াখ দুটো অন্ধকূপের মতন গভীর, দাঁতগুলো যেন এক কটা লাঙ্গল। কিন্তু যখন দেখলে সেই বিশাল পাহাড়ের ়েন বুকের উপর শিশু কৃষ্ণ খেলা করে বেড়াচ্চেন, তখন াদের আনন্দের সীমা রইল না।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই গল্পটা অনেকেই শুনেছেন। এর ়ত অর্থ কি? পূতনাকে বলা হয়েছে বালঘাতিনী। ার অত্যাচারে শিশুকুল নির্ম্মূল হয়েছে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন, ়ূতনা শিশু রোগ। পূতনা অনেক রকম। এক রকম ়ূতনার যা লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তাতে বোঝা যায় পূতনা ়ধনুষ্টঙ্কার বা চলিত-ভাষায় যাকে বলা হয়—

পেঁচো চোয়ালে

ঐ রাক্ষসী যে দাঁত দিয়ে ছেলে চিবিয়ে খায়, সেগুলো ়াঙ্গলের কাঠির মতনই বটে—

ধনুষ্টঙ্কারের বীজ
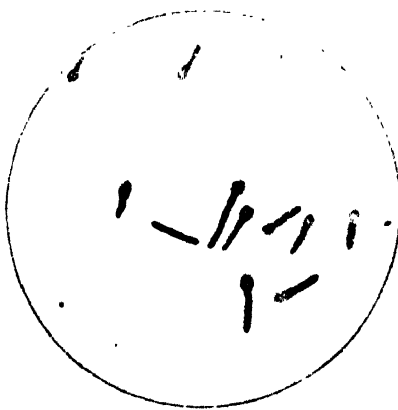
এই বীজাণু শুধু-চোখে দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ ়িয়ে দেখতে হয়। ঘোড়ার লাদিতে এরা বাস করে। ়াঠে বেড়াতে গিয়ে একটী ছেলের পায়ে পেরেক ফুটেছে। মাটীতে ছিল ঘোড়ার লাদি। ঐ মাটী থেকে ধনুষ্টঙ্কারের বীজ দেহে ঢুকেছে। কিছুদিন পর ছেলেটা ধনুষ্টঙ্কার রোগে মারা যায়।

ভাগবত বলেন, পূতনা মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে ধাত্রী হয়েছিল। আমাদের দেশে ধাত্রীর উপর এমন একটা ভক্তি আছে, যারা এখনকার নিম্নশ্রেণীর ধাত্রী দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁদের সে ভক্তির ধারণা হতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, পূতনা আর জন্মে বলিরাজার ভগিনীরূপে বামনরূপী শিশু ভগবানকে দেখে বাৎসল্য রসে গলে আপনার দুগ্ধ পান করাতে ইচ্ছা করেছিলেন; আর এই-জন্যে বিষ মাখানই হোক, তবু ত স্তন পান করিয়েছিল, তাই সে স্বর্গে গিয়ে ধাত্রীর আসন পেয়েছিল। স্তনদান ও বাৎসল্য এত পবিত্র! ধাত্রীর স্থান এত উচ্চে! সেই ধাত্রী যখন বাৎসল্য বা কর্ত্তব্য বোধ করে কাজ করে না, কেবল অর্থ-লোভে তাড়াতাড়ি কাজ করে, তার হাতেই ঐ কাঠির মতন বিষের বীজ থাকে, ঐ বীজগুলো ছেলের কাটা-নাড়ীর ভিতর দিয়ে শরীরে ঢুকে পড়ে। ধাত্রীর দোষে কত ছেলে এ রোগে মরে! ১৯১৮ সালে কলিকাতায় ঐ রোগে ৮৫০ ছেলে মারা পড়েছে। যত ছেলে সবশুদ্ধ মারা যায়, তার প্রায় আড়াই আনাই ঐ রোগে, এই হিসাবে সমস্ত বাঙ্গালায় প্রায় সাড়ে পঞ্চাশ হাজার শিশুর মৃত্যু "পেঁচোর" হাতে। কলিকাতায় এত ছেলে ধনুষ্টঙ্কারে মারা যায়; কিন্তু ডাক্তারদের ও সহকারী দাইদের হাতে, কি হাঁসপাতালে এত ছেলে প্রসব হয়, কৈ তাদের একজনেরও ত ঐ রোগ হয় না।

অনেকের ধারণা এ রোগ দৈব। তাই নানা রকম দৈব চিকিৎসা হয়। এই সহরের উত্তর ভাগে এক প্রসিদ্ধ রাজার বাড়ী। রাণী বছর-বিয়ানী। ছেলেকে পাঁচদিনের দিন "পেঁচোয়" পেত, আর ৬।৭ দিনে মারা যেত। এ একেবারে বাঁধা নিয়ম ছিল। যাগযজ্ঞি, ঝাড়ফুঁক, আরও কত কিছু; কিন্তু রাণীর দশ মাস গর্ভধারণই বৃথা। নিঃসন্তান রাজা জানতেন, এর কোন উপায় নাই, তাই মনের কষ্ট মনেই চেপে রেখেছিলেন। তাঁর এক বন্ধু একদিন আমাকে রাজার কাছে নিয়ে বল্লেন, "এই ডাক্তার আপনার দুঃখ দূর করতে পারেন!" সেবার প্রসবের ভার তিনি আমার উপরেই দিলেন। সেইবার

থেকে সোণারচাঁদ রাজপুত্রেরা রাজবাড়ী আলো করে রয়েছে।

মোকদ্দমা কিছু বেশী নয়। হাতটি বেশ ক'রে টিংচার আয়োডিন, লাইসোল লোশন, কি রসকপূরের লোশনে ধুয়ে, নাড়ী বাঁধবার সুতো আর কাঁচি গরম জলে ফুটিয়ে নাড়ী কেটে, গরম জলে ফোটান ব্যাণ্ডেজ আর ডাক্তারখানার তুলা দিয়ে বাঁধলেই হল। আর দেখতে হয়, আস্তাবলের সঙ্গে যেন আঁতুড়ের কোন সম্পর্ক না থাকে।

এইটুকু করলেই পেঁচো ভূত পালায়। ভয় পেলে চলে না। ভয়ে কত লোক কত কি করে। হিন্দুস্থানীরা পেঁচোকে বলে "জাময়া"। পঁচিশ বছরের কথা। আমি তখন কলিকাতার মিউনিসিপালিটীর স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করি। শ্মশান ও গোরস্থান তদারক করতে হত। একদিন মানিকতলা গোরস্থানে গিয়েছি। মুন্সী ছুটে এসে বললে "মশাই, শীঘ্র আসুন, মরা ছেলে নড়চে।" গিয়ে দেখি সাতদিনের ক্ষুদ্র শিশু। "জামুয়া" ধরেছিল। জামুয়া তাড়াবার জন্যে তার পেটে এক শ আট (১০৮) জায়গায় চিড়াগাছের দাঁড়া দিয়ে চিরে দেওয়া হয়েছে; তবু জামুয়া পালায় নাই। ছেলেটাকে কাঁড়চাপা দিয়ে সারা রাত রাখা হয়েছে। মারা গিয়েছে মনে করে সকাল বেলা গোর দিতে নিয়ে এসেছে। গোর খুঁড়ে তাকে রাখ্‌বা মাত্র পা একটা নড়ে উঠ্‌ল। পরীক্ষা করে দেখা গেল, এত লাঠির ঘায়েও প্রাণ পাখী মরে নাই, কিন্তু পালাবার জন্য বুকের পাঁজরায় মাথা ঠোকাঠুকি করচে, হৃৎপিণ্ডটা যাই যাচ্চি যাই-যাচ্চি বলে আস্তে-আস্তে চলেছে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস ফেলাবার চেষ্টা করাতে ছেলেটা বেঁচে উঠ্‌ল। তার মা ভূতে পেয়েছে মনে করে বাই পালিয়েছে, আমার চাপরাসী তাকে ধ'রে এনে ছেলে শুদ্ধ হাসপাতালে নিয়ে গেল। পরে সংবাদ পত্রে প্রকাশ "মানিকতলা গোরস্থানে শবের পুনরুত্থান।" যা'হোক, এই ভাবে কত ছেলে যে মারা যায়, তা বলা যায় না। এই কথা জানা দরকার, ধনুষ্টঙ্কার হলে ছেলের বাঁচা দায়; কিন্তু না হবার উপায় অতি সহজ। তা নয়, মা-মারা ধাত্রী ছেলে মারা পুতনা সাজে পুতনা সেজে অনেক সময় পোয়াতির দেহে ছোঁয়াচে বিষ ঢেলে দেয়। সেই বিষাক্ত দুধ খেয়ে ছেলের অসুখ হয়। সেই বিষে পোয়াতির দুধ শীঘ্রই শুকিয়ে যায়; কাজেই ঢোকা দুধ অনিয়মে খাওয়াবার দরুন কত ছেলে আমরা হারাই। সেই ছোঁয়াচে রোগে কত পোয়াতি মারা যায়। এই রোগের নাম সেপ্‌সিস্‌। এতে চারি রকম বীজাণু থাক্‌তে পারে। পর পৃষ্ঠায় রোগের বীজাণু দেখুন।

বারো বছরের কথা। একজন প্রসিদ্ধ দেশী দাই মেয়েটীকে প্রসব করিয়েছিলেন। সহজ প্রসব, অথচ হাত ভিতরে দিয়ে ছেলে না নিয়ে এলে ত বাহাদুরী দেখান হয় না! হাতে ঐ প্রকার বীজাণুর মতন কত বীজাণু কিলবিল করছে আছে। টিংচার আয়োডিনে কি লোশনে ধুয়ে দিলেই সব বিষ মরে যায়। তা কি হয়? "আমার হাত কি এতই নোংরা? এই হাতে এই বাড়ীর গিন্নী তোমাকে, তোমার মাকে, তোমার শাশুড়ীকে খালাস করেছি। কৈ তাদের ত বাবু কোন রোগ হয় নাই। তোমাদের কথায় ত আমি লোশন ফোশন হাতে দিতে পারিনে।" নাক মুখ ঘুরিয়ে যখন মেয়ের মাকে এই কথা দাই বল্‌লে, মা চুপ করে রইলেন। কিন্তু মেয়েটীর সেপ্‌সিস্‌ বা সূতিকাজ্বর হল; পেটে ফোঁড়া হয়ে দশ মাস ভুগে যদিও কোন রকমে বেঁচে উঠ্‌ল, ছেলেটী পেটের অসুখে ও লিবারে ভুগে এক বছর না পূরতেই মারা গেল। মেয়েটীর বয়স ছাব্বিশ বছর মাত্র। দেয়ালে সেই ছেলেটীর ফটো টাঙ্গান রয়েছে। মেয়েটী সেই ছবির পানে তাকায়, আর চক্ষের জলে ভেসে বলে "বাবারে, তুই কি আর আসবি না?" আজও তার ছেলে হয় নাই। সেই উদ্দেশ্যে শীঘ্রই অস্ত্র করা হবে। ছেলে পাবার জন্য মা-লক্ষ্মীরা কতই না কষ্ট স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের মা-মাসীরা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে প্রসবের সময় দাইদের কাজ-কর্ম্মের উপর একটু দৃষ্টি রাখেন, তা হলে আর পরে কষ্ট পেতে হয় না। তাঁরা এই কাজগুলি দেখে নেবেন!

১। দাইদের হাতের নখ যেন লম্বা থাকে না, বা হাতে কোন ঘা থাকে না। লম্বা নখের ভিতর নানা রকম বিষ থাকে। ঘায়ে যে সব বীজাণু থাকে, তাই থেকে পোয়াতির জ্বর হয়। (৩ ও ৮ নং ছবি দেখ)

২। অন্য কোন ছোঁয়াচে রোগীকে দেখে এসে যেন পোয়াতিকে ছোঁয় না।

৩। পোয়াতিকে পিচ্‌কারী দিয়ে বাহ্যে করান

দরকার। বাহ্যে একবার ডুবার হয়ে থাক্‌লেও ডুশের জলে সমুদয় মলের নাড়ী বেশ ক'রে ধুয়ে দেওয়া উচিত। তা নইলে ছেলের মাথা যত নীচে আসে, তত একটু একটু মল পড়ে, আর কাপড়-চোপড় সব নোংরা হয়ে যায়। মলে এক প্রকার বিষের বীজাণু থাকে, ঐ ৫ নং ছবিতে দেখান

সূতিকা বিষের এক প্রকার জীব (স্ট্রেপ্টোককাস্)— ২ নং

পুঁযের বীজাণু — ৪ নং

হয়েছে। ঐ বীজ প্রসব-পথে যায়, আর পোয়াতির ভয়ানক জ্বর ও নানা রকম উপসর্গ হয়; এমন কি, এতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হতে পারে।

৯। বাহ্যে করবার পর তলপেট থেকে নীচে পর্য্যন্ত সমস্ত এবং দুই উরোত সাবান-জল দিয়ে বেশ করে, ধুয়ে, লাইশোল লোশনে ধুয়ে, ঐ লোশনে ভিজানো একখানা কাপড়ে সব ঢেকে তবে যেন পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে কনুই পর্য্যন্ত হাত সাবান দিয়ে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট বেশ করে রগড়ে ধুয়ে লাইশোল লোশনে তিন মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এই হাতে টিংচার

মলবিষের বীজাণু — ৩ নং

ধাতুবিষের বীজাণু — ৫ নং

আয়োডিন মাখালেও চলে। এই ভাবে শোধন করা হাত পরীক্ষার আগে অন্য কিছুতে যেন লাগে না। পরীক্ষা কাপড়ের নীচে না ক'রে, দেখে করা উচিত। বাঁ-হাতের আঙুলে দুদিক ফাঁক করে ডান হাতের তর্জ্জনী একেবারে

ভেতরে ঢোকান উচিত, উপরে যেন লাগে না। কোন তেল ব্যবহার করা হবে না। বারবার পরীক্ষা করতে দেওয়া উচিত নয়।

৫। শ্বেত-প্রদর না থাকলে ভিতরে চুণ দিতে নাই, থাকলে চুণ দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। বাতের বাক্স থেকে পোয়াতির ভয়ানক জ্বর হয়।

৬। নাড়ী কাটবার কাঁচি ও নাড়ী বাঁধবার সূতো যাতে গরম জলে সিদ্ধ হয়, আর হাত শোধন করে সেই হাতে ভাল তুলো ও ব্যাণ্ডেজ দিয়ে নাই বাঁধা হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

৭। পোয়াতির যদি শ্বেত-প্রদর থাকে, ছেলের মাথা বেরিয়ে আসা মাত্র বোরিক লোশনে চোখ ধুয়ে দিতে হবে। তার পর চোখের পাতা ফাঁক ক'রে চোখে এক ফোঁটা কষ্টিক লোশন দেওয়া চাই, নতুবা ছেলেটী অন্ধ হতে পারে। আধ ছটাক গোলাপ জলে আড়াই রতি কষ্টিক মিশিয়ে আগে থেকে একখানা নীল কাগজে শিশি মুড়ে রাখা উচিত।

গিন্নিরা যদি দাইয়ের উপর সমস্ত বিষয় নির্ভর না ক'রে এই কাজগুলি নিজে দেখে নেন, তা হ'লে আর পোয়াতি কি ছেলের জন্য ভাবতে হয় না। বাবুদের ও বিষয়ে কিছু বলাই ঝকমারি। এ বিষয়ে তাঁরা হোমরুল্ পূর্ণ মাত্রায় স্বীকার করেন। বাড়ীর গিন্নি যা বলেন, তাই অকাট্য সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। এই অজ্ঞতা ও উদাসীনতার ফলেই বৎসর-বৎসর লক্ষ লক্ষ শিশুর মৃত্যু দৈব ঘটনা বলিয়া স্বীকৃত, এবং নানাবিধ নিবার্য্য রোগ ক্লিষ্ট রমণীদের আর্ত্তনাদে অন্তঃপুর পরিপূরিত।

চিত্রকর

[শ্রীঅজয়কুমার সেন]

(১)

নবীন চিত্রকরদের মধ্যে অসীমকে সকলেই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। সে যাহা আঁকিত—বাস্তবিকই তাহা সুন্দর হইত, কিন্তু বাহিরের অসম্প্রদায়ের লোকেরা দেখিয়া বলিত—'এ কিছুই হয় নাই'—কারণ লোকে যেরূপভাবে চিত্র প্রস্তুত করিতে বলিত—অসীম তাহা না করিয়া তাহার নিকট যাহা ভাল বোধ হইত, তাহাই সে আঁকিত। এইজন্য তাহার কাছে বড় একটা কেহ চিত্র প্রস্তুত করিতে দিত না—দিত শ্যামলকে।

শ্যামল বড়লোকের ছেলে। চিত্রকার্য্যে সে নূতন ব্রতী। তাহার হাতও তত পাকা নয়। যেখানে রং দিলে চিত্রের সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হয়, শ্যামল সেখানে যাহা হয় একটা কিছু করিয়া খানিকটা রংয়ের বাহাদুরী দেখাইয়া দিত। লোকে কিন্তু শ্যামলের সেই চিত্রই তারিফ করিত। শ্যামল অনেক কাজ পাইত, বাহিরে তাহার নাম ডাকও হইল, অর্থাগমও হইতে লাগিল; কিন্তু প্রকৃত প্রতিভা-সম্পন্ন অসীম যে দরিদ্র, সেই দরিদ্রই রহিল;—তাহার জীর্ণ কুটীর ঘুচিল না।

অসীমের গুরু কেহই ছিল না। সে নিজেই ছবি আঁকিতে শিখিয়াছে। শ্যামলের শিক্ষা অন্যের নিকট হইতে। সেইজন্য তাহাদের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ হইত। তবুও তাহাদের মধ্যে খুব প্রণয়।

অসীম ভাবুক ও মিষ্টভাষী, কিন্তু সে লোকের সঙ্গ পছন্দ করিত না; নির্জ্জনে আপন মনে বসিয়া, আপনার খেয়াল মত ছবি আঁকিত,—ক্রেতা জুটিত না।

(২)

কোন ধনী ব্যক্তি প্রচার করিয়া দিলেন, যে তাঁহার মনোমত চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিবে—সে আশাতিরিক্ত পুরস্কার পাইবে।

অসীম বাস করিত সামান্য জীর্ণ কুটীরে, সে কোথাও যাইত না; সুতরাং বাহিরের কোন সংবাদই সে রাখিত না। চিত্র লইয়াই সে বিভোর হইয়া থাকিত। ছবিই যেন তাহার সর্ব্বস্ব।

একদিন তাহার স্ত্রী আসিয়া বলিল, 'ওগো শুনেছ,

একজন বড়মানুষ, তাঁর কি রকম যেন ছবি চাই,—যে তৈরী করে দিতে পারবে—সে নাকি অনেক টাকা পাবে। তুমি কেন সেই ছবি তৈরী করে দাও না। তাহ'লে আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর হয়, তোমারও নাম হয়।'

অসীমের কাণে সে কথা গেল না, সে তখন তন্ময় হইয়া ক্যানভাসের উপর রেখা টানিতেছিল।

অসীমের স্ত্রী তাহার গা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, 'শুনেছ, আমি যা বল্লুম।' অসীম স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি বল্লে, আমি ত শুনিনি।' অসীমের স্ত্রী পূর্ব্বলিখিত বিবরণ আবার বলিল। তাহা শুনিয়া অসীম কহিল, "ও কি আমি পারবো—যে চেষ্টা করবো? সে যদি পারে ত—একমাত্র শ্যামলই পারবে।'

এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী কহিল, 'তুমি বাইরে বেরুবে না—তা কি করে পারবে বল। শ্যামল বাবুর কি রকম নাম ডাক। তুমি কিন্তু যে গরীব—সেই গরীবই রইলে।'

অসীম অন্যমনস্কভাবে "হুঁ" বলিয়া তুলিটা রং-এ ডুবাইয়া ক্যানভাসে একটা কি রেখাপাত করিল; বোধ হয় সেই রেখাপাতে কিছু একটা খুলিয়া গেল,—তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল।

(৩)

একদিন অসীমের কুটীর-দ্বারে তাহার বন্ধু চিত্রকরগণের সমাগম হইল।

অসীম তখন তাহার কুটীরের মধ্যে ছিল। বাহিরে লোকসমাগম দেখিয়া—অসীমের স্ত্রী তাহার নিকটে আসিয়া বলিল, 'ওগো, বাইরে যে অনেক লোক—দেখ না গিয়ে।' অসীম বলিল, 'লোক—কেন? তারা কি চায়!' তাহার স্ত্রী কহিল, 'গিয়ে দেখ না—ওঁরা সব কেন এলেন। বোধ হয় ছবির কথা বলতে।' অসীম বলিল, 'কি ছবি—কার ছবি?' স্ত্রী বলিল, 'আগে বাইরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এস—তা হ'লেই জানতে পারবে।'

অসীমকে দেখিয়া শ্যামল তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'অসীম, কি খবর তা' জান না বুঝি?' আর একজন বলিল, 'অসীমই পারবে—আর কেউ পারবে না।' অসীম বলিল, 'কি ছবি ভাই শ্যামল, আমি ত কিছুই জানি না।' শ্যামল বলিল, 'একজন বড়মানুষ একখানি চিত্র তৈয়ার করতে সকলকে বলেছেন—যাঁরটা তাঁর পছন্দ হ'বে, সে পুরস্কার পাবে। ছবিটি হ'বে স্বামীর মৃত্যু সন্নিকট, পার্শ্বে স্ত্রী উপবিষ্ট।"

অসীম বলিল, 'আমি পারবো না ভাই—আমি ত পারবো না; তুমি চেষ্টা কর।'

শ্যামল ও অন্যান্য সকলে অসীমের হাত ধরিয়া বলিল, 'ভাই অসীম, তুমিই পারবে—অপর কেউই পারবে না।'

অসীম কিছুই না বলিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

(৪)

অসীম আজ চার পাঁচ দিন তার সেই ক্ষুদ্র চিত্রশালা হইতে বাহির হয় না। কেবল কি একটা চিত্র লইয়া সে পড়িয়া আছে। দিন নাই—রাত নাই—নিদ্রা নাই,—কেবল ছবির দিকেই একমনে চাহিয়া থাকে—আর ভাবে।

স্ত্রী ডাকলে কথা কয় না। কেবল ক্যানভাসের উপর আপন মনে রেখা টানিয়া যাইতেছে; যখন মনের মত হইতেছে না, তখন তুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে। এই রকম করিয়া কয়েক দিন গেল। ছবি যে কিছুতেই তার মনের মত হইতেছে না। অসীম শেষে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার স্ত্রী অনেক কাঁদাকাটি করিল—সে কর্ণপাতও করে না। অদ্ধাশনে অনশনে অসীমের শরীর শীর্ণ ও জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে লাগিল। আর সে তুলি ধরিতে পারে না।

একদিন গভীর রাত্রিতে অসীম স্ত্রীকে বলিল, 'আমায় একবার বাইরে নিয়ে চল। যদি আর না যেতে পাই।'

বাহিরে আসিয়া বলিল, 'কই আমি ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—চোখে আমার কি হোল। কই—কিছুই ত নাই, ওগো, সব অন্ধকার যে!'

অসীমের স্ত্রী এই কথা শুনিয়া বলিল, 'তুমি ওরকম করছো কেন? চল ঘরে যাই।'

মাতালের মত টলিতে টলিতে অসীম বলিল, 'আমাকে একবার ছবির ঘরে নিয়ে যেতে পার—একবার।' অসীমের স্ত্রী বলিল, "ছবির ঘরে আর যায় না; তুমি এখন শুতে চল।"

অসীম জড়িতকণ্ঠে বলিল, "না গো না—আমায় একটি বার নিয়ে চল।"

অসীম অতি কষ্টে কোন রকমে তাহার সেই অসমাপ্ত ছবির সম্মুখে বসিয়া বলিল, "ওগো, আমি একটু দেখ্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু বেশীক্ষণ আর পারব না;—চোখ যে যায়। শেষ তুলিটা একবার আমার হাতে তুলে দাও না—শেষ টানটা টেনে দিই।" এই বলিয়া তুলি হাতে লইয়া এক-টান দিয়া "ব্যস" বলিয়াই ঢলিয়া পড়িল।

অসীমের স্ত্রী দৌড়িয়া আসিয়া বুকে হাত দিয়া দেখিল—স্পন্দন পর্যান্ত নাই।

(৫)

পরদিন অতি প্রভাতে সেই ধনী ব্যক্তি ও অন্যান্য চিত্রকর অসীমের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্যামল দ্বারের নিকট গিয়া ডাকিল, "অসীম, অসীম।" কোন উত্তর না পাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, অসীমের দেহ একখানি চিত্রের মূলে পড়িয়া আছে,—আর তাহার স্ত্রী প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ পার্শ্বে উপবিষ্ট। দুই জনেরই জীবন দীপ নিবিয়া গিয়াছে।

শ্যামল বাহিরে আসিয়া সকলকে বলিল, "অসীম সে ছবি তৈরী করেছে—কিন্তু সে ত আর নাই।" বলিয়া চুপ করিল।

শ্যামলের কথা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "কেন অসীমের কি হয়েছে?" শ্যামল বালকের মত কাঁদিয়া বলিল, "চল—দেখবে।"

সকলে চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্যানভাসের উপর যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, সম্মুখে শরীর পরিগ্রহ করিয়া সেই দৃশ্যই রহিয়াছে। অসীম চিত্রে যাহা অঙ্কিত করিয়াছিল, বাস্তবজীবনেও ঠিক সেই অন্তিম দৃশ্যই প্রদর্শন করিয়াছে;—ছবিতেও অসীম আর তাহার স্ত্রী—সম্মুখেও সেই হৃদয়-ভেদী দৃশ্য! একটুও পার্থক্য নেই—একই দৃশ্য!

সকলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই অপার্থিব দুইটী চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। চিত্রকর তাহার চিত্রে ও বাস্তবজীবনে একই দৃশ্য দেখাইয়া গিয়াছে!

বিধবা

(আলোচনা)

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

গতবারে বর্ষীয়সী বিধবাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এইবারে বালিকা ও যুবতী বিধবাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বালিকা বিধবা।

বালিকা বিধবার সংখ্যা আমাদের সমাজে নিতান্ত নগণ্য নহে। 'প্রবাসী'তে (ভাদ্র ১৩২৩, বিবিধ প্রসঙ্গ, ৪১৮ পৃঃ) উদ্ধৃত আদমসুমারির (১৯১১) কয়েকটি অঙ্ক হইতে এ সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানলাভ হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু বিধবাদের মধ্যে এক বৎসরের কম হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু-বিধবার সংখ্যা কিছু কম পনর হাজার! পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধ দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকা বিধবার সংখ্যা সাড়ে সাতাত্তর হাজারের উপর! দশ হইতে পনর বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বিধবার সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ! ইহার অধিক বয়সের বিধবাদের মধ্যে কতগুলি বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা আদমসুমারির বিবরণ হইতে জানার উপায় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষের হিসাব ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু বাঙ্গালা দেশের কথাই ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে হিন্দু বিধবাদের মধ্যে এক বৎসরের কম বয়স হইতে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু-বিধবার সংখ্যা প্রায় সাড়ে নয় শত! পাঁচ বৎসরের ঊর্দ্ধ দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালিকা বিধবার সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার! দশ হইতে পনর বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বিধবার সংখ্যা একত্রিশ হাজারেরও উপর! ইহার অধিক বয়সের বিধবাদের মধ্যে কতগুলি বাল্যকালেই বিধবা হইয়াছিলেন, তাহা আদমসুমারির বিবরণ হইতে জানার উপায়

নাই। যাহা হউক, যতদূর দেখা গেল, তাহাতেই স্তম্ভিত হইতে হয়।

বাল-বিধবার সংখ্যা এত বেশী কেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন নহে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির হিন্দুগণ শাস্ত্রশাসন মানিয়া অরজস্কা কন্যা পাত্রস্থা করিতে ব্যস্ত, অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥ ইতি শ্লোকের নির্দেশ-অনুসারে দশ পার না হইতেই কন্যার বিবাহ দিতে ব্যগ্র, বিশেষতঃ গৌরীদানের পুণ্যলাভে উৎসুক। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে ২।৩ পুরুষ পূর্ব্বে অনেক সময় যুবতী বা বিগত-যৌবনা কন্যা পাল্‌টি ঘরের পাত্র-অভাবে অনূঢ়া থাকিতেন, কিন্তু এখন তাঁহারাও অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অরজস্কা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যোগী। আবার যে শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগকে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়, তাঁহাদিগকে 'অষ্টবর্ষ' কেন, অষ্টমাসা কন্যা বিবাহ করিতে দেখিয়াছি; সম্ভবতঃ বয়সের অনুপাতে কন্যাশুল্কের তারতম্য হয় বলিয়াই অনেক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অল্পমূল্যে শিশুকন্যা-বিবাহের পক্ষপাতী। আবার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে 'গৌরী' অপেক্ষাও অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত। পল্লীগ্রামে বা সহরে যে সব পাড়ায় ইহাদিগের বসতি, সেই সব পাড়া দিয়া যাইতে যাইতে যদি চক্ষুঃ চাহিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ৪।৫।৬।৭ বৎসরের ছোট ছোট অনেক মেয়েরই সীঁথিতে সিঁদুর লক্ষিত হয়। আজকাল বরপণের চাপে কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতেছে বটে, কিন্তু তাহা কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চজাতির মধ্যেই ঘটিতেছে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে, বিশেষতঃ পল্লীসমাজে, এখনও কন্যার বাল্যবিবাহ পুরাদমে চলিতেছে। এই কারণে আমাদের দেশে বালবিধবার সংখ্যা অত্যধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমাজে বহুকাল হইতে প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে কোনও বিরুদ্ধ মন্তব্য করিতে চাহি না। কেননা এ সকল সামাজিক প্রথা অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন, অনেক দিক্ দেখিয়া প্রশ্নের সমাধান করিতে হয়। বালবৈধব্য নিবারণকল্পে, ১২, ১৩, কি ১৪ বৎসরের ন্যূন বয়সে কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না, বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়ের দ্বারা এইরূপ একটী আইন বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত, এবংবিধ সংস্কারপ্রার্থী সম্প্রদায়ের বুলিও আওড়াইতে চাহি না। আস্তিক হিন্দুগণ অবশ্য বলিবেন, এই বালবৈধব্য অভাগিনীগণের প্রাক্তনের ফল, ইচ্ছা করিলেও অভিভাবকগণ ইহার রোধ করিতে পারিতেন না। এই সিদ্ধান্ত লইয়াও অদৃষ্ট ও পুরুষকার সম্বন্ধে বাদবিচার করিতে চাহি না। কেবল হতভাগিনীদিগের জন্য নীরবে চক্ষের জল ফেলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। আমরা অনেকেই যে এ বিষয়ে ভুক্তভোগী, বিষশল্য আমাদের অনেকেরই হৃদয়ে প্রোথিত! বালিকাগণ প্রথম প্রথম নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্তই জ্ঞানহীন থাকে, 'সুধু ঘোমটা দিয়া পাল্কী চড়িয়া বধূ হইবার প্রলোভনটাই তাহার কাছে সব চেয়ে প্রবল'; (শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি', ১ম খণ্ড ২য় পরিচ্ছেদ।) ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজেদের বিষম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা বুঝিতে পারে। যাক্, সে কথা যুবতী বিধবাদিগের প্রসঙ্গে বলিব।

যুবতী বিধবা।

যুবতী বিধবাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

(১) এক শ্রেণীর যুবতী বিধবা কিছুদিন স্বামিসঙ্গ লাভ করিয়া, দাম্পত্যসুখ অনুভব করিয়া, অনেকস্থলে সন্তান-জননী হইয়া, অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় যৌবনেই স্বামী হারান। ইঁহারা স্বামিস্মৃতিতে তন্ময় হইয়া, হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে স্বামি-দেবতার বিগ্রহ-স্থাপনা করিয়া, তাঁহারই ধ্যানে অবশিষ্ট জীবন কাটান, 'নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্' সহ্য করিয়া, পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হইবার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, পূজা অর্চ্চায়, ধ্যান ধারণায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া, জীবন-যজ্ঞ উদ্‌যাপন করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা সন্তানবতী, তাঁহাদিগের স্বামীর স্মৃতিমাত্রই সম্বল নহে, তাঁহারা মৃত স্বামীর জীবন্ত নিদর্শন সন্তানের মুখ দেখিয়া, তাহাকে অবলম্বন করিয়া, স্নেহের কর্ত্তব্যসাধন করিয়া, তাহাকে 'মানুষ' করিয়া, তৃপ্তিলাভ করেন, দুঃখের মধ্যেও সুখ পান।

'তিনি আত্মহত্যা করিয়া এ জীবনজ্বালা জুড়াইবেন··· স্বামীর অন্তিমক্ষণে শোকের অধীরতায় একবার তাহাই ভাবিয়া তিনি হৃদয় বাঁধিয়াছিলেন; কিন্তু তারপর সকল ফুরাইয়া গেলে মধুরকণ্ঠে ছেলে যখন মা বলিয়া ডাকিল এবং কচি কচি হাত দুখানি দিয়া চারি বছরের সে অঞ্চলের নিধি তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া আধ আধ কথায় বলিল,—

"ছি কেঁদো না," তখন তাহার মুখ চাহিয়া আবার তাঁহার বাঁচিতে সাধ হইয়াছিল।' (৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'কৃতজ্ঞতা' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।) ইংরেজ কবি টেনিসনের একটী গানে সন্তানবতী সদ্যো-বিধবার উক্তি—'Sweet my child, I live for thee' এই প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য।

আমাদের সমাজের যুবতী বিধবার এই আদর্শ আমাদের সাহিত্যে অনেক স্থলে চিত্রিত হইয়াছে। মহাভারতের কুন্তী, সপত্নীর অনুরোধে নিজের ও সপত্নীর গর্ভজাত শিশু-গুলির লালনপালনের কর্ত্তব্যসাধনকল্পেই, স্বামীর সহিত সহমরণে না গিয়া ব্রহ্মচারিণী হইয়া দীর্ঘজীবন যাপন করিয়াছিলেন, এই আদর্শ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। আমরা ধারণা করিতে পারি, এই আদর্শে সন্তান-পালনের কর্ত্তব্যভার লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলিতে প্রতাপের মা, শৈবলিনীর মা, রাধা-রাণীর মা প্রভৃতি স্বামিবিয়োগ-শোক সামলাইয়াছিলেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সুকুমার কল্পনালীলার প্রভাবে রোমান্স রচনায় ব্যগ্র ছিলেন, সেইজন্য এই শ্রেণীর গার্হস্থ্যচিত্র অঙ্কন করেন নাই। যে সকল কল্পনাকুশল লেখক আদর্শ পরিবার চিত্রিত করিবার বা অনুরূপ আদর্শ স্থাপনার উদ্দেশ্যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের এই ত্রুটি (?) সংশোধন করিয়াছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অনাথবন্ধু'তে আদর্শ ব্রাহ্মণ-পরিবারের পুত্রবতী যুবতী বিধবা কিরণশশী, শ্বশুর ও বড় মা এই উভয়ের সযত্নে প্রদত্ত শিক্ষার এবং তাঁহাদিগের সস্নেহ ব্যবহারের গুণে কিরূপে বাপের বাড়ীর কুশিক্ষার ফল সঙ্কীর্ণতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি ভুলিয়া, স্বামিস্মৃতি ও সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য এই দুইটি অবলম্বন করিয়া আদর্শ-বিধবায়, গ্রন্থকারের ভাষায় 'জীবন্ত দেবী-প্রতিমা'য় পরিণত হইলেন, গ্রন্থকার তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। প্রৌঢ় বয়সে এই পরিণতি আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল, ভাশুর ও দেবরের পরিবারের সহিত তিনি পূর্ণরূপে মিশিয়া গিয়াছিলেন (৩৩শ পরিচ্ছেদ); তবে তিন বৎসরের শিশুপুত্র লইয়া তিনি যখন বিধবা হইয়া-ছিলেন, তখন তিনি যুবতী, এবং যৌবনেই তাঁহার এই পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে যুবতী বিধবাদিগের মধ্যে ধরিলাম। ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ক'নে বউ' আখ্যায়িকায় 'বিষাদময়ী প্রতিমা' 'শাপভ্রষ্টা দেবী' তারাসুন্দরী (ব্রাহ্মণের ঘরের) পুত্রবতী যুবতী বিধবার আদর্শরূপে চিত্রিতা হইয়াছেন। তবে গ্রন্থকার তারাসুন্দরীর সন্তানের মায়া অপেক্ষা স্বামিস্মৃতিতে তন্ময়তা ও পূজা-অর্চ্চায় নিবিষ্টচিত্ততার উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। (৪র্থ খণ্ড ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।)

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি'তে ফুলের মা (জাতিতে কায়স্থ) দশ বৎসরের কন্যার বিবাহের উদ্‌যোগ করিতেছেন এই বর্ণনা যখন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডেই পাওয়া যায়, তখন তিনি বিগত-যৌবনা নহেন (বাঙ্গালী নারী যে বয়সে সাধারণতঃ সন্তানবতী হয়েন সে কথা মনে করিয়া) অনুমান করি। তথাপি তাঁহাকে প্রৌঢ়া বিধবার মধ্যেই পূর্ব্বপ্রবন্ধে ধরিয়াছি, কেননা কন্যার বিবাহ দিলেই আমাদের সমাজে নারী প্রবীণা (বা 'অকালবৃদ্ধা') বলিয়া বিবেচিত হয়েন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি'তে আদর্শচরিত্র অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য শ্বশুরের প্রতি ভক্তিমতী ও কন্যাস্নেহবতী (৩১ বৎসর বয়সে 'অকালবৃদ্ধা', ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) রাজ-লক্ষ্মীকেও উক্ত কারণে পূর্ব্বপ্রবন্ধে বর্ষীয়সীদিগের শ্রেণীতে ফেলিয়াছি।

৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তরে' অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের ভগিনী বিজয়া ২৬২৭ বৎসরে একটী পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া বিধবা। ব্রহ্মজ্ঞানী স্বামীর নিকট শিক্ষালাভ করাতে প্রথম প্রথম হিন্দুধর্ম্মের কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান-পালন সম্বন্ধে তিনি দ্বিধা বোধ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-পালনে আরও দৃঢ়ব্রতা হইলেন, পরকালে মৃতপতির সহিত মিলিত হইবার উপায় স্বরূপ কঠোর তপস্যা আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিলেন। ক্রমে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব আসিল, ইহাতে তাঁহার জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিল। "জীবনের প্রতি কি এক প্রকার অনাস্থা, বিষয়-সুখের প্রতি কি এক প্রকার নির্লিপ্তভাব, সকলের প্রতি কি এক অপূর্ব্ব সৌজন্য, নিজের সুখ অপরকে দিবার জন্য কি একপ্রকার ব্যগ্রতা, সর্ব্বজীবে কি এক অদ্ভুত দয়া, মুখশ্রীতে কি এক প্রকার পবিত্রতার আভা, দেখিলে বোধ হয় শোকাগ্নি

মানবীকে পোড়াইয়া দেবী করিয়া তুলিয়াছে।" ব্রাহ্ম লেখকের চিত্রিত এই চিত্র অতি সুন্দর, অতি পবিত্র। আবার বিরজা ভ্রাতার সংসারে যখন ছিলেন, তখন সংসারের প্রায় সকল ভার লইয়া তিনি অনলস কর্ম্মশীলতা ও স্নেহমমতায় সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'অনুপমা' আখ্যায়িকার নায়িকা (ব্রাহ্মণের ঘরের যুবতী বিধবা) অনুপমা সন্তানবতী না হইলেও ভাশুরপুত্রদিগের প্রতি মাতৃভাবাপন্না; তিনি বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীর শুশ্রূষা, ভাশুরপুত্রদিগের প্রতি স্নেহ-মমতা, মদনগোপাল-বিগ্রহের সেবা ও স্বামিস্মৃতিতে তন্ময়তা এই চারিটি অবলম্বন পাইয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ফলতঃ অনুপমা এই শ্রেণীর বিধবার সুন্দর আদর্শ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর করের 'অনাথ বালকে' ভাশুরপুত্রের প্রতি মাতৃভাবাপন্না (কায়স্থের ঘরের) বিধবা জ্ঞানদার কথা বর্ষীয়সী বিধবাদিগের প্রসঙ্গে পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি এবং কেন তাঁহাকে বর্ষীয়সী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছি তাহারও কারণ দর্শাইয়াছি। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহের 'ধ্রুবতারা'র শরৎশশী একটি শিশু-সন্তান কোলে লইয়া বিধবা—'কোলে সোণারচাঁদ মনে স্বামীর ভালবাসার স্মৃতি'—লইয়া সে বাঁচিয়া ছিল। দেবসেবা, অতিথিসেবা, পরিজনের সেবা, ব্রতনিয়ম-সংসারে এই সবই তাহার নিত্য আচরণীয়। আবার দেবরের প্রতি স্নেহ ও স্বামিকর্তৃক অবহেলিতা যায়ের সহিত গভীর সমবেদনা তাঁহার চরিত্রকে অপূর্ব্ব মাধুরী দিয়াছে।

৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের 'পূজার ফুলে' স্বামিস্মৃতি-সর্ব্বস্বা নিঃসন্তানা সুষমা (ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা) এই শ্রেণীর আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। (দশ বৎসরে বিবাহিতা, তের বৎসরে বিধবা, ১ম পরিচ্ছেদ।) 'এখন পদে পদে, সুষমার স্বামীকে মনে পড়ে,—সেই স্নেহ, সেই সোহাগ, সেই মূর্ত্তি, সকলই মনে পড়ে, আর মনে হয়, যে কয়টি দিন তাঁকে পাইয়াছিল, প্রাণ খুলিয়া কেন তাঁর সহিত মিশে নাই! সুষমা এখন প্রতি নিশীথে,শূন্য বিছানায়, শূন্য হৃদয়ে কেবল ভাবে···এমনি করিয়া কাঁদে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। এইরূপ অন্ধকার চিত্তে দিনে দিনে স্বামীর সেই প্রেমমূর্ত্তিখানি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল।' (নবম পরিচ্ছেদ।) গভীর নিশীথে সকলে ঘুমাইলে অতীত দাম্পত্য-সুখের ভগ্নাবশেষ স্বামীর পত্রগুলি বার বার করিয়া পড়িয়া সে দুঃখের জীবনে একটু সুখ পাইত। 'পত্র পড়িতে পড়িতে সুষমার সব মনে পড়িত, তার পর ক'ফোটা জল ফেলিয়া পত্রগুলি অতি যত্নে ভাঁজ করিয়া তুলিয়া রাখিত, শেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শুইতে যাইত।'* (২৮শ পরিচ্ছেদ।) সে শাশুড়ীর সেবা ও তাঁহার মৃত্যুর পর দেবর ও ছোট যার সহিত প্রীতিস্নেহের আদান প্রদানে শান্তি পাইয়াছিল। কিন্তু শেষে পাষণ্ডের অত্যাচারে আত্মরক্ষার চেষ্টায় তাহাকে অন্যত্র আশ্রয় লইবার জন্য গৃহত্যাগ করিতে হইল এবং তাহার ফলে সে মিথ্যা কলঙ্ক-লাঞ্ছিতা হইয়া অকালে প্রাণ হারাইল।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অদৃষ্টচক্রে' অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের কন্যা বিরজা এই শ্রেণীর নিঃসন্তানা যুবতী বিধবার আর একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। 'বিরজা অপত্য-স্নেহাস্বাদ-বর্জ্জিতা হিন্দু বিধবার অবলম্বন ধর্ম্মকেই জীবনের অবলম্বন-রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। সে ব্রতাদির আচরণে শরীরকে ক্লিষ্ট ও চিত্তকে জয় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল।...বিরজা স্বামীকে সম্পূর্ণরূপে পাইবার পূর্ব্বেই—তাহার মুকুলিত যৌবনের প্রেম-পিপাসাতুর হৃদয়ে প্রেম-তৃষ্ণার তৃপ্তির পূর্ব্বেই স্বামীকে হারাইয়াছিল। তাই এখন সে দেবতার ধ্যান করিতে বসিলে স্বামীর দিব্যমূর্ত্তি তাহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিত।···দেবপূজা শেষ করিয়া সে যখন পতির চিত্রকে প্রণাম করিত, তখন তাহার মনে হইত, দেবতা তাহাকে সেই পরিচিত-রূপে দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। সে পতি দেবতায় ও ইষ্ট-দেবতায় মিশাইয়া ফেলিত।' (২য় খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ।) এই স্বামি-চিন্তায় তন্ময়তা সত্ত্বেও তাহার চরিত্রে পিতা ও শ্বশুর প্রতি ভক্তি এবং স্বামি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা ভগিনীর প্রতি গভীর স্নেহ ও সমবেদনা, তাহাকে সংসার হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নাই। (৩য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদ)।' 'মানুষের হৃদয় একটা অবলম্বন নহিলে থাকিতে পারে না—সে একটা কিছু আঁকড়িয়া ধরিয়া হৃদয়ের শূন্যভাব দূর করিতে চাহে।......

* এই কাল্পনিক বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে 'প্রিয়প্রসঙ্গে' বিধবার বেদনার বাস্তব বৃত্তান্ত মনে পড়ে; সে বৃত্তান্ত বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

পতিপ্রেম-বঞ্চিতা অপত্যস্নেহ-স্বাদ-সুখহীনা বিরজার হৃদয় দুঃখিনী ভগিনীকেই জড়াইয়া ধরিয়াছিল। সে ভগিনীর ভালবাসা ও জননীর স্নেহ সবই সরোজাকে দিয়াছিল। তাহার এই ভগিনীস্নেহ পরবর্ত্তী শ্রেণীর অন্নপূর্ণার ভগিনী-স্নেহের সহিত তুলনীয়)।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা' নাটকে (কায়স্থের ঘরের) নিঃসন্তানা যুবতী বিধবা শান্ত এই শ্রেণীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সে তের বৎসরে বিধবা, নাটকীয় বৃত্তান্তের ঘটনাকালে সে সপ্তদশী যুবতী। সে 'সোয়ামী কেমন জান্‌তে না জান্‌তে বিধবা হ'লো' তবুও সে 'মরা পতির পূজা করে' কেননা সে বুঝিয়াছিল, 'পতি মেয়ে মানুষের প্রাণের জিনিস, চখের আড়ালে গেছে বটে কিন্তু প্রাণের আড়ালে যায়নি।' মৃত স্বামীর জন্য তাহার এত আকুলতা যে, সে বলিয়াছে, "আমার দু'খানা হাত কেটে দিলেও যদি সে ফিরে আসে, ফিরে এসে যদি চিরজীবন আমাকে দলতে থাকে, তা হ'লেও আমি মনে করি যে, আমার মত ভাগ্যবতী আর কেউ নাই।" পূজা-অর্চ্চা সংযম ব্রত উপবাস পালন করিয়া সে বিধবার ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিত; আবার সংসারে মাতার সেবা, স্বামি-বিড়ম্বিতা ভ্রাতৃবধূর প্রতি স্নেহ ও সমবেদনা, রোগীর শুশ্রূষা, গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম করা, এ সকল গুণও তাহার চরিত্রে বিকশিত হইয়াছে। বাস্তবিক শান্ত 'শান্তগুণে, সতীত্বসম্পদের অতুল ঐশ্বর্য্য, অমানুষিক হৃদয়বলে', সংযম-সদাচারে, স্নেহ-মমতায়, সেবা ভক্তিতে, কার্য্যনৈপুণ্যে, 'সাক্ষাৎ স্বর্গের প্রতিমা।' (৪র্থ অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক)।

এই শ্রেণীর আদর্শ যুবতী বিধবার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'গৃহদাহ' আখ্যায়িকায় মৃণাল (ব্রাহ্মণের ঘরের ১৯।২০ বৎসরের নিঃসন্তানা যুবতী বিধবা)। আমাদের পূর্ব্ব পরিচয় সধবা মৃণালের সহিত। বিধবা মৃণালকে আমরা প্রথম দেখি 'সেজ্‌দা'র (মহিমের) রোগশয্যাপার্শ্বে—মূর্ত্তিমতী সেবার ভূমিকায়। 'বিধবার বেশ। চুলগুলি ঘাড় পর্য্যন্ত ছোট করিয়া ছাঁটা; ইহার মুখের উপর সর্ব্বকালের সকল বিধবার বৈরাগ্য যেন নিবিড় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।' (২৩শ পরিচ্ছেদ)। সুরেশ ডাক্তারীর অভিজ্ঞতা লইয়া তাহার ঐকান্তিক সেবা সম্বন্ধে বলিয়াছে, "এমন অহর্নিশি সতর্ক, এমন গুছিয়ে সেবা করতে, আমি হাঁসপাতালেও কখনো কাউকে দেখেচি বলে মনে হয় না।" 'আমি কখনো এমনটি আর দেখিনি। এমন মিষ্টি কথাও কখনো শুনিনি, এমন নিপুণ কাজকর্ম্মও কখনো দেখিনি। যে কাজ দাও, এমন অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে করে দেবে যে, মনে হবে যেন এই নিয়েই সে চিরকালটা আছে।' (২৪শ পরিচ্ছেদ)। ব্রাহ্ম কেদার বাবুও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "অদ্ভুত অপূর্ব্ব মেয়ে।" 'এ মেয়ে, স্ত্রীলোকের মধ্যে অমূল্য রত্ন!' (২৪শ পরিচ্ছেদ)। আবার মহিম সারিয়া উঠিতেই মৃণাল বৃদ্ধা পুত্রশোকাতুরা শাশুড়ীর সেবার জন্য পল্লীবাসে ফিরিয়া যাইতে ব্যস্ত। তাই সুরেশ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়াছে, 'এই হতভাগা দেশের আজও যদি গৌরব করবার থাকে, ত সে তোমার মত মেয়েমানুষ। এমন জিনিসটি বোধ করি, আর কোন দেশ দেখাতে পারে না।' (২৪শ পরিচ্ছেদ)। কন্যা অচলার কলঙ্কের কথা অনুমান করিয়া যখন কেদার বাবু ভগ্নহৃদয়, তখন নিঃসম্পর্কীয়া মৃণালের সেবা যত্নে, ভক্তি-শ্রদ্ধায় এবং তাহার কর্ম্মশীলতা ও পবিত্রতা-দর্শনে তিনি এতই মোহিত হইয়াছিলেন যে, বহু বৎসরের ব্রাহ্ম সংস্কার-সত্ত্বেও তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "যখনি মাকে দেখি, স্নানান্তে ওই পাঁশুটে রঙের মটকার কাপড়খানি পরে আহ্নিক করতে যাচ্ছেন, তখনি ইচ্ছা করে, আমিও আবার পৈতে নিয়ে অমনি করে কোষাকুষি নিয়ে বসে যাই।" (৩৮শ পরিচ্ছেদ)। ইহার উত্তরে সে যে উদার কথা বলিল, তাহা পল্লীগ্রামের 'অশিক্ষিতা' নারীর পক্ষে বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। বৃদ্ধ স্বামী সম্বন্ধে তাহার উক্তি—'তিনি বুড়ো মানুষ ছিলেন, সংসারে তিনি দরিদ্র, রূপগুণও তাঁর সাধারণ পাঁচজনের বেশী ছিল না; কিন্তু তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল।' (৪১শ পরিচ্ছেদ)। এই উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই মৃণালের চরিত্রের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, উচ্চতা ও পবিত্রতা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

(৶০) এই ত গেল এক শ্রেণীর যুবতী বিধবার কথা। কিন্তু আর এক শ্রেণীর যুবতী বিধবা সন্তান-জননী হইবার পূর্ব্বেই, নারীজীবনের সব সাধ অপূর্ণ থাকিতেই, এমন কি স্বামীর সহিত ভাল করিয়া পরিচয় না হইতেই, স্বামিধনে বঞ্চিতা হয়েন। ('মুকুল না ফুটতে গাছেই শুকাইল,—'স্পর্শমণি' ১ম খণ্ড ৩য় পরিচ্ছেদ)। ইঁহারা প্রথমোক্তদিগের

শারদীয়া উৎসবের বিপুল আয়োজন
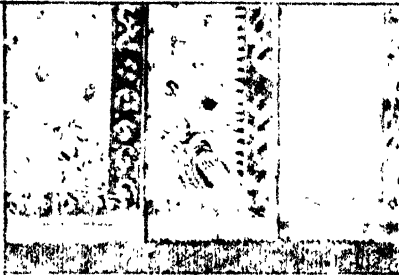
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

অপেক্ষাও দুর্ভাগিনী। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকের স্বামি-স্মৃতিও নিতান্ত ক্ষীণ। বাল-বিধবাদিগের অবস্থা আবার ইঁহাদিগের অপেক্ষাও শোচনীয়, কেননা তাহারা স্বামীর সহিত সামান্যরূপও পরিচয় হইবার পূর্ব্বেই, স্বামিপ্রেমের মর্ম্ম বুঝিবার পূর্ব্বেই, এমন কি স্বামী কি বস্তু, বিবাহ কাহাকে বলে, এসব বুঝিবার পূর্ব্বেই, সেই অমূল্যনিধি হারায়। যৌবনাবস্থা হইলে তখন তাহারা নিজেদের দুর্দ্দশা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করে, তাহার ফলে তাহাদের হৃদয়ে কি তীব্র যাতনা হয় তাহা লেখনী-মুখে প্রকাশ করা অসাধ্য। তবে হয়ত মনস্তত্ত্ববিৎ বলিবেন, যাহারা স্বামীর সহিত অন্তরঙ্গ-ভাবে মিশিয়া স্বামী হারাইয়াছে তাহাদের যাতনাই অধিকতর তীব্র; কেননা বাল-বিধবাদিগের স্বামিসুখলাভই ঘটে নাই, ফলে অভাব-বোধ তেমন তীব্র হইবার কথা নহে। কবি বলিয়াছেন, 'Sorrow's crown of sorrow is remembering happier things.' বাল-বিধবাদিগের এই পূর্ব্বসুখের স্মৃতির অভাব, সুতরাং তাহাদের যাতনা তেমন তীব্র নহে। ইহার পাল্টা জবাবে বলা যায় যে অতীত সুখের স্মৃতিতে দুঃখের মধ্যে একটু সুখও আছে, বাল-বিধবারা সে সুখে বঞ্চিত। স্বামীর আকৃতি-মাত্রের স্মৃতিও তাহাদের নাই বলিলেই চলে। সুতরাং তাহারা বৈধব্যের একটা প্রধান ও শ্রেষ্ঠ আলম্বনে বঞ্চিত। তাহাদের দুঃখের কি অবধি আছে?

এই শ্রেণীর যুবতী বিধবার চিত্রও আমাদের সাহিত্যে অনেক স্থলে অঙ্কিত হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের 'আমার বর' গল্পে, বাল-বিধবা আশার চিত্রই বোধ হয় এ শ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী। আশাকে পিতা অষ্টমবর্ষে গৌরীদান করিলেন, তিন মাস না যাইতে তাহার কপাল পুড়িল। সে তখন এমন অজ্ঞান যে, সাংঘাতিক সংবাদ পাইয়া সকলকে কাঁদিতে দেখিয়া সে, সকলে কাঁদে কেন সেই কথা পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করিল। পূজার সময় পাড়ার অন্য মেয়েদের বর আসিলে, 'আমার বর' কবে আসিবে মাকে শুধাইল। শোক সহ্য করিতে না পারিয়া, মা-বাপ তাহাকে লইয়া কাশী গেলেন। সেখানে গিয়া বাপ মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। যখন তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়স তখন সে নিজের অবস্থা বুঝিল। তাই 'বল ত জীবনে তোমার কি ইচ্ছা করে?' সন্ন্যাসীর এই প্রশ্নে সে উত্তর করিল, 'একবার আমার স্বামীকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে।' তাহার পর সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা পাইয়া সে হৃদয়ের মধ্যে আশা পূর্ণ করিয়া স্বামিদেবতাকে প্রত্যক্ষ করিল। সেই হইতে সে সদানন্দময়ী স্বামিভাগ্যবতী হইল, তাহার হৃদি-বৃন্দাবনে নিত্যলীলা চলিতে লাগিল।

৺শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'বিশ্বনাথে' রাজপুতকন্যা 'আজন্ম দুঃখিনী' পিতৃ ও ভ্রাতৃগতপ্রাণা মীরার চিত্রটিও সুন্দর। 'সূতিকা-গৃহে জননী সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে স্বামি-হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।......পিতা দ্বাদশ বর্ষে সুপাত্রে তাহার পরিণয় বিধান করিলেন বটে, কিন্তু অদৃষ্টে সহিল না। ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে মীরা বিধবা হইল।...বিমাতার জীবিতকালে মীরা ভাইগুলিকে সস্নেহে লালন পালন করিত। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাহাদের সকল ভার তাহার উপর পড়িল।' (১৩শ পরিচ্ছেদ)। সে কর্ম্মিষ্ঠা, সংসারের কাযকর্ম্ম করিয়া, পিতার সেবা ও ভ্রাতৃগণের যত্ন-আদর করিয়াই তাহার দিন কাটিত। 'কাজই আমার সব।...আমি কাজকেই বিয়ে করেছি। সোয়ামী কেমন ছিলেন মনেও পড়ে না। আশীর্ব্বাদ কর, কাজ কর্‌তে কর্‌তেই যেন মরি। যেন বাপ ভাইদের সাম্‌নে পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাই।' (১৪শ পরিচ্ছেদ)। তাহার এই উক্তি হইতেই তাহার চরিত্রের স্বরূপ স্পষ্টীকৃত হয়। কুলীন ব্রাহ্মণের প্রত্যাখ্যাতা পত্নী সরলার দুঃখে সমবেদনা ও তাহার সঙ্কিত সখীত্বে মীরার চরিত্রের আর একটা দিক ফুটিয়াছে। সরলাকে স্বামিকর্তৃক অপমানিতা হইলেও স্বামীর প্রতি প্রেম অব্যাহত রাখিতে শিক্ষা দেওয়াতে বাল-বিধবা মীরার মজ্জাগত পতিভক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। (৫৪শ পরিচ্ছেদ।)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর 'স্পর্শমণি'তে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের ঘরের বাল-বিধবা যুবতী অন্নপূর্ণা এই শ্রেণীর আর একটি আদর্শ বিধবা। "বড় মেয়েটিকে বিশ্বনাথ সাত বৎসরে পাত্রস্থা করিয়াছিলেন।...সপ্তম বৎসরে কন্যাদানে পৃথিবীদানের পুণ্যসঞ্চয় করিলেন।...নবম-বর্ষীয়া অন্নপূর্ণাও বিবাহের দুই বৎসর পরে শাঁখা-সিঁদুর ফেলিয়া

বাধা।...দয়াদাক্ষিণ্য, উদারতা, এবং পরসেবা-প্রবৃত্তি গৌরীরও যথেষ্ট ছিল।" (৩৯শ পরিচ্ছেদ।) অপরিচিতা সুষমা পীড়িতা হইয়া পথিপার্শ্বে পড়িয়া আছে সংবাদ পাইয়া দ্বাদশীর প্রাতে "জল" না খাইয়া গৌরী কিরূপে তাহাকে আশ্রয় দিতে ছুটিল এবং সস্নেহে ও সযত্নে তাহার শুশ্রূষা করিল। (৩৮শ পরিচ্ছেদ)।—এই বৃত্তান্ত হইতেই তাহার পরসেবা-প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

৺শিবনাথ শাস্ত্রীর 'বিধবার ছেলে' আখ্যায়িকার প্রথম অংশে (ব্রাহ্মণের ঘরের) বাল-বিধবা যুবতী নিস্তারিণী 'পাড়ার মধ্যে রোগীর সেবা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, দীনহীনদিগের সাহায্য প্রভৃতি কার্য্যে আপনাকে দিয়া থাকেন' (২য় পরিচ্ছেদ) এবং বধূ পিত্রালয়ে গেলে বৃদ্ধা মামীর সেবা ও সংসারের ঝঞ্ঝাট পোহাইবার জন্য তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিতা হইলেন (৪র্থ পরিচ্ছেদ), এই চিত্র পূর্ব্ববর্ণিত গৌরীর চিত্রের ন্যায়ই মনোজ্ঞ বটে; কিন্তু পরে এই ব্রাহ্মণের ঘরের বাল-বিধবাকে পরিণত বয়সে পুনর্ব্বার বিবাহ এবঞ্চ অসবর্ণ-বিবাহ করিতে দেখিয়া হিন্দু পাঠকের চির-পোষিত বিধবার আদর্শ একেবারে ওলট-পালট হইয়া যায়!

এই পর্য্যন্ত বিধবার পবিত্র আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। বারান্তরে এই আদর্শ-চ্যুতির কথার আলোচনা করিব।

কবীর

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

ফুল-বাগিচায় নাই বা গেলি—যাওয়া সে তোর মিছে—
অন্তরেতে ফুলের মেলা তোর;
পদ্ম হাজার ফুটছে সেথা—তারির 'পরে বসে'।
রূপের রসে হ'য়ে যা তুই ভোর।

*   *   *

বঁধুর সাথে প্রেম ক'রেনে রাত্রি দিবা ধ'রে—
এমন কিছু কঠিন সে তো নয়;
সত্য সে এক পরমপুরুষ পিছন পানে তোরে
আগ্‌লে সে যে ব'সেই সদা রয়।

*   *   *

কবীর কহে—বন্ধু ওরে, নখ হ'তে তোর শিখা
গরল-ভরা দেহের পাত্রখান;
পেয়ালাটী আজ ভরিয়ে নে তোর—রসামৃতে ভরা'—
নামের সুধা ক'রেনে তুই পান।

*   *   *

দেহেরি মোর অন্দরেতে উঠ্‌ছে কত সুর,
উঠ্‌ছে বেজে কতই না যে রাগ;
সুরতী সে সখি আমার কৌতুকেতে চাহে—
বঁধুর সাথে খেল্‌ছি আমি ফাগ।
আমারি যে প্রিয় সে গো—লজ্জা ভয় ছেড়ে
তারি সাথে খেল্‌ছি হোরি আজ—
সেই খেলাতে ঝর্‌ছে আজি অনুরাগের ধারা
কুতুহলী বিশ্ব-ভুবন মাঝ।

*   *   *

দেহেরি মোর অন্দরেতে খেল্‌ছে হোরি স্বামী—
উঠ্‌ছে বেজে কতই না যে সুর,
সরস কত রাগ-রাগিণী আপনি উঠে বাজি,—
আনন্দে আজ হৃদয় পরিপুর।
দেহেরি মোর অন্দরেতে বাদ্য কতই বাজে,
জ্যোতির ঝলক উজল করে প্রাণ,
সহজ রচা আনন্দে আজ তনুটী মোর ভরা,
আনন্দ তার নাইক অবসান।
অসীম সুরে রাগ-রাগিণী বাজ্‌ছে অনাহত—
তম্বুরারি নাইক পরিচয়,
রসনারো নাইক সাড়া—অনন্ত সে সুর
অন্তরেতে সদাই জেগে রয়।

*   *

এমনি ক'রেই আমার সাথে
খেল্‌ছে হোরি স্বামী;
পথ চেয়ে মোর কাট্‌ল জনম—লুকোচুরী তার
ধ'র্‌তে আজও না পারিনু আমি;
নাইবা বাণী প'শ্‌ল কাণে—চোখের দেখা থাক্‌—
আমি যে তার প্রাণের পরশ কামী।

ফুলের তোড়া

[শ্রীসুশীলকুমার রায়]

(ক)

আজ তোমাদের কাছে আমার জীবনের একটা কাহিনী বল্‌তে এসেছি। যে দিন আমি পৃথিবীর ওপর প্রথম পায়ের ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখ্‌লাম, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার চোকের সাম্‌নে দিয়ে কত জিনিষ চ'লে গেছে, কিন্তু কিছুই আমার বুকের ভেতর বুঝি তেমন গভীর ভাবে দাগ্‌ কাটতে পারি নি। প্রথমেই ব'লবে এমনটা কক্‌খনো হয় না; কিন্তু আমি ব'লছি সেটা একেবারে সত্যি। এখনও আমার চোকের সামনে সেই ঘটনা-গুলো যেন জ্বল-জ্বল ক'রছে। তোমাদের যদি কৌতূহল হ'য়ে থাকে, তবে শোন, আমি ব'লে যাই।

(খ)

সে আজ অনেক দিনের কথা, আমি তখন বন্নুইচে একটি জমিদারের ছেলেকে পড়াতাম। তারা জাতিতে শিখ্‌। ছাত্রটি আমার বড়ই অনুরক্ত ছিল; আর আমিও তার স্বধর্ম্মে খুব অনুরাগ দেখে তাকে বড় ভালবাসতুম। সে প্রত্যহ সকালে উঠে নিজ-হস্তে ফুল তুলে গ্রন্থ সাহেবের পূজা ক'রত। কখন ফুলের অপব্যবহার ক'রত না। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম, তুমি ফুলকে অত ভক্তি কর কেন? সে ব'লেছিল, দেবতার পূজায় যে জিনিষ লাগে, তাকে নিজের কাজে কি ক'রে লাগাব?

ছবছর প্রবাসে আছি। মাঝে-মাঝে বাঙলা দেশের জন্তে প্রাণ কেঁদে উঠত। উচ্চ-শিক্ষিত হ'য়ে অবিবাহিত অবস্থায় বিদেশে প'ড়ে থাকা ভাল দেখায় না; তাই বাবা আমাকে দেশে ফিরে যাবার জন্তে প্রায়ই পত্র লিখ্‌তেন; কিন্তু আমি ততটা গ্রাহ্য ক'রতাম না।

একদিন সত্যসত্যই দেশে ফিরে যাবার জন্তে স্থিরসঙ্কল্প হলাম। জমিদার বাবুর কাছে শেষ বিদায় নিয়ে যেদিন আমি টঙ্গাতে গিয়ে উঠ্‌লাম, সেদিন মুসলমানদের একটা মস্ত বড় মেলা। রাস্তার দুধারে লোকের ভিড়। সেই জনসঙ্ঘের মধ্য দিয়ে আমি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, এমন সময় 'মাষ্টার জি, মাষ্টার জি' ব'লে একটি বালক আমার টঙ্গার গতিরোধ ক'রে দাঁড়াল। তার হাতে একটা ফুলের তোড়া। সে আমার কাছে এসে ব'ল্‌লে, এটা আপনাকে নিতে হবে। আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লাম 'তুমি ত ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে ফুল দাও না!' 'আমি তা জানিনে, আপনার জন্তে নিয়ে এসেছি, নিতেই হবে।' আমি তার ফুলের মতই নির্ম্মল, পবিত্র মুখখানির দিকে চেয়ে আর কিছুই ব'লতে পারলাম না, ফুলের তোড়াটি নিলাম। সেখান থেকে ষ্টেসন পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ মাইল রাস্তা আমি কেবল তার কথাই ভাবতে ভাবতে অতিবাহিত করলাম।

(গ)

ষ্টেসনে ভয়ানক ভিড়। রাত্রি আটটার সময় গাড়ী। যাত্রীরা সকলের বাইরে অপেক্ষা ক'রছে। হুকুম এসেছে, এ গাড়ীতে কারুর যাওয়া হবে না, জায়গার একান্ত অভাব। আমি অতি কষ্টে বুকিং-অফিসের কাছে গিয়ে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটের জন্য আবেদন ক'রতেই তারা আমাকে ভেতরে যাবার পথ খুলে দিলে; আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

দূরে গাড়ীর লাল আলো দেখা গেল। যাত্রীরা সকলে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াল। আমার শরীর তখন পরিশ্রমে অবসন্ন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি কামরা খুলে কোন রকমে ব'সে প'ড়লাম। আমার ওঠবার অব্যবহিত পরেই একটি মুসলমান যুবক সেই গাড়ীতে এসে উঠলেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠ্‌ল প্রায় বাইশ তেইশ জন স্ত্রীলোক। আমি নিজের দগ্ধ অদৃষ্টকে একবার ধিক্কার দিয়ে চুপ ক'রে একটি কোণে ব'সে রইলাম। যুবকটির বয়স পঁচিশ বছর। দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী। তার হাতে একখানি রুমাল ও একটি সোনালি-কাজ-করা ডিবে। যখন সে

তার শুভ্র রুমালখানি দুলিয়ে নিজের স্থানটি পরিষ্কার ক'রে আমার পাশে এসে ব'সল, তখন মনে হ'ল কে যেন সদ্য-প্রস্ফুটিত একরাশ ফুল আমার নাকের কাছে এনে বসাল। অনেকক্ষণ থেকে একটা অদম্য কৌতূহল আমার বুকের ভেতর মাথা-কোটাকুটি কচ্ছিল। আমি আর থাকতে না পেরে ইংরাজিতে ব'ল্লাম, এরা কি আপনারই ফ্যামিলি? তিনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে ব'ল্লেন, না। আমি আবার বেহায়ার মত প্রশ্ন ক'রলাম, এদের সকলের কাছেই কি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট আছে? যুবকটি একবার, তাই ত ব'লে, পরিষ্কার উর্দ্দু ভাষায় তাদের জিজ্ঞাসা করায় তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে ব'ল্লে, না—আমাদের কাছে ত টিকট নেই। তারপর তারা একটা দমকা বাতাসের মত যেমন এসেছিল, তেমনি চ'লে গেল, কেবল তাদের স্মৃতি জাগিয়ে ব'সে রইল দুইটি যুবতী।

গাড়ী ছাড়তে তখন দু-মিনিট বাকি। একটি যুবতী তৃষ্ণায় ব্যাকুল হ'য়ে আমাদের জানাতেই আমি তখনি একটি পাণি-পাঁড়েকে ডেকে জলের বন্দোবস্ত করলাম। তারপর তাকে পয়সা দেবার জন্যে পকেটে হাত দেবার আগেই যুবকটি একটি আধুলি তার দিকে ফেলে দিয়ে ব'ল্লে, আপনাকে আর দিতে হবে না। আমি বড়ই লজ্জিত হ'য়ে প'ড়লাম।

(ঘ)

কালো আঁধারের বুক চিরে বাষ্পীয় শকট ছুটে চ'লেছে। গাড়ীর মধ্যে গ্যাসের আলো কখন উজ্জ্বল, কখন ক্ষীণ হ'য়ে বাইরের গাঢ় অন্ধকারের সঙ্গে যেন প্রাণপণে যুদ্ধ করছিল। আমার একলাটি চুপ করে ব'সে ভাল লাগছিল না; তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কোথায় থাকেন? তিনি সহজ ভাবে উত্তর দিলেন ইংলণ্ডে। আমি অবাক্ হ'য়ে গেলাম। সোৎসুক ভাবে প্রশ্ন করিলাম, কতদিন থেকে?

"আমি প্রায় সেখানে দেড় বৎসর ছিলাম। ইলেকট্রিক ইন্‌জিনীয়ারিং কাজ শিখ্‌তে গেছলাম; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরই আমার পিতা আর সেখানে থাক্‌তে দেননি। যুদ্ধ শেষ হ'লে আবার যাবার ইচ্ছে আছে।"

অবশ্য তার সঙ্গে কথোপকথন ইংরাজীতেই হচ্ছিল। এমন সময় ট্রেণখানি একটি ষ্টেসনে দাঁড়াল।

আমার তখন ক্ষিদেয় বত্রিশ নাড়ী পাক দিচ্ছিল। খাবারওয়ালাদের সন্ধান ক'রলাম, কিন্তু কাউকেও খুঁজে পেলাম না, অগত্যা আবার নিজের জায়গাটি অধিকার ক'রে ব'সলাম।

আমি যখন আমার এই দুরবস্থার কথাটা ভাবতে ভাবতে এক প্রকার তন্ময় হ'য়ে গেছি, তখন হঠাৎ পাশের দিকে তাকাতেই দেখ্‌লাম একজোড়া চোক আমার দিকে চেয়ে র'য়েছে। লজ্জায় আমার মাথাটা নুইয়ে গেল। তিনি বোধ হয় আমার এই ভাবটা লক্ষ্য ক'রে ব'ল্লেন, "আপনি কি কিছু খাবেন? আমি দিতে পারি।" একবার পাশের যুবকটির দিকে ঈষৎ কটাক্ষপাত ক'রে উত্তর দিলাম "আপনার কাছে—কি আছে?" "গোস্ত, রুটি, ওহো আপনি ত' তা খাবেন না। আচ্ছা—আছে হাঁ, আপনাকে খাবার দিতে পারি, যদি খান।"

"কি খাবার?"

"খাজা।"

"না, আপনি মেলা থেকে যে প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছেন ছেলে মেয়েদের দেবেন ব'লে, আমি তা কি ক'রে খাই।" যুবতী তার কোমল কণ্ঠে সুর চড়িয়ে ব'ল্ল "আমি যখন দিচ্ছি, তখন খান না, কোন দোষ হবে না।" পাশের যুবকটির দিকে একটু হেলে তাঁর মত জিজ্ঞাসা ক'রলাম; তিনি একটু হেসে ব'ল্লেন "খা—জা, তা খেয়ে ফেলুন।" আমি তখন অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে ব'ললাম, দিন। তখন তিনি একটি বাক্স টেনে আমাকে ব'সতে দিয়ে নিজে আর একটি খুলে আমার হাতে এক-একখানি করে খাজা দিতে লাগিলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সমস্তই খেতে লাগলাম।

(ঙ)

পেটে ভ'রে আহার ক'রে আমার পঁচিশ মাইল ভ্রমণের শ্রান্তিটা বেশ অনুভব ক'রতে লাগলাম। চোক দুটো যেন কে তার কোমল অঙ্গুলি-স্পর্শে জোর ক'রে টিপে ধরছিল। বন্ধুবর অর্থাৎ যুবকটি আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরে একটু রসিকতা ক'রে বল্লেন, এইবার শোবার পালা। গোঁড়া আস্‌তে এখনও দুঘণ্টা দেরী আছে, এর ভেতর একটু ঘুমিয়ে নিন্। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে "ব'ঙ্কের" ওপরে শুয়ে পড়লাম।

নীচে ঝনাৎ ক'রে— একটা শব্দ হ'ল। আমি তখন ধীরে ধীরে নিদ্রাদেবীর সাহায্যে স্বপনের একটা নতুন রাজ্যে পাড়ি দেবার চেষ্টা করছি। গাড়ীর মধ্যে গ্যাসের আলো ক্রমে নিবে আসবার উদ্যোগ করছিল। কামরার মধ্যে বেশ অন্ধকার। কিছুই ভাল দেখা যাচ্ছিল না, কেবল সেই আলোটাই আমার চোকের সামনে মিটমিট ক'রে জ্বলছিল। এখানে বোধ হয় বল্‌লে ভুল হবে না যে, B. N. W. Ry গাড়ীতে আলোর এইরূপ অবস্থাই ছিল, এখন ব'লতে পারি না কিরূপ দাঁড়িয়েছে। আমি বেশ একটু আরাম করছি, এমন সময় একখানি কোমল হস্তের স্পর্শ আমার কপালের ওপর অনুভব করলাম। গালের ওপর কার মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস এসে লাগছিল। মনে হ'ল, কার যেন একখানি মুখ আমার অতি নিকটে। আমি তখন তন্দ্রায় বিভোর। কে ব'ল্লে, "বাবুজি, পান নহি খাইয়েগা"। এই কোমল আহ্বানে আমার আচ্ছন্ন স্মৃতি যেন সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি বল্‌লাম, "দিজিয়ে।" আমার দেহের ওপর নিদ্রাদেবীর প্রভাব তখন খুব বেশী, হাতটাও ওঠাতে পারলাম না ; কিন্তু সে নিজেই আমার মুখের ভেতর পানটা গুঁজে দিলে। আমার সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে যেন একটা তড়িৎ-প্রবাহ খেলে গেল। আমি বল্‌লাম "কেয়া, ইসমে তামাকু হ্যায় ?" সে একটি ক্ষুদ্র 'না' বলেই পান ফেলে দিতে বল্‌লে। আমিও মুখ বাড়িয়ে ফেলে দিলাম। সে আবার একটি পান আমাকে দিলে।

(চ)

নিদ্রাদেবীর প্রভাব তখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। পানের মধুর রস গলধঃকরণ করতে করতে আমার অবস্থাটা বেশ ভাল ক'রে আগাগোড়া ভাবছিলাম। ঈশ্বরের ওপর আন্তরিক শ্রদ্ধায় আমার বুকখানা ভরে গেল।—কি তাঁর অপার করুণা! ক্ষুধার্ত্তকে বুঝি এমনি ক'রেই তিনি সব দিইয়ে দেন, আর তাঁর করুণা নারী-হৃদয়ের মধ্য দিয়াই বোধ হয় তিনি প্রকাশ করেন। তাই এঁরা সর্ব্বদেশে পূজ্যা।

আবার ঝনাৎ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। আমি তখন আবার সবেমাত্র নিদ্রাদেবীর আরাধনা ক'রছি, এমনি সময় ললাটে আবার কার স্পর্শ অনুভব করলাম।

"বাবুজি পান নহি খাইয়ে গা ?"

"নেহি, বারবার পান আচ্ছা নহি।"

সে আমার কপালের ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল! হস্তের প্রত্যেক সঞ্চালনে আমি পরম স্বস্তি অনুভব করছিলাম।—তার পর সে চ'লে গেল। অস্পষ্ট আলোকে তার মুখখানি ঈষৎ ম্লান দেখে আমার বুক অনুতাপে ভরে গেল। ধীরে ধীরে ওপর থেকে নেমে প'ড়লাম। বন্ধুবর তখনো সেই ভাবে ব'সে আছেন। তাঁর অসীম ধৈর্য্য দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। কথায় কথায় টের পেলাম তিনি গোঁড়ায় গাড়ী রিজার্ভ ক'রতে যাচ্ছেন, আবার বহ্‌রইচে ফিরে যাবেন। আমি তাঁকে বল্‌লাম "আমার একটি উপকার ক'রবেন ?" তিনি সোৎসাহে ব'ল্‌লেন, কি বলুন। আমি বল্‌লাম, "এই স্ত্রীলোক ছুটির সঙ্গে বোধ হয় কেউ নেই, এঁরা কোথায় যাবেন ?" তিনি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন "মতিহারী।" তার পর একটু হেসে বল্লেন, "এতে আপনার কি উপকার হবে।" আমি এই বিদ্রূপে যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম, বল্‌লাম, আপনি ইংলণ্ডে থাকেন, বোধ হয় জানেন নারী-জাতির উপর আমাদের কি কর্ত্তব্য। আমার উপকারের মধ্যে এই যে, যদি আপনি দয়া ক'রে ওদের একটি মেয়ে গাড়ীতে বসিয়ে দেন। আর কিছুই চাই না। গোঁডা আসতে আর একটা ষ্টেসন বাকি। গাড়ীখানি খুব জোরে ছুটে চলেছে। সেখানে আবার কুলি পাওয়া যায় না। আমি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ষ্টেসনে দেখলাম একজন মাত্র কুলি। আমি প্রাণপণে তাকে ডাকতে লাগলাম। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর আহ্বানে সে আমার কাছে ছুটে এলে, আমিও সত্বর আমার মোটগুলি তার হাতে দিয়ে নামিয়ে দিলাম। বন্ধুবরের কাছে থেকে শেষ বিদায় নিতে গিয়ে হঠাৎ আমার মনে একটা কথা এলো ; জিজ্ঞাসা ক'রলাম, ঐ স্ত্রীলোকটিকে আপনি কি চেনেন ? তিনি সরল ভাবে ব'ল্‌লেন, উনি বিহারের জহর বাঈ। ওঁর একটু অনুগ্রহ লাভ করবার জন্যে বিহারে এমন কোন জমীদার নেই যে তার সর্ব্বস্ব না দিতে পারে।

আমি কিছু না ব'লেই গাড়ী থেকে নেমে প'ড়লাম। সে তখন দৃঢ় মুষ্টিতে সোনালি কাজকরা একটা রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছিল। যেন সে নিজেকে সামলাতে পারছে

না, তাই ঐ রেলিংটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রেছে। তার চাহনি ভৎসনাপূর্ণ। আমার অকৃতজ্ঞ হৃদয় সে দৃষ্টির নীচে নুইয়ে প'ড়ল। আমি মাথা না তুলেই নমস্কার ক'রে ব'ললাম, "আপনি যে আজ আমার ওপর করুণা প্রকাশ ক'রেছেন, সে জন্যে আমি চির-কৃতজ্ঞ। আশা করি ভবিষ্যতে অনেকে,—আমার মত ক্ষুধার্ত্ত আপনার অনুগ্রহ লাভ করে কৃতার্থ হবে।" তারপর আমি চ'লে গেলাম; মনে হ'ল আমার যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার স্বর্ণখচিত বস্ত্রের প্রান্তভাগ ঈষৎ নড়ে গেল।

ষ্টেসনটি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। আমি দূরে একটি জায়গায় গিয়ে ব'সলাম। যাত্রীদের কোলাহল সেখানে একটু কম। গাড়ী আসতে দুঘণ্টা দেরী। দূরে একদল স্ত্রীলোক দেখ্‌লাম। তাদের সামনের যুবতীটিকে আমি চিন্‌তে পারলাম। সে এবার অতি ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল। হাতে আমার সেই ফুলের তোড়া। সেটা সে বড় জোরে তার বুকের ওপর চেপে ধ'রেছিল। আমি এক-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম। তারা এসে আমার কাছ থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে ব'সল। একবার মনে হ'ল উঠে গিয়ে তাদের নিকটে বসি, কিন্তু আমার হাত পা তখন অসাড় হ'য়ে গেছে। মোহে সমস্ত শরীরটা আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। ধীরে ধীরে আমার সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে আসতে লাগল।

পুনর্জন্ম

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

গাধা ব'ললে—"এত কম খেয়ে এত বেশী কাজ যে করে, সে নিতান্তই গাধা।"

ধোপা ব'ললে—"তা' নইলে ওটুকুও যে জুটবে না।"

"না হয় নাই জুটল"—ব'লে গাধা খাওয়া এবং কাজ করা দুই-ই এক সঙ্গে ত্যাগ ক'রলে। ফলে তার স্বশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি হ'ল।

* * * * *

কিন্তু সেই "স্বশরীর" অবস্থাটাই যত গোল বাধালে।

গাধা স্বর্গে গিয়েও তার গর্দ্দভ দেহের কোন পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পেলে না; সেটা ঠিক তেমনিই আছে—তবে একটু সূক্ষ্মভাবে এই যা! তখন সে একেবারে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দরবারে হাজির হ'ল।

ব'ল্‌লে—"প্রভু, স্বর্গেও আমার এই দশা?"

ব্রহ্মা ব'ল্‌লেন—"কি ক'রব বাপু? তোমার গাধাত্বতো এখনো ঘোচেনি, আর সেটা না ঘুচ্‌লেতো তুমি দিব্য দেহের অধিকারী হতে পারনা।"

গাধার মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল—দেখে ব্রহ্মার দয়া হ'ল। একটু নরম সুরে ব'ললেন—"তবে যদি মর্ত্ত্যে আবার জন্ম নিতে চাও—"

ব্রহ্মার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে গাধা ব'ললে—

"তবে এই বর দিন যেন আর গাধা হ'য়ে না জন্মাতে হয়; মানুষ হ'য়ে জন্মাই যেন এবার।"

ব্রহ্মা ব'ললেন—"তথাস্তু।"

* * * * *

ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হবার নয়। গাধা মর্ত্ত্যে মানুষ হ'য়ে জন্মাল;—যে সে মানুষ নয়—একেবারে মহাকুলীন রজক বংশাবতংশ হ'য়ে।

মানুষ হ'য়ে জন্মালে যা' হয় গাধারও তাই হ'ল। অর্থাৎ সে পূর্ব্বজন্মের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে গাধাদের সঙ্গে ঠিক ধোপাদের মতই ব্যবহার ক'রতে লাগ্‌ল।

ব্রহ্মার আশীর্ব্বাদের জোর ছিল—তাই তার গায়ে আঁচড়টুকুও প'ড়ল না,—যদিও এটা ঠিক যে, তার জাঁক-জমক দেখে পাড়ার অন্য ধোপাদের চোখ টাটাতো, তার ব্যবহারে পাড়ার বুড়োদের শিরদাঁড়া খাড়া হ'য়ে উঠ্‌ত এবং তার চালচলনে পাড়ার ছেলেদের জিভের আড় ভেঙ্গে যেত।

তারপর যখন আয়ু ফুরিয়ে এল—তখন পুত্র-কলত্র-নাতি-নাৎনি পরিবেষ্টিত হ'য়ে, গঙ্গাতীরে, "অন্তে গঙ্গা

নারায়ণ ব্রহ্ম" শুনতে শুনতে গাধা মনুষ্য-দেহ ত্যাগ ক'রলে।

*　　*　　*　　*　　*

গঙ্গাতীরে দেহত্যাগের ফলে তার স্বর্গলাভ হ'ল।

কিন্তু স্বর্গে গিয়ে আবার সেই বিপদ;—এত ক'রেও সেই ভূতপূর্ব্ব গর্দ্দভটীর সূক্ষ্মদেহটা মনুষ্যাকার ধারণ ক'রলে না।

ব্যাকুল হ'য়ে গাধা আবার ব্রহ্মার পায়ের কাছে গিয়ে প'ড়ল।

ব্রহ্মা ব'ল্লেন—"কি ক'রব বাপ্? এজন্মেও তোমার গাধাত্বটা তো ঘোচাতে পারলে না।"

গাধার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেল—অর্থাৎ গাধাদের মুখ যতটা পরিমানে শুকোয়—ওরি মধ্যে একটু বীভৎস রসাভাষ রেখে।

তাই দেখে ব্রহ্মার আবার দয়া হ'ল। ব'ল্লেন—"পুনর্জ্জন্ম না হ'লেতো আর গাধাত্ব ঘুচ্‌বে না। এবার কি হ'য়ে জন্মাতে চাও বল—গাধা হ'তে চাও তো কুলীন গাধা, শিয়াল হ'তে চাও ত তো খ্যাঁক-শিয়াল, পাখী হ'তে চাও তো হাড়গিলে এবং মানুষ হ'তে চাও তো রাজবাড়ীর ঘরজামাই হ'য়ে জন্মাতে পার।"

গাধা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। বোধ হয় ভাব্‌ছিল যে কোন্ জন্মটা ভাল। তারপর ধীরে ধীরে ব'ললে—"প্রভু আপনার ইচ্ছাই সফল হোক্।"

কথাটা ঠিক গাধার মত হ'লনা। অতএব উত্তরে ব্রহ্মার বোধ হয় বলা উচিত ছিল—"হে গর্দ্দভ, আমার ইচ্ছায় এখনি তুমি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হও।" কিন্তু তা হ'ল না—কেননা স্বর্গটা ঠিক যাত্রার আসর নয় এবং ব্রহ্মা আর যাই হোন্, যাত্রাদলের অধিকারী নন্।

ব্রহ্মা তাঁর চারটী মুখের একটি মুখ দিয়ে এতক্ষণ হাই তুলছিলেন, দ্বিতীয় মুখটী দিয়ে হাসছিলেন এবং তৃতীয় মুখটী দিয়ে একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা ক'রছিলেন। গাধার উত্তরটা তাঁর কাণে পৌছল কি না জানি না—তবে তিনি নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে চতুর্থ মুখটী দিয়ে ব'লে ফেললেন—"তথাস্তু।"

*　　*　　*　　*　　*

ব্রহ্মার কথা মিথ্যা হবার নয়—গাধাকে পুনর্জ্জন্ম নিতে হ'ল। কিন্তু কোন্ রূপ ধারণ ক'রে যে সে এবার জন্ম নিলে, সেটা অনিশ্চিত রয়ে গেল। ব্রহ্মাতো কিছু স্পষ্ট আদেশ দেননি এবং গাধাও যে কিছু স্বীকার ক'রবে সে স্বভাবই তার নয়। চিত্রগুপ্ত—র্যাঁর খাতা থেকে আমি এ কাহিনীটী "না বলিয়া গ্রহণ" ক'রেছি—তিনিও এ বিষয়ে কিছু স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে যান নি।

তবুও আশা করা যাক্—না, গাধার সম্পর্কে বেশী আশা করাটা কিছু না।

তবে মৃত্যুর পর যদি তার গাধাত্বটা ঘোচে, তাতে কারুর আপত্তি হবে না বোধ হয়।

নিখিল প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। "বর-বুদর্ মন্দির"।

অবনীর অনেক বিস্ময়কর বিচিত্র সামগ্রীর সংবাদ শিশুকাল হইতেই লোকে অন্ততঃ—শুনিয়া ও জানিয়া রাখে বটে, কিন্তু আবার এমন অনেক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যতম বস্তুও জগতে আছে, যাহার বিষয় এখনও সকলে জানে না; যেমন যবদ্বীপের অতি অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য-শিল্প শোভা বড় বুদ্ধের মন্দিরটীর বিষয় জগতের অনেকের নিকট আজিও অবিদিত রহিয়াছে। এই বর-বুদর্ মন্দির প্রাচীন যুগের সুন্দর ও বিরাট শিল্প-কলার এক শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। মিশরের "পিরামিড" অপেক্ষা এই মন্দির নির্ম্মাণে মানুষের পরিশ্রম যে অপরিমেয় হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; এবং কলাকৌশল ও কারুকার্য্য হিসাবে ইহার সহিত বোধ হয় পীরামিডের তুলনাই হয় না। কিন্তু তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পীরামিডের কথা আজ বিশ্ববিদিত হইয়াছে; কিন্তু বর-বুদরের নাম হয় ত অনেকে কখন শুনেনও নাই।

ভাষাতত্ত্বের গবেষণা দ্বারা যতদূর জানিতে পারা যায়—অনুমান, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাব অর্দ্ধজগতে পরিব্যাপ্ত, সেই সময় ইহা নির্ম্মিত হয়। যবদ্বীপের মধ্যপ্রদেশে এই

মন্দির স্থাপিত এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণের দ্বারাই ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সপ্তম শতাব্দীতে যখন যবদ্বীপে উপস্থিত হন, তখন সঙ্গে করিয়া ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ বিভূতি আনয়ন করিয়াছিলেন। তথাগতের সেই পবিত্র পাঞ্চভৌতিক কায়াবশেষ ভস্ম যথাযোগ্য সম্মানের সহিত সমাহিত করিয়া, তদুপরি এই মহান্ সমাধিস্তূপ 'বরবুদর' নির্ম্মিত হয়—যাহা তদানীন্তন জগতের এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; এবং এতাবৎ পৃথিবীর কোন অংশে যাহার সমতুল্য স্মৃতিমন্দির আর নির্ম্মিত হয় নাই। যবদ্বীপের ইতিবৃত্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রায় আট শত বৎসর ধরিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে কত লক্ষ-লক্ষ ভক্ত ও তীর্থযাত্রী প্রতি বৎসর এই মন্দির সন্দর্শন করিতে আসিত। তার পর যবদ্বীপ যখন মুসলমান অধিকারে আসিয়া পড়ে তখন হইতে পৃথিবীর এই বিরাট বিস্ময়ের সামগ্রীটি অযত্নে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ক্রমে ইহার চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল হইয়া উঠে; এবং আশেপাশের একাধিক অবিশ্রান্ত আগ্নেয়গিরির উদ্গীরিত বিপুল ছাই-ভস্মে ইহা ঢাকা পড়িয়া যায়।

১৮১৪ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সার ষ্টামফোর্ড র্যাফেল্‌স্ সেই জঙ্গলবেষ্টিত ভস্মরাশির ভিতর হইতে একদিন হঠাৎ এই মন্দিরটি আবার নূতন করিয়া আবিষ্কার করেন এবং যত্নে ইহার উদ্ধার কার্য্যে ব্রতী হ'ন। তার পর নেপোলিয়ান সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহের সময় যবদ্বীপ যখন ওলন্দাজগণের হস্তে আসিয়া পড়ে, তখন ওলন্দাজেরাও বহু অর্থ ব্যয়ে ইহার পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিতে একান্ত যত্নবান হন। ফলে তের শত বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত সেই 'বরবুদর' মন্দির আজিও তেমনি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকিয়া বিস্মিত দর্শকের কৌতূহলী দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করিয়া দিতেছে!

উপযুক্ত যান-বাহনের অভাবে যাতায়াতের একান্ত অসুবিধা বশতঃ বরবুদরের যাত্রী তেমন অধিক হয় না। তা ছাড়া পিরামিডের মত 'বরবুদর' ব্যাপার এখনও পৃথিবীময় ততটা ঘোষিত হয় নাই। ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা বিমান-যানের সাহায্যে বরবুদরে যাত্রীর যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করিতেছে। আশা করা যায়, বরবুদর এইবার জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এই মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য্য ও অপূর্ব্ব শিল্প সৌন্দর্য্য সবিস্তার বর্ণনা করিতে বসিলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া উঠিবে। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আলফ্রেড্ রাসেল্ ওয়ালেস্ বলিয়াছেন, "বরবুদর মন্দিরে মানবের যে অপরিমেয় অর্থ সামর্থ্য ও শিল্পচাতুর্য্য বিনিয়োজিত হইয়াছে, তাহার তুলনায় পীরামিডের পরিশ্রম ও ব্যয়ভার অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়!"

বরবুদর মন্দির এক বিরাট দিগ্‌বলয় শিল্পখচিত স্তূপ। দিকে দিকে স্তরে-স্তরে অসংখ্য চূড়া শিখর মাল্য-স্তম্ভ সন্নিবেশিত। সর্ব্বোচ্চ দেশে এক প্রকাণ্ড গম্বুজ,—যাহার ব্যাসের পরিমাপ প্রায় ৫২ ফিটেরও অধিক! স্থাপত্যকলাবিদ্গণ অনুমান করেন যে, এই গম্বুজের শীর্ষদেশ এক সময়ে একটী অমৃত-বেষ্টন স্তম্ভে পরিশোভিত ছিল। এই পার্ব্বত্য দেবগৃহের বহির্বেদীর উপর আরোহণ করিলে একটী ত্রিংশৎ কোণ-বিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছান যায়। এই ক্ষেত্রের উপরই মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু উহার ভিত্তি যে আরও নিম্নে, তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বহির্বেদীর ছয় ফিট নীচে আর একটা অনুরূপ বেদী এবং তাহারও দশ ফিট নীচে আবার একটী তদনুরূপ বেদী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই সমতল ক্ষেত্রটী পাষাণ প্রাকারে পরিবেষ্টিত ছিল। এই প্রাকারের প্রত্যেক দিকে বাহিরে যাইবার জন্য মুক্ত দ্বার ছিল এবং সেই দ্বারপথ-সংলগ্ন সোপানশ্রেণী উভয় পার্শ্বে প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি-বেষ্টিত হইয়া নিম্নের সমতল ভূমি পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। সোপানের সর্ব্বনিম্নভাগে উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাষাণ-গঠিত মহাস্তবদন সিংহ মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। তের শত বৎসর পরেও সেই সিংহমূর্ত্তিগুলি এখনও তেমনি হাসি-মুখে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু সোপানশ্রেণীর অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। উপরের সেই ত্রিংশৎ কোণবিশিষ্ট সমতল ক্ষেত্র হইতেও অসংখ্য সোপানশ্রেণী আঁকিয়া-বাঁকিয়া স্তরে-স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে; এবং শিখর-দেশের গম্বুজতলে যে বৃত্তাকার ক্ষেত্র আছে, তথায় যাইয়া শেষ হইয়াছে। ভিত্তিমূল হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে গ্রথিত এই বিরাট দিগ্‌বলয় বৌদ্ধ স্মৃতিমন্দিরের প্রত্যেক স্তরে এক-একটি প্রশস্ত চত্বর আছে—সেগুলি প্রস্থে প্রায় সাত ফিট পরিমাণ। দশ ফুট অন্তর অন্তর এক-একটি স্তর বিভাগ হইয়াছে। প্রত্যেক স্তরেই যে প্রশস্ত চত্বর আছে, তাহা হইতে জল নির্গমনের জন্য নানা আকারের অসংখ্য পশুপক্ষী ও রাক্ষস-মুখ পয়ঃপ্রণালী সংযুক্ত আছে। এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক কোণে এক একটি সুদৃশ্য স্তূপের মধ্যে পদ্মাসনে ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি সমাসীন। যে কোন যাত্রী এই মন্দির সন্দর্শনে আসিবে, তাহারই কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে অসংখ্য চূড়াগম্বুজ পরিশোভিত ও নানা বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত প্রত্যেক স্তরের চারিদিক হইতে অগণ্য বুদ্ধমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে! মন্দিরের অভ্যন্তরে চতুঃপার্শ্বে অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যকলা ও বিচিত্র শিল্প-সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ বৌদ্ধ জাতকের সমগ্র কীর্ত্তি কাহিনী খোদিত রহিয়াছে।

চতুর্থ স্তর হইতে উপরের চত্বরে উঠিবার জন্য মাত্র দ্বাদশটি করিয়া ধাপ সংযুক্ত এক-একটি সোপান আছে। এই চত্বরের বহির্দ্দেশ স্থূল ও প্রশস্ত প্রাকার বেষ্টিত। প্রাকারের শীর্ষদেশে ত্রিবলী-সম্বলিত বৃত্তাকার বেদী সংযুক্ত; এবং এইরূপ ভিন্ন-ভিন্ন বেদীর উপরিভাগে পাশাপাশি বাহাত্তরটি সুন্দর সমাকৃতি মর্ম্মর-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-গাত্রে আগাগোড়া ঝাঁঝরের মত ছিদ্র করা এবং শিখরদেশে এক-একটি অষ্ট কোণ ও ক্রম-সঙ্কীর্ণ-শীর্ষ স্তম্ভ স্থাপিত আছে। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটীর মধ্যেও ভগবান বুদ্ধদেবের এক-একটি অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই যেন মধ্যের সেই বৃহত্তম গম্বুজটীর শীর্ষদেশে চাহিয়া আছে। সে স্থির প্রশান্ত দৃষ্টি যেন এ পঙ্কিল জগতের মায়া মোহ ও সহস্র প্রলোভন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঊর্দ্ধে অনন্তের পানে চাহিয়া আছে!

ভারতের মহিমামণ্ডিত প্রাচীন শিল্পকলা ও স্থাপত্য-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন স্বরূপ জগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম দেবালয় 'বরবুদর' মন্দিরের বিরাট ও বিচিত্র শোভা দর্শনমাত্র বিস্ময়ে পুলকে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হয়। ইহার সৌন্দর্য্য ও শিল্প চাতুর্য্য বর্ণনার অতীত।

২। অন্ধের দৃষ্টিদান।

সার্ আর্থার পীয়ার্সনের প্রতিষ্ঠিত "সেণ্ট ডান্‌স্টান্‌স্" আশ্রমের (St Dunstan's House) নাম শিক্ষিত সমাজের নিকট অবিদিত নাই। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে জনসাধারণের ধারণা ছিল এই যে, অন্ধের পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকার কোন সার্থকতা নাই, কারণ দৃষ্টিশক্তির অভাবে তাহারা জগতের কোন কাজেই আসে না। কিন্তু সার আর্থার পীয়ার্সনের যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায়ের গুণে জগৎ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, দৃষ্টিশক্তি হারাইলেও মানুষ একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় না।

বিগত মহাযুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে সার আর্থার স্বয়ং দৃষ্টিহীন হইয়া পড়েন; এবং বাধ্য হইয়া তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য কয়েকখানি সংবাদপত্র পরিচালন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাহার মত একজন কর্ম্মবীর কিছুতেই অলস ভাবে জীবন যাপন করিতে পারেন না। দৃষ্টিহীনের দুর্ব্বল অসহায় অবস্থা অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিয়া, বিশেষ অন্ধজনের দুঃখে তাঁহার হৃদয় সমবেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। তিনি দৃষ্টিহীন হতভাগ্যদের কার্য্যক্ষম ও তাহাদের নিরানন্দ জীবনকে সুখকর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথমে দুইটি মাত্র ছাত্র লইয়া তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলেন। মার্চ্চ মাসের মধ্যে তাঁহার ষোল জন ছাত্র জুটিল। তখন সদাশয় শ্রীযুক্ত অটো কান (Mr. Otto Kahn) তাহার "সেণ্ট ডানস্টান্‌স্" আবাস অন্ধের কল্যাণ কামনায় সার আর্থার পীয়ার্সনের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেখিতে-দেখিতে ১৯১৮ সালের মধ্যে এই সেণ্ট্ ডান্সটানস্ আশ্রমে ১৫০০ দেড় হাজার অন্ধ আসিয়া আশ্রয় লইল। ইহাদের অধিকাংশই য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে চক্ষুহীন হইয়াছিল। দৃষ্টিশক্তির অভাব যে ভাবে পূরণ হইতে পারে সার্ আর্থার ইহাদিগকে সেই ভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রণালী ও বিষয় অন্ধজনের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া সপ্রমাণিত হইয়াছে।

এই আশ্রমে এক্ষণে আটটি বিষয়ে অন্ধজনকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে;—সাঙ্কেতিক লিখন, টেলিফোঁর কাজ, কৃষি ও পশুপালন, ঝুড়ি চিয়াড়ী বুনন, জুতা সেলাই, ছুতারের কাজ, ও সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্য দৃষ্টিহীনেরা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতেছে। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য সার্ আর্থার যোগ্যতা অনুসারে পুরুষ ও মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন এবং যে ছাত্র যে কাজের উপযুক্ত, বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে।

সেণ্ট্ ডান্সটান্‌স্ আশ্রমের সমস্ত ব্যয়ভার সাধারণের প্রদত্ত চাঁদার টাকায় নিষ্পন্ন হয়। সভ্যজগতের প্রত্যেক সহর হইতে প্রতি মাসে অনেক টাকা চাঁদা পাওয়া যায়। এই অতি মহৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটী আজ জগতের লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখানে শুধু অন্ধগণের শিক্ষার ব্যবস্থাই নহে, তাহাদের খেলাধূলা ও গীতবাদ্য প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তও আছে; এবং শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে যাহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, সে ব্যবস্থাও করিয়া দেওয়া হয়। এই মহদনুষ্ঠানের জন্য আজ বিশ্বের শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ সার্ আর্থারের উদ্দেশে প্রেরিত হইলেও, তাঁহার ঋণ জগৎ কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না।

৩। ভাস্কর্য্যের নূতনত্ব।

জেকব এপ্‌ষ্টীনের (Jacob Epstein) খোদিত পাষাণ মূর্ত্তিগুলি প্রথমে সাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিতে পারে নাই; বরং চারিদিকে তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনাই শোনা গিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি বিলাতের এক প্রদর্শনীতে তিনি প্রভু যীশুখৃষ্টের যে "সমাধি-নিষ্ক্রান্ত" প্রতিমূর্ত্তিটী প্রদর্শন করিয়াছিলেন, দর্শকেরা তাহা দেখিয়া যখন বলাবলি করিতে লাগিল, "কি আশ্চর্য্য! এ আবার কোন্ দেশের যীশুমূর্ত্তি? প্রভুর এ রূপ তো কখনও দেখি নাই!" দলে দলে দর্শকের ভিড় লাগিতে সুরু হইল এই অদ্ভুত যীশুমূর্ত্তি দেখিবার জন্য। ক্রমে ইহা লইয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল,—চারিদিকের কাগজপত্রে নানা রকম লেখালেখি চলিতে লাগিল। শেষে পাদ্রীরা যখন এপ্‌ষ্টীনের নিকট এই শাস্ত্রবিরুদ্ধ যীশুমূর্ত্তির জবাবদিহী চাহিল। এপ্‌ষ্টীন তাহার উত্তরে বলিলেন,—সাধকের মানসপটে ধ্যানযোগে তাহার ইষ্টদেবতার যে মূর্ত্তিটী উদ্ভাসিত হইয়ে উঠে সেই তার দেবতার যথার্থ প্রতিরূপ। আমার অন্তরের দেবতা এই রূপেই আমাকে দেখা দিয়াছেন। এই যীশুমূর্ত্তি কোন বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়, কোন বিশেষ ধর্ম্মেরও অন্তর্গত নয়। তিনি য়ুহুদীও নহেন, ক্রিষ্টীয়ানও নহেন। আমার যীশু বিশ্বের ও বিশ্বমানবের দেবতা,—তাই আমি আমার দেবতাকে সজীব মানুষের মত করিয়াই গড়িয়াছি,—কৃত্রিম দেবতার মুখোস পরাই নাই!"

পাদ্রীসমাজের প্রবল আপত্তি ও লেখালেখি সত্ত্বেও এপ্‌ষ্টীনের এই "সমাধি-নিষ্ক্রান্ত" যীশুমূর্ত্তির একদল সমজদার লোকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল। সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ যোগীর মত কৃশ কঠোর; পরিধানে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর মত বেশ, প্রশস্ত ও সবল আকৃতি, অতিকায় হস্তপদ, গভীর একাগ্রতা ও প্রভুত্ব প্রতিফলিত মুখের ভাব যেন তাঁর অন্তরের একমাত্র ইচ্ছা যে বিশ্বহিত, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। কীলকবিক্ষত দক্ষিণ পাণি বিস্তার করিয়া তিনি যেন জগতের লোককে ডাকিয়া বলিতেছেন "ভয় নাই! ওরে ভয় নাই! এমনি করিয়া দুঃখের আঘাত সহিতে শেখ, বেদনাকে বরণ করিয়া নে, সেই তো সার্থকতা, সেইখানেই যে তৃপ্তি! ওরে আত্মত্যাগের মধ্যেই যুগে-যুগে মানুষের অমরত্ব চির প্রতিষ্ঠিত, এ কথা কোন দিন তোরা ভুলিস্‌নে!"

এপ্‌ষ্টীনের খোদিত অন্যান্য ভাস্কর্য্য মূর্ত্তির মধ্যেও শিল্পী উহাদের

বাহিরের প্রতিকৃতি অপেক্ষা আভ্যন্তরিক মূর্ত্তিটিই প্রত্যেক আঘাতে ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণপণ যত্নবান হইয়াছেন। "সৈনিক" ও "বার-বিলাসিনী"র প্রতিমূর্ত্তি দুটীও ইহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

৪। জল-মিশ্রিত দুগ্ধ।

আমাদের দেশে এখন আর যেমন অধিক মূল্য দিয়াও খাঁটি দুগ্ধ সহজে মেলে না, ইয়োরোপ ও আমেরিকাতেও এই অসুবিধা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের এই প্রবঞ্চনা এতদিন অবাধে চলিয়া আসিতেছিল; কারণ দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিলে সহজে লোকে তাহা ধরিতে পারিত না। সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত ডাঃ হর্টভেট্ (Dr. Hortvet.) একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন; এই যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই সঠিক ধরিতে পারা যায় যে, দুগ্ধের সহিত কি পরিমাণ জল মিশ্রিত করা হইয়াছে। শীতোষ্ণমান যন্ত্রের (Fahrenheit Thermometer.) পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, জল সাধারণতঃ শূন্যতাপের ৩২ ডিগ্রীর পরেই জমিয়া যায়। কিন্তু জলের সহিত চিনি বা নুন প্রভৃতি অর্থকিছু দ্রবমান পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে আরও পরে ঘটে। সেইরূপ খাঁটি দুগ্ধের মধ্যে মাটা মাখন, চিনি প্রভৃতি কয়েকটি পুষ্টিকর পদার্থ স্বভাবতই থাকে বলিয়া দুগ্ধ শূন্যতাপের যে ডিগ্রীতে জমিয়া যায়, দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত থাকিলে তদপেক্ষা আরও সত্বর ঘটে। ডাক্তার হর্টভেট্ বহুদিন ধরিয়া নানা পরীক্ষা করিয়া এই সূত্রে যে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত জলের পরিমাণ অতি আশ্চর্য্য রূপে সঠিক ধরিতে পারা যায়।

৫। ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ।

যে দিন হইতে জানিতে পারা গিয়াছে যে মশকই ম্যালেরিয়ার বিস্তারের কারণ, সেই দিন হইতে স্থির হইয়াছে যে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ সাধনও মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। ভারতবর্ষের অনেক গ্রাম যদিও প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া যাইতেছে, তথাপি আজ পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করিবার জন্ম কোথাও প্রকৃত চেষ্টা হইতে দেখা যায় নাই। আমেরিকার কোন-কোন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু সে দেশের কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ আমাদের মত নিশ্চেষ্ট বসিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে না। ম্যালেরিয়া বিনাশ করিবার জন্ম তাহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। অনেক গ্রাম হইতে তাহারা ম্যালেরিয়াকে একেবারে নির্ব্বাসিত করিতেও সমর্থ হইয়াছে। তবে ম্যালেরিয়াকে দূর করা কিঞ্চিৎ ব্যয় সাপেক্ষও বটে। এই জন্যই বোধ হয় এখানে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে এখনও রীতিমত কোন অভিযান আরম্ভ হয় নাই—নিশ্চয়ই এই অজুহাতে, যে এ দরিদ্র দেশ অর্থাভাবে সে ব্যয়-বহুল ম্যালেরিয়া বিনাশের অভিযানের ব্যয়ও বহন করিতে পারিবে না। কিন্তু সম্প্রতি আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য-সভার অধ্যক্ষ ডাঃ উইক্‌লিফ রোজ (Dr. Wickliffe Rose) ম্যালেরিয়ায় নির্ম্মূলের এক সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিলে আমাদের দেশেও আশাতীত উপকার হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, গ্রামের লোকেদের কোমর বাঁধিতে হইবে। সকলে মিলিয়া সদলে এই কার্য্যে ব্রতী হইলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ম্যালেরিয়ার করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। প্রথমে সন্ধান করিয়া জানিতে হইবে, কোথায় ইহার সূতিকাগার। তারপর চেষ্টা করিতে হইবে, মশক প্রসবের সেই আধারগুলি নষ্ট করা। পঙ্কিল ও দুর্গন্ধময় নালা আর ডোবাগুলি পত্রপাঠ বুজাইয়া দিতে হইবে। গ্রামের পয়ঃপ্রণালীগুলি নিত্য পরিষ্কার রাখিতে হইবে। মজা ও হাজা পুষ্করিণীগুলির পানা ও পঙ্ক উদ্ধার করিতে হইবে এবং গ্রামের প্রত্যেক পুষ্করিণীটি খাল কাটিয়া পরস্পরের সহিত সংযোগ করিয়া দিতে হইবে,—যাহাতে জলের উপরে প্রচুর সূর্য্যালোক আসিয়া পড়িতে পারে এবং যাহাতে প্রত্যেক পুষ্করিণীর জল বরাবর একটা কুণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ক্রমাগত এককুণ্ড অন্যান্য কুণ্ডে সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বদা অবাধগতিশীল থাকে। বাটীর নিকট জঞ্জাল বা আঁস্তাকুড় রাখিবে না। পানীয় জল শোধন করিয়া লইবে। প্রতি মাসে একবার করিয়া পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। চুনা মাছ যাহাতে প্রত্যেক পুষ্করিণীতে অধিক পরিমাণে রাখিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করিবে। গ্রামের নোংরা জল ও ময়লাবাহী খানাগুলিতে মধ্যে-মধ্যে কলের তেল ঢালিয়া দিলে মশা নষ্ট হইবে। ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল, গ্রামের মধ্যে যত না থাকে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গ্রামের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীদের স্থানান্তরে পাঠাইয়া তাহাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চিকিৎসা করাইবে এবং ডাক্তার যতক্ষণ না উহাদের রক্ত পরীক্ষা করিয়া ম্যালেরিয়ার বীজ নষ্ট হইয়াছে বলেন ততদিন গ্রামে লইয়া আসিবেন না। সন্ধ্যার পর খোলা গায়ে থাকা বা গৃহের বাহির হওয়া বন্ধ করিতে হইবে, এবং শয়নকালে প্রত্যেকের শয্যায় মশারীর আবরণ রাখা আবশ্যক। এই সকল নিয়ম যথাযথ প্রতিপালন করায় আমেরিকার আরকান্সাস প্রদেশের একেট নামক গ্রামে এক বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন ভাগ ম্যালেরিয়া কমিয়াছিল এবং গ্রামবাসীরা স্বয়ং এই কার্য্যে ব্রতী হওয়ায় তাহাদের খরচ মাথা পিছু প্রত্যেকের ৩১০ আনার অধিক পড়ে নাই।

ছোট-ছোট গ্রামে উপরিউক্ত উপায়ে গ্রামবাসীরা সচ্ছন্দে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেখানে একটা জেলা বা সমস্ত পরগণায় ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—সেখানে এ ভাবে কাজ হওয়া বহু ব্যয়সাধ্য এবং সম্ভবপর নহে। এরূপ স্থলে ডাক্তার রোজ বলেন, প্রত্যেক গৃহস্থকে 'ঢাকা' ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ গৃহের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম তারে বোনা জাল দিয়া ঘিরিয়া

বর-[illegible]ন্ধর মঠ

বৌদ্ধ-জীবনীর খোদিত আলেখ্য

বুদ্ধ জাতকের খোদিত চিত্র

পদ্মাসনে ধ্যানস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি

মহাস্য বদন সিংহ মূর্ত্তি

গীর্জ্জার মত সজ্জিত বুদ্ধ স্তূপ

ঝুড়ী তৈয়ারী ছুতারের কাজ চিয়াড়ী বোনা

অন্ধগণের পরিচালিত জুতার কারখানা

পশু পক্ষী পালন সেবা শুশ্রূষা

সার আর্থার পীয়াসন

সেণ্ট ডান্‌স্টান্‌স্ আশ্রম

সমাধি নিষ্ক্রান্ত

বার-বিলাসিনী

সৈনিক

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক

পরলোকগত তিলক

জন্ম ১৮৫৬ সাল, ২৩শে জুলাই মৃত্যু - ১৯২০ সাল, ৩১শে জুলাই

শ্মশানে জনমণ্ডলী

এলাহাবাদে শোভাযাত্রা
(লোকমান্য তিলকের অস্থি প্রয়াগে গঙ্গায় লইয়া যাইবার সময়)

তিলক-তর্পণ !

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

ত্যাগের তিলকে দীপ্ত-ললাট,
দৃপ্ত তেজের নির্ভীক ঠাট্,
মারাঠার মহা-মহিমা বিরাট—
লভিল কি নির্ব্বাণ ?
হে লোকমান্য লোক-সম্রাট্ !
সাধনা যে তব স্বাধীন স্বরাট্,
হারাল কি আজ সেই রাজপাট
"কেশরীর" অভিমান ?

জন্মভূমির মোহ-মৃত্তিকা,
জাগাইলে যাহে জীবনের শিখা
বিঘ্ন-বিপদ বজ্র-ঝটিকা
সহিয়া অপরাজিত,-
স্তিমিত সে চিৎ-পবন স্পর্দ্ধা
স্তব্ধ বেদের গভীর তূর্য্য
জ্ঞান-মণ্ডিত ধ্যান-মাধুর্য্য
গৌরবে সমাহিত !

দীর্ঘ বরষ সহাস্য মুখে
কারা-যন্ত্রণা বহিয়াছে সুখে
নির্ব্বাসনেও অকাতর বুকে
সয়েছে দ্বীপান্তর !
বিদেশীর দ্বারে ভিক্ষার লাগি—
কভু আসে নি সে দেশ-বৈরাগী
দাসের উপাধি-কলঙ্ক মাগি
কলুষিত নহে কর !
বন্দীর গৃহ মন্দির যার,
শৃঙ্খল-ভার কণ্ঠের হার ;
নিগ্রহ ছিল সম্মান তার—
দণ্ড—পুরস্কার !
ক্ষুব্ধ ক্ষমতা, ঈর্ষ্যার গ্লানি
যাহার চরণে পরাজয় মানি,
বাহু বন্ধনে লয়েছিল টানি
বরষি অশ্রুধার !
বক্ষ যাহার লক্ষ আঘাতে,
ঘোর দুর্দ্দিনে দুঃখের রাতে,
টলে নি, কাঁপে নি,—শব-সাধনাতে
নির্ভয়ে ছিল রত।
ত্রিংশত কোটী উন্নত শির,
ইঙ্গিতে যার শান্ত অধীর ;
অবনীর সেই দুর্লভ বীর
বল্লভ-লোকে গত !
লোকহিত-ব্রত জীবনের কাজ,
ক্ষেম নিষ্কাম তাপসের সাজ ;
জন্মভূমির ধূলি যার তাজ—
দারিদ্র্য আভরণ ;
নিখিল-ভারত-চির-কল্যাণ
আজন্ম যার হৃদয়ের ধ্যান,—
স্বরাজ, স্বদেশ তপ-জপ জ্ঞান—
বিদেহ সে মহাজন।
জন্মদিনের অভিষেক দিতে
বন্দনা যবে উঠে চারি ভিতে,—
রোদনে ডুবায়ে বোধনের গীতে—
মরণে হানিল বাজ !

বাগ্রে যে দিন শুনিবারে দেশ
সবার উপরে তার উপদেশ,—
সেই পুরোহিত, দেশ-যজ্ঞেশ
অন্তর্হিত আজ !
বিবেক তাহার দৃঢ় অচপল ;
জ্ঞানের বারিধি অসীম, অটল ;
অমিত, দৃপ্ত অন্তর-বল
রাষ্ট্র-ধুরন্ধর !
নহে, তোষামোদজীবী, ভিক্ষুক,
হীন, কাপুরুষ, দীন, দুর্ম্মুখ,
অর্থ-লোলুপ,—চাহি নিজ-সুখ
পতিত স্বার্থপর !
সে ছিল সরল—শাণিত খড়্গ
দেবীর সেবায় সমুৎসর্গ,—
মাতৃপূজার অগ্নি-অর্ঘ্য,
পবিত্র হোমশিখা !
জ্যোতি কণা তার জীবন সভাতে,
মহাশক্তির দীপ্ত আভাতে,
ভারতের ভালে নূতন প্রভাতে
দিয়াছিল জয়-টীকা !
পুণা পুনার 'গণপতি'-মেলা,
ছত্রপতির উৎসব-খেলা—
নব জীবনের উন্মেষ-বেলা,
কে জানিত সেই দিন ?
ধ্বনিল যে দিন করিতে ধন্য,
দেশভক্তের তপ-অরণ্য,
ভগবদ্গীতা—পাঞ্চজন্য—
কর্ম্মযোগীর বীণ্ !
মৃত্যুঞ্জয় যাহার স্পর্শে
জেগেছে জীবন ভারতবর্ষে—
দেখায়ে গিয়াছে মহা-আদর্শে
কঠোর দণ্ড ভুগে !
স্বাধীনতা যার জীবন-তন্ত্র—
মুক্তির বাণী অভয় মন্ত্র
সে নহে কালের অধীন যন্ত্র
অমর সে যুগে-যুগে !

জন গণ-অধিনায়ক-প্রধান
দেশের সেবায় নিবেদিত-প্রাণ—
পেয়ে কত বাধা, শত অপমান—
দ'মেনি যে এক তিল—
প্রাণ-সঞ্জীব যাহার কর্ম্ম—
লোক-কল্যাণ চরম ধর্ম্ম—
জননীর প্রীতি অক্ষয় বর্ম্ম
সে নহে মরণ-শীল!
গিয়াছে সে চলি সাধি নিজ কাজ!
দাক্ষিণাত্য জ্যোতিঃ ঋষি-রাজ!
দধীচির মত 'অস্থি'র-বাজ
জাতিরে করিয়া দান!

অপূর্ব্ব তার স্বদেশ-ভক্তি
দিব্য তেজের অভিব্যক্তি
নিষ্ঠা-চরম, পরমা-শক্তি
অনন্ত-মহাপ্রাণ—
বুঝি কে সারথি ভুলিয়া ভারতে,
কোন দেবতারে এনেছিল রথে,
আজি পুনঃ তারে স্বর্গের পথে
ফিরাইয়া নিল সে যে!
উদ্‌গ্রীব হ'দে ত্রিদিব তাহারে
বরণ করিবে পারিজাত-হারে
লক্ষ্মীর করে স্বর্গের দ্বারে
শঙ্খ উঠিছে বেজে!

পুস্তক-পরিচয়

দেওয়ানজী

শ্রীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এই উপন্যাসখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চবিংশ গ্রন্থ। ইতিপূর্ব্বে এই গ্রন্থমালায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 'ব্রাহ্মণ পরিবার' প্রকাশিত হইয়াছে এবং সে গ্রন্থের যথেষ্ট আদর হইয়াছে, বর্ত্তমান উপন্যাসখানিও গ্রন্থকারের পক্ষ যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। গল্পের নায়ক দেওয়ানজীর চরিত্র আদর্শস্থানীয়, গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতার সহিত এই চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় বৃথা বাগাড়ম্বর নাই, বক্তব্য বিষয় অতি সহজ ও সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে।

রাখী বন্ধন

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য একটাকা

'রাখী বন্ধন' একখানি নাটক; গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের একজন প্রধান ও খ্যাতনামা অভিনেতা। তাঁহার ব্যবস্থিত 'ষ্টার রঙ্গালয়ে' এই নাটকখানি অভিনীত হইতেছে। দর্শকগণের মুখে ইহার যথেষ্ট প্রশংসাও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাই এ নাটকখানির বিশিষ্ট পরিচয়। গ্রন্থকার মহাশয়ও হয় ত এইটুকু পরিচয়েই সন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু পরিচয়দাতা তদতিরিক্ত আরও কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। এই নাটকখানির বিশেষত্ব আছে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ ধারণা আছে যে, নাটকের অন্ততঃ পাঁচটী অঙ্ক থাকাই চাই এবং প্রত্যেক অঙ্কের পাঁচ সাতটী গর্ভাঙ্ক না হইলে নাটকই হয় না। প্রহসন, গীতিনাট্যে অবশ্য এ আইনের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। অপরেশ বাবু এই নাটকখানিতে সেই চিরাগত পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়াছেন। এখন ইয়োরোপের নাট্যকারগণ গর্ভাঙ্ক বাদ দিয়াছেন এবং তিন অঙ্কে নাটক শেষ করেন। অপরেশ বাবু তাহাই করিয়াছেন; এবং তাহাতে ঘটনা সংস্থান ও বিষয়সৌন্দর্য্যের অণুমাত্রও ত্রুটি হয় নাই। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক নাটকের ঘটনা দশবার বৎসর, এমন কি নায়কের সমস্ত জীবনকাল নাটকের বিষয়। অপরেশ বাবু তাঁহার এই 'রাখী বন্ধনে' চব্বিশ ঘণ্টা কালমাত্র লইয়াছেন। এই চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা দ্বারাই একখানি সুন্দর নাট্যকাব্য গঠিত হইয়াছে। শেষ বিশেষত্ব এই যে গ্রন্থকার জগদ্বিখ্যাত সুলেখক ইবসেনের নাটকের আদর্শে রাখী বন্ধন রচনা করিয়াছেন। আদর্শ অতি উচ্চ, গ্রন্থকার সে আদর্শ ক্ষুণ্ণ করেন নাই। তাঁহার আরও কৃতিত্ব এই যে, যাঁহারা ইবসেনের নাটকের সহিত পরিচিত নহেন, তাঁহাদের কিছুতেই এ কথা ধরিবার যো নাই—ঘটনা এমনই দিশী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের নায়িকা বা বলিতে গেলে প্রধানতম ধারাবতীর চরিত্র যে ছায়া অবলম্বনে পরিকল্পিত, তাহা নীতিবিদের নিক্তিতে যাহাই বলুক মনস্তত্ত্বের হিসাবে মহা রহস্যময়। এই নাটকের মধ্য হইতে একটা স্থান মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতেই চক্ষুষ্মান পাঠক কথাটা ধরিতে পারিবেন। নায়িকা ধারাবতী একস্থানে বলিতেছেন—"সহধর্ম্মিণী নই, চন্দাবত যা বলেছে তাই; সহায় তার প্রণয়িনী। এ পাঁচ বৎসর এই রক্তমাংসের আবরণ তাকে দিয়েছি, কিন্তু এর অভ্যন্তরে যে প্রাণ তা তাকে দিইনি, দিতে পারি নি। কেন পারিনি—আজ তা বুঝতে পারছি; বুঝতে পারছি, আমার মনে মনে আত্মদান বিফল হয় নি,—তাই পারি নি—বুঝতে পারছি, আমার প্রথম দৃষ্টি যাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ করেছিল, সেই স্বামীই আমার পণ রক্ষা ক'রেছে,—তাই পারি নি; বুঝতে পারছি, যে রমণী-হৃদয় বিজয়ী স্পর্শ আমার অঙ্গে প্রথম উল্লাসের তরঙ্গ তুলে আমায় আত্মহারা করেছিল,—সে স্পর্শ তেজসিংহের নয়—তোমার—তাই পারি নি! বীরবল!

সেই জ্ঞানে ধর্ম্ম সাক্ষী, তুমিই আমার স্বামী তেজসিংহ নয়, আমি কেবল তার উপপত্নী।" নারী-হৃদয়ের এই যে রহস্য, ইহা পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে ভাবিবার কি কিছুই নাই? গ্রন্থকার অপরেশ বাবু সুকৌশলে এই জটিল রহস্য প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহার এই নাটকখানি নাট্য সাহিত্যে উচ্চতর স্থান পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজ যে সকল কথা ভাবিতেছেন লিখিতেছেন, 'বন্দনা' তাহারই অভিব্যক্তি। যিনিই এই নাটকখানি পড়িবেন, তিনিই গ্রন্থকার অপরেশ বাবুর ক্ষমতার প্রশংসা করিবেন।

SIVA CHHATRAPATI

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম এ প্রণীত; মূল্য আড়াই টাকা

এখানি ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। গ্রন্থের নাম দেখিয়া অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, ইহা মহারাষ্ট্র-কুলতিলক শিবাজীর জীবন চরিত। পক্ষান্তরে ইহা সম্পূর্ণ জীবন চরিত নহে, জীবন চরিত লেখকের উপাদান। যে সমস্ত কাগজপত্রের সাহায্যে শিবাজীর জীবন কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মধ্যে মারাঠী ভাষায় লিখিত সভাসদ বখর চিটনীস্ ও শিবদিগ্বিজয় অন্যতম। সুরেন্দ্র বাবু যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়া এই সভাসদ বখরের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা মারাঠী ভাষায় অভিজ্ঞ নহি; আমাদের অবলম্বন ইংরেজী অনুবাদ। সুরেন্দ্র বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাঠী ইতিহাসের অধ্যাপক, তিনি উক্ত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ। তাঁহার অনুবাদ আমরা নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করিতে পারি। সভাসদের ইংরেজী অনুবাদ পূর্ব্বেও হইয়াছিল, প্রথমে জগন্নাথ লক্ষ্মণ মানকর সভাসদের অনুবাদ করেন; প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরলোকগত ডাক্তার ভিনসেণ্ট স্মিথ ঐ অনুবাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন; মানকরের পুস্তক এখন আর পাওয়া যায় না। তারপর সভাসদ বখরের মূল সম্বন্ধেও অনেক গোল হইয়াছিল। রাও বাহাদুর কাশীনাথ নারায়ণ সেনা যে মূল সভাসদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র বাবু তাহারই ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। ইতিহাসাচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়, তাঁহার শিবাজীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত গ্রন্থে মূল সভাসদ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সুরেন্দ্র বাবু তাহা হইতেও অনেক সাহায্য লাভ করিয়াছেন; আমরা মারাঠী বখর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতাম না, সুরেন্দ্র বাবুর এই ইংরেজী অনুবাদ সে অভাব পূরণ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ, সুতরাং ইংরেজী ভাষাতেই লিখিত; আমাদের অনুরোধ যে সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার এই পুস্তকখানির বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করুন; তাহা হইলে ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকগণের বিশেষ উপকার হইবে।

গীতাতত্ত্ব

শ্রীঅটলবিহারী সিংহ বি-এস্ প্রণীত; মূল্য ১৷৹

কিছুদিন পূর্ব্বে তত্ত্ববিদ্যা সভার সাংবৎসরিক মহাধিবেশন উপলক্ষে শ্রীমতী য়্যানি বেসেণ্ট ভগবদ্গীতা অবলম্বন করিয়া চারিটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতাগুলি Hints on the study of the Bhagabat Gita' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারই প্রথম দুইটী বক্তৃতা 'মহাপ্রস্থান' ও 'গীতা-যোগশাস্ত্র' অটলবাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ বলা বোধ হয় ঠিক হইল না; কারণ, তিনি অনুবাদ উপলক্ষে অনেক স্থানে স্বাধীন ভাবেও আলোচনা করিয়াছেন। অটল বাবু যে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি যখন তাঁহার এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে দেখান তখন আমরা ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ এ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন।

জহান্ আরা

(ঐতিহাসিক চিত্র)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য পাঁচসিকা

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মোগলযুগের ইতিহাস বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেছেন, আমাদের 'ভারতবর্ষ' পত্রে সম্রাট্ আকবর সম্বন্ধে তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আকবরের জীবন চরিত বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেইজন্য তাঁহাকে অনেক অধ্যয়ন করিতে হইতেছে, অনেক যত্ন চেষ্টা পরিশ্রম করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইতেছে। এই উপকরণ সংগ্রহ উপলক্ষে তিনি যে সমস্ত তথ্য পাইতেছেন, তাহাই অবলম্বনে মধ্যে মধ্যে তিনি এক একখানি করিয়া ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত করিতেছেন। 'জহান্—আরা' তাঁহার সেই ঐতিহাসিক চিত্রের অন্যতম। ঐতিহাসিক প্রবর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকায় একস্থলে বলিয়াছেন "এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় শাহজহান্ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ে অথবা ইটালীয় মানুচীর গ্রন্থের বাজার গুজব, এবং প্রায় শতবর্ষ পরবর্ত্তী খাফিখাঁর অবিশ্বাস্য ইতিহাসের কাঁচা ভিত্তির উপর গাঁথা। সমসাময়িক রাজকীয় কাগজপত্র, চিঠি ও ব্যক্তিগত জীবনী অবলম্বনে আমার ইংরাজী গ্রন্থ 'আরঙ্গজীবের ইতিহাস' ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই সব উপাদান ব্রজেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে ব্যবহৃত হওয়ায়, সেই অতীত যুগের ভ্রাতৃদ্রোহী সমর, স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাত, বৃদ্ধ সম্রাটের চেষ্টা পরাজয়, বিলাপ যাতনা, কন্যার মাতৃতুল্য সেবা প্রভৃতির একটি দৃশ্যপটের মত মনোরম, অথচ বর্ণে বর্ণে সত্য ইতিহাস 'জহান আরা' আকারে বঙ্গ সাহিত্যের ভাণ্ডারে অর্পণ করা হইয়াছে।" আচার্য্য যদুনাথের এই কথা কয়টিই এই গ্রন্থের যথেষ্ট পরিচয়। আমরা এই গ্রন্থখানিতে জহান-আরার ন্যায় মহিয়সী মহিলার প্রকৃত মনোরম চিত্র পাইয়াছি; এমন পবিত্র জীবন যে ভাবে কলঙ্ক-লাঞ্ছিত হইয়া রঙ্গালয়েও

উপন্যাসের মাল-মসলা যোগাইয়াছিল, তাহা যে অপনীত হইল, ইহাই আমাদের বিশেষ আনন্দের কথা, এবং এইজন্যই রজেন্দ্রবাবু আমাদের ধন্যবাদভাজন। পুস্তকখানির রচনা-চাতুর্য্য ও ভাব বিন্যাস এতই সুন্দর যে, পড়িতে বসিলে গ্রন্থকারকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না; এক একটা চিত্র যেন আলোকচিত্রের ন্যায় চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান হয়; তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়। নীরস ইতিহাসকে বর্ণনা কৌশলে এমন মনোরম করা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক। সম্রাট শাহজাহানের 'জীবন সায়াহ্নের' বর্ণনা পাঠ করিতে-করিতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা সাহিত্যকে সুশোভিত করিবে, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

সরল স্বাস্থ্যরক্ষা

ডাক্তার শ্রীরাধন বসু, এম বি প্রণীত, মূল্য চারি আনা মাত্র

এই 'সরল স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বালক বালিকাদিগের জন্য লিখিত। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে এখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি অতি সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত; কতকগুলি কটমট বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা ইহাকে কণ্টকিত করা হয় নাই। যাহাদের জন্য ইহা লিখিত, তাহারা যাহাতে স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে পারে, তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ডাক্তার রাধাধন এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। বালক বালিকারা ইহা পড়িয়া এবং ইহার নির্দেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে, ইহাই আমাদের বাসনা। পুস্তকখানির মূল্য এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে যথাসাধ্য কম করা হইয়াছে।

বাদশা পিরু

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

এখানি উপন্যাস। নামটা একটু নূতন রকমের, গ্রন্থকার কিন্তু নবীন নহেন। তিনি সামাজিক গ্রন্থ প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত। তাঁহার 'প্রজাপতি' নামক উপন্যাসের পরিচয় প্রদান কালে আমরা সে কথা বলিয়াছিলাম। সমাজের কোন্ তত্ত্ব এই উপন্যাসে আলোচিত হইয়াছে, তাহার আভাস ইন্দিরার প্রথম পত্রেই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার ইন্দিরার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 'গরীবের ঘরে মেয়ে হয় কেন? হয়েই বা মরে না কেন? তিল তিল মরার অপেক্ষা আঁতুড়ে মরলেই ত শান্তি পায়। একটা মেয়ের এত জ্বালা, পাঁচটার তা হলে কি হয়?' ইহারই মর্ম্মভেদী কাহিনী বাদশা পিরুতে আছে। লেখক একেবারে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন; তাই ইহা এমন প্রাণস্পর্শী হইয়াছে।

দুই বোন্

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা

এখানি প্রকাণ্ড একখানি সামাজিক উপন্যাস। গ্রন্থকার যে আমাদের পল্লীসমাজ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাহা এই পুস্তকখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। বড়ই সুখের ও আশার কথা যে, আমাদের দেশের কৃতী ঔপন্যাসিকগণের দৃষ্টি এক্ষণে আমাদের পল্লী-সমাজের উপর নিপতিত হইয়াছে। বইখানি বড় হইলেও ইহাতে এত ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে এবং এত অধিক পাত্রপাত্রী আনীত হইয়াছে যে, অনেক সময় বসিয়া ভাবিতে হয়। তখন মনে হয়, গ্রন্থকার এই প্রায় চারিশত পৃষ্ঠার মধ্যে এত অধিক চরিত্রের সমাবেশ না করিলেই ভাল করিতেন, অথবা গ্রন্থখানি আরও একটু বড় করিলে বেশ হইত। গ্রন্থকার রোহিণীর চরিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। রোহিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মূর্ত্তি, পৃথিবীতে পাপীদের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন এবং নন্দলালকে উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি।

প্রবন্ধ-মালা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা

পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই অতি বৃদ্ধ বয়সেও দার্শনিক তত্ত্ব লইয়াই আছেন; এখনও মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁহার গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধমালায় কিন্তু আধুনিক কোন প্রবন্ধই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা তাঁহার যে সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম, সেগুলি এতকাল যে কেন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতাম না। এতদিন পরে দেখিলাম, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন এবং সেই বহুকালের হীরার টুকরাগুলি মালা বদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গলায় দোলাইয়াছেন। এই প্রবন্ধগুলি আমরা যখন পড়িতাম, তখনও আমাদের যেমন আগ্রহ ছিল, এতকাল পরে পুনরায় পড়িয়াও সে আগ্রহ মিটিতেছে না, বারবার পড়িতে ইচ্ছা হইতেছে। এমন সুন্দর, এমন জ্ঞানগর্ভ, এমন সরল অথচ প্রাণস্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধগুলির আবার কি পরিচয় দিব? ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে বিরাজ করা উচিত, এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস করিবেও।

কাব্যমালা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা

এই সংগ্রহ-পুস্তকের কবিতাগুলি পূজনীয় ঠাকুর মহাশয়ের রচনা। কিন্তু এই সময়কার সকল কবিতাই এই কাব্যমালায় স্থান পায় নাই। প্রকাশক মহাশয় বলিতেছেন, সেগুলির আর খোঁজ-খবর পাওয়া যাইতেছে না। বড়ই দুঃখের কথা। যাহা হউক, এই কাব্য-মালায় যে কবিতাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই জন্য আমরা প্রকাশক মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি যদি সংগ্রহ না করিতেন, তাহা হইলে হয় ত ইহাও আমরা পাইতাম না। 'পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম' একেবারে অতুলনীয়। উপনিষদের গভীর বাণীর এমন প্রাঞ্জল ও মধুর অনুবাদ যে হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতাম না। প্রকাশক মহাশয় এই

অনুবাদও বর্ত্তমান কাব্যমালার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এমন উপভোগ্য কাব্যমালা বাঙ্গালা সাহিত্যে দুর্ল্লভ বলিলেই হয়।

গুপ্ত উপন্যাস

শ্রীতারাকান্ত কাব্যতীর্থ সঙ্কলিত, মূল্য দুই টাকা

এই 'গুপ্ত-উপন্যাস' উপন্যাস নহে, ইহা ডিটেক্‌টিভের গল্পও নহে, বর্ত্তমান প্রেম কাহিনীও নহে। ইহা সেকালের গল্প উপন্যাস। আমরা ছেলেবেলায় যাহা শুনিয়া প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিতাম, কাব্যতীর্থ মহাশয় সেই ছেলেবেলার গল্পগুলির মধ্যে কয়েকটী সাজাইয়া গোছাইয়া এই গুপ্ত উপন্যাস লিখিয়াছেন। মাতুল ও ভাগিনেয়, পথিক শুকদেবে সত্যরাজ প্রভৃতি অনেক সরল উপন্যাস ইহাতে আছে। সকলগুলিই উপভোগ্য, সকলগুলিই সুন্দর; কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টার নাম করিব? তাহার পর শ্রীযুক্ত কাব্যতীর্থ মহাশয়ের ভাষা অতি মনোরম; কেমন করিয়া গল্প বলিতে হয়, তাহা তিনি বেশ জানেন। সুতরাং তাঁহার এ পুস্তকের আদর হইবে।

অনাথ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ প্রণীত, মূল্য এক টাকা দুই আনা

বহুদিন পূর্ব্বে যখন 'মুকুল' নামক ছেলেমেয়েদের মাসিক পত্রে 'অনাথ' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইত, তখন আমরা এই গল্পটী বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করিতাম। আমাদেরই যখন আগ্রহ হইত, তখন ছেলেমেয়েদের যে অধিক আগ্রহ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। লেখিকা মহোদয়া সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠা, এই অনাথ তাঁহার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। আমরা সকলকে, বিশেষতঃ কিশোর কিশোরীদিগকে এই সুন্দর পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

শিশু পালন

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি সম্পাদিত, মূল্য আট আনা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক; সুতরাং শিশু পালন সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিবেন, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া লইবেন; এবং তাহার উপযোগিতা ও কার্য্যকারিতাও কেহ অস্বীকার করিবেন না। ডাক্তার বসু এই পুস্তকখানি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিয়াছেন, কোন স্থানেই দুর্ব্বোধ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের অবতারণা করেন নাই; সমস্ত আবশ্যক কথা বেশ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গোড়াকার শিশুদের খেলাধূলার চিত্রখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তকখানি আমাদের দেশের বালিকা বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

বারীন্দ্রের দ্বীপান্তরের বাঁশী

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত, মূল্য এক টাকা

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমারের পরিচয় সকলেই জানেন। তিনি মাণিকতলার বোমার মামলায় দ্বীপান্তরিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি মুক্তিলাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই বাঁশী নিশ্চয়ই বারীন্দ্রকুমার দ্বীপান্তরে বসিয়া বাজাইয়াছিলেন; আমরা বহুকাল পরে সৌভাগ্যক্রমে সেই বাঁশীর স্বর শুনিতে পাইলাম। 'সৌভাগ্য' কথাটা বড়ই ঠিক, কারণ এখনকার দিনে এমন করিয়া প্রাণ ঢালিয়া বাঁশী বড় বেশী লোকে বাজান না। আমরা এ বাঁশীর কবিত্ব দেখিতেছি না, ছন্দ দেখিতেছি না—শুধু দেখিতেছি বাঁশী-বাদকের প্রাণের উন্মাদনা—শুধু দেখিতেছি ভাবের অকৃত্রিমতা। সে হিসাবে এই দ্বীপান্তরের বাঁশী যে সুন্দর বাজিয়াছে, এ কথা বলিতেই হইবে।

কিরণের কথা

[শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু, বি-এ]

(১)

লীলা চা তৈরি শেষ করিয়া টেবিলের এক কোণে বসিল। কিরণ অন্যমনস্ক ভাবে একখানা ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া লইয়া একটা ছবি আঁকিতেছিল।

"চা যে জুড়িয়ে গেল।"

"ও—"

দুই চামচ চা খাইয়া কিরণ আবার ছবিতে মন দিল। লীলা উঠিয়া আসিয়া, হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইয়া, কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

"কার ছবি আঁকা হচ্ছিল, দেখলে, অমন কোরে ছিঁড়তে না।"

"দেখেছি।"

"ওটা কিন্তু ভারি সুন্দর হ'ত।"

"থাক্, থাক্,—আর কি ছবির লোক নেই ?"

"তুমি যে কখনো পুরোনো হও না লীলা,— তোমার দিনে-দিনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন কোরে দেখি।"

"খুব হয়েছে, চুপ কোরে চা খাও দেখি— ।"

কিরণ আবার তিন চামচ চা খাইয়া, আর একখানি ছেঁড়া কাগজ মেজে হইতে কুড়াইয়া লইয়া, আড় চোখে মুচ্‌কি হাসিয়া, লীলার দিকে চাহিল ;—তার পর লিখিতে লাগিল, "তুমি কখনও কি—"

ততক্ষণে লীলা টেবিল কাঁপাইয়া, চেয়ার ছাড়িয়া, কিরণের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; সে কিরণের হাত হইতে পেন্সিল কাড়িয়া লইয়া নীচে লিখিল, "কি—"

পকেট হইতে আর একটি পেন্সিল বাহির করিয়া কিরণ তাহার তলায় লিখিল, "আমার হবে—"

লীলা উত্তর লিখিল, "হয়েই ত আছি—"

তাহাদের খেলা চলিতে লাগিল। কিরণ লিখিল, "আর আমি—"

"আমারই—"

"তুমি বুঝতে পারছ না—"

"খুব পারছি—"

"কিন্তু দেখো—"

লীলা বড় বড় অক্ষরে লিখিল, "না—"

কিরণ আর লিখিতে পারিল না। লীলা আবার কাগজখানি টানিয়া, কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া টেবিলে গিয়া চা খাইতে বসিল।

লীলা বলিয়া উঠিল, "চিনির কাপ্‌টা সরিয়ে দাও না! তোমার চিনি কম লাগছে না ?—তোমার জন্যে চা'টা জুড়িয়ে গেল—!"

কিরণ চিনির পেয়ালা আগাইয়া দিল। তার পর দুই জনেই স্তব্ধ,—শুধু চা পানের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

"ও কেক্‌টা আবার কার জন্যে রাখা হচ্ছে ? নাও, খেয়ে ফেল—।"

কিরণ আবার কেক্‌টা টানিয়া খাইতে লাগিল।

"আর এক slice রুটি দেব ?"

কিরণ অস্ফুট স্বরে বলিল, "না।"

লীলার খাওয়া তখনো শেষ হয় নাই,—কিরণ টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় আবার যাওয়া হবে,—এক্ষুনি ঝড় আসবে।"

কিরণ জানালার কাছে আসিয়া, বৈশাখী সন্ধ্যার ঝড়ের আকাশের দিকে শূন্য নয়নে তাকাইয়া রহিল। ছাদের পর ছাদ, তার পর ছাদ,—তাহার উপর কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। এই বুঝি ঝঞ্ঝার ডমরুধ্বনি বাজিয়া উঠে, বিদ্যুতোৎসব আরম্ভ হয়, বন্যা নামিয়া আসে!

লীলার দিকে না তাকাইয়া অস্ফুট স্বরে কিরণ বলিল, "একটু বেড়িয়ে আসি"—বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

লীলা কাতর স্বরে বলিল, "কিন্তু ভিজে' অসুখ কোরলে তুমি ত একা ভুগবে না—।"

কিরণের পদশব্দ যখন মিলাইয়া গেল, তখন লীলা শূন্য ছাদে বাহির হইয়া, একখানা চেয়ারে নির্জীবের মত বসিয়া পড়িল। আধ-কাপ চা, রুটি, কেক্ টেবিলে পড়িয়া রহিল। ত্রস্ত পাখীর সারি উড়িয়া চলিয়াছে ; তপ্ত তাম্রবর্ণ আকাশ স্নিগ্ধ কালো রূপ ধরিতেছে। বিদ্যুৎ বিদীর্ণ, সলিল-গর্ভ পুঞ্জীভূত মেঘের প্রতি চাহিয়া লীলা ভাবিতে লাগিল : তুমি কি—এ প্রশ্নের উত্তর কোথায় ?

(২)

কিরণ জানিত, লীলা এই উত্তরই দিবে। তবু—এই "তবু" আলেয়ার আলোটা জীবনে এমন পথভুল করিয়া দেয়! লীলার সহিত তাহার ছোটবেলা হইতে জানা-শুনা। লীলার দাদা স্কুলে তাহার সহপাঠী ছিল ; এবং এখনও এই বোন্‌টির প্রেমের রসে দুই বন্ধুর যোগ অম্লান, সরস রহিয়াছে।

কিরণের মনে পড়িল, সেই ছেলে-বেলায় প্রথম যেদিন সে লীলার দাদার সহিত তাহাদের বাড়ী যায়,—লীলা বিনা কারণে তাহার দাদার পড়ার-ঘরে আসিয়া, কোঁকড়ানো চুল দুলাইয়া, লাল ঘাঘ্‌রা ঘুরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে-রাতে বাড়ী ফিরিয়া কিরণের ভাল ঘুম হয় নাই। সে বার-বার বালিসে মুখ গুঁজিয়া ভাবিয়াছিল, লীলা কেন তাহার বোন্ হইয়া জন্মে নাই—তাহার নিজের কোনো বোন্ ছিল না। তাহার পর ধীরে-ধীরে মনে পড়িল, কেমন করিয়া একদিন দুই-জনের মাঝখানে ছেলেমানুষী সঙ্কোচের পর্দাটা হঠাৎ ছিঁড়িয়া গেল,—আর এক ছেলে-মানুষী ভালবাসা জমিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার এক জন্মদিনে

লীলা দাদাকে কত বলিয়া এক রঙের-বাক্স উপহার দিয়াছিল। সেই হইতে তাহার ছবি আঁকা সুরু। তার পর নয় বছর ধরিয়া কত গল্প গান, কত ছবি-আঁকা, ছবি-ছেঁড়া, কত কথা-কাটাকাটি, কথা-বাধাবাধির মধ্য দিয়া এই দুইটি জীবন জড়াইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই কিশোর-কিশোরীর তরী দুইখানি পাশাপাশি ভাসিয়া, যৌবনের ঘাটে আসিয়া হঠাৎ থামিল। প্রভাতের রঙিন আলোয় যাহারা স্বপ্ন লোকের মাঝখান দিয়া বাহিয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহারা মুখে-মুখে চাহিয়া দাঁড়াইল; ভাবিয়াছিল, তাহাদের পাল বুঝি এক, হাল বুঝি এক;—এবার যে বোঝা-পড়ার সময় আসিল। দুই তরীর মাঝে জলের গর্জ্জন যে বাড়িতেছে, ব্যবধান যে বড় হইতেছে,—এবার হালে-হালে, পালে পালে এক করিয়া এক দাঁড়ে না টানিলে, সম্মুখের অকূল সমুদ্রের উর্ম্মি উন্মাদনার কোন্ স্রোতে কে ভাসিয়া যাইবে।

কিরণ তাই বাঁধিতে চায়, কিন্তু লীলা যে চায় না। কিরণ আজ এক বিখ্যাত ভারতীয় চিত্রশিল্পী; রঙের পর রঙ গুলিয়া, তুলির পর তুলি বুলাইয়া, সে বিশ্বের মর্ম্মাধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য্যময়ীর সন্ধানে চলিয়াছে।—লীলা সেই সন্ধানের পথে আসিয়া দাঁড়াইতে চায় না। কিরণ মাঝে মাঝে ভাবিত, হয় ত সে, অজন্তা-গুহায় যাহারা চিত্র আঁকিয়াছে, সেই শিল্পীদলের মধ্যে ছিল,—তা না হইলে ভারতের অন্তরবাসিনী সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী তাহাকে এমন করিয়া মুগ্ধ করিল কেন? কোন্‌টা সত্য—সেই মানসী, না লীলা?

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে,—কালো মেঘের ফাঁক দিয়া দুই তিনটি তারা অন্ধকার, বিজন মন্দিরের পূজারতির প্রদীপের মত জ্বল-জ্বল করিতেছে। রাত্রি তখন বারোটা,—লীলা তাহার ডায়রীতে লিখিল—

"না। ব্যথা পেলে,—তোমায় আমি ব্যথা দিতেই চাই। যে হাতে তোমার হাতে রঙের তুলি তুলে দিয়েছি, সে হাতে ফুলের মালা পরানো যায় না যে! আজ যে তুমি নিছক সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা কোরছ, ও রঙের মায়া কাটিয়ে, নারীর রূপের স্বপ্ন ভেঙ্গে, কবে তুমি বেরুবে—মানব-অন্তরের বেদনাকে মূর্ত্তিমতী কোরবে! বাঁশকে কেটে, দগ্ধ শলাকা দিয়ে পুড়িয়ে, গর্ত্ত না কোরলে বাঁশী বুঝি হয় না,—হৃদয়কে না ফাটালে গান বুঝি ঝরে না,—রঙের সঙ্গে প্রাণের রক্ত না মেশালে রাত্রি শেষের ঊষার আলোককে আঁকতে পারা যায় না! তোমার কলা-লক্ষ্মীর পাশে আমি আসন গ্রহণ কোরতে চাই না, এই আমার পণ। শিল্পি, বেদনার পর বেদনা দিয়ে তোমায় জাগিয়ে তুলবো।"

খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে, সে কিরণের বাড়ীর ছাদের দিকে তাকাইয়া রহিল। আকাশের তারাদলের মত তাহার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

(৩)

ইহার পর তিন মাস কাটিয়া গেছে। শ্রাবণের মেঘাবগুণ্ঠিত দিনটি সন্ধ্যার তীরে আসিয়া সহসা ছিন্ন মেঘের স্তূপে, অরুণ-আলোর লীলায় অপরূপ আভা মণ্ডিত।

লীলা ছাদে বসিয়া সেই সোণালি-আলোয় ব্রাউনিংএর Paracelsus পড়িতেছিল,—কিরণ ধীরে আসিয়া ঢুকিল। লীলা আপন মনে পড়িতে লাগিল। কিরণ ছাদের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া, লীলার সাম্‌নে একখানি চেয়ারে বসিল।

"এবার শেলি ছেড়ে ব্রাউনিংএ পেয়েছে—"

বই হইতে মুখ না তুলিয়া লীলা বলিল, "বেশ ভাল লাগে, যদিও কিছু বুঝি না।"

কিরণ চুপ করিয়া বসিয়া পাঠনিরতা লীলাকে ও পশ্চিম-গগনের মেঘ-শয্যায় সূর্য্যের বিকার দেখিতে লাগিল।

সূর্য্যের শেষ স্বর্ণবিন্দু স্তব্ধ ঘন মেঘে মিলাইয়া গিয়াছে। আকাশের এক কোণে একটি তারা জ্বলজ্বল করিতেছে। লীলা বইখানি টেবিলে রাখিয়া উঠিল।

"একটা আলো নিয়ে আসি।—আচ্ছা, তুমি এই Paracelsus-এর মৃত্যু-শয্যার একখানা ছবি আঁকো না!"

"থাক্, আলো আনতে হবে না—তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে—।"

কিরণের স্বর শুনিয়া লীলা বসিল। সে বুঝি আজ একটা বোঝা-পড়া করিয়া লইতে চায়।

লীলা হাসিমাখা সুরে স্তব্ধতা ভাঙ্গিল, "আমার শিল্পীর খবর কি?"

"ঠাট্টা রাখো, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

হাসিভরা চোখে কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া লীলা বলিল, "কি তোলো আবার।"

কিরণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর

বলিল, "লীলা, সত্য কথা বলো দেখি। আচ্ছা, তোমার ভয় কি, আপত্তি কি?"

"আবার! এই তিনবার গেলো; দেখো, তুমি যে ছেলেমানুষটি এসেছিলে, তা নেই। এবার বল্লে কথা বন্ধ।"

"না, আজ আমায় একটা জবাব দাও,—আমি আর দোলায় দুলতে পারি না।"

"কি সেন্টিমেন্টাল তুমি—"

"তোমার লীলা রাখো, লীলা! আজ আমি শেষ বোঝাপড়া কোরব, না হলে—"

"না হলে কি?—দেশত্যাগী হবে? সন্ন্যাসী হবে? সে ভয় নেই—"

"সে ভয় নেই বলেই তো আমায় এমি কোরছ!"

"কি করছি?"

তার পর টেবিলের উপর হইতে কিরণের হাতটি তুলিয়া লইয়া, আদরের সহিত হাসিয়া বলিল, "আমরা দু'জন বন্ধু. কি বলো? মনে নেই, সেই আট-বছর আগে দাদা যখন আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়,—আমরা কি সম্পর্ক পাতিয়েছিলুম? বলেছিলুম, যে সে সম্পর্ক প্রথম ভাঙ্গবে সে যেন—"

"থামো লীলা, থামো। আচ্ছা, আমি প্রথম ভাঙ্গছি, —কি কোরবে তুমি করো।"

লীলার মুখ কালো হইয়া গেল। সে ভাঙ্গা স্বরে বলিল, "কিরণ!"

"লীলা!"

"কি বলছিলে বলো—"

"তুমি সুখী হবে না?"

"হয় ত—"

"আচ্ছা তুমি আমায়—"

"সেই জন্তেই তো রাজি হচ্চি না—"

"ওঃ, আবার তোমার হেঁয়ালি!"

"হেঁয়ালি নয়,—তবে শোনো বলি। তোমাকে আমি এতটা শ্রদ্ধা করি যে, তোমার স্বপ্নকে আমি ভাঙ্তে চাই না—।"

"ওঃ, তোমার পূজার কি শেষ হবে না—ঠাট্টা?"

"ঠাট্টা নয়,—তোমায় আমি সত্যি এত ভক্তি করি যে, আমরা যদি মিলি, আর তুমি যদি খুব ব্যথা দাও, দুর্ব্ব্যবহার করো, তবু তুমি আমায় অসুখী কোরতে পারবে না। কিন্তু দেখো,—"

"আবার 'কিন্তু'! আচ্ছা, আমি তর্ক কোরব, কি বলো?"

"হাঁ, আজ আমি সব বোলবো। তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে বাধলে, তুমি আমার জন্যে ত্যাগ করতে আরম্ভ কোরবে—তোমার রঙের উৎসের ওপর আমি পাথর হয়ে থাকব, সে আমি সইতে পারব না—।"

"সে ত খুব সুন্দর জিনিষ। জানি, দুটো স্বাধীন মনকে এক গেরোয় বাঁধতে গেলে, দুজনের স্বাধীনতা একটু কমে আসে।—দু'জনে ত্যাগ কোরে মিলবে, দুজনেই ছাড়বে, তবেই ত তাদের সত্যি ভালবাসা প্রমাণ হবে—"

"সেটা আমি মোটেই চাই না।"—

"তুমি কেবল সাফ্রাজিষ্টদের বাঁধা বুলি বোলছ - তাদের কথার প্রতিধ্বনি কোরছ।"

"হয় ত—"

"হয় ত নয়, তুমি সত্যি ভেবে বলো—"

"দেখো, আমরা দু'জনেই এত বিভিন্ন—"

"আবার সাফ্রাজিষ্ট্ সাহিত্যের বাংলা তর্জ্জমা—"

"তুমি জানো, মাঝে মাঝে আমার অশান্ত 'আমি' জেগে ওঠে, তখন আমায় সেটাকে দলে পিষে মেরে ফেলতে হবে, আর—"

"তুমি বলতে চাও,—আমার অনেক-খানিটা তোমার ভালো লাগে, অল্প-খানিকটা পছন্দ হয় না—"

"তুমি কাতর হয়ো না। আমি জানি আমার চেয়ে তুমি কত বড়। আমার জন্যে তোমাকে ছোট কোরে টেনে আন্তে পারবো না। তুমি বুঝছ না—"

"না, তোমার হেঁয়ালি কোনো কালে আমি বুঝব না।"

"দেখো, আমাদের দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্ব বড় সুস্পষ্ট। আমরা প্রত্যেকে বিশেষ,—প্রত্যেকেরই জীবনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য, আদর্শ, সাধনা আছে—"

"সেই জন্তেই তো তোমায় ভালোবাসি—"

"সেই জন্তেই তো আমরা মিলতে পারি না—"

"এত লোক মেলে কি কোরে?"

"জানি না,—হয় ত সব ফাঁকি দিয়ে—"

"তবে তুমি আমায় চাও না?"

লীলা কিরণের হাত ছাড়িয়া করুণ সুরে বলিল, "মেনে নাও, ভাই।" তার পর থামিয়া বলিল, "না কিরণ, আমায় একটু ভাববার সময় দাও, কাল বোলবো।"

মাথার উপর নীলাকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে. শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র হইতে পূর্ব্বদিকের পুঞ্জীভূত মেঘের দলে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে,—দুইজনে মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। লীলার যখন চমক ভাঙ্গিল,—সামনের চেয়ার, চাহিয়া দেখিল, শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। ভিজে ছাদে নতজানু হইয়া চেয়ারের উপর মাথা গুজিয়া সে পড়িয়া রহিল। চোখের তটে যে অশ্রুর বান রুদ্ধ ছিল, তাহা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

(৪)

সারারাত্রি বিছানায় ছটফট করিয়া, কিরণ ভোর বেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কি একটা স্বপ্ন দেখিয়া যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। উঠিয়া কি করে ভাবিয়া পাইল না। টেবিলে একটা অ্যালবাম ছবি পড়িয়া ছিল; সেইটা লইয়া বসিল। ছবিখানা হাতে লইয়া বসিল, ছবি আর বুলাইল না। সহসা দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল, লীলা সিঁড়ি দিয়া তাহার ঘরের দিকে উঠিয়া আসিতেছে। সে ভাবিল, এ কি ভ্রম! যদিও এই মূর্ত্তিটিই সারারাত্রি ধরিয়া, ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুমের মধ্য দিয়া বার-বার আসিয়াছে, তবু দিনের আলোয় যে এরূপ ভ্রম হইতে পারে, তাহা সে ভাবে নাই। উঠিয়া দরজার কাছে যাইতেই দেখিল, সত্যই লীলা আসিয়াছে।

লীলা আসিয়াছে! তবে কি সে গত সন্ধ্যায় যা কিছু বলিয়াছিল, সব মিথ্যা, সব মায়া- সব তার লীলা! কিরণ আনন্দের আতিশয্যে তাহার দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু দরজার গোড়ায় থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি লীলার সাজ! নগ্ন পদ, শুষ্ক মুখ, রুক্ষ কেশ,—ঝড়ে-ছেঁড়া লতার মত! অপরূপ আঁখি দুটি এমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, এমন কালো ছায়াময় কেন? সেও কি কিরণের মত সারারাত্রি জাগিয়াছে? লীলা উন্মাদের মত আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া, সামনের এক চেয়ারে নির্জীবের মত বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার কালো মুখের দিকে চাহিয়া কিরণের কণ্ঠ শুকাইয়া গেল, স্বর বাহির হইল না। অতি কষ্টে ভাঙ্গা গলায় বলিল, "লীলা, কি হয়েছে?"

"দাদাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"কি?—কে?-"

"পুলিসে।"

কশাহত অশ্বের মত কিরণের সর্ব্ব দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর লীলা কিছু সুস্থ হইলে, কিরণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কখন?"

"আজ ভোর বেলা।"

"তুমি এমন কোরে এলে কেন,—একটা খবর পাঠালে পারতে! তোমার মাকে একলা ফেলে এলে? তুমি একটু বিশ্রাম কোরে নাও, আমি একটা গাড়ী ডাকতে বলি।"

"না, সে কিছুতেই হবে না,—আমাদের বাড়ীতে তোমার যাওয়া অসম্ভব!"

"কি বলো লীলা, তোমার মার কাছে আমার যে এখন যাওয়া চাই-ই। কাল রাত্রির কথা সব ভুলে যাও এখন -"

লীলার মুখে কে যেন চিপটির পর চিপটি মারিল। সে অতি জোরের সহিত আপনাকে দমন করিয়া বলিল, "আমি ভেবেছিলাম, পুলিস তোমার এখানেও এসেছে বুঝি, তাই ছুটে এলাম। আমাদের বাড়ীতে তোমার কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না—পালাও, তুমি পালাও--"

অদম্য আবেগে সে চেয়ার হইতে উঠিয়া কিরণের পাশে ছুটিয়া আসিল। তাহার হাত দুটি ধরিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিয়া উঠিল, "তুমি শীগ্‌গীর পালাও ভাই, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, কথা শোনো! পুলিস যে এখনও তোমার বাড়ী আসেনি— আশ্চর্য্য! আজ না এলে, কাল আসবে। দাদাকে যখন ধরেছে, তোমায় ছাড়বে না,—এক্ষুনি যাও তুমি।"

কিরণ মন্ত্রাহতের মত দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। এ যেন লীলার স্বর নয়,- যেন কোন্ দূর অজানা লোক হইতে করুণ কণ্ঠের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

লীলা আবার আপনাকে সংযত করিয়া, শ্রান্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কিরণ বলিল, "এমন সময় তোমাদের ছেড়ে আমি কেমন কোরে যাবো? আর, তুমি মিছে ভয় কোরছ।"

"মিছে ভয় নয়। দাদাকে যখন ধরেছে, তোমায় নিশ্চয় ধরবে। তোমাদের বই, লেখা খাতা সব নিয়ে গেছে, আমার বাক্স শুদ্ধ search হয়েছে। তোমার চিঠির তাড়া নিয়ে

গেছে। আর ঘরময় জিনিসপত্র উল্টে, বই, কাগজ, কাপড় ছড়িয়ে, একাকার কোরে গেছে।"

"কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই।"

"Intern কোরতে প্রমাণের দরকার হয় না।"

"কিন্তু তোমার মাকে—তোমাদের--"

"আমার জন্যে ভাবনা নেই, মাকে আমি দেখব। আর তুমি ত আমাদের দেখতে পারবে না,—কেন জেলে পচবে! আর যদি solitary cellএ রাখে—"

লীলার মাথার কেশগুচ্ছ ফুলিয়া উঠিল,—সারা দেহ ক্ষোভে, ক্রোধে, শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল।

"তুমি কি কোরতে বলো?"

"আমি ত বল্‌ছি পালাতে।"

"পুলিসের হাত থেকে কোথায় পালাবো? না, আমায় একটু ভাববার সময় দাও।"

"ভাববার সময় নেই,—পণ্ডিচারী যাও, চীন-জাপান যেখানে হয় যাও,—আফ্রিকার জঙ্গলে যেতে পারো, South seaর দ্বীপগুলোয়—ভারত ছেড়ে পালাও।"

"না, আমায় একটু ভাববার সময় দাও। চলো, তোমার মাকে একবার দেখে আসি---"

"আচ্ছা, একটিবার ভাই,—আমি তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি,—তুমি একটু বিশ্রাম কোরে নাও।"

সেইদিন এক তরুণ যুবক এক তরুণীর নিকট বিদায় লইয়া, জগতের বিচিত্র দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িল। যাবার সময় কিরণ লীলাকে জীবনের প্রথম চুম্বন করিয়া গেল। সে কি লীলাকে চুম্বন,—সে বাংলার তরুণী প্রাণকে চুম্বন!

(৫)

ইয়োরোপগামী ইটালিয়ান জাহাজে কিরণ পলাইতেছে। ডেকের উপর আকাশ, বাতাস, আলো, জলের খেলা দেখিয়া তাহার দিন কাটে। শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজখানি উড়িয়া চলিতেছে,—যেন সুনীল তরঙ্গায়িত পথ দিয়া কোন্ নৃত্যময়ী অভিসারিকা সুদূর দেশের সন্ধানে চঞ্চল পদে ছুটিয়াছে। প্রতিদিন প্রভাত সূর্য্য স্বর্ণতুলি দিয়া তাহার পথে স্বপ্নছবি আঁকে। রাত্রির তারারা তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যায়। তাহার পদতলে শুভ্র পুষ্পময় সাগর কাঁপিয়া, দুলিয়া দিনে-রাতে কখনো ভৈরবী সুরে, কখনো মল্লার তানে গান শোনায়।

একটা তুলি ও কাগজ লইয়া কিরণ সন্ধ্যার সময় ডেকে বসিয়া ছিল। গলিত স্বর্ণের মত সিন্দুর সহিত অরুণ বর্ণ আকাশ এক হইয়া পশ্চিম-গগন-কোণে মায়াদেবীর আলয় সৃষ্টি করিয়াছে,—সেই দিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। প্রতিদিন সে তুলি লইয়া বসে,—কিন্তু ছবি আর আঁকা হয় না। অসীম সাগরের শান্ত জলেও তাহার মন স্নিগ্ধ হইতেছিল না। কেন সে লীলাকে ছাড়িয়া আসিল,—তাহার দেশকে ছাড়িয়া আসিল? এই কি মুক্তি! নির্জ্জন কারাগারবাসে মুক্তি ছিল,—আজ যে আনন্দময় বিচিত্র পৃথিবীতে তাহার মুক্তি নাই, জগৎ-জোড়া কারাগার কেন আপনার হাতে সে গড়িল! জাহাজটা যদি আবার বাংলায় ফিরিয়া যায়, সে বাঁচে!

সহসা তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পাইল। একটি মধুর কণ্ঠ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল,—"আপনার বুঝি আর ছবি আঁকতে ভাল লাগছে না।" মুখ তুলিয়া দেখিল, একটি বিদেশিনী যুবতী তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

"ধন্যবাদ, আমি একটু বেড়াচ্ছি—"

তার পর দু'জনে সন্ধ্যা-সাগরের দিকে চাহিয়া, রেলিংএ ঠেস দিয়া দাঁড়াইল।

বিদেশিনীটি বলিল, "আপনি আর্টিষ্ট বুঝি?"

"রং গুলে খেলা করি।"

"আপনাকে আরো তিনদিন এম্নি কোরে বসে থাক্‌তে দেখেছি।"

"ছবি আঁকার চেয়ে, ছবি দেখা আমার ভাল লাগে।"

সে বিদেশিনীর দিকে চাহিয়া দেখিল। সাগরের নীল জলের মত তাহার চোখ দু'টি স্নিগ্ধ নীল,—সন্ধ্যা-সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণধারার মত তাহার কেশগুচ্ছ!

"সন্ধ্যাটি কি সুন্দর!"

"হাঁ, খুব সুন্দর!"

"কিন্তু আমার একটা ছোটখাট কালো ঝড় দেখতে ইচ্ছে করে—"

"আমিও কখনো সাগরের ঝড় দেখি নি,—আমারও ইচ্ছে হয়।"

"অবশ্য, জাহাজ ডুববে না; কিন্তু ইঞ্জিনটা ভেঙে যাবে। তার পর wireless সাহায্যে আসবে।"

কিরণ বলিল, "সে ত নিশ্চয়।"

"সমুদ্র এখন কি শান্ত দেখুন। দেখে মনেই হয় না, এ ক্ষুধিতা রাক্ষসীর মত কত জাহাজ ডুবিয়েছে, কত মানুষ খেয়েছে।"

"পৃথিবীর আদিকাল থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কত নাবিক অজানা দেশ খুঁজে ডুবে মরেছে। বলুন দেখি, কত ঝড়ে কত যাত্রী মরেছে,—কত ধন সাগরের তলে গেছে,—কত সেনা, রণতরী ডুবেছে!"

"মনে করুন, সেই সব তরীগুলো,—সেই সব নাবিক, যাত্রী, সেনা, বণিকদের নিয়ে আজ সাগরের উপর ভেসে ওঠে,—হঠাৎ যদি ঝলমল নীল জল থেকে প্রতি দেশের, প্রতি যুগের, সভ্যতার প্রতি পর্ব্বের মানুষেরা কতরকম রূপ, মূর্ত্তি, কতরকম বেশ-ভূসা পরে', কত রকম অদ্ভুত, বিচিত্র জাহাজে করে উঠে আসে!"

কিরণ বলিল, "বেশ একটা আঁকবার ছবি হয়।"

দুইজনে আবার নীরব হইল। ঠিক সেই সময় খাবার ঘণ্টা পড়াতে দুইজনেই যেন বাঁচিয়া গেল।

দুইদিন কাটিয়া গিয়াছে,—বিকালে কিরণ ও বিদেশিনী ডেকে বেড়াইতেছিল।

Diana কাতর স্বরে বলিল, "ওঃ, বড় গরম!"

"হ্যাঁ, কাল থেকে বড় গরম পড়েছে। বাতাস ত একেবারে বন্ধ। আপনার বড় কষ্ট হচ্চে!"

"সাগরটায় যেন একটা নীল সিল্কের ওড়না পাতা রয়েছে,—একটুও কাঁপছে না।"

দুইজনে দুইখানি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিল।

কিরণ বলিল, "ইঞ্জিন্ ঘরের temperature ১১৫ হয়েছে।"

"সূর্য্যের রংটা দেখুন—তামার মত—ওঃ!"

"খালাসীগুলো লোহার শেকল নাড়তে কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ করছে,—ইঞ্জিনটা কি বিশ্রী শব্দ করছে!"

"ঠিক যেন একটা লোহার কঙ্কালে-গড়া লোহার মাংসপেশী ও স্নায়ুময় বিরাট দৈত্য বেদনায় ছটফট করে আর্ত্তনাদ করছে।"

"একটু হাওয়া বয় না,—পশ্চিমের আকাশটা হলদে হয়ে গেছে—"

ভীষণ গরমে সকলের মেজাজ খারাপ হইয়া গিয়াছে,—কথাবার্ত্তা কহিতে ইচ্ছা করিতেছে না; তাহারা চেয়ারে ঠেস দিয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িল।

কয়েক ঘণ্টা পরে Diana যখন চোখ মেলিল, সে চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি ভয়ঙ্কর কালো।"

কিরণ চোখ চাহিয়া বলিল, "কি?"

"ওই যে আকাশের ওই কোণটায়!"

"হাঁ, কি কালো মেঘ,—সাগরের কোণে স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে,—ঝড় আসবে বোধ হয়।"

"কালোর এমন রং আমি কখনো দেখি নি। একটা ড্রাগন যেন চুপ কোরে, হাঁ কোরে পড়ে রয়েছে।"

"আর জাহাজটা দেখছি মন্ত্রমুগ্ধের মত ওর মুখের মধ্যে টলতে-টলতে চলেছে—"

"দূর থেকে কি একটা শব্দ আসছে! তারাগুলো কি বড় দেখাচ্ছে! যেন তাদের খুব কাছে এসে পড়েছি! কি কাঁপছে—" সে হতাশের মত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

সহসা তাহাদের চেয়ার নড়িয়া উঠিল। সমস্ত জাহাজ দুলিল। কিরণ না ধরিলে, বিদেশিনী ছিট্‌কাইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইত। জাহাজের আলোগুলি কাঁপিয়া উঠিল। মাস্তুলে সন্ সন্ শব্দ হইতে লাগিল। কেবিনের দরজা-জানালাগুলি ভীষণ শব্দ করিয়া বার-বার খুলিতে ও বন্ধ হইতে লাগিল। কিরণের হাত হইতে একখানি কাগজ উড়িয়া সাগরের জলে পড়িয়া গেল।

"ওঃ! কি গরম হাওয়া!" বলিয়া Diana কেবিনের দিকে ছুটিল।

কিরণ সে হাওয়ার মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না,—এক মাস্তুলের পাশে আশ্রয় লইল।

বাতাস বহিতে লাগিল। জাহাজ দুলিতে লাগিল। আকাশের তারাগুলি উল্কার মত যেন তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, যেন কোন ডাইনী উদ্বেলিত সাগরের কালো জল মন্ত্র পড়িয়া ফুটাইতেছে।

তারারা কোথায় মিলাইয়া গেছে। জাহাজটা মাতালের মত এক ঘন অন্ধকার-ভরা গহ্বরে আসিয়া ঢুকিতেছে।

সহসা ঘন তমিস্রপুঞ্জ বিদ্যুৎ বিদীর্য্যমান হইল,—সংগ্রামের প্রথম আহ্বানের মত বজ্রধ্বনি হইল। মাস্তলগুলি কাঁপিয়া উঠিল। এক প্রচণ্ড ঢেউ আসিয়া ডেক ভাসাইয়া দিয়া গেল। কিরণ এক মাস্তল হইতে আর একটা মাস্তলে ছিট্‌কাইয়া পড়িল,—তাহার সর্ব্ব দেহ ভিজিয়া গেল। ভাবিল, ডেক ছাড়িয়া নীচে যায়। কিন্তু ডেকের উপর দিয়া পর্ব্বতের স্তূপের মত ঝোড়ো হাওয়া ঠেলিয়া যাইতে সাহস হইল না। একটা মোটা দড়ি দিয়া সে মাস্তলে নিজেকে জোরে বাঁধিল। সম্মুখে উদ্বেলিত সিন্ধু ও মেঘময় আকাশ মিলিয়া প্রলয়-নৃত্য সুরু করিল। অন্ধকারের পর্দ্দার পর পর্দ্দা পড়িতে লাগিল। তার পর আবার বজ্রধ্বনি হইয়া বৃষ্টি নামিল। সে কি বৃষ্টি। এক এক ফোঁটা জল যেন এক-একটি লোহার দানার মত ভারি, সূচের মত তীক্ষ্ণ!—সমস্ত আকাশ লক্ষ-লক্ষ প্রপাতের বাহু মেলিয়া, ঝরিয়া পড়িয়া, সাগরকে আলিঙ্গন করিতে গেল। মাস্তলগুলি বেতবনের মত কাঁপিতে লাগিল! কিরণের মনে হইল যদি সে মাস্তলের চূড়ায় বাঁধা থাকিত!

সহসা দূরে একটা মাস্তল ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিদ্যুতের আলোয় কিরণ দেখিল, কাপ্তেনের কেবিনের সামনে ভাঙ্গা মাস্তল আঁকড়াইয়া এক শুভ্রমূর্ত্তি কাঁপিতেছে। ঝড়ের আঘাতে মূর্ত্তিটি ডেকে লুটাইয়া পড়িল, এক অপরিচিত কণ্ঠের করুণ ধ্বনি কানে আসিল।

কিরণ থাকিতে পারিল না। সে নিজের দেহ হইতে দড়ির বন্ধন খুলিয়া ফেলিল। তার পর রজ্জুর শেষ প্রান্ত মাস্তলের গায়ে বাঁধিয়া সেই ভাঙ্গা মাস্তলের দিকে টলিতে টলিতে চলিতে লাগিল। কিছুদূর যাইতেই, তাহার পায়ের উপর দিয়া এক ঢেউ বহিয়া গেল,—তাহার আঘাতে সে ডেকে শুইয়া পড়িল। আবার এক ঢেউ আসিয়া তাহার উপর দিয়া বহিয়া গেল। অনেক কষ্টে গড়াইয়া সে সেই ভাঙ্গা মাস্তলের কাছে আসিয়া পৌঁছিল দেখিল, এক নারী দেহ মাস্তলের গায়ে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। জোর করিয়া দাঁড়াইয়া সেই নারীদেহ বুকে জড়াইয়া তুলিতেই, আর একটা ঢেউ দুজনকেই ডেকের উপর ভাসাইয়া দিল। কিরণ মূর্চ্ছিতা নারীতনুকে বুকে করিয়া জড়াইয়া, স্রোতের সহিত যুঝিতে লাগিল। আর এক ঢেউ,—এইবার বুঝি দুইজনেই অতল সমুদ্রে ভাসিয়া যায়! তাহার বিবেচনা-শক্তি, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, অনুভব-শক্তি চলিয়া গেল;—শুধু এক অস্পষ্ট, অন্ধ আবেগে পরিচালিত হইয়া সে এক হাতে দড়িটি, আর এক হাতে সেই নারীকে ধরিয়া রহিল। এক নিমেষের জন্য সে সব ভুলিয়া গেল। তাহার সমস্ত অতীত জীবন বায়স্কোপের ছবির মত এক সেকেণ্ডের মধ্যে চোখের উপর ভাসিয়া গেল—লীলার মুখখানি। তার পর সব অন্ধকার!

বোধ হইল, যেন এক বিপুল, বিশাল, শক্তিমান বাহু তাহাদের দুইজনকে টানিয়া তুলিতেছে। যখন চোখ মেলিল, তাহারা দুজনেই কাপ্তানের কেবিনের দরজার গোড়ায় লুটাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে,—তাহাদের পাশে এক বিশাল রুদ্রমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া।

আবার জাহাজ দুলিয়া উঠিল,—সে মূর্ত্তি কোথায় সরিয়া গেল। কিরণ কেবিনের পাশে আশ্রয় পাইয়া, আশায় শক্তিমান হইয়া উঠিল। নারীদেহকে আপনার কোলে টানিয়া লইয়া, oilskin কোট জড়াইয়া, আপনার দেহের তাপ দিয়া তপ্ত করিতে লাগিল।

"Diana—"

Diana চোখ মেলিল না। কিরণ তাহার হাত-পা ঘষিয়া দেহ গরম করিতে লাগিল।

"Diana—"

Diana চোখ মেলিল, অস্ফুট স্বরে বলিল, "বড় ঝড়—বড় ঝড়—" আবার চোখ বুজিল।

কিরণ আনন্দে তাহাকে আরো নিকটে টানিয়া লইল।

ঝড় বহিতে লাগিল। সম্মুখের ডেক হইতে সব জিনিস ক্ষুধিত ঢেউয়ের দল টানিয়া লইতে লাগিল।

আর একটা মাস্তল ভাঙ্গিয়া পড়িল,—ব্রিজের একটা দিক ভাসিয়া গেল। এইবার জাহাজ সজীব হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে লোহার কলের জাহাজে ছিল,—ষ্টিমে চলিতেছিল;—আর সে লোহার আর কাঠের তৈরি জাহাজ নয়,—সে যে মানব-সভ্যতার ধাত্রী—যুগে-যুগে, নব-নব যাত্রীদের ক্ষুধিত সিন্ধুর বুক হইতে সেই ত রক্ষা করিয়াছে! সাগরের সহিত লড়াই করিয়া সেই ত দেশের সহিত দেশকে, জাতির সহিত জাতিকে বাঁধিয়াছে! ক্রুদ্ধা সিংহিনীর মত আপন বক্ষের ভীত মানব-যাত্রীদের বাঁচাইবার জন্য সে রুখিয়া দাঁড়াইল,—তাহার বক্ষ বিদীর্ণ না করিলে এ মানবযাত্রীদের সে ত্যাগ করিবে না।

ঝড় বহিতে লাগিল, জাহাজ দুলিতে লাগিল। Diana বলিল, "ওঃ, কি কালো মেঘ!"

"বিদ্যুৎবালারা আনন্দে হাসছে আর নাচছে!"

"আর তরঙ্গ-দানবেরা তাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি কোরে প্রলয়-নৃত্যে যোগ দিয়েছে!"

"আকাশটা বুঝি সাগরের বুকে ভেঙে পড়ে!"

"বড় শীত কোরছে!—"

কিরণ Dianaকে আরও কাছে জড়াইয়া ধরিল। কে ভাবিয়াছিল, অকূল সমুদ্রে ঝড়ের দোলায় একটী বঙ্গদেশের যুবক ও একটী আইরিশ যুবতী এমন করিয়া হাত জড়াইয়া দুলিবে! অসীম ব্যোমে ভ্রাম্যমান একটী তারা যেমন লক্ষ-লক্ষ যুগ ঘুরিতে-ঘুরিতে নিমেষের জন্য আর একটী তারার অতি কাছাকাছি আসিয়া, তার পর আপন পথে চলিয়া যায়,—অনন্তকাল আর তাহাদের দেখা হয় না,—তেমনি কি তাহারা দুজন ক্ষণিকের জন্য অতি পাশাপাশি আসিয়া পড়িয়াছে?

কিছুক্ষণ হইল ঝড় থামিয়া গেছে। কিরণ কেবিনে আসিয়া ঢুকিল। বোতলে জিনিস পুরিয়া নাড়িলে জিনিসগুলো যেমন মিশাইয়া যায়, ঘরের জিনিসপত্র তেমনি মিশাইয়া গেছে। পায়ের জুতা বিছানার উপর উঠিয়াছে, বিছানার বালিস মেঝেয় লুটাইতেছে। টেবিলের বই-কাগজ চারিদিকে ছড়ানো। ছন্নছাড়া ঘরের মূর্ত্তিটি দেখিতেছে, এমন সময়ে এক খানসামা আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। কিরণ অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইল। এ কি সেই কালো মূর্ত্তি, যে তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া বাঁচাইয়াছিল? আরো ভালো করিয়া দেখিতে যাইয়া সে আরও বিস্মিত হইল,—এ মুখ যে চেনা!

বলিল "করিম না কি?"

"হাঁ দাদাবাবু!"

করিম তাহার মামার বাড়ীর 'বয়' ছিল।

"তুমি?"

"এই জাহাজের কাজ নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছি।"

"কেন?"

সে এক বিখ্যাত Cinema-starএর নাম করিল। তাহাকে দেখিবার জন্য, তাহার কোম্পানিতে তাহার ভৃত্য রূপে অভিনয় করিবার জন্য, সে নিজের গ্রামের জমি বেচিয়া আমেরিকা চলিয়াছে।

"দেশ ছেড়ে বেরিয়েছ,—আজ যদি মরতে?"

"সেই জন্যেই বেরিয়েছি —"

"তুমিই কি আমাদের টেনে তুলেছিলে?"

"আল্লা বাঁচিয়েছেন দাদা বাবু!"

কালো সমুদ্রের উপর কালো মেঘ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে। ভগ্ন-ইঞ্জিন মাস্তুলহীন জাহাজের বেগ মন্দ। পূর্ব্ব তোরণ-দ্বারে উষার নিষ্প্রভ তারার দিকে চাহিয়া কিরণ ভাবিল, জীবনের এই ঝড়ের রাত্রিটি তাহার সকল সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি,—সকল চিন্তা-সাধনার বাইরে।

(৮)

কিরণের ডায়ারি হইতে—

ভেনিস,

তরা—

এই দুই মাস ইটালির নগরের পর নগর ঘুরে-ঘুরে এই ভেনিসে এসে একটু শান্তি পেয়েছি। এই আড্রিয়াটিকের রাণী সুন্দরী ভেনিস সাগরের ওপর স্বপ্নের মত উঠেছে। এই সৌন্দর্য্যময়ীর রূপই বা ক'দিন ভুলিয়ে রাখবে? মুক্তি আমার নেই, — এই জগৎ-জোড়া কারাগারে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি না,—বাংলায় ফিরে যেতে চাই। লীলা, সে কে আমায় এমন কোরে তাড়ালো? যে কারাগারে বন্ধু রয়েছে, তারি পাশে যে আমার সত্য মুক্তি।

এই তিন দিন ধরে ভেনিসের খালে-খালে, লেগুনে-লেগুনে, gondolaয় ঘুরে বেড়িয়েছি, তরঙ্গ-গীত-মুখর সিন্ধু এর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। এর চারিদিকে অবিরাম জলের কলগান উঠছে—তাই দিন-রাত শুনতে ইচ্ছে করে। মোটরের ভক্-ভক্, গাড়ীর খট্‌খট্ ঝন্-ঝন্ শব্দ নেই। পাথরে-বাঁধানো, ধূলো-ভরা পথ নয়। ইন্দ্রধনু-গড়া হারের মত খালের পর খালে একে জড়িয়ে রয়েছে। এই ঢেউ-খেলানো জলের পথের ওপর রাত্রিদিন আলোর ঝলমল, দাঁড়ের ঝপ্-ঝপ্, যাত্রীদের কোলাহল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই জলের দর্পণে রেনেসাঁস্ শিল্পীর আনন্দের সাধনায়-গড়া আপন অপরূপ রূপ দেখিয়া সে কি আপনি মুগ্ধা হইয়া গিয়াছে।

৫ই—

কাল St. Mark-এর এক কোণে গিয়ে মনে, হ'ল এ জায়গাটা যেন পরিচিত,—বহুদিন আগে যেন এখানে এসেছিলুম! Grand Canal দিয়ে, Rialto-র নীচে দিয়ে, Ducal Palace-এর পাশ দিয়ে যখন সাগরের মাঝে এসে পড়লুম,—সম্মুখে অপ্সরীর মত ভেনিস দাঁড়িয়ে,—তাহার মন্দির-চূড়া, প্রাসাদশ্রেণী স্বচ্ছ, সুনীল আকাশের শুভ্র মেঘ-স্তূপের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। ওই হর্ম্ম্যগুলি বুঝি মেঘের মত শুভ্র মুক্তা দিয়া তৈরী। তার পর সন্ধ্যা নামিল। রক্তপট্টবসনা সলজ্জা বধূর মত ভেনিস দাঁড়াইল। তাহার পায়ের জল অলক্তকরাগমাখা, তাহার মাথার উপর স্বর্ণ-কেশগুচ্ছ। ধীরে রাত্রি নামিল। চন্দ্র প্রেম-প্রদীপ জ্বালাইয়া সাগরের চিরবধূকে নূতন করিয়া তারার মালা পরাইল।

এই ভেনিসকে আমি যেন স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম,—এত পরিচিত মনে হয়। হয় ত ভেনিসের শিল্পীদলের মধ্যে আমিও ছিলাম। Tintoretto, Titian-এর যুগে আমি এখানে জন্মিয়াছিলাম। এই চিরনবীনা নগরী আমারও সাধনার সৃষ্টি। এই বিংশ শতাব্দী পিছাইয়া গিয়া সেই যুগটা আসে না? যখন গ্রীসের আর্টের আলো, খৃষ্টের ধর্ম্মের আলো, দুই আলোর আলোয় ইয়োরোপের দেশে দেশে সকলের প্রাণে প্রাণে আনন্দের দেয়ালি-উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল।

৯ই

কালো চোখ,—ভেনিস-সুন্দরীদের মন ভোলানো কালো চোখ,—gondola-য় দুলে দুলে-জলে রঙের খেলা দেখা,—প্রাসাদগুলোর ছায়ার কাঁপন দেখে চোখ দুটো রঙের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে।

১১ই—

সুন্দরী, আর যে ভুলতে পারছি না! আমার মাথার ভেতর যেন পাখীর দল উড়ে চলেছে। হাওয়ার মুখে পাখীদের ডানার শব্দের মত সমস্ত দেহের রক্ত যেন কোন্ অশান্ত ছন্দে নৃত্য কোরছে। বসন্তের শেষে যে হাঁসের দল মানস-সরোবর ছেড়ে উড়ে চলে যায়, তারা কোন্ অদম্য আবেগের প্রেরণায় যায়, কোন্ অজানা সঙ্গী এই অনন্ত আকাশের মধ্য দিয়া তাহাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়;—সেই অদম্য অজ্ঞাত শক্তির হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে ভেসে যেতে চাই।

১৪ই—

আর্ট কি শুধু সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা? শিল্পী কি শুধু তরুণীর মুখকে, ফুলের রংকে, আলো আঁধারের লীলাকে আঁকে? এতদিন কেবল রং নিয়ে খেলেছি, সুন্দরীর মুখ এঁকেছি। এবার জগতের দুঃখকে আঁকতে ইচ্ছে করে;—অধীনতার অপমান, পদাহতের অধিকার, নিরন্নের ব্যথা, চাষী-মজুরের কর্ম্মজীবন, পতিতার বেদনাকে মূর্ত্তিমতী কোরতে চাই।

জগতের দুঃখ দূর কোরতে শিল্পী কি কোরতে পারে? তাহার কাজ জাগানো,—তাহার কাজ আনন্দ-সৃষ্টি। ধরণী যে সুন্দরী,—জীবনের সংগ্রামের পথ যে অপরূপ—এই বোধে দেশকে উদ্বুদ্ধ করা।

ধনীরা বলে, "ধনই সব চেয়ে বড়, জীবনকে ভোগ করো।" মধ্যবিত্তেরা বলে, "জীবনের দুঃখকে ভুলতে চেষ্টা করো।" ধনহীনেরা বলে, "দুঃখই পৃথিবীর সত্য,—নতশিরে তাহাকে বহন করো।"

আচ্ছা, কোন্‌টা সত্যি? কালিদাসের কাব্য, না একটা লোহার কল? অজন্তার চিত্রশালা, না একটা কয়লার খনি? রবীন্দ্রনাথের গানগুলো, না এক মোটরকার? কোন্‌টা চাই?—র‍্যাফেলের ছবিগুলো, না একটা এয়ারোপ্লেন? বৈষ্ণব-পদাবলী, না একটা howitzer? বাউলের গান, না বারুদের কারখানা? দুটোই চাই। কিন্তু মিলের ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে সেতারের ঝঙ্কার কে বাঁধতে পারে?

১৫ই—

ডাক্‌ছে,—কে আমায় ডাক্‌ছে। বলছে, 'শিল্পি, আজ তোমার মেকি লাল নীল রং রেখে দাও—মানুষের রক্তের লাল রং দিয়ে বারুদের কালো রং দিয়ে ইয়োরোপ জুড়ে যে সত্যিকার ছবি আঁকা চলছে, সেইখানে এসে যোগ দাও দেখি?' আমি দেখছি, সন্তানরক্তসিক্তা, যুদ্ধাগ্নিদগ্ধা, অশ্রুময়ী ইয়োরোপ কোন্ নবপ্রভাতের জন্য করুণ নয়নে তাকিয়ে আছে,—দুঃখিনী মাতার দেহ যুদ্ধ-মত্ত জাতির দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন কোরছে,—তাহার শ্যামল অঙ্গ অগ্নিতে পুড়ে গিয়েছে,—স্বর্ণ-অঞ্চল ভস্মীভূত। তাহার কালো কেশ কামানের ধূম্ররাশিতে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার বুকের প্রদীপটি উদ্দাম ঝোড়ো বাতাস হইতে সে সযত্নে রক্ষা করিতেছে। এই মাতা গ্রীসকে আপন স্তন্যদানে পুষ্ট করিয়াছিল,—রোমকে আপন স্নেহচ্ছায়ায় বর্দ্ধিত করিয়াছিল। আজ

অশ্রান্ত বিদ্রোহী সন্তানদের মিলাইবার জন্য পূর্ব্বতোরণ-দ্বারে করযোড়ে চাহিয়া তপস্বিনীর মত মঙ্গল-মন্ত্র জপিতেছে।

১৮ই—

কাল সারা রাত ধরে রঙের লড়াই দেখেছি,—সাত রং সাত তুলি মিলে ঝগড়া আরম্ভ কোরেছে,—সে কি হোলি-খেলা!

লাল বলে, আমি প্রভাতের আকাশের রং, সন্ধ্যার রং, সূর্য্যের রং, আমি রক্তের রং, আগুনের রং, আমি জীবনের রং; আমি অশান্ত জীবনকে নব-নব রূপে বিকশিত, বিবর্ত্তিত কোরে চলেছি।

নীল বলে, আমি সমস্ত আকাশের রং, সমস্ত সাগরের রং, আমি অনন্ত ব্যোমে, অসীম সিন্ধুতে চিরচঞ্চল।

সবুজ বলে, আমি মাটির গায়ের অঞ্চল, আমি প্রাণের তাজা রং, গাছ-পালা-ঘাসকে সুন্দর করি।

কালো বলিল, আমার বুক হইতে তোমরা সব উৎসারিত হয়েছ; আমিই শ্রেষ্ঠ।

এম্নি সাত রং-এর এক রামধনু চোখের উপর ঘুরিতে লাগিল! সহসা তাহার মাঝ হইতে লীলার মুখ পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিল। তারপর শাদা রং আসিয়া বলিল, আমি আলোর রং আসিয়াছি—সব কোথায় মিলাইয়া গেল।

২০শে—

Your first duties are to humanity—Mazzini.

এ কি অশান্তি, জীবন-দেবতা! কোথায় আমায় নিয়ে যেতে চাও? আমি যেখানেই যাই, আমি যা কিছু করি,—সব যে ব্যর্থ হচ্ছে। আনন্দ কৈ?

সুখের জন্য আমায় সৃষ্টি করো নি,—দুঃখকে বরণ করবার জন্য, মৃত্যুকে বরণ কোরে জীবনের জয় গাবার জন্য কি আমায় এই সুন্দরী পৃথিবীতে পাঠালে?

দুঃখ-সংগ্রামময় জগতের যজ্ঞে যদি জীবন উৎসর্গ কোরতে হবে, তবে শিল্পী কোরে মোহিনী ধরণীর রঙের সুধায় মাতিয়েছিলে কেন?

২১শে—

আচ্ছা, আয়ারল্যাণ্ডটা কেমন? সে কি Dianaর মত রহস্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী, সুন্দরী?

*　*　*

----

(৭)

"তুই যে কিছু খাচ্ছিস না লীলা?"

"কৈ মা?"

"না মা, অমন কোরলে চলবে কেন?"

"খেতে যে ভালো লাগে না মা—"

"কি আর করবি মা—"

"তুমিও ত কিছু খাচ্ছ না মা?"

"আমার কথা ছেড়ে দে,—প্যারিস থেকে তোর দাদার কোনো খবর আসে নি?"

"না মা।"

"হাঁরে, কিরণের কোনো খবর পেলিনি,—সে কোথায় নিরুদ্দেশ হোলো?"

"কৈ না।"

টেবিলের ওই কোণ্‌টায় কিরণ বসিয়া লিখিয়াছিল, "লীলা, তুমি কখনও কি" সেই কোণ্‌টার দিকে চাহিলে তাহার মুখে রুটি উঠিত না। তাহার উপর কিরণের নাম শুনিয়াতে সে আর খাবার টেবিলে বসিয়া থাকিতে পারিল না। আধ-বাটি চা আর অভুক্ত রুটি মাখন রাখিয়া, চোখের জল কোনো মতে চাপিয়া, আপনার ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে মা ডাকিলেন, "লীলা, আজ কি পড়বি নে?"

"যাই মা।"

রোজ বিকালে মা ও কন্যা যখন ছাদে বসেন, তখন বলিবার কথা খুঁজিয়া পান না। কোন দিন মার চোখের জলের বান আসে, কন্যা গলা জড়াইয়া সান্ত্বনা দেয়; কোনো দিন কন্যার অশ্রুসাগর উদ্বেলিত হয়, মাতা সান্ত্বনা দেন। এইরূপ অশ্রুসমাচ্ছন্ন দীর্ঘ সন্ধ্যা এড়াইবার জন্য লীলা ঠিক করিয়াছিল, রোজ মাকে কোনো বই পড়িয়া শুনাইবে।

সেই ছাদে সন্ধ্যার সোণালি আলো তেম্‌নি আসিয়া পড়িয়াছে,—শরতের স্বচ্ছ আকাশের পশ্চিম কোণে সূর্য্য ঢলিয়া পড়িয়াছে। লীলা মার পাশে বসিয়া Browningএর Paracelsus তর্জ্জমা করিয়া শোনাইতে লাগিল।

*　*　*

ঠিক সেই সময়ে আয়ারল্যাণ্ডে Londonderryতে সিন্‌ফিন্ ও পুলিসের মধ্যে ভয়ানক মারামারি হইতেছিল। কিছুদূরে এক খোলা মাঠের উপর ভাঙ্গা গির্জ্জার মধ্যে কতকগুলি সিন্‌ফিন্ একটি আহতকে লইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এক আইরিশ যুবতী আহতের অচৈতন্য দেহটির ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছিল। ময়লা কালো সার্জ্জের সুট-পরা যুবকের দীর্ঘ দেহ গির্জ্জার ভাঙ্গা মেঝের ওপর শায়িত, হস্তপদ ক্ষতবিক্ষত, দীর্ঘ কুঞ্চিত অসংযত কেশ রক্তমাখানো। মাথাটি চার্চ্চের পাথর হইতে কোলে তুলিয়া যুবতী কাতর স্বরে বলিল, "কই, ডাক্তার এখনো এলেন না?"

চারিদিকে কয়েকটি যুবক উৎকণ্ঠিত হইয়া দাড়াইয়া; ধীর স্বরে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

যুবতী আবার বলিল, "গুলিটা কি গভীর ক্ষত কোরে গেছে?"

"সেই রকম তো বোধ হয়।"

"এঁকে তো আমরা কখনো দেখিনি,—ভারতীয় বোলে বোধ হয়।"

"মারামারি ঠিক সুরু হয়েছে—উনি হঠাৎ পেছন থেকে মোরিয়ার মত ছুটে পুলিসের মাঝে গিয়ে পড়লেন।"

"এক হাতে একটা ছোট লাল পতাকা, আর এক হাতে ছোটো এক রিভল্‌ভার,—এত পা কাঁপাছিল যে, আমি ভাবলুম, এই বুঝি পড়ে যান।"

"একটা গুলি ছুঁড়তে হয় নি,—উনিই আজকের মারামারিতে প্রথম আহত হন।"

"পুলিসরা বলিপুষ্ট দেহ মরবার জন্যে একেবারে ছুটে এসেছিল।"

মেয়েটির দিকে চাহিয়া একজন বলিল, "আপনি অমন কোরে ছুটে গিয়ে না তুলে আনলে—"

কিরণ একবার মাথা নাড়িয়া চোখ মেলিল; অস্ফুট স্বরে বলিল "লীলা—"

"না, আমি Diana—"

নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে কিরণ চারিদিকে চোখ চাইল, "ও, তুমি Diana।" তার পর কম্পিত হস্তে আপন বুকের পকেট হইতে কি বাহির করিতে চেষ্টা করিল,—রক্তহীন হাত অবশ হইয়া পড়িয়া গেল।

Diana পকেটে হাত দিয়া একটী ছবি বাহির করিল। সেটি Dianaকে model করিয়া আঁকা আয়ারল্যাণ্ডের ছবি। জাহাজের চারিদিকে যেমন ঝড় উঠিয়াছিল, তেমনি তাহাকে ঘিরিয়া ঝড়ের রাত ঘনাইয়াছে,—তাহার মধ্যে কে আলোকের তপস্বিনী অকলঙ্কা উষার মত দাঁড়াইয়া।

"উঃ—"

"বড় কষ্ট হচ্চে?"

"না Diana, এমনি যদি বাংলার কারাগারে মরতুম!"

"আমি বাংলাকে ভালোবাসি।"

"বেশ সুখে মরছি, লীলা লী-বাং-লা—"

আর কথা ফুটিল না।

Diana চোখ ছুটি বন্ধ করিয়া রক্তমাখা হাত ছুটি বুকের উপর জোর করিয়া দিয়া নিজের বুক হইতে ক্রশ বাহির করিয়া চুম্বন করিতেই, সকল যুবক মৃত্যু-পথিক শিল্পীর চারিদিকে নতজানু হইয়া বসিল। সকলে করযোড়ে প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা শেষে Diana অশ্রুমাখা কণ্ঠে বলিল, "প্রভু, ইঁহার মত আমাদের মরিবার শক্তি দাও।"

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম এ, পি-আর-এস]

রাজস্ব-নীতি

৮। জল-সেচনের বন্দোবস্ত।

প্রজার দুঃসময়ে খাজনা রেহাই এবং সরকারী ফৌজের কুচ-কাওয়াজ ও ছাউনীর নিমিত্ত শস্য হানির জন্য ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করিয়াই কিন্তু পেশবা-সরকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কৃষি-প্রধান দেশে কৃষিক্ষেত্রে সেচনের নিমিত্ত নিয়মিত জল-সরবরাহের বন্দোবস্তের প্রয়োজন। সর্ব্বদা মেঘের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইলে, শস্যের আশা ছাড়িয়া দিতে হয়; কারণ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অপ্রচুর বর্ষণ বা অকাল বর্ষণ এই কলি-যুগেরই বিশেষত্ব নহে। প্রাচীন কালেও প্রকৃতির এই অনিয়ম ও খাম-খেয়ালি ভাবে ভারতবর্ষের লোক বিপন্ন হইয়াছে; কিন্তু সেই জাতীয় উন্নতির দিনে তাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম-বিপর্যায়ের সংশোধনের ভার দেবতার হাতে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই। তখনকার হিন্দু-নরপতিগণ দেশের ও দশের কল্যাণার্থ সলিল-সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করিতে যত্নপরায়ণ ছিলেন। তাহার বহু প্রমাণ চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে ও কলহন-প্রণীত রাজতরঙ্গিনীতে আছে। কাশ্মীরে একজন নরপতির উদ্যোগে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কৃত্রিম উপায়ে জল-সেচনের এমন সুব্যবস্থা হইয়াছিল, যে, এক বৎসরের মধ্যে শস্যের মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল। মৌর্য্য-যুগে ও তাহার পরেও ভারতীয় নৃপতিরা কৃত্রিম হ্রদ নির্ম্মাণ করিয়া জল-সেচনের ব্যবস্থা করিতেন। তাহার প্রমাণ সাকক্ষত্রপ রুদ্রদ্রমণের উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়। পেশবারাও ভারতবর্ষের এই চির-পুরাতন নীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্রের কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের দুই প্রকার ব্যবস্থা ছিল। (১) পয়ঃ-প্রণালীর দ্বারা; এই ব্যবস্থা হইতেই 'পাটস্থল' নামের উৎপত্তি। (২) কূপ হইতে কপিকল ও বলদের সাহায্যে জল তুলিয়া যে সকল জমিতে দ্বিতীয় উপায়ে জল-সেচন করা হইত, তাহার নাম ছিল, 'মোটস্থল'। সাধারণতঃ পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশস্থ কোন খাদে বাঁধ দিয়া বর্ষার জল সঞ্চিত করিয়া রাখা হইত। সেই জল পয়ঃপ্রণালীর পথে বাহিত হইয়া কৃষিক্ষেত্রে নীত ও ব্যবহৃত হইত। এই প্রকার বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যয় কখনও বা সম্পূর্ণ, কখনও বা আংশিক ভাবে, সরকারী তহবিল হইতে দিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রমাণ স্বরূপ দুইখানি দলিল উদ্ধৃত করিতেছি।

বারোমার তালুকের অন্তর্গত কোপল পরগণার কামাবিশদার গোবিন্দরাও যাদবকে পেশবা সরকার একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন--'এই পরগণার ধান্য ক্ষেত্রে তুঙ্গভদ্রা হইতে বাঁধ ও খালের সাহায্যে জল আনীত হইত এবং ধান্য উৎপন্ন হইত। বৃষ্টিতে ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মেরামতের জন্য দুই হাজার হোন সম্প্রতি মঞ্জুর করা হইয়াছে। বাঁধটি ভাল করিয়া মেরামত করাইবে। খরচের টাকা তোমার পরগণার দেয় রাজস্ব হইতে কাটা যাইবে।' দ্বিতীয় পত্রখানি পেশবা সরকার তরফ ঘোড়বারের অন্তর্গত নসরাপুর গ্রামের মোকদমকে লিখিয়াছিলেন। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম--৮০০৲ টাকা ব্যয়ে নসরাপুর গ্রামে শ্রীবাণেশ্বরের সান্নিধ্যে একটি বাঁধ বাঁধিবার আদেশ লক্ষ্মণকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তিকে দেওয়া হইয়াছে। ঐ ৮০০৲র মধ্যে ৪০০৲ সরকার হইতে দেওয়া হইবে। বাকী অর্দ্ধেক যে সকল কৃষক জমিতে জল নিবে, তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।' এইভাবে কখনও রাজার এবং কখনও রাজা ও প্রজা উভয়ের ব্যয়ে কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের বন্দোবস্ত হইত। পেশবা-যুগে এই জন্যই মারাঠা দেশে কৃষির এমন উৎকর্ষ হইয়াছিল যে, ওয়েলিংটন ও মনরোর ন্যায় ইংরেজ সেনানীরাও তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

৯। তগাই

প্রকৃতির অনিয়ম যেমন আধুনিক কালের আমদানী নহে, সেইরূপ মহাজনের অত্যাচারও এদেশে নূতন নহে। প্রাচীনকাল হইতেই কুসীদজীবীদিগের অত্যাচারে দরিদ্র কৃষককে বিপন্ন হইতে হইতেছে। তখনও এসিয়া বা ইয়োরোপে সমবায়-ঋণদান সমিতি বা Co-operative Credit Society'র সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহাদের কর্ত্তব্যের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া, রাজা তাঁহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই। উত্তমর্ণের কঠিন পীড়ন হইতে দরিদ্র কৃষককে রক্ষা করিবার এবং কৃষির উন্নতি বিধানের অভিপ্রায়ে হল, গরু ও বীজ ক্রয়ের জন্য অভাবের সময় সরকারই কৃষিজীবীদিগকে অল্প সুদে বা বিনা সুদে টাকা ধার দিতেন। কৃষকেরা নিজেদের সুবিধামত কখনও বা দুই বৎসরে, কখনও বা চারি বৎসরে, কিস্তিতে কিস্তিতে অল্প অল্প করিয়া সরকারী ঋণ শোধ দিত। এই ঋণের নাম তগাই ঋণ। তকাবী দিবার প্রথা আজও বর্ত্তমান; কিন্তু যেখানে পেশবা-সরকারের নিকট হইতে মারাঠা কৃষকের প্রতিবৎসরই 'তগাই' মিলিত, সেখানে নিতান্ত দুর্বৎসর ব্যতীত ইংরেজ-সরকারের নিকট হইতে 'তকাবী' মিলে না। তখনও অর্থ-বিজ্ঞানের বিবিধ সূত্র রচিত হয় নাই, Leissez Faire বা উদাসীন-নীতি তখনও এদেশে অজ্ঞাত। রাজা মনে করিতেন, তিনি প্রজাগণের পিতৃ স্থানীয়,—তাহাদের ভালমন্দে দৃষ্টি না দিলে,—জোর করিয়াও বিনাশের পথ হইতে তাহাদিগকে টানিয়া না ফিরাইলে, পরকালে তাঁহাকে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হইবে। তাই তিনি বাজার-দরও ঠিক করিয়া দিতেন, সুদের হারও বাঁধিয়া দিতেন, পাগড়ীর কাপড়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন; আবার আবশ্যক হইলে উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সহিত ন্যায়সঙ্গতভাবে রফা করিতে জোর করিয়া বাধ্য করিতেন। অন্যত্র বলিয়াছি, শিবনের পরগণার পাটীল ও জমিদারগণ অন্যপ্রকারে আপনাদের অভাব-অভিযোগের দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইয়া, ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আলে গ্রামে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের একটা অভিযোগ এই যে—প্রজাগণ ঋণ দায়ে প্রপীড়িত; উত্তমর্ণদিগের দাবী কতদূর সঙ্গত, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করা হউক। পেশবা-সরকার তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—"তোমরা নিবেদন করিয়াছ যে বিভিন্ন গ্রামে রায়তেরা সাউকারের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। যদি হিসাব পরীক্ষার পর তাহাদের সঙ্গত দাবীর পরিমাণ স্থির হয়, এবং যদি তাহা পরিশোধ করিবার মত নগদ টাকা তোমাদের না থাকে, তবে ঋণের টাকা শস্য দ্বারা পরিশোধ করিবে। তাহাদের দাবী সম্বন্ধে যথাযোগ্য তদন্ত করা হইবে; এবং সুদের হার অত্যধিক বিবেচিত হইলে, সরকার হইতে ন্যায্য হার ঠিক করিয়া দেওয়া হইবে। তার পর তোমরা তোমাদিগের ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে কিস্তিতে-কিস্তিতে পরিশোধ করিবে।

কিন্তু কেবল আইনের বলে কুসীদজীবীর অত্যাচার নিবারণ করা যায় না। টাকার অভাব হইলে, এবং অন্যত্র কম সুদে ঋণ না পাইলে, কৃষককে অর্থগৃধ্নু মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হইবেই; এবং উচ্চ হারে সুদ দিতেও নিজের প্রয়োজনের অনুরোধেই সম্মত হইতে হইবে। পেশবা-সরকার এই জন্যই তগাই ঋণ-দানের ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, এই নীতি উদ্ভাবনের গৌরবের দাবী তাঁহারা করিতে পারেন না। কারণ, মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের বহু পূর্ব্বেও মুঘল-সাম্রাজ্যে তগাবী ঋণের ব্যবস্থা ছিল।

তগাই সরকারী ঋণই বটে, কিন্তু টাকাটা সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইত না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা,—মামলতদারই হউন, কামাবিসদারই হউন,—নিজের অর্থ হইতে দুঃস্থ প্রজাদিগকে তগাই দিতেন। সুদের জন্য কোনই জুলুম করা হইত না। কখন-কখনও বিনা সুদেই তগাই মিলিত। কিস্তিবন্দীর ব্যবস্থা সকল সময়েই থাকিত। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি দলীলে রাঘো গোবিন্দ নামক কর্ম্মচারীকে পরগণা পাটোদের অন্তঃপাতী মুথড়ে গ্রামের লোকদিগকে ১৫০০৲ তগাই দিতে বলা হইয়াছে। এই ঋণ দুই বৎসরে পরিশোধ করিবার কথা। প্রজারা অবশ্য তাহাদের সুবিধামত টাকাটা পরিশোধ করিবে। এই দলীলখানিতে সুদের আদৌ উল্লেখ নাই। অপর একখানি দলীলে কিন্তু সুদের উল্লেখ আছে। তখন মহাজনেরা লইতেন শতকরা ৭৫৲; আর তগাইর সুদ ছিল তাহার এক তৃতীয় অংশ অর্থাৎ শতকরা ২৫৲ মাত্র। আর

একখানি পত্রে পেশবা-সরকার লক্ষ্মণ হরি নামক কর্ম্মচারীকে তগাই পরিশোধের জন্য কসবা গোবলের থাতককে তাগাদা দিতে নিষেধ করিতেছেন; কারণ, সে বৎসর (১৭৭৩ খৃঃ) ঐ গ্রামে শস্য ভাল হয় নাই। তগাই ঋণ কেবল টাকায় দেওয়া হইত না;—প্রয়োজন হইলে প্রজাগণ শস্যও ধার পাইত। আর এই ঋণ আদায় হইবার পূর্ব্বেই যদি মামলতদার বা কামাবিসদারের চাকরী যাইত, তাহা হইলেও তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না; কারণ, সরকারী নিয়ম অনুসারে নূতন শাসনকর্ত্তাকে নিজের তহবিল হইতে মায় সুদ তগাইর টাকা ও শস্য পরিশোধ করিতে হইত। তার পর তিনি কিস্তিবন্দী করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন। পেশবা-সরকার চিন্তামণ হরি নামক একজন কর্ম্মচারীকে একখানি পত্রে এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন—'ঐ পরগণার রায়তদিগকে তগাই দিয়া চাষ-আবাদ করিতে উৎসাহ দাও। যদি তোমার চাকরী সম্বন্ধে কোন গোলমাল হয়, তবে নূতন মামলতদার মায় সুদ তোমার টাকা পরিশোধ করিবেন।'

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি, পেশবা-সরকার কৃষির উৎকর্ষ ও বিস্তারের জন্য আজকালকার সভ্যজগতের অনুমোদিত কোন উপায় অবলম্বনেই শৈথিল্য বা অবহেলা করেন নাই। কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচনের জন্য পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণের ব্যয়ভার তাঁহারা বহন করিতেন; পতিত, অনাবাদী জমির চাষ-আবাদের জন্য তাঁহারা উদ্যোগী প্রজাকে নিষ্কর ও অল্প-করে জমি দান করিতেন; মহাজনের উৎপীড়ন হইতে দরিদ্র রায়তকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অল্প সুদে এবং কিস্তিতে-কিস্তিতে অল্পে-অল্পে পরিশোধ করিবার চুক্তিতে তগাই ঋণ দিতেন; এবং জমির প্রতি যাহাতে চাষীর মমতা হয়, যাহাতে তাহারা সর্ব্বপ্রকারে চাষের জমির উৎকর্ষ সাধনে উদ্যোগী হয়, এই জন্য তাঁহারা দীর্ঘকালের জন্য জমির কোল দিতেন এবং চাষের জমির বিক্রয় ও বন্ধক রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। পরলোকগত বিচারপতি রাণাডে বলেন,—The system of revenue management under Balaji Baji Rao, Madhao Rao and Nana Fadnavis was, on the whole, careful. New sources of revenue were developed, and the old improved. The land settlements made by the Peshwas during this period show that, while anxious not to oppress the Ryots, every care was taken to insist on the rights of the Government. Whenever the country needed that relief, leases varying from three to seven years were granted on terms of Istawas, i. e., gradually increasing assessment." পেশবা যুগের রাজস্ব নীতির সুফল বর্ণনা করিতে যাইয়া মার্শেল সাহেব লিখিয়াছেন,—(Marshell's Statistical Report of Belgaum, 1820) ......encouraged husbandry by starting ploughing matches, and by showing marked consideration to exceptionally hard-working husbandmen. In this way every available inch came under tillage, and the country was filled with people, many very rich, and all happy and contented. The revenue in each village was fixed and moderate, settled without trouble and paid without a groan." অর্থাৎ কৃষি কর্ম্মে উৎসাহিত করিবার জন্য চাষের প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল; এবং বিশেষ পরিশ্রমী চাষীদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখান হইত। এইরূপে চাষের উপযোগী প্রত্যেক ইঞ্চি জমিই আবাদ হইয়াছিল, এবং দেশ জনপূর্ণ হইয়াছিল। অধিবাসিদিগের মধ্যে অনেকের ধন এবং সকলেরই সুখ-সন্তোষ ও তৃপ্তি ছিল। প্রত্যেক গ্রামের খাজনার হার অল্প ও নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই হার বিনা গোলমালে নির্দ্ধারিত হইত এবং প্রজারা বিনা কষ্টে খাজানা দিতে পারিত। কোন দেশের রাজস্ব-নীতি সম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসা আর কি হইতে পারে? পুণার প্রথম ইংরেজ কলেক্টর কাপ্তেন রবার্টসন লিখিয়াছেন যে, নানার প্রভুত্ব সময়ে বাছিয়া-বাছিয়া উচ্চবংশের সচ্চরিত্র যুবকদিগকেই মামলতদার ও সুবেদার নিযুক্ত করা হইত। বিশ্বস্ত লোককে এই সকল চাকরী খাজনার টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন কড়ার না করিয়াই দেওয়া হইত।* নানার সুশাসনে দেশে অন্যায় অত্যাচার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। উচ্চবংশীয় যোগ্য ব্যক্তিদিগের

হাতে বিভিন্ন জিলার ভার ছিল। প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণে দেশব্যাপী কোন বিপদ হইলে তজ্জনিত ক্ষতি ও ছোট-খাট অনেক লোকসান সরকার সহিয়া লইতেন,—সাধারণ লোকের কোন অনিষ্ট হইত না। এই জন্যই, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষের পরও, দেশের অধিকাংশ জমিই অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত পুরাতন মালিকদের হাতেই ছিল। Between 1772 and 1800, the years of the administration of Nana Fadnis the management of the Peshwas Land Revenue was perhaps more efficient than at any other time. The Mamledars or Subhedars were chosen from families of character and respectability. The office was given to trustworthy persons without any special agreement as to the amount of revenue their charges would supply. Under Nana's management abuses were restrained within narrow limits. Under the system above described, with as a rule, men of ability and position in charge of the same districts for long times of years and with the provision that the weight of all general calamities and of most minor losses should fall on the government and not on the people, inspite of the terrible period of distress caused by the famine of 1792 the bulk of the land-holders remained on their hereditary estates till the close of the 18th century. ইংরেজ-বিজয়ের পর সুবিখ্যাত এলফিনষ্টোন সাহেব মহারাষ্ট্রে পুরাতন রাজস্ব-নীতিই অব্যাহত রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম-প্রথম এলফিনষ্টোনের মত সহৃদয় শাসনকর্ত্তাও যে দেশের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও প্রজার মনের অসন্তোষ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই, তাহার বহু প্রমাণ Bombay in the days of George IV নামক গ্রন্থে বোম্বায়ের তদানীন্তন প্রবীণ বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড ওয়েষ্টের পত্নী লেডি ওয়েষ্টের দৈনন্দিনী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রবার্টসন বলিয়াছেন যে, ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও দেশের ভূম্যধিকারিগণ তাহাদের পৈতৃক ভূমি হারান নাই; আর শ্রীমতী ওয়েষ্টের দৈনন্দিনীর সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন যে, যখন এলফিনষ্টোন মারাঠা শাসনের নিন্দা ও কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতির বহু প্রশংসা করিয়া, তাঁহার সুবিখ্যাত রিপোর্ট লিখিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই মহারাষ্ট্রের প্রজাগণ অনশনে কাতর ও অবিচারে উত্যক্ত হইয়া, দলে দলে পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া, নিকটস্থ দেশীয় রাজ্যগুলিতে চলিয়া যাইতেছিল। মারাঠা শাসন পদ্ধতি তুলনায় যে কোম্পানীর শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট ছিল না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পেশবা যুগের রাজস্ব নীতি সেকালের পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাজস্ব-পদ্ধতির তুলনায়ও অপকৃষ্ট ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠা কৃষকের অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর আইরিশ প্রজাদিগের তুলনায় অনেক ভাল ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও আইরিশ প্রজাগণ যে সকল অধিকারের জন্য আন্দোলন করিতেছিল, সেই ন্যায্য খাজনার হার, দীর্ঘকালের জন্য জমির চাষের স্বত্ব, প্রভৃতি অধিকার মারাঠা প্রজাদিগের বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল। পেশবা জ্যেষ্ঠ মাধবরাও তাঁহার রাজ্যে 'বেঠ বেগার' রহিত করিয়াছিলেন। এই সেদিন সংবাদপত্রে পড়িলাম যে, মধ্য-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সমিতিতে মাননীয় মিঃ দীক্ষিত প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ঐ প্রদেশ হইতে বেগার ধরিবার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হউক। তাঁহার প্রস্তাবের ফল কি হইয়াছে জানি না। ফরাসী দেশের প্রজাগণকেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত জমিদারের জন্য ও সরকারের জন্য বেগার খাটিতে হইত। সে দেশে বেগার-প্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে তখন, যখন বিপ্লবের বিরাট রক্ত-প্রবাহে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, জমিদার ও কৃষকের সকল বৈষম্য ভাসিয়া গিয়া, ফরাসী দেশের প্রাচীন সমাজ, প্রাচীন শাসন-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষের উপর নবীন সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুলিলে চলিবে না। মারাঠা প্রজার যতই অধিকার থাকুক না কেন, সে তাহা রাজার নিকট হইতে বাহুবলে কাড়িয়া লয় নাই। তাহার সমস্ত অধিকারই রাজার দয়াদত্ত দান, আর ইংরাজ ও ফরাসী প্রজার সকল অধিকার তাহাদের প্রাণের বিনিময়ে

অর্জ্জিত, বাহুবল-লব্ধ। এক রাজা যাহা স্বেচ্ছায় দান করিয়াছিলেন, অপর রাজা তাহা আবার ফিরাইয়া লইতে পারেন। মহারাষ্ট্রের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। শিবাজী হইতে নানা ফড়নবিস পর্য্যন্ত এতগুলি মহামনীষী দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য যে শাসন-পদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়াছিলেন, তাহা দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের তর্জ্জনী-হেলনে একেবারে বিপর্য্যস্ত হইল; প্রজার কোন আবেদনে তিনি কর্ণপাত করিলেন না। রঘুনাথের দৌর্ব্বল্য ও আনন্দীবাইয়ের কুটিলতার উত্তরাধিকারী অর্থ-পুত্র, দ্বিতীয় বাজীরাও সাহেব আবার দেশের খাজানা ইজারা দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। শিবাজী যে কুপ্রথা রহিত করিয়াছিলেন, বাজীরাও তাহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিলেন। ফলে, দুষ্ট লোকেরা ইজারা ঠিক হইবার সময়ে, অনেক বেশী টাকা হাঁকিয়া, মামলতদার ও সুবেদারের পদ কিনিয়া লইতে লাগিল। প্রজার শক্তি নাই যে সে অত টাকা দেয়। তাই প্রতি বৎসর নূতন-নূতন মামলতদার খাজনার ইজারা লইয়া তালুক ও পরগণার মালিক হইয়া আসিতে লাগিলেন। যাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আরম্ভ কালের বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফলের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। নূতন ইজারাদারের সহিত পরগণার প্রজার এক বছরের মাত্র সম্পর্ক; সুতরাং সে তাহাদিগকে দয়া করিবে কেন? এই এক বৎসরের মধ্যে সে তাহার তহবিল যতটা পূর্ণ করিয়া লইতে পারে, ততই তাহার লাভ। আগে খাজনার হার বেশী হইলে, পাটীল ও কুলকর্ণীর প্রতিবাদে তাহার প্রতিবিধান হইত। নূতন ইজারাদারেরা পাটীলের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পাটীল তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অসম্মত হইলে, ইজারাদারেরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াই খাজানা আদায়ের উপলক্ষে প্রজার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারের প্রতাপে মহারাষ্ট্রের অমন পল্লী-সমাজও পঙ্গু হইয়া পড়িল। কোন পদ্ধতিই, সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রবল প্রজামত পশ্চাতে না থাকিলে, রাজার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে টিকিতে পারে না। তাই পেশবা-কুল-কলঙ্ক, কাপুরুষ বাজীরাওও অনায়াসে মারাঠা-সাম্রাজ্যের প্রাচীন শাসন-পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছেন। দেড় শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত বহু মনীষির একাগ্র সাধনায় যে শাসন-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, একজন মাত্র কুশাসকের চেষ্টায় তাহা ধ্বংস হইয়া গেল। আর ঐ সময়েই ফরাসী দেশে প্রবল প্রজামতের ভৈরব হুঙ্কারে বহুদিনের জরাজীর্ণ স্বেচ্ছাতন্ত্রের শক্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময়েই সমবেত জনমণ্ডলীর ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে রাজ-কারাগার বাস্তিলের লৌহ-কবাট মহা-শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই সঙ্গে স্বাধীনতার স্বর্ণ দেউলের অবরুদ্ধ দ্বারও পশ্চিমের জনগণের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল। সে দেশে সেই দেউলের পূজা-আরতি এখনও মহোৎসবে চলিতেছে।

১০। বাট্টাই

মহারাষ্ট্রে খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট হইত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনুসারে, এ কথা আগে অনেক বার বলিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া পেশবা সরকার শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ ভাল জমি হইতে গ্রহণ করিতেন না। পাহনীদারেরা দেখিয়া-শুনিয়া একটা নিরিখ বাঁধিয়া দিতেন; প্রজারা সেই নিরিখ অনুসারে খাজানা দিত। অজন্মা হইলে প্রজা খাজনা রেহাই পাইত। খারাপ জমির বেলায় কিন্তু প্রজারা রাজার সহিত একটা হারাহারি ভাগের বন্দোবস্ত করিতেই চাহিত,—রাজাও এই বাট্টাই বন্দোবস্তে আপত্তি করিতেন না। রাণাডের ভাষায় বাট্টাই বিভাগের পরিচয় দিতেছি। "Whenever the Battai or system of crop division obtained, the Government after deducting for seeds and other necessary charges paid by the Ryots, left ½ or ⅓ of the crop to the cultivator, and took the rest for the State...... The Battai system was not much in favour." এক কথায়, চাষের ব্যয় বাদ দিয়া বাকী শস্যের অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ প্রজা পাইত, বাকী অংশ সরকারে যাইত। মনে রাখিতে হইবে যে, বাট্টাই প্রথার প্রচলন খুব অল্প যায়গায়ই ছিল; এবং এই প্রথা ক্রমে-ক্রমে লোপ পাইতেছিল।

মহীশূর—শ্রবণ বেলগোলা

[শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বি-ই]

(৩)

মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া, বিশ্রাম না করিয়াই, মন্দির-দর্শন ও তাহার নির্মাণ-পদ্ধতি ও বৈচিত্র্যগুলি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। দেবরাজাইয়া বলিলেন যে, একজন নির্গ্রন্থ সাধু নিকটবর্ত্তী মন্দিরে আছেন,—চলুন তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাওয়া যাক্। শুনিলাম, ইনি পূর্ব্বে ম্যাঙ্গালোরে বাস করিতেন। ম্যাঙ্গালোরে অনেক জৈনের বাস। ইঁহারা সকলেই দিগম্বর-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইনি পূর্ব্বে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বণিক ছিলেন। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ব্যবসা উপলক্ষে তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। স্বগ্রামে ফিরিবার সময় তিনি দেখেন যে, কাহার শব দাহ করা হইতেছে। জিজ্ঞাসায় জানিলেন যে, তাঁহারই স্ত্রীর মৃতদেহ দগ্ধ করা হইতেছে, তিনি সহসা মারা গিয়াছেন। সেই মুহূর্ত্তে তিনি সমস্ত অর্থ ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিলেন। নির্গ্রন্থ সাধুরা নগ্ন; কাহারও কাছে কিছু প্রার্থনা করেন না। দেখিলাম, তিনি একটি ভগ্ন কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিয়া আছেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করাতে তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। ইঁহার আকৃতি অনেকটা কাশীস্থ স্বর্গীয় ভাস্করানন্দ স্বামীর ন্যায়। ইনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিলেন না; অন্য কাহারও সহিত কথা কহেন নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকটে আসীন ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, ইঁহার সমেতগিরি বা পরেশনাথ পর্ব্বত দেখিবার বড় ইচ্ছা; নগ্ন বলিয়া রেলগাড়ীতে যাইতে দিবে কি? আমি 'না' বলাতে তিনি একটু মলিন হাসি হাসিলেন। আমি বলিলাম, সামান্য বস্ত্রে নগ্নতা ঢাকিয়া যাইলে ক্ষতি কি? তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, যাহা একবার ত্যাগ করা যায়, তাহা কি আর গ্রহণ করিতে আছে? ইঙ্গিতে দুঃখের ভাব দেখাইয়া বলিলেন যে, না যাইতে পাইলে আর বিশেষ ক্ষতি কি? শুদ্ধ তীর্থ দর্শন করা হইবে না বই ত আর কিছুই নহে। এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে পল্ল-নাভাইয়ার পুত্র ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন শুনিলাম যে, নির্গ্রন্থ সাধু পরেশনাথ দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

সাধুকে দেখিয়া আমার বিশেষ ভক্তি হইল। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি ও ঈষৎ আনত নয়ন আমার বেশ লাগিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল, যেন মনের মধ্যে কিসের অন্তঃপ্রবাহ চলিতেছে। তিনি আমাকে ইঙ্গিত দ্বারা পর-দিন আসিতে বলিয়া দিলেন।

আমরা যে বারাণ্ডায় বসিয়া সাধুকে দর্শন করিতে-ছিলাম, তাহারই আর এক কোণে দুইটী সাধু রহিয়াছেন দেখিলাম। তাঁহাদের একজনের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর; অপর সাধুটি পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স্ক। ইঁহাদের পরিধানে গৈরিক বসন। ইঁহাদের সম্বলের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক ও দুই-একখানি গৈরিক বস্ত্র। যুবা সন্ন্যাসীটি কোন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কি লিখিয়া লইতেছেন দেখিলাম, এবং বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিতেছেন। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও হিন্দী ও সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য এই দুই ভাষার ব্যাকরণ পাঠ করিতেছেন। যুবক সন্ন্যাসীটি হিন্দী বা সংস্কৃতের কোন ধার ধারেন না। ইঁহার মুখ-মণ্ডল সরলতাপূর্ণ; ইনি যেন সর্ব্বদা হাস্য করিতেছেন। এই দুইটি সাধুকে "ক্ষুল্লক" সাধু বলে; প্রথমোক্ত সাধুটি নির্গ্রন্থ শ্রেণীভুক্ত। বৃদ্ধ ক্ষুল্লকের নিকট হইতে তাঁহাদের সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম।

নির্গ্রন্থের অনেকগুলি নাম। নির্গ্রন্থ, দিগম্বর শ্রমণ, জাতরূপধর, ক্ষপক, ঋষি, মুনি, যতি,—ইহারা একার্থবাচী। ইঁহাদিগের আর এক নাম মহাব্রতী; ক্ষুল্লক মহাব্রতী নহেন, ইনি অনুব্রতী বা অল্পব্রতী। ক্ষুল্লকেরা দিবসে একবার ভোজন করিয়া থাকেন এবং ভোজনের পূর্ব্বে ৫টি পাত্র জল দ্বারা স্নান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে মূল, বার্ত্তাকু,

এবং তৈল-ভর্জ্জিত সর্ব্বপ্রকার খাদ্য নিষিদ্ধ। কোন শস্য বা কোন কিছুর সমগ্র তাঁহারা আহার করিতে পারেন না। আহারের পূর্ব্বে চূর্ণ বা ভগ্ন করিয়া আহার করিতে হইবে। তাঁহাদের পক্ষে মিষ্টান্ন ভোজনও নিষিদ্ধ। শর্করা, গুড়, দধি, দুগ্ধ, মধু ও নারিকেল ভোজনে কোন নিষেধ নাই। পীড়িত হইলেও ভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ গ্রহণ করা নিয়মবিরুদ্ধ; ভোজনের সময় ঔষধ গ্রহণ করিতে পারেন। ক্ষুল্লকের পক্ষে সঙ্গীত সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। ক্ষুল্লককে নিম্নলিখিত ব্যসনগুলি মন হইতে দূর করিতে হইবে;—ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ, হাস্য, রতি, অরতি অর্থাৎ অবিশ্বাস, শোক, ভয়, জুগুপ্সা, হিংসা, লিঙ্গভেদজ্ঞান। ক্ষুল্লক সাধুকে মস্তক ও গুম্ফ মুণ্ডিত করিতেই হইবে। নিগ্রন্থ সাধুর পক্ষে মুণ্ডন অনাবশ্যক; তবে তিনি ইচ্ছা করিলে হস্ত বা অঙ্গুলি দ্বারা কেশ উৎপাটিত করিতে পারেন। সাধুরা এই ব্যাপারের নাম রাখিয়াছেন "শোচন ক্রিয়া।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নিগ্রন্থ সাধু আমাকে ইঙ্গিত দ্বারা কল্য আসিতে বলিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আমরা মন্দির-দর্শনে বহির্গত হইলাম। প্রথমে যে মন্দিরটি দেখিলাম, তাহার নাম আক্কান বস্তি বা বসতি। ইহা পার্শ্বনাথ স্বামীর মন্দির। ইহা পূর্ব্বমুখী ও চালুক্য রীতিতে বাড়াপা প্রস্তরে (pot stone) নির্ম্মিত। এখানে একটি অনুশাসন-লিপি ক্ষোদিত আছে; ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, মন্দিরটি ১১৮২ অব্দে বীর বল্লাল নরপতির মন্ত্রী চন্দ্রমৌলির স্ত্রী অচল দেবী কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বীর বল্লাল জৈন নরপতিদিগের অন্যতম। এই অনুশাসন হইতে সেকালের একটি সুন্দর সামাজিক প্রথার বিষয় অবগত হওয়া যায়। বীর বল্লালের মন্ত্রী চন্দ্রমৌলি একজন শাস্ত্রজ্ঞ শৈব ব্রাহ্মণ এবং তাঁহার স্ত্রী অচল দেবী জৈন ছিলেন। অচল দেবীর গুরু নয়কীর্ত্তির শিষ্য বালচন্দ্র। ইনিই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্রমৌলি স্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পূজারাগ প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নরপতির নিকট হইতে একটি গ্রাম দান স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন। ইহার আয় হইতে ও তৎকালীন সামন্ত রাজা ও বণিক-দিগের দান হইতে মন্দির-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

অচল দেবী একজন ভক্তিমতী, নিষ্ঠাযুক্তা জৈন ছিলেন। ইঁহারই প্রার্থনায় জৈন নরপতি বীর বল্লাল দেব পূর্ব্ববর্ণিত গোমতেশ্বরের সেবা, পূজা প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বেক্কা গ্রাম দান করেন। এই মন্দিরের স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেক নূতন-নূতন তথ্য সংগ্রহ করিলাম। এ প্রবন্ধে সে সকলের উল্লেখ করিলে, সাধারণ পাঠকের তাহা বোধগম্য হইবে কি না, এই আশঙ্কায় তৎসম্বন্ধে পৃথক্ প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। তবে এখানে দুই-একটি সাধারণ কথার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মন্দিরটির মুখ-মণ্ডল প্রভৃতি লইয়া চারিটি অঙ্গ বিদ্যমান। মুখমণ্ডলের দুই পার্শ্বে চালুক্যরীত্যন্তর্গত রক ও ক্রমনিম্ন আলিসা বিদ্যমান। অদ্ধমণ্ডলের স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য অতিশয় সুন্দর ও জটিলতাশূন্য। স্তম্ভগুলির মধ্যকার ব্যবধান ইহাদের পাদপীঠ বা অধিষ্ঠানের প্রস্থের সার্দ্ধ দুই গুণ; শ্রবণ-বেলগোলাস্থ ও মহীশূরের নিকটবর্ত্তী চালুক্য মন্দিরে সাধারণতঃ এই ব্যবধানটি স্তম্ভপাদের প্রস্থের ২॥ হইতে ৩ গুণ হইয়া থাকে দেখিয়াছি। অদ্ধমণ্ডপের সরদালের উপর আর্য্যাবর্ত্তীয় রীতিতে মন্দিরের প্রতিকৃতি ও তন্মধ্যে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। অদ্ধমণ্ডল ও অন্তরালের দ্বারদেশের পার্শ্বে দ্বারপালের মূর্ত্তি লক্ষিত হয় না। ইহা এ মন্দিরের একটী বৈচিত্র্য বলিতে হইবে। গর্ভগৃহের সরদালের উপর তীর্থঙ্কর-মূর্ত্তি ক্ষোদিত। চালুক্য রীতিতে দেখা যায় যে, শেখরের নিম্নে গর্ভগৃহের উচ্চতা ইহার জঙ্ঘার ৩ গুণ। এ মন্দিরে এ অনুপাতের কোন বৈলক্ষণ্য দেখিলাম না। ইহার শেখর সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আমি শেখরটিতে আর্য্যাবর্ত্তীয় রীতির বিশেষ প্রভাব ও ইহার সহিত নিকট সম্বন্ধ ও সাদৃশ্য দেখিলাম। দ্রাবিড়রীতি অপেক্ষা আর্য্যাবর্ত্তীয় রীতির সহিত সম্বন্ধ অধিক-তর ঘনিষ্ঠ স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আর্য্যাবর্ত্তীয় রীতির ন্যায় শেখরের কোণদেশ আমলক দ্বারা বিভক্ত। এই আমলকগুলি শেখরকে যেন ভিন্ন-ভিন্ন তলে বিভক্ত করিয়াছে, এবং ইহার প্রত্যেক দিকের মধ্যদেশে তল-বিভাগকারী হিসাবে কীর্ত্তিমুখ মূর্ত্তি ও তাহার নিম্নস্থ গোলাকার ক্ষেত্রের মধ্যে তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি বিরাজমান। উড়িষ্যার প্রত্যেক মন্দিরে এইরূপ তলবিভাগকারী গোলা-কার ক্ষেত্র দৃষ্ট হয়; তথায় এ গুলির পারিভাষিক নাম

"ভাস্‌" ; ইহা বোধ হয় "ভাঃ" হইতে গৃহীত। যাহা হউক, শেখরের শীর্ষদেশ বা গম্বুজ* লইয়া ইহাকে চারিতলে বিভক্ত মনে করা যাইতে পারে; শেখরশীর্ষের উপরেও "কীর্ত্তিমুখ" ক্ষোদিত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, মন্দিরে চারিটি তলের ব্যবস্থার মধ্যে একটি সুন্দর আধ্যাত্মিক অর্থ রহিয়াছে। জৈনপুরাণ মতে জম্বুদ্বীপস্থ মেরুপর্ব্বতে চারিটি অরণ্য বিদ্যমান ; ইহাদের নাম যথাক্রমে, ভদ্রশালবন, নন্দনবন, সৌমনসঃ বন, পাণ্ডুক বন। নিম্নতল হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির-শেখরের এই চারিটী তলদেশ যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত চারি নামে অভিহিত করা হয়। বন নামের সার্থকতার জন্য কীর্ত্তিমুখগুলির পার্শ্বে লতাপত্রাদি ক্ষোদিত দৃষ্ট হয়।

আক্কানবস্তি দর্শনানন্তর আমরা নগরজীনালয় বস্তি দেখিতে যাইলাম। এ মন্দির ১১৯৬ অব্দে নির্ম্মিত হয় এবং এখানে আদিদেব বা ঋষভদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্ব-বর্ণিত আক্কানবস্তি ও এই মন্দিরের ভাস্কর্য্য কৌশলে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এ স্থানেও দেখা গেল যে, শেখর-নিম্নস্থ গর্ভগৃহের উচ্চতা জজ্ঘার ৩ গুণ।

মন্দিরগুলি দর্শন করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাসায় আসিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া কাফি পান করিয়া সুস্থ হইলাম। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা আহার করিয়া আসিয়া মিলিত হইলেন ; জৈনধর্ম্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা চলিতে লাগিল। ইঁহারা অনেকে সমস্ত দিন তাঁহাদের পিত্তলের কারখানায় ঢালাই ও পিটাই প্রভৃতি কার্য্য তদারক করিয়া ক্লান্তদেহে ও মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চ্চা করিতে কোনও কষ্ট অনুভব করিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে এক জন পিত্তল-ব্যবসায়ী ভাল ইংরাজী জানেন না ; আমার সহিত সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। ইনি সংস্কৃতে বেশ কথা কহিতে পারেন। ইঁহার নাম শিব-রামাইয়া। ইনি আমাকে রাইস্‌-প্রণীত Inscriptions at Sravan Belgola পাঠ করিতে দিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা চলিল। রাত্রি অধিক হওয়াতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, আমিও আহারাদি করিয়া নিদ্রা গেলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে (১০—৯-১৫) সকলে মিলিয়া শ্রবণ বেলগোলা গ্রামের উত্তর দিকস্থ চন্দ্রগিরি পর্ব্বতস্থিত মন্দির দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম। চন্দ্রগিরি বিন্ধ্যগিরি অপেক্ষা প্রায় তিনশত ফিট নীচু। এই পর্ব্বতের সহিত জৈনদিগের প্রাচীন ইতিহাস জড়িত। চন্দ্রগুপ্ত হইতে পর্ব্বতটির নাম চন্দ্রগিরি হইয়াছে। এ চন্দ্রগুপ্ত মহারাজ অশোকের পিতামহ বলিয়া জৈনদের বিশ্বাস; কেন না, এ পর্ব্বতে উৎকীর্ণ এক অনুশাসনে লিখিত আছে যে, এই চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রে রাজত্ব করিতেন ; এবং ইনি যে ভদ্রবাহুর শিষ্য, তিনি খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্ব্বেকার লোক। কিন্তু কথা হইতেছে যে, অনুশাসনটি কবে উৎকীর্ণ হইয়াছিল? ইহা কখনই অষ্টম বা নবম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার নহে। ভদ্রবাহু শ্রুতকেবলীদিগের মধ্যে সর্ব্বশেষে আবির্ভূত হয়েন। ইঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিয়া রাখা ভাল। ভদ্রবাহু ও অন্যান্য ত্রয়োদশ জন শ্রুত-কেবলী ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দেখিলেন যে, দ্বাদশ বর্ষব্যাপী, অশেষ দুঃখপ্রদ দুর্ভিক্ষ অচিরে উপস্থিত হইবে। ইহা শুনিয়া সমস্ত জৈনসঙ্ঘ তাঁহার অধীনে ভারতের উত্তর দেশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা যখন চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে উপস্থিত হয়েন, তখন ভদ্রবাহু বিশেষ পীড়িত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত। তাঁহার সেবার জন্য কেবল চন্দ্রগুপ্তকে আপনার নিকট রাখিয়া দিয়া, জৈন সঙ্ঘকে বিশাখ-মুনির নেতৃত্বে চোল এবং পাণ্ড্যরাজ্যে যাইতে আদেশ করিলেন। এই পর্ব্বতে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার গুরু ভদ্রবাহুর সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভদ্রবাহুর জীবনাবসান হয়। ইহার পরে এক গুহার মধ্যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ইহারই মধ্যে তাঁহার পদচিহ্ন পূজার্চ্চনা করতঃ এই পর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। এইখানেই তাঁহারও জীবন-লীলার শেষ হয়। যাহা হউক, চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে শেষ শ্রুত-কেবলী ভদ্রবাহুর জীবনাবশেষ হয় বলিয়া দিগম্বর জৈনদিগের বিশ্বাস ; এবং এই কারণে এই স্থান সমস্ত দক্ষিণ-ভারতের মধ্যে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান।

চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে উঠিয়া প্রথমেই ভদ্রবাহু-গুহা দর্শন করিলাম। এইখানে ভদ্রবাহু জীবন ত্যাগ করেন। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানের চারিদিকে ভিত্তি বা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরের মত করিয়া দিয়াছেন। ইহা পর্ব্বতের ক্রমনিম্ন অংশের সর্ব্বনিম্নে অবস্থিত। তাহার মধ্যে পদ্মাঙ্কিত

* আর্য্যাবর্ত্তীয় রীতিতে ইহার নাম কপুরী।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭

প্রথম খণ্ড] অষ্টম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

গীতায় জ্ঞান ও ভক্তি

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে ধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট, তাহা এই—ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম-সমর্পণ কর। ইহা ভক্তের কথা; অতএব গীতায় ভক্তির স্থানই প্রধান। তাই বলিয়া জ্ঞানকে অবহেলা করা হয় নাই,—গীতাতে ভাল কোন জিনিষকেই অবহেলা করা হয় নাই। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, সন্ন্যাস—জগতে যাহা কিছু ভাল, গীতা সে সকলেরই আধার স্বরূপ। কিন্তু গীতায় জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকেই বড় বলা হইয়াছে। তাই এই অলৌকিক উপদেশাবলির উপসংহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

> সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
> ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং॥
> মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
> মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
> সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
> অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

১৮ অধ্যায় ৬৪—৬৬ শ্লোক

"আমার সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয় উৎকৃষ্ট বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য তোমার মঙ্গলজনক বাক্য বলিতেছি। আমাতে তোমার মন নিবিষ্ট কর, আমাতে ভক্তিমান হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে প্রণাম কর; তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে—তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি,—তুমি আমার প্রিয়। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাতেই শরণ লও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব,—শোক করিও না।"

ইহা লক্ষ্য করা উচিত যে, ভগবান তাঁহার শেষ উপদেশে

যে বাক্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞানের কথা কিছু বলিলেন না—শুধু ভক্তির কথা বলিলেন; তাঁহাতে মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া একান্ত ভাবে তাঁহার শরণ লইতে বলিলেন; এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই উপায়ে তাঁহাকে নিশ্চয় পাওয়া যাইবে।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং॥

১৮।৬২

"হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্বপ্রকারে ভগবানের শরণ লও। তাঁহার প্রসাদে তুমি পরম শান্তি এবং শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হইবে।"

সংশয় হইতে পারে, কোন্ বাক্য গ্রহণ করিব,—গীতার বাক্য, না উপনিষদের বাক্য? গীতা বলিলেন, ভগবানকে ভক্তি কর, তাহা হইলে মোক্ষলাভ হইবে; উপনিষদ বলিয়াছেন, ভগবানকে জানিতে চেষ্টা কর,—ভগবানকে জানিলেই মোক্ষলাভ হয়,—মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

কিন্তু বাস্তবিক উভয় বাক্যের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। কারণ, ভগবানকে জানিবার শ্রেষ্ঠ উপায়—একান্ত ভাবে তাঁহার শরণ লওয়া। তিনি কি, তাহা তিনি নিজে না জানাইলে, জানিবার উপায় নাই। উপনিষদ বলিয়াছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষবৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং

"এই আত্মা (ব্রহ্ম—ভগবান) উৎকৃষ্ট বচন দ্বারা লাভ করা যায় না, বুদ্ধি বা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই আত্মা স্বয়ং যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই ইঁহাকে পাইয়া থাকেন,—তাঁহার নিকট আত্মা নিজ তনু প্রকাশ করেন।"

কিন্তু কিরূপ ব্যক্তিকে ভগবান স্বয়ং বরণ করেন, কোন্ ভাগ্যবানের নিকট তিনি নিজ তনু প্রকাশ করেন? ভগবদ্গীতায় ভগবান সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন।

মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থং অহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থঃ জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

১০।৯,১০,১১

ভগবান বলিতেছেন, "মদ্ভক্ত পণ্ডিতগণ আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণ করে, পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া থাকে, সর্ব্বদা আমার কথা কহিয়া থাকে,—ইহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয়, ইহাতে তাহাদের আনন্দ হয়। সেই সকল ব্যক্তি সর্ব্বদা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া রাখে, এবং প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে—আমি তাহাদিগকে সেইরূপ বুদ্ধি দিয়া থাকি, যদ্দ্বারা তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে। তাহাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক আমি উজ্জ্বল জ্ঞানদীপের সাহায্যে তাহাদের অজ্ঞানজ অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি।"

ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, সদাসর্ব্বদা মন ভগবানে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে,—সাংসারিক সুখ, ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি অন্য যাবতীয় বিষয়ের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। ভগবানের সহিত মনের যোগ সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই উদ্দেশ্যে গীতায় "নিত্যযুক্ত" শব্দ বহুবার ব্যবহার করা হইয়াছে।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। ৭।১৭
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥ ৮।১৪
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯।১৪
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০
ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমাঃ মতাঃ॥ ১২।২
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। ১৩।১০

এইরূপ ভক্তিযোগ অত্যন্ত কঠিন; কারণ, মনের স্বভাব বড় চঞ্চল। কিছুক্ষণ মন স্থির করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে, মন বারবার সংসারের তুচ্ছ বিষয়ে

আকৃষ্ট হইয়া তাহাতেই তন্ময় হইয়া যায়। তাই অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥ ৬,৩৪

উত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

মন স্থির করিবার দুইটি উপায়—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। যতবার মন বিষয়ে উপরত হইবে, ততবার তাহাকে বিষয় হইতে তুলিয়া আনিতে হইবে—ইহাই অভ্যাস। দ্বিতীয়তঃ বৈরাগ্য—ভগবান ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্তি থাকিবে না; সংসারের নানা বিষয়ে আসক্তি থাকে বলিয়াই আমাদের মন তৎপ্রতি ধাবমান হয়; ঐ আসক্তি নিবারণ করিলে মনের গতি প্রতিরুদ্ধ হয়—মন স্থির হইয়া থাকে। এই প্রকার অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মন স্থির করিয়া, সেই মন সর্ব্বদা ঈশ্বরে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। ইহাই ভক্তিমার্গ বা ভক্তিযোগ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গীতা হইতে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতিপন্ন হইবে যে, ভগবানকে লাভ করিবার জন্য ভক্তিমার্গ গ্রহণ করিতে গীতা বারবার উপদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা নিম্নে আরও কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪

(এই শ্লোকের প্রথম পাদটি ১৮ অধ্যায়ের ৬৫ শ্লোকে পুনরায় উক্ত হইয়াছে; সেখানে ইহাকে "সর্ব্বগুহ্যতম" বাক্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।)

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহং এবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥
মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ১১।৫৩-৫৫

গীতার মতে, জ্ঞানমার্গ শ্রেষ্ঠ, না ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ,—এ বিষয়ে সংশয় হওয়া উচিত নহে; কারণ, অর্জ্জুন এই প্রশ্ন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে মীমাংসা করাইয়া লইয়াছেন। একাদশ অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলি শুনিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১২।১

উত্তরে শ্রীভগবান বলিতেছেন,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ১২।২-৫

কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে উপরিউক্ত শ্লোকে জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হইল না। তিনি শ্লোকগুলির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—সকল ভক্তের মধ্যে সেই ভক্তই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠ), যে ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া, সর্ব্বদা অবহিত-চিত্ত হইয়া, পরম শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের উপাসনা করে। আর যাহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিকার, অচিন্তনীয়, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা সাক্ষাৎ ভগবানকে পাইয়া থাকে,—তাহাদের যুক্ততমত্ব বা অযুক্ততমত্বের প্রশ্ন উত্থিত হয় না।

"ন তু তেষাং বক্তব্যং কিঞ্চিদ্যাং তে প্রাপ্নুবন্তীতি। "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" (গীতা ৭।১৮) নহি ভগবৎস্বরূপাণাং সতাং যুক্ততমত্বমযুক্ততমত্বং বা বাচ্যং।"

(১২ অধ্যায় ৪ শ্লোকের শঙ্করভাষ্য)।

অনুবাদ:—তাহাদের (জ্ঞানীদের) বিষয়ে কিছুই বক্তব্য নাই; কারণ, তাহারা আমাকে পাইয়া থাকে। "জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ" (গীতা ৭।১৮)। যাহারা ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের যুক্ততমত্ব বা অযুক্ততমত্ব প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

পূজ্যপাদ আচার্য্য দেবের প্রতি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা বলিতে বাধ্য যে, তিনি শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীভগবান তাঁহার ভক্তদের প্রশংসা করিতেছিলেন। এ অবস্থায় স্বভাবতঃই

অর্জ্জুনের মনে প্রশ্ন উঠিল—কাহারা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী না ভক্ত? এবং শ্রীভগবান উত্তর করিলেন, ভক্তই তাঁহার নিকটতম। যদি শ্রীভগবানের অভিপ্রায় এইরূপ হইত যে, জ্ঞানী তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং ভক্ত তাঁহার অতি সমীপস্থ, তাহা হইলে তিনি এরূপ উত্তর দিতেন না;—তাহা হইলে তিনি বলিতেন, জ্ঞানী আমার নিকটতম।

অধিকন্তু, ইহাও লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, যে হিসাবে জ্ঞানীকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা যাইতে পারে, সে হিসাবে ভক্তকেও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিতে হইবে। কারণ, অদ্বৈত মতে, প্রত্যেক জীবের আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; এবং আত্মা ব্যতীত জীবের অপর সকল অংশ মিথ্যা; অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। সুতরাং এ কথা বলা যায় না যে, জ্ঞানীর আত্মাই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ভক্তের আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। যদি এরূপ আপত্তি হয় যে, ভক্তের আত্মা ব্রহ্ম হইতে বাস্তবিক অভিন্ন হইলেও, ভক্ত সেই ঐক্য অনুভব করে না,—তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, জ্ঞানমার্গের সাধকও প্রথম হইতে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করে না। আচার্য্যের নিকট "তৎত্বম্ অসি" এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া, শিষ্যের সেই মুহূর্ত্তেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি হয় না;—বিচার করিয়া, মনঃস্থির পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ধ্যান করিবার পর, সত্যজ্ঞান উদয় হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলেই আবার মোক্ষ হয় না,—বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

তস্য তাবদেবচিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে।

"জ্ঞানীর (মোক্ষলাভে) ততদিন পর্য্যন্ত বিলম্ব হয়, যতদিন না দেহ পরিত্যাগ করা হয়। যখন তিনি দেহ পরিত্যাগ করেন, তখন ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান।"

গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির অর্থ এইরূপ বলিয়া বোধ হয়,—যিনি জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন, এবং যিনি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন—উভয়েই অবশেষে ভগবানকেই প্রাপ্ত হন; কিন্তু ভক্তিমার্গ শ্রেয়ঃ; কারণ, জ্ঞানমার্গ দ্বারা ভগবানকে লাভ করা অতিশয় কঠিন। জ্ঞানীদের সম্বন্ধেই ভগবান বলিলেন, "তে প্রাপ্নুবন্তিমামেব" এই কথার উপর শঙ্করাচার্য্য জোর দিয়াছেন। তাঁহার বলিবার যেন উদ্দেশ্য, ভক্তদের সম্বন্ধে ভগবান সে কথা বলেন নাই। প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য্যদেব কি ইহা লক্ষ্য করেন নাই যে, অর্জ্জুনের প্রশ্নের অতীতানন্তর শ্লোকগুলিতে (যে শ্লোকগুলি শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে প্রশ্নের উদয় হইল) শ্রীভগবান ভক্ত সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, "স মামেতি?"

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।

নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥ ১১।৫৫

বাস্তবিক পক্ষে ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন ঘনিষ্টতম বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।

জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪

"ভক্তির দ্বারা ভগবানকে জানা যায়, দেখা যায়, ভগবানের অন্তরে প্রবেশ করা যায়।" বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে সকল শ্লোক পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও বলা হইয়াছে যে, ভক্তি দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় (১৮ অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক, ১০ অধ্যায় ১০ শ্লোক, ৯ অধ্যায় ৩৪ শ্লোক)। সুতরাং, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না যে, জ্ঞানীদের সম্বন্ধেই ভগবান বলিয়াছেন, "তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব" এবং ভক্তদের সম্বন্ধে তাহা বলেন নাই। *

দ্বাদশ অধ্যায় চতুর্থ শ্লোকের পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাষ্যে আচার্য্যদেব "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" (৭।১৮) এই ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।

আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তির্বিশিষ্যতে।

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মমপ্রিয়ঃ॥

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং।

আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবা নুত্তমাংগতিং॥ ৭।১৬-১৮

এখানে জ্ঞানী শব্দ দ্বারা যে জ্ঞানমার্গাবলম্বী সাধককে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ

---

* তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব-এই বাক্যের তাৎপর্য্য এইরূপ বোধ হয়, যথা ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি তথা জ্ঞানিনোঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তি নান্যং। অর্থাৎ মাং শব্দের সহিত এব শব্দের সম্বন্ধ, তে শব্দের সহিত নহে।

আছে। কারণ, তাহা হইলে, যাঁহারা শুদ্ধ ভক্তি আশ্রয় করিয়া ভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবেন? যাঁহারা ভগবানকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। অতএব শুদ্ধ ভক্তকে এই চারি শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীতে পড়িতে হইবে। তাঁহারা "আর্ত্ত" নহেন; কারণ, শঙ্করাচার্য্য আর্ত্তের অর্থ করিয়াছেন, "তস্করব্যাঘ্ররোগাদিনাভিভূত আপন্নঃ"। যদি বলা যায় যে, তাঁহারা সংসার-ভয়ে ভীত, এজন্য তাঁহাদিগকে আর্ত্ত বলিতে হইবে,—তাহার উত্তর এই যে, যাঁহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, তাঁহারাও সংসার-ভয়ে ভীত; তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও আর্ত্ত বলিতে হইবে। জ্ঞানমার্গাবলম্বী যে সংসার-ভয়ে ভীত, তাহা বেদান্তসার হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্য প্রতিপন্ন করিবে—

"অয়মধিকারী জননমরণাদি সংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিব উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।"

যাহার মাথায় আগুন লাগিয়াছে, সে যে ভাবে জলরাশি অভিমুখে ছুটিয়া যায়, এই (জ্ঞানমার্গাবলম্বী) সেই ভাবে সংসারানল-সন্তপ্ত হইয়া উপহার হস্তে বিদ্বান ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবে।"

ভগবদ্ভক্তের দ্বিতীয় শ্রেণী "জিজ্ঞাসু"। শুদ্ধ ভক্ত এ শ্রেণীতেও পড়িতে পারেন না; কারণ, কৌতূহল চরিতার্থ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তৃতীয় শ্রেণী "অর্থার্থী"। শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন, "ধনকামঃ"; সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত এ শ্রেণীতেও পড়িবেন না; কারণ, ভক্তের অবতার শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং রমণীং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতু ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

অতএব ভক্তিমার্গের সাধককে চতুর্থ শ্রেণী "জ্ঞানীর" মধ্যে পড়িতে হইবে। "জ্ঞানী" যে কি রকম, তাহা ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিঃ"—জ্ঞানীর মন সর্ব্বদা ভগবানে নিবিষ্ট থাকিবে; এবং তাঁহার ভগবানেই ভক্তি থাকিবে; অপরের প্রতি ভক্তি থাকিবে না। ইহা শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। বাস্তবিক পক্ষে জ্ঞানমার্গ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে অর্থ লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্গীতায় জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। যাহাকে জ্ঞানমার্গ বলা হয়, তাহার উল্লেখ ভগবদ্গীতায় নিম্নলিখিত স্থানে আছে—

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং॥ ১২।৩

এখানে জ্ঞান শব্দ পাওয়া গেল না। অতএব জ্ঞানমার্গের সাধককে ভগবদ্গীতার ভাষায় অক্ষরোপাসক বলিতে হয়। ভগবদ্গীতায় কাহাকে জ্ঞান বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক পড়িলে স্পষ্ট হইবে—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥

১৩,৮—১২

যাহার মান নাই, দম্ভ নাই, হিংসা নাই,—যিনি ক্ষমাশীল ও সরল-স্বভাব,—যিনি আচার্য্যকে উপাসনা করেন,—যিনি শুচি, স্থির ও জিতাত্মা,—যাঁহার ইন্দ্রিয়জ সুখ ভোগে বৈরাগ্য হইয়াছে,—যাঁহার অহংকার নাই,—যিনি জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধি রূপ সংসারের চতুর্বিধ দুঃখের কথা নিরন্তর স্মরণ রাখেন,—স্ত্রী-পুত্র গৃহে যাঁহার আসক্তি নাই,—যিনি সদাসর্ব্বদা ভগবানে ভক্তিমান আর কাহাকেও ভক্তি করেন না,—নির্জ্জন স্থান যাঁহার প্রিয়,—জনসমাগম যিনি পরিহার করেন,—যিনি সর্ব্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানশীল ও তত্ত্বজ্ঞানী—তিনিই জ্ঞানী। যিনি ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, এ সকল কথাই তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায়। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতি যে প্রকৃত ভক্তের বিশেষ লক্ষণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

অধ্যাত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানের উল্লেখ থাকাতে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত সম্বন্ধে এই সকল শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে কি না। "আমি এই দেহ, ইন্দ্রিয় বা মন নহি"—ইহাই অধ্যাত্মজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান এই যে, "ভগবানকে লাভ করিলেই প্রকৃত সুখ হয়, আর কিছুতে প্রকৃত সুখ নাই।" প্রকৃত ভক্তের এই উভয় জ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য। অতএব গীতায় ভগবান আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই যে চারি প্রকার ভক্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শুদ্ধ ভক্তকে জ্ঞানী এই শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে হইবে। যাঁহারা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, তাঁহাদিগকে "জ্ঞানী" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত না করিয়া, "জিজ্ঞাসু" এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করাই বোধ হয় অধিকতর সমীচীন। শঙ্করাচার্য্য জিজ্ঞাসু শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ভগবত্তত্ত্বং জ্ঞাতুমিচ্ছতি যঃ"। ভগবত্তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা জ্ঞানমার্গের সাধকের লক্ষণ। বেদান্ত দর্শনের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—এই "জিজ্ঞাসা" যাঁহাদের তাঁহারাই জিজ্ঞাসু। অতএব জ্ঞান-মার্গের সাধককে "জিজ্ঞাসু" এই শ্রেণীর অন্তর্গত করাই যুক্তিযুক্ত।

দ্বাদশ অধ্যায় ত্রয়োদশ শ্লোকের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় শঙ্করাচার্য্য ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার জন্য পুনরায় বলিয়াছেন,—

"তে প্রাপ্নুবন্তিমামেব" (গীতা ১২।৪) ইতি অক্ষরোপাসকানাং কৈবল্য প্রাপ্তৌ স্বাতন্ত্র্যমুক্ত্বা, ইতরেষাং পারতন্ত্র্যাৎ ঈশ্বরাধীনতাং দর্শিতবান 'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা' ইতি। যদি হি ঈশ্বরস্য আত্মভূতাস্তে মতা অভেদদর্শিত্বাৎ, অক্ষরস্বরূপা এব তে ইতি সমুদ্ধরণকর্ম্মবচনং তান্ প্রতি অপেশলং স্যাৎ।

অনুবাদ—যাঁহারা অক্ষরোপাসক (জ্ঞানমার্গাবলম্বী) তাঁহারা মোক্ষলাভ বিষয়ে স্বাধীন, এই কথা ভগবান দ্বাদশ অধ্যায়ের চতুর্থশ্লোকে 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব' এই বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাঁহারা ভক্তিমার্গ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মোক্ষলাভ ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে; কারণ, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, 'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা'। অক্ষরোপাসক যখন ভগবানের আত্মভূত, তখন অক্ষরোপাসকও অক্ষরই হইয়া যান। তাঁহাদিগকে সমুদ্ধরণ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে লক্ষ্য করা উচিত হয় না।"

জ্ঞানী যে মোক্ষলাভ বিষয়ে স্বাধীন, শঙ্করাচার্য্য ইহার দুইটি হেতু দিলেন,—(১) জ্ঞানী সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব'; (২) ভগবান অন্যত্র বলিয়াছেন, 'জ্ঞানীত্বাত্মৈব মে মতং'। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব' এইরূপ বাক্য ভগবান কেবলমাত্র জ্ঞানীদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করেন নাই। ৯ অধ্যায় ৩৪ শ্লোকে, ১০ অধ্যায় ১০ শ্লোকে, ১১ অধ্যায় ৫৫ শ্লোকে, ১৮ অধ্যায় ৬৫ শ্লোকে ভগবান ভক্তদের সম্বন্ধে "মামেব এষ্যসি" "তে মামুপযান্তি" "স মামেতি" "মামেব এষ্যসি" এই সকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব ভগবান জ্ঞানীদের সম্বন্ধে 'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব' এই বাক্য প্রয়োগ করায়, ইহা প্রতিপন্ন হয় না যে, জ্ঞানী মোক্ষলাভ বিষয়ে ঈশ্বরাধীন নহে। দ্বিতীয়তঃ, শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী যখন ভগবানের আত্মা, অর্থাৎ ভগবান হইতে অভিন্ন, তখন ভগবান জ্ঞানীকে উদ্ধার করিবেন, এ কথা যুক্তিযুক্ত হয় না। কিন্তু "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" এখানে অভেদ অর্থে আত্মা শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; কারণ, ইহার ঠিক পূর্ব্বেই ভগবান বলিয়াছেন,—

প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।

জ্ঞানী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, ভগবান জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়। অতএব ভগবান ও জ্ঞানী অভিন্ন নহেন। অত্যন্ত প্রিয় এই অর্থে প্রাণ, জীবন, আত্মা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ আছে। এখানেও আত্মা শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানী ভক্তিলাভ করিয়া তাহার পর ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন জ্ঞানী, নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মলাভ করিবার পর,

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং॥

সুতরাং জ্ঞানীও ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে প্রাপ্ত হন। অতএব ইহা বলা যুক্তিযুক্ত নহে যে, ভক্তই মোক্ষলাভ বিষয়ে

ঈশ্বরাধীন, এবং জ্ঞানী মোক্ষলাভ বিষয়ে ভগবানের অধীন নহে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গীতায় ভক্তির স্থান উচ্চ বলিয়া জ্ঞানকে অবহেলা করা হয় নাই। জ্ঞানমার্গে যে শুষ্ক জ্ঞান অবলম্বন করিয়া মোক্ষলাভের চেষ্টা করিতে হয়, সে জ্ঞান স্বতন্ত্র। আমরা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলে যাহা বুঝি, গীতায় সচরাচর সেই অর্থ লক্ষ্য করিয়া জ্ঞান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অমানিত্বং অদম্ভিত্বং অহিংসা ক্ষান্তিঃ আর্জ্জবং ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে (ত্রয়োদশ অধ্যায় ৮ হইতে ১১ শ্লোক) জ্ঞানের লক্ষণসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে। এই জ্ঞানের সহিত ভক্তির কোন বিরোধ নাই; বরং এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সমাবেশ সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকগুলিতে জ্ঞানের লক্ষণ উল্লেখ করিবার সময় শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে ভগবানে অচলা ভক্তি প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ—

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।

আবার, কোন্ ভক্ত শ্রেষ্ঠ তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।

এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় উৎকৃষ্ট বলিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে। গীতার অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া বোধ হয় যে, জ্ঞানের সাহায্যে সংসারে আসক্তি বিনষ্ট হইবে; এবং ভক্তির সাহায্যে ভগবানকে লাভ করা যাইবে। সংসারাসক্তি হেতুই মন সচরাচর মলিন হইয়া থাকে। এই মলিনতা দূর হইলে মন শুদ্ধ হয় এবং মনে ঈশ্বরানুরাগ স্বভাবতঃ বিকশিত হয়। জ্ঞান হৃদয়ের এই মলিনতা দূর করিয়া হৃদয় পবিত্র করে বলিয়া, বলা হইয়াছে—

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।

জ্ঞানের সাহায্যে মানব উপলব্ধি করে যে, সংসারে দুঃখের পরিমাণই বেশী; যে অল্প পরিমাণে সুখ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইতে নাই; কারণ, সংসারের সকল দ্রব্য অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী,—তাহাদের প্রতি আসক্তি থাকিলে, তাহাদের অভাবে বা বিয়োগে বহু কষ্ট পাইতে হইবে।

"দুঃখালয়মশাশ্বতং"

"জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং"

"যেহি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥" ৫.২২

এই বৈরাগ্যের ভাব গীতার সর্ব্বত্র এত পরিস্ফুট যে, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন, "গীতা গীতা বারবার বলিলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গীতার মূলতত্ত্ব। গীতা গীতা বলিলেই তাগী তাগী আসিয়া পড়ে,—তাগী* অর্থাৎ ত্যাগী,—যাহার বিষয়ে আসক্তি নাই।"

জ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি, একমাত্র ভগবানকে পাইলেই সুখ—সে সুখ অনন্ত, অপরিমেয়—

"ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে"

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং"

"সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।"

জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতির দ্বারাই সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়। আমরা স্বয়ং দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন; সুতরাং আমরা কোন কর্ম্মে লিপ্ত হই না। কর্ম্মফল আমাদের আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

"গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ইতি মত্বা ন সজ্জতে"

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা যদি বাহ্য বস্তুর উপর সুখের জন্য নির্ভর করি, তাহা হইলে আমাদিগকে কষ্ট পাইতেই হইবে; কারণ, বাহ্যবস্তু আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। আমাদের নিজেদের মধ্যেই সুখের সন্ধান করিতে হইবে; তাহা হইলে সে সুখের কেহ ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। ঈশ্বরানুরাগই সে সুখের আকর।

"বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং"

জ্ঞানের সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি, কাম ও ক্রোধ সকল পাপের মূল,—তাহাদিগকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিহার করিতে হইবে।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং॥

* সংস্কৃত "তগ" ধাতুর অর্থ ত্যাগ।

এই সকল কারণে ঈশ্বর-লাভের চেষ্টায় জ্ঞান বহু পরিমাণে সাহায্য করে। অতএব জ্ঞানের অনুশীলন করা সকলের কর্ত্তব্য—ভক্তেরও কর্ত্তব্য। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকেও জ্ঞানলাভ করিতে বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৪।৩৪

যাঁহার জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ নাই, তিনি একমাত্র ভক্তিকেই আশ্রয় করিবেন। ভক্তির পথ অবলম্বন করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। সে পথে সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ করিতে হইবে, পরম শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে উপাসনা করিতে হইবে, এবং তাঁহারই উদ্দেশে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে।

মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি কৌন্তেয় প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥
মৎ কর্ম্মকৃৎমৎ পরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরং সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥

পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, যোদ্ধা, বণিক, প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি এবং অসহায় কারাগৃহবাসী সকল ব্যক্তি সকল অবস্থাতেই এইরূপ একান্ত ভাবে ভগবানের শরণ লইতে পারে; সুতরাং সকলেই তাঁহাকে পাইতে পারে।

মেঘনাদ

[ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল]

(৫)

সেইদিন হাসপাতালের কাজ সারিয়া মেঘনাদ জেল-খানায় গেল। জেলে যাইতে তাহার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল। সেখানে মনোরমার সঙ্গে আজ আবার দেখা হইতে পারে, এ কথা মনে হইতে, তাহার প্রাণের ভিতর ভীষণ তোলপাড় করিতে লাগিল। যে দুষ্ট দানব তার মনের ভিতর বাসা করিয়া কাল সারারাত তাহাকে নাচাইয়াছে, সে এখন আবার বিজয় গর্ব্বে হুঙ্কার করিয়া উঠিল। মেঘনাদের মাথার ভিতর ভয়ানক গোলমাল লাগিয়া গেল। সে জেলে প্রবেশ করিবার সময় সঙ্কল্প করিল যে, আর সে মনোরমার সঙ্গে কিছুতেই দেখা করিবে না। দেখা করা তার উচিত হইবে না। কিন্তু মনের মধ্যে গোলযোগ মিটিল না,—সে সর্ব্বক্ষণ মনোরমার কথাই ভাবিতে লাগিল।

জেলে প্রবেশ করিয়াই সে আফিস-ঘরে ঢুকিল। সেখানে জেলার বাবু তাহাকে কতকগুলি কাগজপত্র সহি করিতে দিলেন। সে সব কিছুই সে বুঝিতে পারিল না; কেবল চোখ বুলাইয়া সহি করিয়া গেল। তার পর সে নূতন কয়েদীদের পরীক্ষা করিতে গেল। সে পরীক্ষায় সে কিছুই ভাল করিয়া দেখিল না; কেবল কয়েদীদের সে মামুলী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, জবাব লিখিয়া, মামুলী অর্ডার লিখিয়া গেল,—কি যে মাথামুণ্ড লিখিল, তাহা সে নিজেই ভাল বুঝিল না। এই দলের মধ্যে মণি মিঞা ছিল। সে মেঘনাদকে সেলাম দিয়া বলিল, "হুজুর, আমাকে কেরাণীর কাজ দিতে আজ্ঞা হয়,—আমার শরীর ভাল নয়।" মেঘনাদ স্পষ্ট করিয়া সে কথাটা না বুঝিয়াই, সেইরূপ আদেশ দিয়া গেল; এবং তাহার নির্দ্দেশ মত বিশেষ খোরাকের ব্যবস্থা করিল—এ সব সে জলের মত করিয়া গেল।

ইহার পর অন্যান্য কার্য্য সারিয়া ফিরিবার সময়, জেলার সংবাদ দিল যে, মনোরমা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়। মেঘনাদের বুকের ভিতর ধুপধাপ করিতে লাগিল। এ আহ্বান অস্বীকার করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইল না;—সে নির্ব্বিবাদে মনোরমার ঘরে গিয়া হাজির হইল।

আজও মনোরমা একলা ছিল। আজও তাহার সেই মনোহর মূর্ত্তি, তার চোখের ভিতর সেই চঞ্চল, উজ্জ্বল মদিরা! মনোরমাকে দেখিবার পর হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে

তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। এখন তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার সেই নেশা যেন আরও জোর করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল। কষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া মেঘনাদ বলিল, "তুমি আমাকে ডেকেছ কেন?"

আজ মনোরমার ব্যবহারে সে তীব্র নির্লজ্জতা নাই—সে যেন কতকটা নরম হইয়া পড়িয়াছে। তার চলন-চালনের ভিতর একটুখানি স্নিগ্ধ সঙ্কোচ আসিয়া পড়িয়াছে। আজ তাহাকে দেখিয়া মেঘনাদের কিছুতেই মনে হইল না যে, সে জাত-অপরাধী।

মনোরমা একবার মেঘনাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই, মুখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল; ধীরে-ধীরে বলিল, "তুমি আমার মোকদ্দমার তদ্বিরের বন্দোবস্ত করবে বলছিলে।"

"হাঁ, সে আমি করেছি,—প্রহ্লাদবাবু আর রাজচন্দ্র বাবুকে তোমার পক্ষে নিযুক্ত করেছি।"

মনোরমা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আর একবার মেঘনাদের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি মেঘনাদের মনে ঝড় তুলিয়া দিল।

মনোরমা বলিল, "তোমার দয়ার শেষ নাই! তোমাকে কটু কথা বলেছি বলে, তুমি আমার উপর রাগ কোরো না, আমি বড় দুঃখী।" সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মেঘনাদ বিপদে পড়িল। মনোরমাকে কাঁদিতে দেখিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল; অথচ তাহাকে শান্ত করিবার জন্য সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না। যে-সব কথা তাহার মনে আসিতে লাগিল, তাহার নিজেরই মনে হইতে লাগিল যে, সে-সব কথা বলা অত্যন্ত নাটুকে গোছের হইবে। কাজেই সে চুপ করিয়া বসিয়া, মনে-মনে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ বাদে মনোরমা বলিল, "আমি এ মোকদ্দমা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্দোষ!"

মেঘনাদ চট্ করিয়া এ কথা বিশ্বাস করিয়া ফেলিল—বিশ্বাস করিবার জন্য সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তার প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাকে তবে পুলিস ধরলে কেন? কি জান তুমি এ সম্বন্ধে, আমায় বলতে চাও কি?"

"তোমায় বলবো না তো আর কাকে বলবো? এখন বিশ্বাস করা না করা তোমার হাত। এই লোকটা আমাকে অনেক লোভ দেখিয়েছিল। আমি লোভে পড়ে—এই—তা'কে আসতে লিখেছিলেম। সে মদ খেয়ে টল্‌তে-টল্‌তে গভীর রাত্রে আমার ঘরে এলো। তখন সে ঘোর মাতাল। আমি তা'কে ধরে বিছানার উপর বসালাম। সে সেখানে শুয়ে পড়লো। খানিক বাদে মরার মত অসাড় হ'য়ে গেল। দেখে আমার বড্ড ভয় হ'ল,—আমি সতীশ বাবুকে ডেকে পাঠালাম। সতীশ বাবু তার চজন চাকরকে ডেকে, ওকে ধরা-ধরি করে ওর ঘরে নিয়ে গেল। তখন সে মরে গেছে। ওরা তা'কে নিয়ে কি ক'রেছিল, তা' আমি জানি না। তার পর বড় দারোগা বাবু যখন তদারকে এলেন, তখন সতীশ বাবু আমাকে যা' শিখিয়ে দিয়েছিল, আমি তাই বল্লাম। কিন্তু সতীশ বাবুর স্ত্রী আমার নাম করে তা'কে কি সব বল্লে, তাতেই আমরা ধরা প'ড়লাম। আমি আর কিচ্ছুই জানি না, আমার কোনও দোষ নাই।"

মেঘনাদের কাছে এ কথাগুলির প্রত্যেকটি বেদবাক্যের মত সত্য বলিয়া মনে হইল। সে উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "যা বল্লে, সত্যি?"

মনোরমা সজল নয়নে মেঘনাদের দিকে চাহিয়া, তাহার হাতখানা দু'হাতে ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ছুঁয়ে বলছি, এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়।"

সেই কোমল স্পর্শে মেঘনাদের শিরায়-শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তাহার যাহা কিছু সংযম ছিল, সব ভাসিয়া গেল। মনোরমা জয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াই আজ তাহাকে ডাকাইয়াছিল—সে সম্পূর্ণ জয়ী হইল। মেঘনাদের হৃদয়-প্রাকারের গোড়া আলগা হইয়াই ছিল,—এ আক্রমণের সম্মুখে তাহা একেবারে টিকিতে পারিল না।

মেঘনাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে এই স্পর্শে তাহার সমস্ত চিত্ত একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব উত্তেজনায় নাচিয়া উঠিল,—সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল,—প্রাণের ভিতর সে একটা তীব্র পৈশাচিক ক্ষুধা বোধ করিল। তাহার মনে একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল, মনোরমাকে কোলের কাছে সাপটিয়া ধরিতে। এমন সময় জেলার বাবু ঘরে আসিয়া তাহাকে ডাকিলেন।

বাহিরে আসিয়া মুক্ত বাতাসে মেঘনাদ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে যেন একটা নেশার ঘোর হইতে হঠাৎ মুক্ত হইল। মুক্তির আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে তার প্রাণটা ধিক্কারে

ভরিয়া গেল। সে যে এত দুর্ব্বল, তাহা ভাবিতে তাহার বড় দুঃখ হইল।

জেলখানার কাজ সারিয়া যখন মেঘনাদ বাহির হইল, তখন প্রায় কাছারীর বেলা হইয়াছে। মেঘনাদ তাহার বাইসিকেলে চড়িয়া সোজা প্রহ্লাদ বাবুর বাড়ী গেল।

(৬)

প্রহ্লাদ বাবু বুড়া মানুষ। বয়স পঞ্চান্ন বছর; কিন্তু শরীরটা খুব ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দক্ষ ও দক্ষ উকীল বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। সংসারের অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট আছে, আর বিষয়-বুদ্ধির তুলনা নাই।

প্রহ্লাদ বাবু তখন মক্কেলদের বিদায় দিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন; মেঘনাদ বাবুকে দেখিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

মেঘনাদ তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া, মনোরমার মুখে আজ যাহা শুনিয়াছিল, তাহা সমস্তই তাঁহাকে বলিল। প্রহ্লাদ বাবু নীরবে শুনিয়া গেলেন; তাঁহার চক্ষু মেঘনাদের মুখের উপর নিবদ্ধ রহিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া বুড়া হাসিয়া বলিল, "মনোরমাকে রক্ষা করা আপনার হাত, ডাক্তার বাবু!"

মেঘনাদ চুপ করিয়া রহিল।

প্রহ্লাদ বাবু বলিলেন, "প্রকৃত অবস্থা যেমন বলিলেন, সে কথা প্রমাণ করা যাইবে না; কেন না, তাহার সাক্ষী সাবুদ নাই। অপর পক্ষে সাক্ষী আছে সতীশের স্ত্রী। সে কি দেখেছে, তা' জানি না; কিন্তু খুব সম্ভব, মনোরমার ঘর থেকে মরাটাকে নিয়ে যেতে দেখেছে। তা'ছাড়া, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, ঐ চাকরদের একটাকে এপ্রভার করে' তার সাক্ষ্য পুলিস থেকে দেবে। এর সামনে দাঁড় করাবার কোনও প্রমাণই আমাদের নেই। এ অবস্থায় যদি এই কথা আসামীরা বলে, তবে তাতে ফল তো কিছু হ'বেই না,—বরং এ থেকে ওদেরই কথা কতকটা প্রমাণ হ'বে। কাজেই ওকথা আমরা বলতে পারি না। আমাদের এক Case হ'তে পারে যে, লোকটা আত্মহত্যা ক'রেছিল।"

মেঘনাদ বলিল, "সে তো মিথ্যা,—আর সে একেবারেই টিকিবে না। আমার রিপোর্টেই তো সে কেস ফেঁসে যাবে।"

প্রহ্লাদ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাই তো বলছি, আপনার হাত। আমি মেডিক্যাল জুরিস্‌প্রুডেন্স ভাল জানি না। তবে আমার বোধ হয়, আপনার রিপোর্ট সত্ত্বেও, আপনি এখন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে, আত্মহত্যার কেস সমর্থন ক'রতে পারেন। যদি তা' পারেন, তবেই সব দিক রক্ষা হয়।"

মেঘনাদ একটু চটিয়া বলিল, "আপনি আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেন?"

"যখন তা' ছাড়া, সত্য-সত্য যারা নির্দ্দোষ, তা'দের রক্ষা পাবার উপায় নাই, তখন তা'তে এতই কি দোষ?"

মেঘনাদের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ ভাবিয়া সে বলিল, "সত্য কথা ব'লে কি আপনারা কোনও মতেই আপনাদের পক্ষ সমর্থন ক'রতে পারেন না?"

"আমার বিবেচনায় এ কথা বলতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতা হ'বে। কোনও জুরী এ কথা বিশ্বাস করবে না। লাভের মধ্যে এতে প্রমাণ হ'বে যে, লোকটা মরেছে মনোরমার ঘরে,—আর সতীশ সেই মরা মানুষটাকে এমন করে রেখেছে যে, লোকে সেটা আত্মহত্যা বলে ধরে নেয়। এ দুটো কথা স্বীকার ক'রলে তো সরকার পক্ষের কেস তিন পোয়া প্রমাণ হ'য়ে গেল।"

মেঘনাদ গম্ভীর ভাবে ভাবিতে লাগিল। শেষে সে বলিল, "আপনারা আর একটু ভেবে-চিন্তে দেখুন, কোনও উপায় হয় কি না। আপনি যা' ব'লছেন, তা' একেবারেই অসম্ভব।"

প্রহ্লাদ বাবু। "আপনিও একটু ভেবে-চিন্তে দেখুন। আমি সতীশ আর মনোরমার সঙ্গে আজ দেখা ক'রবো; আর রাজচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শও ক'রবো—কিন্তু আমার তো মনে হয় না যে, এ ছাড়া আর উপায় আছে।"

"আচ্ছা, ভেবে দেখবো" বলিয়া মেঘনাদ চলিয়া গেল। তার মনের ভিতর ভীষণ তোলপাড় হইতে লাগিল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। এক-একবার তাহার মনের ভিতর এ কথা জাগিয়া উঠিল যে, সে একটা ভীষণ পরীক্ষার ভিতর পড়িয়াছে—এ পরীক্ষায় তাহাকে জয়ী হইতে হইবে। কিন্তু নিজের কথা সে বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিল না। মনোরমার কথা, এই ভীষণ মোকদ্দমার কথা সে ভাবিতে লাগিল—ভাবিয়া-ভাবিয়া কূল পাইল না।

বেলা তখন প্রায় ১১টা। তাহার বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। সে তন্ময় হইয়া ভাবিতে-ভাবিতে রাস্তা দিয়া চলিল। অনর্থক অনেকটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া, ঘণ্টাখানেক বাদে সে বাড়ী ফিরিল।

সে সমস্ত রাস্তা আজকার সমস্ত ঘটনা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ভাবিল। আজকার প্রথম আবিষ্কার যে মনোরমা নির্দ্দোষ—বড় আনন্দের কথা! তা' ছাড়া, মনোরমাকে যে জ্ঞাত-অপরাধী বলিয়া সে সাব্যস্ত করিতে বসিয়াছিল,—আজ তার মনে হইল, সে বিশ্বাস ভুল। এটাও কম আনন্দের কথা নয়। মনোরমাকে সে ইচ্ছা করিলেই আপনার করিতে পারিবে, সে মেঘনাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে,—এ কথা সে আজ বুঝিতে পারিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটা কথা ভাবিতে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল,—রক্তের গতি বাড়িয়া গেল—সে স্বপ্নের ভিতর ডুবিল। স্বপ্নের ঘোরের ভিতরই মনে হইল যে, নির্দ্দোষ হইলেও, খুব সম্ভবতঃ মনোরমাকে ফাঁসিকাঠ হইতে বাঁচান যাইবে না। কি ভীষণ কথা! মিথ্যার কি অখণ্ড প্রতাপ! আর এই পরিণামের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মেঘনাদ নিজে! ভাবিতে তাহার হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া যাইবার মত হইল। অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! সে-ই মনোরমার সর্ব্বনাশের কারণ হইতে বসিয়াছে। আর মিথ্যাকে পরাভূত করিয়া,সত্যের প্রতিষ্ঠা করিবে বলিয়া সে স্পর্দ্ধা করিয়াছিল বলিয়াই, মিথ্যা আজ এই মর্ম্মান্তিক ভাবে তাহার প্রাধান্য প্রচার করিবার উদ্যোগ করিয়াছে! এখন উপায় কি? কি ভুল করিয়াছিল মনোরমা! সে কেন পাপের পথে পা' দিয়াছিল—কেন ঐ দোকানদারটাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিল? তার পর—সতীশটা কি গণ্ডমূর্খ—! সে-ই তো যত গোলযোগের সৃষ্টি করিল।

কিন্তু উপায় কি? মিথ্যার এই অষ্ট বন্ধন হইতে সত্যকে মুক্ত করিবার সত্যই কি কোনও উপায় নাই? প্রহ্লাদ বাবুর কথা মনে পড়িল—সে যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে,—কিন্তু সে যে একেবারেই অসম্ভব! আর সাক্ষ্য দিলেই সে মিথ্যা টিকিবে কেমন করিয়া? সে যে বড় বড়াই করিয়া সবডিভিসন্যাল অফিসার ও আর একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তার দম্ভের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছে, এখন তাহাকে "স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিতে" হইবে! আচ্ছা, সে কি বলিতে পারে,—ধর, যদি সে বলে—কিন্তু এ যে একেবারেই অসম্ভব—কেমিক্যাল একজামিনারের রিপোর্টেই তো সব কথা প্রকাশ হইয়া যাইবে! তা' ছাড়া, নিজের গলায় ছুরি দেওয়ার থিওরী তো কোনও মতেই দাঁড় করান যাইতে পারে না! আচ্ছা যদি—না, মিথ্যা কথা বলা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব!

মেঘনাদ ঘুরিয়া-ফিরিয়া বার-বার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে কল্পনা করিতে লাগিল যে, কি রকমে মিথ্যা সাক্ষ্য কোনও উপায়ে দেওয়া যাইতে পারে। নানা রকম কল্পনা করিল; কিন্তু প্রত্যেক বারই সে জোর করিয়া বলিল যে, মিথ্যা সে কিছুতেই বলিবে না।

বাড়ী ফিরিয়া সে দেখিতে পাইল, যোগেন্দ্র বাবু তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। সে আসিতেই তিনি বলিলেন, "এই যে মেঘনাদ বাবু! বড় গোলযোগ হয়েছে,—ঐ খুনের মোকদ্দমায় কেমিক্যাল একজামিনারের রিপোর্ট এসেছে—visceraতে কোনও বিষের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বড় মুস্কিল! একবার Medical Jurisprudenceখানা পড়ে দেখতে চাই,—আপনার Taylorখানা একবার দেবেন?"

এ কথায় মেঘনাদের সমস্ত শরীর তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় কি জানি কেন নাচিয়া উঠিল। সে তখন কোনও কথা বলিতে সাহস করিল না। নিঃশব্দে বইখানা আনিয়া যোগেন্দ্র বাবুকে দিয়া বলিল, "তাই তো, তা'হ'লে মৃত্যুর আর কি কারণ হ'তে পারে?"

"আর যাই হ'ক, আত্মহত্যা হ'তেই পারে না! তবে একটু ভাবালে।"

যোগেন্দ্র বাবু চলিয়া গেলে, মেঘনাদ আবার ভাবিতে লাগিল। সাক্ষ্যে তাহার রিপোর্ট উল্টাইয়া দিবার একটা পথ পাওয়া গিয়াছে—এ কথা বার-বারই তা'র মনে হইতে লাগিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার প্রলোভনটা এখন ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। যতই সে এ কথা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল, ততই ফিরিয়া-ফিরিয়া এই কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইল না।

আহারান্তে সে Lyonএর মেডিক্যাল জুরিস্প্রুডেন্স লইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিতান্ত যন্ত্র-চালিতের মত সে বইখানা পড়িতে লাগিল। পড়িয়া-শুনিয়া সে দেখিতে পাইল যে, তাহার রিপোর্ট ষোলআনা বজায় রাখিয়াও মনো-

রমার সপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া যায়! কিন্তু তাহা হইলেও সেটা মিথ্যা সাক্ষ্য হইবে। তার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এখনও খুব জোর করিয়াই বলিতে লাগিল যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অসম্ভব—কিন্তু প্রলোভন বেশ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

(৭)

সকালে উঠিয়া মেঘনাদের মনটা ভয়ানক ভার বোধ হইল। গতরাত্রের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা আবার নূতন করিয়া তাহাকে পাইয়া বসিল। সে তাড়া-তাড়ি কাপড়-চোপড় পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইল।

লৌহজঙ্ঘ নদী তখন অত্যন্ত ক্ষীণকায়া, নাই বলিলেই হয়। যেখানে নদী থাকিবার কথা, সেখানে একটা প্রকাণ্ড বালির চড়া,—তার মধ্য দিয়া এঁকাবেঁকা, সরু মোটা হইয়া একটা ক্ষীণ জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে এই নদীই কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। বর্ষায় নদীর জল যেখানে আসিয়া ঠেকে,—সেই বরাবর একটা লম্বা রাস্তা টাঙ্গাইল সহরটার আগাগোড়া জুড়িয়া রহিয়াছে। এই রাস্তাই টাঙ্গাইলের লোকের বেড়াইবার পথ। মেঘনাদ এ পথে না গিয়া সটান বালির চড়ার উপর গিয়া উঠিল; এবং সেখানে ভিজা বালির উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

এতদিন সত্যনিষ্ঠাটা তার একরকম বাতিকের মত ছিল। অতি-বড় ছোট হইতে অতি বড় প্রকাণ্ড ব্যাপারেও সে মিথ্যা বলিতে জানিত না, মিথ্যা বরদাস্ত করিতে পারিত না। সে জানিত, সত্যের পথ সরল; তাহার অনুসরণ করিতে কোনও লেঠা নাই। কিন্তু আজ এ কি বিষম দায়! মনোরমা সত্য-সত্যই নির্দ্দোষ, অথচ, প্রহ্লাদ বাবুর মতে, তাহার নির্দ্দোষিতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, মিথ্যার আশ্রয় ছাড়া অন্য গতি নাই। সত্যের সঙ্গে সত্যের এই বিরোধে মারা যাইতে বসিয়াছে বেচারা মেঘনাদ। এখন তাহার মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াই কি তবে একমাত্র উপায়?

আচ্ছা, সোজা-সুজি সত্য কথা বলিলে দোষ কি? প্রহ্লাদ বাবু বলিয়াছেন, তাহাতে সরকার পক্ষের সমর্থন করা হইবে,—আর কোনও জুরীই সে কথা বিশ্বাস করিবে না। তাই কি ঠিক? মেঘনাদের মনে হইল, প্রহ্লাদ বাবুর কথা মানিয়া লওয়াটা ঠিক হইবে না,—এ সম্বন্ধে আরও বড় উকিলের পরামর্শ লওয়া দরকার।

তার পর, কখন যে এ কথা ভাবিতে-ভাবিতে মেঘনাদ হঠাৎ মনোরমার ধ্যানের মোহের ভিতর পড়িয়া গেল, তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া, সেই ধ্যানে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহার সঙ্গে নিজেকে জুড়িয়া দিয়া, কত অভূতপূর্ব্ব কল্পনায় ডুবিয়া গেল। হাঁটিতে-হাঁটিতে, ভাবিতে-ভাবিতে সে কাগমারীর খেয়াঘাটের কাছে আসিয়া পড়িল। এখন এখানে খেয়াঘাট নাই,—তার জায়গায় আছে, লৌহজঙ্ঘের স্বল্প-পরিসর জলের উপর দিয়া নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত করিবার জন্য একটা ছোট বাঁশের সাঁকো। ইহার পরেই জলটা অনেকটা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সেইখানে এক পাশে কাদার উপর দুইটি বালক খেলা করিতেছে। মাঝিদের ছেলে,—জলেই তাদের বাস,—তাই জলের পোকার মত জল-কাদায় ইহারা খেলিয়া বেড়ায়। একটা ছেলে সর্ব্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া একটা জীবন্ত মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া আছে,—আর একটা ঠাণ্ডা কাদার উপর পরম আরামে শুইয়া আছে।

মেঘনাদ একদৃষ্টে এই ছেলে দুটির দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া-চাহিয়া সে মনোরমার ধ্যান করিতে লাগিল। যখন সে সম্পূর্ণ সম্বিৎ লাভ করিল, তখন দেখিতে পাইল যে, সে মনে মনে কল্পনা করিতেছে যে, জেল হইতে মনোরমাকে বাহির করিয়া লইয়া সে পলাইয়া গিয়াছে গারো পাহাড়ের এক নিভৃত জঙ্গলে। সেখানে একটা ছোট কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তারা শিকার করিয়া, কতক বা চাষ-আবাদ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে;—অথচ পরস্পরের সাহচর্য্যে তাহারা পরম আনন্দে দিন কাটাইতেছে। এই মস্ত কল্পনায় তাহার হাসি পাইল;—কিন্তু তখনি তাহার মনে হইল, এমন কি হইতে পারে না? জীবনটাকে আমরা নানা রকমে জটিল করিয়া তুলিয়াছি; না হইলে জীবন ধারণ করিতে, এবং চাই কি সুখী হইতে, এমন তো কিছু গুরুতর আয়োজনের দরকার হয় না। ঐ যে দুটি নগ্ন বালক পরম আনন্দে কাদায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, উহাদের সুখ রাজার প্রাসাদের ধপ্‌ধপে পোষাক-পরা ফিট্‌-ফাট রাজকুমারের সুখের চেয়ে কম কিসে? মনে হইল, ইহাদেরই জীবন স্বভাবানুযায়ী—আমাদের জীবন মানুষের গড়া আড়ম্বরে বোঝাই। এ সব

আড়ম্বরের বোঝা ফেলিয়া দিয়া, ঠিক ইহাদেরই মত জীবন ধারণ এমন কি অসম্ভব!

কিন্তু এ সব বাজে কথা! প্রথম কথা, মনোরমাকে উদ্ধার করা দরকার! তাহার উপায় কি? ভাবিতে-ভাবিতে মেঘনাদ মনে ঠিক করিল, কথাটা একবার, কলিকাতায় গিয়া, বড় উকিল ব্যারিষ্টারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ঠিক করিতে হইবে।

"এই যে মেঘনাদ বাবু এখানে!"—বলিয়া প্রহ্লাদ বাবু বাঁশের পুল হইতে নামিয়া মেঘনাদের কাছে আসিলেন। তিনি গতরাত্রে নদীর অপর পারে কাগমারী গিয়াছিলেন, সকালে ফিরিতেছেন, এরূপ প্রকাশ করিলেন।

"কি ঠিক ক'রলেন,—কিছু উপায় বের ক'রতে পারলেন কি?"

মেঘনাদ অন্যদিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "উপায় একেবারে নেই, তা' নয়; সামান্য দুটো-একটা কথা এদিক-ওদিক ক'রলে, গলা কেটে আত্মহত্যা করা সাব্যস্ত করা যায়।"

"তবে আর কি!"

"কিন্তু আমার রিপোর্টে যে সব অবস্থার কথা লিখেছি তা'—"

অতি মৃদুস্বরে প্রহ্লাদ বাবু বলিলেন, "নথীখানা আজ রাত্রে আমার ওখানে আসবে,—আপনি তার ভিতর কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিলেই, সে সব ঠিক হ'য়ে যা'বে।"

মেঘনাদ চমকিয়া উঠিল! সে খুব জোরের সহিত বলিয়া উঠিল, "না—সে আমার দ্বারা হ'বে না।"

কিছুক্ষণ দুইজনে নীরবে রহিল। পরে মেঘনাদ বলিল, "দেখুন প্রহ্লাদ বাবু, আপনি যতই যা' বলুন, আমার বিবেচনায় মনোরমার পক্ষে সত্য কথা বলাটাই সব চেয়ে শ্রেয়ঃ হ'বে। আর সে কেসটা অবিশ্বাস করার মত এমন কিছু নয়! আমি অনেক বিবেচনা ক'রে দেখেছি, তাতে গলা-কেটে আত্মহত্যা অসম্ভব,—কিন্তু হঠাৎ হার্ট ফেল হ'য়ে লোকটা মারা যাওয়া অসম্ভব নয়। বরং সেটাই সত্য ব'লে মনে হচ্ছে। তা' হ'লে মনোরমার কথার সঙ্গে ঠিক মিলে যায়।"

প্রহ্লাদ বাবু হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, আমি এই কাজ করে বুড়ো হ'য়ে গেলাম,—এমন জবাব দিয়ে যে আসামী কখনও খালাস হ'তে পারে, এ কথা না দেখলে বিশ্বাস্ করতে পারি না।"

"আপনার মতে কি তবে সম্পূর্ণ সত্য কথা ব'লে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা একেবারেই অসম্ভব?"

"কোনটা সত্য কথা ব'লছেন ডাক্তার বাবু? মনোরমা আপনার কাছে যে কথা ব'লেছে, সে কথা সত্য নয়! কাল আমি জেলে গিয়ে, মনোরমা আর সতীশের সঙ্গে দেখা করে', দুজনকে অনেকক্ষণ জেরা করে বুঝতে পারলাম যে, কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।"

মেঘনাদ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, তাহার মুখে কথা সরিল না। প্রহ্লাদ বাবু বলিয়া গেলেন, "আমার কাছেও মনোরমা ঐ কথাই প্রথম বলেছিল। কিন্তু আমি খুব কষে জেরা ক'রতেই, সে একেবারে এলিয়ে গেল,—কোনও কিছুই ঠিক ক'রে ব'লতে পারলে না। তা'র পর আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আসল কথাটা বের করলাম। পুলিসের লোকেরা অনেক চেষ্টা ক'রেও সে কথা বের ক'রতে পারে নি।"

শুষ্ক মুখে মেঘনাদ বলিল, "সত্য কথাটা কি?"

"সত্য কথা এই যে, সতীশ ক্ষুর দিয়ে গলা কেটেই লোকটাকে মেরেছে।"

মেঘনাদ হাসিয়া বলিল, "সে হতেই পারে না। এ আঘাতটা মৃত্যুর পরে করা হ'য়েছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। এই যদি মনোরমা আপনাকে বলে' থাকে, তবে সে আপনার কাছেই মিথ্যে বলেছে।"

প্রহ্লাদ বাবু বলিলেন, "মানলাম না হয়, সে মিথ্যাই ব'লেছে। কিন্তু আপনি যা শুনেছেন তাই যে সত্যি, তাই বা কি করে ব'লছেন। যে একটা মিথ্যা ব'লতে পারে, দুটো মিথ্যাও সে ব'লতে পারে। বিশেষ, মনোরমা আর সতীশ দুজনেই স্বীকার ক'রেছে যে, সতীশ মনোরমাকে এই কথা শিখিয়ে দিয়েছিল আপনাকে বলতে।"

মেঘনাদের মাথার ভিতর তখন আগুন জ্বলিতেছিল। প্রহ্লাদ বাবুর কথায় মনোরমার উপর তাহার একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছিল,—রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল। মনোরমার মত মেয়ে যে তাকে এমনি করে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিবে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে কিছুই বিচিত্র নয়; কিন্তু মেঘনাদের কাছে এটা ভয়ানক অন্যায় ও

অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। সে আর বেশী কথা বলিল না। প্রহ্লাদ বাবু তাহাকে দুই চারিটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সে রিপোর্টে বিষ-প্রয়োগে মৃত্যু সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কি-কি হেতু দেওয়া সম্ভব,—সে এই প্রশ্নের উত্তরে তাহা বলিয়া ফেলিল। প্রহ্লাদ বাবু শেষে বলিলেন, "তবে আপনি কি করা স্থির করলেন?"

মেঘনাদ খুব জোরের সঙ্গে বলিল, "আমি—আমি সত্য কথাই ব'লবো।"

"কিন্তু সত্য কোনটা?

মেঘনাদ একটু ভাবিয়া বলিল, "অন্ততঃ আত্মহত্যার কথাটা সত্য নয়, এটা ঠিক।"

"ক্ষুরের আঘাতে মৃত্যু হওয়াটা কি একেবারেই অসম্ভব?"

"একেবারে অসম্ভব বলা যায় না; কিন্তু মোটেই সম্ভব নয়। আর তা' না হ'লেও, আঘাতটা যে স্বকৃত নয়, তা এক রকম নিশ্চয়!"

"তবেই তো মুস্কিল! কিন্তু মনোরমা যে নির্দ্দোষ তাও নিশ্চয়।"

"কেমন করে জানলেন বলুন?"

"এই কাজ করে বুড়ো হ'য়ে গেলাম, সত্য মিথ্যা বাছতে পারবো না মেঘনাদ বাবু?"

মেঘনাদ কথা কহিল না। সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া, প্রহ্লাদ বাবুর কাছে তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া, হাসপাতালে গেল। সে অনেকটা রাস্তা আসিয়া পড়িয়াছিল,—হাসপাতালে যাইতে অনেকটা দেরী হইয়া গেল। সেখান হইতে কাজ সারিয়া সে জেলখানায় গেল।

দুইটা কথা সমস্তক্ষণ তাহার কাণে বাজিতে লাগিল। প্রহ্লাদবাবু বলিয়াছিলেন "সত্য কোনটা?" সেও ভাবিতে লাগিল তাই। তা ছাড়া, প্রহ্লাদবাবু বলিয়াছিলেন, "মনোরমা নির্দ্দোষ তাহা নিশ্চয়।" এ কথা সে অনায়াসে বিশ্বাস করিয়াছিল। তাই যদি সত্য হয়, তবে সে সত্য সাক্ষ্য দিলে বাস্তবিক অসত্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিবে,—নির্দ্দোষকে ফাঁসিতে ঝুলাইবে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে কূল পাইল না।

মনোরমার উপর তাহার ভয়ানক রাগ হইয়াছিল; এবং সেই রাগের মাথায়, সে অনেক ভাবিলেও, শেষে সাব্যস্ত করিল যে, মনোরমার জন্য ভাবিয়া সে মরিবে না। এমন হতভাগিনী যে মেয়েটা, তার যা' হয় হ'ক, তা'র জন্য সে দায়ী নয়।

এই রকম ভাবিতে-ভাবিতে সে জেলখানায় গেল। সেখানে অন্যান্য কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া, সে মনোরমার ঘরে গেল;—কেন গেল, তা' সে নিজেই বুঝিল না। আজ মনোরমার সঙ্গে সে কিছুতেই দেখা করিবে না স্থির করিয়াছিল—কিন্তু তবু সে গেল।

মেঘনাদ মনোরমাকে খুব কঠোর ভাবে বলিল, "মনোরমা, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা ব'লেছিলে কেন?"

মনোরমা তার মুখের দিকে একবার চাহিল। একবার তা'র চক্ষে আগুন ঝলক দিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে সে মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু বলিল না।

মেঘনাদ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন তুমি আমার কাছে মিথ্যা কথা ব'লতে গেলে?"

মনোরমা কাঁদিয়া ফেলিল।

মেঘনাদ বলিল, "আমি চল্লাম। তোমার ভাল ক'রতে এসেছিলাম, তুমি আমায় বঞ্চনা ক'রেছ—আর তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নাই।"

মনোরমা তাড়াতাড়ি মেঘনাদের পা' জড়াইয়া ধরিয়া, পায়ের ভিতর মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল; শুধু বলিল, "তুমি আমায় ছেড়ে যেও না।"

একমুহূর্ত্ত মেঘনাদ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর মনোরমাকে হাতে ধরিয়া তুলিল। মনোরমা তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার অঙ্গস্পর্শে মেঘনাদের সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। সে আবার সম্বিৎ হারাইল। মোহে বিভোর হইয়া সে বাহু দিয়া মনোরমাকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানের সমাধি হইয়া গেল।

মনোরমা বলিল, "আমি বড় হতভাগিনী! আমাকে তুমি মেরে ফেল, দু'দিন বাদে তো মরেই যাব; এখন তুমি আমাকে ত্যাগ করো না।"

মেঘনাদ বলিল, "আমার কি সাধ, আমি তোমায় ত্যাগ করি মনোরমা! বড় দুঃখেই এমন কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল। নইলে—" বুকের ভেতর তাহাকে চাপিয়া

ধরিয়া মেঘনাদ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল,— হঠাৎ জ্ঞান হইল—সে তাড়াতাড়ি মনোরমাকে সরাইয়া দিল।

কিছুক্ষণ পরে মনোরমা বলিল, "আমি তোমাকে ইচ্ছা করে' মিথ্যা কথা বলি নি। তখন সেই রাত্রে কি যে সব কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল, তা' স্পষ্ট করে আমার মনেই নেই। আমার কেবল মনে আছে যে, লোকটা আমার ঘরে এসে শুয়ে প'ড়লো,—আর মনে আছে যে, সতীশবাবু আর তার চাকরেরা তা'কে ধরাধরি ক'রে বের করে নিয়ে গেল। সতীশবাবুর কাছে পরে শুনে আমার যা' মনে হ'য়েছিল, আমি তাই সত্য বলে জেনেই তোমার কাছে ব'লেছিলাম। তার পর প্রহ্লাদবাবু এসে আমাকে নানা রকম ক'রে জিজ্ঞাসাপত্র ক'রে বুঝিয়ে গেলেন যে, আমি যা' তোমাকে ব'লেছি, তা' সত্য নয়। তাঁর সব কথা শুনে আমাকে স্বীকার ক'রতে হ'ল যে, বোধ হয় আমার ঘরেই সতীশবাবু তার গলায় ক্ষুর বসিয়ে দিয়েছে। তার আগে লোকটা মরে গিয়েছিল না বেঁচে ছিল, তা আমি ঠিক ব'লতে পারি না—এ কথাও বুঝলাম। তবে আমি ভেবেছিলাম, সে মরেই গেছে। আমি এখনো জানি নে, কোন্‌টা সতি, কোন্‌টা মিথ্যা। আমাকে তোমরা দয়া করে' আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না।"

মেঘনাদের বুকের উপর হইতে একটা প্রকাণ্ড বোঝা নামিয়া গেল। এমন ভ্রান্তি হওয়া যে খুবই সম্ভব, তাহা সে জানিত। এমন অবস্থায় একটা মেয়েমানুষের জ্ঞান একেবারে লোপ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। তার পর কথাবার্ত্তায় তার জ্ঞানের ভিতর যে সব ফাঁক ছিল, সেগুলি এমন ভাবে ভরিয়া গিয়াছিল যে, সে মনে করিতেছিল যে, সবই যেন সে দেখিয়াছে। এই আরোপিত স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া সে মেঘনাদকে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যা নয়। আর, প্রহ্লাদবাবু জেরার দ্বারা মনোরমার মুখে যে-সব কথা বাহির করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য না হইবারই ষোলআনা সম্ভাবনা; কিন্তু একটা কথা খাঁটি সত্য যে, মনোরমা নির্দ্দোষ! সে স্থির করিল যে, মনোরমাকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা করা আবশ্যক, তাহাই সে করিবে।

মনোরমা আঁচলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মেঘনাদ অগ্রসর হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। তাহার মুখ ধরিয়া তুলিল; বলিল "কেঁদ না, লক্ষ্মী!"

মনোরমা ডাক্তারের বুকে মুখ লুকাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বুকে মুখ রাখিয়াই বলিল, "আমার কেবলি মনে হ'চ্ছে, আর তোমায় আমি কাছে পাব না। তুমি আর একটু দাঁড়াও।"

মেঘনাদ আবার তাহার মুখ তুলিয়া ধরিল। তখন মনোরমা তার বুকের কাছে লতাইয়া রহিয়াছে। মুখখানা তুলিয়া ধরিতেই, মনোরমা হঠাৎ তাহাকে চুম্বন করিয়া ফেলিল। মানুষের কাণ্ডজ্ঞান কতক্ষণ ঠিক থাকে? মেঘনাদ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া মনোরমাকে চুম্বন করিল। তখন মনোরমা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "এখন তুমি এস—আর যদি দেখা নাও হয়, তবু আমার দুঃখ থাকবে না।"

মেঘনাদের রক্ত তখন তাতিয়া তার সমস্ত শরীরময় নাচানাচি করিতেছে—তার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে লোপ পাইয়াছে,—সে মনোরমাকে বুকের ভিতর আবার চাপিয়া ধরিল। হঠাৎ ঘরের কোণায় একটা শব্দ হইল। মেঘনাদ চাহিয়া দেখিল, একটা বুড়ী ঘরের কোণায় বসিয়া রহিয়াছে। বুড়ী কাল সন্ধ্যা বেলায় এ ঘরে ভর্ত্তি হইয়াছে। আসিয়া অবধি সে ঘরের এক কোণায় নিশ্চল একটা নেকড়ার পুঁটুলির মত পড়িয়া আছে। মেঘনাদ তাহাকে এতক্ষণ লক্ষ্যই করে নাই।

বুড়ীকে দেখিয়া মেঘনাদের সর্ব্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। লজ্জায় তা'র সেইখানে মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল!

"আছল বরণ-যে—"*

(শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ)

[শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম্-এ]

[১]

(১)

আছল বরণ যে 'শ্যামল' মেরি,—
কৈছনে সেহ 'গোরা' ভৈ-গল ফেরি ?

(২)

কোন জনমে হাম,—
বৃন্দাবন-বিপিনে,—
ঢু রণ্ বংশী ব-জাওয়ি !
নূ-পুর রুণ্ ঝুণ্,
দোলয়ি শিখি-চূড়,—
"রা-ধা, রাধা"-নাম গা-ওয়ি !

(৩)

বাঁ শরী শুনয়ি সো,
মা-আতল ধরণী ;
রো অল কানন-বিহঙ্গ ;
কাঁ-দল ব্রজবালা :
পা-আগল যমুনা,—
উছলল শ্যাম তরঙ্গ !

(৪)

শ্যাম বরণে মেরি
রা-আধিকা হেরয়ি-সো,—
রো-অল ডাকি শ্যাম নাম !
তব্ ক্রী-ঈড়া ছোড়য়ি মু',—
টু-টয়ি লীলা-গেহ,
ধা-ওমু কথি কোন-ধাম !

(৫)

যব্ বাজ রাধিকা-শিরে হানয়ি ফেরি,—
তব্ রো-দন ধরা-ভর আজহুঁ মেরি !

[২]

(১)

'শ্যাম'-বরণ কাঁহে কৈছনে ফেরি,—
রাধা-বরণ-'গোরা' ভৈ-গল মেরি ?

(২)

রাধিকা-শির-'পর
বিরহক অশনি
হানয়ি যব্ চল গৌরি,—
তব্-সে রোই ফেরি,—
শিরে অভি-শাপা,—
"রা-আধা, রাধা"-নাম ধেয়ি !

(৩)

জননি-জঠরে মুই,—
রাধা রূপ ধে-য়য়ি,—
শ্যাম-বরণ ভেল গোর !
জনম অবধি তঁই,—
শাঁপা বহয়ি ফেরি,—
রা-ধিকা-বেদনা-বিভোর !

(৪)

রা ধা-বরণ-গোর,—
'রা-আধে' ন-মিলয়ি,—
আঁ-আঁখ-বিগলিত লোরে !
আজু মা-নব-হিত-ব্রতে,—
প্রে-এম বি-লাওয়ে,—
পা-পীক ধরণহুঁ কোরে !

(৫)

তঁই আছল বরণ-যে 'শ্যামল' মেরি,—
আজু রাধা-বিরহে 'গোরা' ভৈ-গল ফেরি !

* "মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন,—
তোমারে করিব রাধা !—"চণ্ডীদাস। ... ... [লেখক]

মানসিক বিকার

[অধ্যাপক শ্রীরভীন হালদার, এম্‌-এ]

মনোযন্ত্র—অজ্ঞাত মন

"আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে, সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি ; নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে, কেন না জানি নে।"

শ্রী প্রমথ চৌধুরী।

সবুজপত্র, বৈশাখ, ১৩২১।

"যত জানি, তত জানি না" – এই যেমন বিশ্ব-রহস্য-সন্ধিৎসুর শেষ কথা, তেমনি মনস্তত্ত্বজিজ্ঞাসু জানেন, যত-জানি-না, তা যে যত-জানি তা'র চেয়ে কেবলমাত্র অনেক অনেক বেশি তাই নয়, এমন কি, মনন-যন্ত্রের যে-অংশটাকে আমরা জানি বলিয়া "মন" বলি, সমুদায় চেতস্এর সে একটা ক্ষুদ্র নগণ্য প্রকাশ মাত্র। যে ভাগটা মগ্ন রহিয়াছে, সেটাই যে কি বিপুল, তার পরিচয় আমরা প্রথম পাই মনোবিকারের আলোচনায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিতর্কে পাড়ি দিবার পূর্ব্বে, মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ 'Unconscious' বলিতে কি বোঝেন, তা প্রথমে দেখা দরকার। পশ্চিমেই যখন এই শব্দটির অঙ্গে লক্ষবিধ অর্থ যোজিত হইয়াছে, তখন বঙ্গে যে এ সম্বন্ধে কোন একটা স্পষ্ট ধারণা থাকিবে, এরূপ আশা পোষণ করা একটু অধিক স্বদেশ প্রীতির পরিচায়ক।

ও-ধারে এই অপূর্ব্ব শব্দটির প্রধানতঃ তিন-রকম অর্থে ব্যবহার হইতেছে :—

(১) অ-সংবিদ্ = অ-মানসিক ; এই অর্থটাই খুব প্রচলিত। অন্ততঃ, ভিষক্‌রা ত এ'কে এই অর্থেই ধরেন। ঔষধ প্রয়োগ করিলে, বা মাথায় আঘাত লাগিলে যে একটা অ-চৈতন্য হয়, তা'ই "Unconscious"। মুনষ্টারবার্গ-ও এই অর্থই পছন্দ করেন। এঁ'রা বোধ করি ধরিয়া লইতে চান যে, এমন মনন-ক্রিয়া নাই, যা' আমাদের চেতনার বাহিরে বা অগোচরে ঘটিতে পারে। প্রত্যুত, অধিকাংশ মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মত এই যে, এমন সব ব্যাপার আছে, যা'তে মানসিক ক্রিয়ার সমুদায় লক্ষণই বর্ত্তমান, বাদে গোচরীভূতত্ব। এই মতের অনুসারে সচেতনতাটা মনের অনেক-গুলি ধর্ম্মের মধ্যে অন্যতম মাত্র,—তা'ও আদপেই অবিচ্ছেদ্য নয়।

অ-সংবিদের "অ-মানসিক" অর্থ ধরিলে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্যাপারটা "মনোজ্বরতত্ত্বের" (Psychopathology) কোঠা হইতে একেবারে "মনোজড়তত্ত্বের" (Psychophysics) কোঠায় যাইয়া পড়ে।

(২) দ্বিতীয় ধারণাটাকে সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ধরিয়া খাড়া করা শক্ত। কারণ কি, ওর মধ্যেই রহিয়াছে একটা নিরাকার অনির্দ্দেশ্যত্ব। এ'কে ঝাপ্‌সা ধারণা বলিতে পারি। কেন না, এ'তে অসংবিদ্ বলিতে মনের এমন একটা গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ প্রদেশকে নির্দ্দেশ করে, যার আধেয়ের (Content) প্রধান লক্ষণই হইতেছে অস্পষ্টতা। ইয়ুং এ'র প্রতিপোষক। এঁ'র মতে মনের অজ্ঞাত অংশটা একটা আবর্জ্জনা কোঠার সামিল। অকর্ম্মণ্য জিনিসপত্র রাখিবার জন্য যেমন একটা বাজে ঘরের দরকার, তেমনি নানা মানসিক ক্রিয়া, যা তা'দের কর্ম্মঠতা হারাইয়া সংপ্রতি সুপ্ত হইয়াছে, তা'রা আসলে লুপ্ত হয় না, কিন্তু এই গুপ্ত ঘরে তাক্ত হয়। তা'রা সচেতন মনন-ক্রিয়ার তুলনায় হেয় এবং শক্তিহীন। এই সকল বিস্মৃত মনোভাব খিচুড়ী পাকাইয়া নানাপ্রকার জটিল মনোভাব তৈয়ার করে। তা ছাড়া, নিষ্পেষিত, বিরুদ্ধ, বেদনাময় চিন্তা এবং আবেগ-ও অ-সংবিদের একটা প্রধান অংশ। তিনি এ সকলকে "ব্যক্তিগত অ-সংবিদ্" বলেন। এরই পাশাপাশি "অতি-ব্যক্তিগত অ-সংবিদ্" রহিয়াছে—যা ব্যক্তি দ্বারা অর্জ্জিত না হইয়া উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ; যেমন সহজ সংস্কার। এই "অতি-ব্যক্তিগত অ-সংবিদের" মধ্যেই সহজ জ্ঞান (Intuition) "কারণ" অবস্থায় ঘুমাইতেছে।

আসলে এই ধারণা একটা ঝাপ্সা দার্শনিক ধারণা ছাড়া আর কিছুই নহে।

(৩) তৃতীয় ধারণাটি মনোবিশ্লেষণ মূলক; ফ্রয়ড্-ই এ'কে বিশদ করিয়াছেন। অ-গোচরীভূত মানসিক ক্রিয়াগুলিকে ফ্রয়ড্ দুই ভাগ করেন; (ক) "উপ-সংবিদ্" আর (খ) "অ-সংবিদ্"। উপ-সংবিদ্ চিন্তা সেইগুলিকে বলি, যেগুলি কোন এক বিশেষ মুহূর্ত্তে চৈতন্যের মধ্যে জাগরূক নাই—কিন্তু সুযোগ পাইলেই এরা অনায়াসে বিস্মৃতির তল হইতে উঠিয়া আসিয়া সুগোচর হইয়া দাঁড়াইবে। এদের গুরুত্ব অল্প বলিয়াই এরা চেতন-নিকেতনের বাহিরে দ্বারের পাশে থাকিতে পায়, এবং দরকার মাফিক্ হাজির হয়। অ-সংবিদ্ কিন্তু আবার এই গুরুত্বের আধিক্যের দরুণই সংবিদ্-লোকে প্রবেশে অক্ষম। সংবিদ্ আর অ-সংবিদের মধ্যে যে পাহারাওয়ালা, সে খুব হুঁসিয়ার। কি করিয়া ছদ্মবেশ ধরিয়া অ-সংবিদের মনন-ক্রিয়া পাহারাওয়ালাকে ঠকাইয়া বাহিরে আসে, তা' আমরা পরে আলোচনা করিব।

অ-সংবিদ্ সম্বন্ধে ফ্রয়ডের ধারণা ও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ধারণার প্রভেদ আর কিছু নয়—পূর্ব্বেই একটা মনোমত সিদ্ধান্ত স্থাপন না করিয়া, ফ্রয়ড্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে ধাপে-ধাপে উঠিয়া যান্; অর্থাৎ তাঁর হইতেছে আরোহ-প্রণালী, অতএব বৈজ্ঞানিক প্রণালী। অ-সংবিদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধারণা শারীরিক ও দার্শনিক ধারণা। সবাই জানেন, বিজ্ঞানের মধ্যে 'মিষ্টিসিস্‌ম্'-এর কোন জায়গা নাই,—সেখানে সমস্তই স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। যে-জায়গায় দৃষ্টি আর চলে না, সে-জায়গায় বিজ্ঞান অনায়াসে চুপ্ করিয়া যাইবে, "হিং টিং ছট্" ফাঁদিবে না। অজ্ঞাত মনটা কি রকম হইলে ভাল হয়, তার একটা সুনির্দ্দিষ্ট, কি, নীহারিকা-ময় ধারণা লইয়া কাজ সুরু না করিয়া, ফ্রয়ড্ বাস্তব ঘটনার মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গবেষণার ফলে তিনি ক্রমে অ-গোচর মনন-ক্রিয়াগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাল করিয়া বুঝিতে লাগিলেন,—তাদের আধেয়, অর্থ, উৎপত্তি এবং গৌণার্থ সম্বন্ধে উত্তরোত্তর অধিক জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন—যা'তে করিয়া তিনি এমন জায়গায় দাঁড়াইলেন, যেখান থেকে তিনি এ-সমস্ত ব্যাপারের সাধারণ নিয়ম সম্বন্ধে বড় করিয়া দু'চার কথা বলিতে পারেন।

মনোবিশ্লেষণের মতে অ-সংবিদ্ মনের এমন একটা জায়গা, যা'র আধেয়ের লক্ষণ ছয়টি; দান্ত, চলিষ্ণু, সক্রিয়া, শিশুচিত, অযৌক্তিক এবং প্রবল ভাবে যৌন। এই ষড়্‌গুণ, এবং আরো এখানে-অনুল্লিখিত সব লক্ষণ মিলিয়া অসংবিদের এমন একটা সুসঙ্গত ও সুস্পষ্টার্থ সংজ্ঞা দাঁড় হইয়াছে, যা'র মূলে আছে প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং যা'র সত্যতা যে-কোন লোকে যে-কোন মুহূর্ত্তে পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু তা'র জন্য চাই প্রাক্তন-সংস্কার-বিমুক্ত, শুদ্ধ, সরল, শিক্ষার্থী একটা মন—অর্থাৎ বেকনের "আইডলা"-বিমুক্ত—যা' এ-ধারে একটু দুর্ঘট। একধারে যেমন ভুয়ো স্বদেশহিতৈষিতা (?), আর একদিকে তেম্‌নি যুগ যুগ সঞ্চিত আপন-মন-ভাঁড়ানো তথাকথিত নৈতিকতা মনোগবেষণার ঘোর পরিপন্থী। কিন্তু সে এখন থাক্।

(১) প্রথমতঃ মূলে যেটা সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য, সে হচ্ছে শমদম। নিষ্পেষণের ফলেই অসংবিদের অস্তিত্ব। আমরা এ-সম্বন্ধে কি যে বলিতে চাই, অথচ স্পষ্ট করিতে পারি না, তা'কে একটা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে চতুর্দ্দিক থেকে আক্রমণ করিবার মৎলব রাখি। কথাটা এই, যে, কোন ব্যক্তির জাগ্রত চেতনার মনন ক্রিয়াগুলি আর তার অজ্ঞাত-মনের ভিতরের অ-গোচর মনন-ক্রিয়াগুলি পরস্পর বিরোধী, বেখাপ ও অসমঞ্জস; এই জন্যই অজ্ঞাত-মনের ক্রিয়াগুলির সংবিদের খোলা বারান্দায় আসা বারণ—এই "repression"। বিরোধটা প্রধানতঃ নৈতিক—"নৈতিক"-কে একটু মোটা অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে। ব্যক্তিটির মনোমধ্যে সমাজ, নীতি, ধর্ম্ম, শীলতা, ভদ্রতা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যে-সব মাপ-কাঠি আছে, তা'রই সঙ্গে উক্ত গুপ্তমনঃক্রিয়াগুলির সংগ্রাম। এই গুপ্ত ভাবগুলির অস্তিত্ব মাত্রই অসহ; অতএব ব্যক্তিটি তার মনোমধ্যে এইগুলির বিদ্যমানতা যন্ত্রচালিতবৎ স্বতঃই অস্বীকার করিবে। কতকগুলি চিন্তাকে জোর করিয়া সচেতন ভাবে মন থেকে দূর করিয়া দিবার প্রয়াসের সঙ্গে আমরা অল্প-বিস্তর পরিচিত আছি। কিন্তু দুর্ব্বাসনার নির্ব্বাসন-জাতীয় ঈদৃশী স-চেষ্টতা নিষ্পেষণ-প্রক্রিয়ায় খুব অল্পই কার্য্য করিয়া থাকে। আসলে "শমদম" আর "নিষ্পেষণ" দুই-ই "repression" কথাটার একটা ক্ষীণ অনুবাদ মাত্র। আসলে বেশির ভাগ যা' ঘটে, তা' হচ্ছে একটা যন্ত্রচালিতবৎ অগোচর ঘটনা। ব্যক্তির অজ্ঞাতে

তার চৈতন্যের তরফ্ থেকে কোন চেষ্টার অপেক্ষা না রাখিয়াই, চিন্তার অসমঞ্জস ও বেখাপ ধারা দু'টি আপনা-থেকেই তফাৎ থাকে।

(২) তা' হইলে দেখা গেল, অসংবিদ্ একটা নির্ব্বাসিত মানসিক পদার্থ – যদিও নির্ব্বাসন নিষ্কাশন নয়। দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিব যে, এই বস্তুর একটা গতি-বেগ আছে। অসংবিদ্ একটা শান্ত নিশ্চুপ বস্তুপুঞ্জের জমাখানা ত নয় মোটেই, বরঞ্চ একটা কারখানাঘর, যার মধ্যে প্রচণ্ড সব তাণ্ডব চলিতেছে। গুপ্ত মনঃক্রিয়াগুলিকে "ইচ্ছা" আখ্যা দিতে পারি। এই ইচ্ছাগুলি, কাল্পনিক হোক্, বাস্তবিক হোক্,—যে কোন রকমের তৃপ্তির জন্য অনবরত কেবল গুমরাইতেছে; আর এই সচেষ্টতার দরুণই অসংবিদের বহিঃপ্রকাশগুলি ঘটিতে পায়। আমরা ক্রমে দেখিব যে, স্বপ্নে, পুরাণে, উপকথায়, শিল্পে, সাহিত্যে ও মানুষের নানাবিধ চিন্তায় এবং কাজে কি করিয়া সেগুলির প্রকাশ হয় এবং কি করিয়া সে ইচ্ছাগুলি পূর্ণ হয়।

(৩) অসংবিদের তৃতীয় লক্ষণটি পূর্ব্বোক্তগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রূপে সম্পর্কিত। আমাদের সহজাত সংস্কারগুলি আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার পরিমার্জ্জনের পূর্ব্বে একটা অসংস্কৃত আদিম অবস্থায় থাকে; আমাদের মনস্ এর অ-গোচর অংশটা তা'দের খুব কাছাকাছি। এই সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত, এবং এই সকলের উদ্দেশ্য শেষকালে সিদ্ধ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভিতরে-ভিতরে কি যে সংগ্রাম চলিতে থাকে, তা' সাধারণতঃ কা'রও হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ-সকল ছাড়া মানুষ হয় ত একটা স্বার্থপর, হিংসুক, অপরিচ্ছন্ন, অবিনয়ী, নিষ্ঠুর, আত্মসর্ব্বস্ব ও দাম্ভিক জন্তু-মাত্র হইত, সে অপরের সুবিধা-অসুবিধার কোন ধার ধারিত না, এবং সভ্য-সমাজের জন্য যে-সমস্ত অতি জটিল সামাজিক ও নৈতিক মাপকাঠির দরকার, সে সমস্ত সম্বন্ধেও তার কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। তথাপি, মনোবিশ্লেষণের চর্চ্চায় যতদূর জানা গেছে,—এই মার্জ্জন প্রণালীর ফল সাধারণতঃ যত সুষ্ঠু ও সুসম্পাদিত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে, প্রকৃত প্রস্তাবে তত নয়। সভ্যতার চাকচিক্যের পেছনে জীবন ভরিয়া একটা আদিম, অসংস্কৃত ও ক্ষুধিত বাসনার পুঞ্জ প্রোথিত থাকে,—এ সর্ব্বদাই প্রকাশের জন্য আঁকুবাঁকু করিতেছে, সুযোগ পাইলেই মানুষ সেই আদিমতায় ফিরিয়া যাইতে চায়।

(৪) শিশু-জীবনের একেবারে আদিতে "মনস্" সচেতন আর অ-চেতনে দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়,—সম্ভবতঃ এটা প্রথম বর্ষেই ঘটে। আমরা যে-সমুদয় অ-নৈতিক ও অসভ্যোচিত বৃত্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হই, তা'দের সঙ্গে সমাজানুশাসনের অনুসারক নিষেধক বৃত্তিগুলির দ্বন্দ্বেই এই দ্বিখণ্ডীভবনের সূত্রপাত। এই নিষেধক বৃত্তিগুলিও সম্ভবতঃ অংশতঃ সহজাত,—যদিও এদের অধিকাংশই প্রলব্ধ ও অর্জ্জিত। আদিম প্রবৃত্তিগুলি নিষ্পেষিত হওয়াতে, তা'দের বেগের অধিকাংশ অপর সব সামাজিক লক্ষ্যের মুখে পরিচালিত হয়; চৈতন্যের কর্ম্মতৎপরতা যে শক্তি থেকে উদ্দীপনা পায়, তা'র বেশির ভাগেরই উদ্ভব এইখানটাতে। সোজাসুজি বহিঃ প্রকাশ যে তা'রা পাইল না, তা'র মানে এই নয় যে, তা'রা একদম্ বরখাস্ত; কিন্তু তা'রা কেবল মাটির নীচে মাথা লুকাইতে বাধ্য হইল—সেখান থেকে বক্র-কুটিল সব বিচিত্র পথে তা'রা দেখা দিবে। কোন কোন বৈচিত্র্যকে হয় ত আমরা "বিকার" বলিয়া জানি। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, যা'কে বিকার বলি, তার-ও মধ্যে স্বভাবের কার্য্যটি ঠিক্ ঠিক্ মত-ই চলিতেছে। অতএব কোন্ জায়গাটাতে যে স্বভাবের শেষ হইয়া গিয়া অস্বাভাবিক বিকারের এলাকার সুরু, সেই সীমা-রেখাটি ধরা একটু শক্ত কথা। ব্যাপার এই যে, আসলে ঐ রেখাটি মোটে নাই-ই। শুধু সমাজের মাপকাঠিতেই আমরা মনোবিকারের বিচার করি,—সমাজের সঙ্গে বনিবনাও না হইলেই বলি, লোকটার মাথা খারাপ।

(৫) সে যাই হোক্, শিশুর স্বভাব যে কেবল নৈতিক মাপকাঠিকেই তাচ্ছিল্য করে, তাই নয়; তা'র কাছে নৈয়ায়িকেরও মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। অসংবিদের অবশ্য আপনার আলাদা রকমের একটা কার্য্য কারণ সম্বন্ধ-পারম্পর্য্য রহিয়াছে; কিন্তু সে ন্যায়, বিচার-বুদ্ধির ন্যায় নয়, সে মনোবেগের ন্যায়। সেই জন্যই সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা এ'কে অযৌক্তিক বলিয়া দেখিয়া থাকি। কালশূন্যতা, অর্থাৎ কালের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কের ঐকান্তিক অভাব, অ-সংবিদের একটা প্রধান লক্ষণ। মোট কথা, অ-সংবিদ্ "লজিকের" কোন তোয়াক্কাই রাখে না।

(৬) অ-সংবিদের ষষ্ঠ লক্ষণ একটা অতি প্রবল যৌন ভাব,—"যৌন" কথাটাকে একটু মোটা অর্থে ধরিতে হইবে। এই যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে আমরা পরে যথাস্থানে বিস্তারিত রকমে আলোচনা করিবার আশা রাখি। কারণ কি "Sufficient unto the day is the evil thereof." শৈশব-মনস্ যৌন ভাবের প্রভাবের বাহিরে নয়, এ-ই এই স্থানে আমাদের বক্তব্য। যৌনতা যৌবনেরই একচেটিয়া নয়। অ-সংবিদের এতাদৃশ যৌন হইবার কারণ আর কিছুই নয়—তথাকথিত সভ্যতার স্রোতে এই "আদি" ভাবটাই সবচেয়ে বেশী নিষ্পেষিত হয়; এবং এই নিষ্পেষণেই অসংবিদের অস্তিত্ব।

অসংবিদ্ লইয়া কারবার বলিয়া মনোবিশ্লেষণ, শোনা যায়, দুর্নীতি-মূলক। এই অপবাদের মূল্য তা'দের কাছেই, যা'রা দুনিয়ার বিজ্ঞানগুলিকেও নিজেদের "মরাল" কাঠির দ্বারা মাপ করে। অ-সংবিদের মূলে আছে এমন একটা ভেদাভেদ-বিবেচিকা বুদ্ধির অসদ্ভাব, যা' প্রাকৃত মনের একটা প্রধান ধর্ম্ম। নীতির রাজ্য কেবল যে চৈতন্যের এলাকায়, অ-সংবিদ্ যে একটা আলাদা প্রদেশ, এই কথাটি মনস্তত্ত্ব-শিক্ষার্থীকে অতি অবহিত চিত্তে প্রণিধান করিতে হইবে। জীবনের এমন একটা দশায় অসংবিদের সূত্রপাত, যখনও পর্য্যন্ত জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া হয় নাই। আসল কথাটা হচ্ছে, অ-চেতন মনোবেগগুলি ভীষণরূপে অহং-কেন্দ্রিক—তা'র যা' দরকার, সেই দিকেই তা'র গো—তার পর চেতন লোকের ভাষায় তা'কে সুনীতিই বল, আর দুর্নীতিই বল। অ-সংবিদ্ আসলে দুর্নীতিগ্রস্তও নয়, নীতি-বাদীও নয়,—সে অ-নৈতিক। শিল্প ও সাহিত্যের উৎপত্তি এই অসংবিদে, তা' আমরা পরে দেখিব। ততক্ষণ, যে-সকল নীতি বাতিক-গ্রস্ত সমালোচক (?) মহাশয়েরা "কাব্যে দুর্নীতি" শীর্ষক নিবন্ধে বাংলা মাসিকের আটপাতা জোড়েন, তাঁ'রা একটু দয়া-পুরঃসর অবধান করিবেন; কারণ কি, মনঃ কন্দর এমন একটা আঁধার বন্দর, যেখান-টাতে "Shipping" জাতীয় "intelligence" বড় কাজে আসে না।

যাক্, অসংবিদের একটা মোটামুটি আভাস এবারে দেওয়া গেল। ষ্টান্‌লি হল্ বলেন, মনকে সমুদ্রে-ভাসা তুষার-শৈলের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে যা'র আট ভাগের একভাগ জলের উপরে, সুতরাং দৃশ্য;—আর আট ভাগের সাত ভাগ জলের নীচে, সুতরাং অ-দৃশ্য। এই দৃশ্য অংশকে সংবিদ্ এবং অ-দৃশ্য অংশকে অ-সংবিদ্ বলা যায়।

অসীম

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ]

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সেই উদ্যানতলে সহস্র-সহস্র মুক্তাবিন্দু শ্যামল দূর্ব্বাদল-শীর্ষ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল; স্বচ্ছ শিশিরের স্বল্প আবরণ তরুশির মণ্ডন করিয়াছিল। সদ্যঃ-প্রবুদ্ধ বিহগকুল কুলায় পরিত্যাগ করিয়া দিগন্ত শব্দায়মান করিতেছিল। স্থবির অশ্বত্থমূলে একখানা মৃদু হরিদ্বর্ণ ইরানী গালিচা দূর্ব্বাশ্যাম ভূপৃষ্ঠে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িয়া ছিল। তখন অরুণ-বরণ তরুণ তপন-কিরণে স্নিগ্ধ, শান্ত, উষার ঈষদালোকে প্রস্ফুটনোন্মুখ গোলাপের ন্যায় সুন্দরী একটী রমণী নিঃশব্দ পাদক্ষেপে সেই শিশিরবিন্দু-শোভিত জীর্ণ অশ্বত্থতলে ঈষদ্ধরিৎ ইরানী গালিচার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রমণী যুবতী। যে যৌবনের প্রারম্ভে কুকুরীও পরমা সুন্দরী হয়, রূপসী সেই মনোবিমোহন প্রথম যৌবনের সীমায় পদার্পণ করিয়াছে মাত্র। গমনকালে তাহার সমস্ত সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া একটা অবর্ণনীয় তড়িৎ তরঙ্গ দেখা যাইতেছিল,—তাহা কেবল গতিশীলা, সদ্যঃস্নাতা, অনির্ব্বচনীয় সুন্দরীতেই দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদ্বর্ণ ইরানী গালিচার প্রান্তে উপস্থিত হইয়া যুবতী সহসা তাহার এককোণে লুটাইয়া পড়িল, সেই কোণটা বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল, তাহা মস্তকে রাখিল, হৃদয়ের উপরে স্থাপন করিল এবং অবশেষে পুনর্ব্বার চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থা হইয়া যুবতী সেই জীর্ণ অশ্বত্থের একটা উচ্চ মূলে উপবেশন করিল, এবং অস্ফুট স্বরে গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। অস্ফুট স্বর ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিল।—

"ও মেরে পিয়ারে।
কভি না মিটি মেরি নয়নাকো পিয়াস,
ময় না ছোড়ে তেরি দরশনকে আশ।
বিত গয়ে কিতি দিবস রজনী,
বিত গয়ে মাহ্ সাল।
বিত গয়ে মেরে রূপ যৌবন
বিত গয়ে খুস হাল।
গুজরে মালিক গুজরে মুল্লুক,
গুজরে দৌলৎ মাল।
গুজর গয়ে মেরে সুখ ও দুখ,
গুজর গয়ে মেরে কাল।
সব সুখ গয়ে মেরে ও পিয়ারে—
মেরে দিল তবহুঁ নাহি হোয়ে নিরাশ।"

গীত শেষ হইল। রমণী উহা পুনর্ব্বার গাহিল। সেই সময়ে তাহার পশ্চাৎ হইতে এক শুভ্র বসন-পরিহিত অনিন্দ্য-গৌরকান্তি যুবা তাহার নিকটে আসিলেন। রমণী কিন্তু সঙ্গীতে ও নিজ মনোভাবে তন্ময় হইয়া তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না। যুবা যখন গায়িকার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন রমণী চমকিতা হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল,—তাহার মুখ লজ্জায় অরুণ হইয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল, "আপনি—তুমি?" সম্বোধন শুনিয়া যুবা শিহরিয়া উঠিলেন। রমণী পুনরায় কহিল, "তুমি? মাশুক, পিয়ার, দিল,—তুমি?" যুবা দুই হস্ত পিছু হটিয়া গেলেন এবং কহিলেন, "মণিয়া বাঈ, কি বলিতেছ?" "বলিতেছি কি জান, জানি? বলিতেছি যে, আমার এই ছাতির অন্দরে তোমার জন্য তখ্‌তেতাউশ পাতিয়া রাখিয়াছি। আমার কলিজা, আমার দিন দুনিয়া, আমার দিল্, আমার বাদশাহ্—।" "মণিয়া—মণিয়াবাঈ—কি বলিতেছ মণিয়াবাঈ? তুমি কি পাগল হইয়াছ? আমি যে তোমাকে একটা কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি।" "কাজের কথা? আমার সঙ্গে তোমার আর কি কাজ থাকিতে পারে দিলের? দেখ, মহুয়ার গন্ধে মৌমাছিগুলা পাগল হইয়া ছুটিয়াছে,—বকুলতলে ফোটা ফুল গন্ধে আকুল করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত রাত্রি ফুল কুড়াইয়া তোমার জন্য শয্যা রচনা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। দিলের, একবার বসিবে চল!" "ছি মণিয়া, ও কি বলিতেছ! এখনই কে আসিয়া পড়িবে,—হয় ত কে দেখিয়া ফেলিবে,—কি মনে করিবে?" "মনে করিবে? আমি তাহার সম্মুখে তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইব।" "রাম, রাম,—মণিয়াবাঈ, তুমি কি পাগল হইয়াছ?" "সে কথা কি এতদিনে বুঝিলে জানি? যেদিন আফরাশিয়র খাঁর অম্বর দুয়ারে তোমার অতুল রূপরাশির ডালি আমার নয়নপথে ধরিয়াছিলে, মণিয়া যে সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তোমার জন্য পাগলিনী হইয়াছে, তাহা কি বুঝিতে পার নাই? এতদিন কি তোমার চোখের সম্মুখে পর্দ্দা পড়িয়া ছিল? জানি, পাটনা সহরের প্রসিদ্ধা মণিয়াবাঈ কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে পিতা, মাতা, নাম, যশঃ, প্রথম যৌবনের রোজগার ছাড়িয়া আসিয়া, তোমার দুয়ারে কুক্কুরের মত পড়িয়া আছে, তাহা কি বুঝিতে পার নাই? আউরৎ একমাত্র কারণে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারে; এবং মণিয়া সেইজন্যই সমস্ত ছাড়িয়াছে।" কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া, অসীম দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, "মণিয়া, সে কথা সত্যই আমি বুঝিতে পারি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তুমি আফরাশিয়র খাঁর ভয়ে আমার গৃহে আশ্রয় লইয়াছ। তুমি জান যে আমি হিন্দু, তুমি জান যে ইহা নিষ্ঠাবান হিন্দু-ব্রাহ্মণের গৃহ, তুমি জান যে অনাথা আশ্রয়হীনা পরিচয়ে এই গৃহে স্থান পাইয়াছ, তুমি জান যে তুমি যবনী, আমার অস্পৃশ্যা? মণিয়া, কাঁদিও না, কাঁদিয়া কোন ফল নাই। এ কথা যদি পূর্ব্বে বলিতে, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে তোমার পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিতাম।" মণিয়া কাঁদিতেছিল, অসীমের উক্তির শেষাংশ শুনিয়া সে সহসা স্থির হইয়া গেল; এবং বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিল, "জানি, তুমি যদি আজি মণিয়াকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া কাটিয়া কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ কর, তথাপি তাহার মুখে রূঢ় কথা শুনিবে না। তোমরা - পুরুষেরা এই বুদ্ধি লইয়া রাজ্য শাসন কর; অথচ বুঝিতে পার না যে, একটা মানুষ, যে ধূলি তোমার পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়াছে, তাহা অঙ্গে মাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বেড়াইতেছে? দিলের, জানি তুমি হিন্দু, জানি তুমি

উচ্চবংশ জাত, জানি তুমি দীনা-হীনা বেশ্যা-কন্যার পক্ষে দুর্লভ দেবতা—তথাপি জানি, আমি রমণী। মুহূর্ত্তের জন্য তোমার চরণপ্রান্তে আমার হীনতা, দৈন্য, ক্ষুদ্র রূপ-যৌবন সমর্পণ করিয়াও আমি সুখী। সে যে কত সুখ, তাহা যে তোমরা বুঝিতে পার না দিলের! তুমি তোমার রূপ, যৌবন, ধন, মান, ধর্ম্ম, বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ফিরিয়া যাও; দীনা, হীনা, যবনী বেশ্যা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া তাহা কলঙ্কিত করিও না। যদি কখনও সময় পাও—সুখ-সম্ভার, বৈভব, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যদি কখনও সময় পাও, তাহা হইলে বর্ষবর্ষান্তে একবার স্মরণ করিও, আমার আত্মা তাহাতেই তৃপ্ত হইবে।"

মণিয়া অশ্বত্থমূল পরিত্যাগ করিল,—অসীম চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে মণিয়া কহিল, "আপনি কোথায় আসিতেছেন, ফিরিয়া যান।" অসীমও রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ মণিয়া?" সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মণিয়া কহিল, "বাবুসাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যান,—আমার মুহূর্ত্তের জন্য চিত্তবিভ্রম হইয়াছিল, এখন তাহা কাটিয়া গিয়াছে। আমি মণিয়া, পাটনা সহরের কসবী, মুজরা করিয়া খাই,—এখন আমার কসবী মায়ের ঘরে আবার কসব করিতে ফিরিয়া যাইতেছি। ভয় করিও না বাবু-সাহেব, আমি মরিব না। আমার জাতির কি মরণ আছে?" সহসা অসীম অগ্রসর হইয়া মণিয়ার হস্ত ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, "মণিয়া, জীবন তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া যখন তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য পাঠানের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলাম—তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তোমাকে এমন করিয়া বিদায় দিব! মণিয়াবাঈ, তোমার পিতা-মাতা পাটনা সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বলিয়া বেড়াইতেছে যে, অসীম রায় তাহাদের বালিকা কন্যাকে ভুলাইয়া আনিয়াছে। সেইজন্য তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাও। আর—আর—আর কি জান মণিয়া,—এখনও পর্য্যন্ত কেহ আমাকে প্রেম-সম্ভাষণ করে নাই—তোমার-তোমার নিকট এ—এ সম্ভাষণ প্রত্যাশা করি নাই।" মণিয়া তাহার হস্তমুক্ত করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া, অসীমের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল,—তাহার অশ্রুধারা তাঁহার পদ-প্রান্ত অভিষিক্ত করিল। রুদ্ধকণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "স্পর্শ করিলে কেন? আমার বেশ্যা জননী জীবনে যে পথ আমার জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল, সেই পথ অবলম্বন করিতে যাইতেছিলাম দিলের! তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে কেন? তোমার পবিত্র স্পর্শে হীনা, যবনী, বেশ্যাকন্যা যে পবিত্র হইয়া উঠিল! কেন তুমি আমার উদ্দেশ্য বিফল করিলে? যে দেহ তোমার পবিত্র করস্পর্শে পূত হইয়াছে দিলের, তাহা আর কামুকের পাপ করস্পর্শে কলুষিত হইবে না—তাহা উৎসর্গীকৃত শুভ্র-পুষ্পের ন্যায় চির নির্ম্মল থাকিবে।" অসীম মণিয়ার হস্ত ত্যাগ করিলেন। মণিয়া চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিলের, তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। বল, আমি কোথায় যাইব?" অসীম অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "মণিয়া, তুমি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাও।"

এই সময়ে সেই প্রভাত সূর্য্যকিরণ-প্লাবিত সুন্দর উদ্যান মুখরিত করিয়া বামাকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইল—

"ভাল যদি বাস নিরবধি
তবে কেন ও কালবরণ,
কুঞ্জান্তরে সারানিশি ফিরে
উষাকালে এলে গুণানিধি?"

গৈরিক-বসন পরিহিতা এক বঙ্গদেশীয়া বৈষ্ণবী খঞ্জনী বাজাইতে-বাজাইতে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবী আসিয়া সেই অশ্বত্থমূলে দাঁড়াইল। অসীম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কোথায় গা?" বৈষ্ণবী হাসিয়া গড় হইয়া একটা প্রণাম করিল, এবং কহিল, "ছোট হুজুর, আমাকে চিনিতে পারিলেন না, আমি যে সরস্বতী! সেই ডাহাপাড়ার ঠাকুর-পাড়ায় আমার ঘর।" অসীম অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তাই ত, তুমি সরস্বতীই ত! এ দেশে কবে আসিলে সরস্বতী?" "কাল সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছি। ছোট হুজুর, ভাল আছেন ত? আপনারা দুই ভাই চলিয়া আসিবার পরে, গ্রাম যেন কাণা হইয়া গিয়াছে। কবে দেশে ফিরিবেন হুজুর?" "দেশে যে কবে ফিরিব সরস্বতী, বলিতে পারি না; কখনও ফিরিব কি না সন্দেহ।"

"সে কি কথা! অমন কথা মুখে আনিতে নাই। আপনার বাড়ী, আপনার ঘর, আপনার ধন-দৌলৎ, আপনি কাহার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইয়াছেন?" "সে অনেক কথা সরস্বতী! তুমি কোথায় যাইবে?" "বৈষ্ণবের মেয়ে আর কোথায় যায় হুজুর? বয়স হইয়াছে,—দেশে আপনার বলিতে বড় কেহ নাই, সুতরাং বৃন্দাবনে চলিয়াছি! আপনাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে এতদূর আসিয়াছি। মদনমোহন যদি টানেন, তাহা হইলে শ্রীবৃন্দাবন অবধি পৌঁছিব।" "এতটা পথ কি করিয়া চলিবে?" "কেন, পায়ে হাটিয়া?" "দিন গুজরাণ হয় কি করিয়া?" "ভক্ত জন দেখিলে নাম শুনাই,—প্রভু যেদিন যাহা জুটান, তাহাই খাই। যেখানে সন্ধ্যা হয়, সেইখানেই রাত্রি কাটাই। অন্য কোনও উপায় নাই।" "ভাল কথা, আমাদের সন্ধান পাইলে কোথায়?" "শুনিলাম, এইখানে একজন বাঙ্গালী আমীর আছেন। ভাবিলাম, আর কিছু হউক না হউক, একবেলার অন্ন ত জুটিতে পারে!" "বাঙ্গালী আমীর! এটা ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাসা।" "ওমা, তাই বুঝি! তবে এ বেলা এইখানেই প্রসাদ পাইব।" "তুমি অন্দরে যাও,—সম্মুখে পূজার ঘরে দুর্গাকে দেখিতে পাইবে।"

সরস্বতীও তাহাই প্রার্থনা করিতেছিল,—অনুমতি পাইয়াই সে নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইল। অসীম যতক্ষণ সরস্বতীর সহিত আলাপ করিতেছিলেন, ততক্ষণ মণিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার অসীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিয়া, তুমি কখন যাইবে?" মণিয়া কহিল, "এখনই।" "চল, আমি তোমাকে রাখিয়া আসি।" "আপনাকে আর ঝুট্ মুট্ তখলিফ্ দিব না, আমি একাই যাইতেছি।" "তোমার একা যাওয়া উচিত নহে; কারণ, তোমাকে প্রায় সমস্ত সহরটা ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। পাটনা সহর, সুতরাং সকাল হইলেও নিরাপদ নহে।" "কোন চিন্তা নাই। পাটনা সহরের কোন লোক মণিয়ার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবে না—সে করে কেবল দিল্লী ও আগরার লোক। যাইবার পূর্ব্বে একটা কথা নিবেদন করিয়া যাই বাবু সাহেব, যদি কখনও সহসা তোমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই, অথবা যদি দেখিতে পাও, যেখানে আমার উপস্থিত থাকিবার কথা নহে সেখানেও আমি উপস্থিত আছি, তাহা হইলে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না।" "কথাটা বুঝিলাম না মণিয়া!" "বাবু সাহেব, এই সপ্তাহকাল তোমাকে নিরবধি দেখিতে পাইতেছি,—হয় ত মধ্যে মধ্যে চোখের দেখা দেখিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিব না,—মনের বল, দেশ-কাল-পাত্রের বিবেচনা ভাসাইয়া দিয়া, তুমি যেখানে আছ দিলের —, বাবু সাহেব, সেইস্থানে লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে। তুমি ভয় পাইও না, তোমার জাতি বা বংশ-মর্য্যাদার কোন হানি হইবে না।" "লজ্জা দিও না, মণিয়া, আমি যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিব, তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট আসিও। যদি বাদশাহের দরবারে থাকি, তথাপি আসিও। কিন্তু তুমি একা যাইতে পারিবে না; চল আমি তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।" "ঐটি মাফ্ করিও। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একাই যাইতে হইবে। দোহাই তোমার দিলের,—মাঝে-মাঝে ঐ সম্বোধনটা এখনও আসিতেছে; কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের একমাত্র ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিতেছি, কাল হইতে আর আসিবে না।"

মণিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইয়া রাজপথ অবলম্বন করিল; এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইল যে, একখানা তাঞ্জামে বসিয়া এক মুসলমান যুবা সহর হইতে ফিরিতেছে। সে তাঞ্জামের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাহকদিগকে কহিল, "রাখ।" আরোহী তাহার মুখের দিকে চাহিলে, সে মস্তকের অবগুণ্ঠন সরাইয়া দিয়া কহিল, "ফরীদ, তাঞ্জাম হইতে নাম।" তাহার মুখদর্শন করিয়া ফরীদ এক লম্ফে তাঞ্জাম পরিত্যাগ করিল; এবং মণিয়ার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "মণিয়া জান্, সমস্তই খোদার কেরামতী! আমার জানটা যেন এতদিন কলিজার পাঁচা ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছিল। রহমৎউল্লাহ্ জানি, বল, তুমি আজি আমার মজলিস্ গুলজার করিবে?" "যাইব,—কিন্তু দুই দণ্ডের অধিক থাকিতে পারিব না ভাই!" "সেটা কি কথার কথা মাশুকা?" "শোভান্ আল্লা! ও নাম করিও না,—আমি নেকা করিয়াছি।" "তোবা, তোবা,—ঝুট্ বলিও না। এই প্রথম যৌবনের হাজার মজা ছাড়িয়া, তুমি কেন নেকা বসিতে যাইবে মণিয়াজান্? যাহার নাক নাই, যাহার কাণ নাই, যাহার কোমর বাঁকা, যাহার যৌবনের আফ্তাব ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহারা গিয়া বিশটা করিয়া নেকা বসুক।

মণিয়াজান্, তুমি পাটনা সহরের আঁখিয়ার রোসনি, সুবাবিহারের বুলবুল। তোমায় কয়দিন না দেখিয়া আমি ফকীরী লইতেছিলাম।" "দেখ ফরীদ! পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পাগলাম করা ভাল নয়। যদি বেশী গোলমাল করিবি, তাহা হইলে তোর মজলিসে যাইব না। তোর তাঞ্জামটা একবার ছাড়িয়া দে, আর আমাকে একবার মহেন্দ্রুতে লইয়া চল।" "কি ভাই, আস্নাই?" "ঝাড় মারি আস্নাইয়ের মুখে! গুনিয়ায় আসিয়া বহুৎ আস্নাই করিলাম, এখন দিনকতক পরকালের কথা ভাবিতে দে।"

মণিয়া তাঞ্জামে আরোহণ করিল এবং মস্তকের অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। ধনি-সন্তান ফরীদ খাঁ তাহার নিতান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায় সঙ্গে-সঙ্গে চলিল। মহেন্দ্রু পাটনা সহরের অদূরে অবস্থিত। তখন এই অঞ্চলে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিত। মহেন্দ্রুর নিকটে আসিয়া মণিয়া ফরীদকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফরিদ্ ভাই, তোর সঙ্গে কোন হিন্দু ফকীরের আলাপ আছে?" ফরীদ বিস্মিত হইয়া কহিল, "তোবা, তোবা! হিন্দু ফকীর কি করিবে মণিয়াজান্?" "আমার খসমটা নেকা করিয়াই বিগ্ড়াইয়াছে,—তাহাকে বশ করিবার ঔষধ মাগিতে যাইব।" "তোমার খসম্ বিগ্ড়াইয়াছে? মণিয়াজান্, না জানি পাটনা সহরের বাকী আউরাংগুলার খসম কি অবস্থায় থাকে!" "তাহারা এলাজ শিখিয়া রাখিয়াছে! আমার ত এতদিন খসম ছিল না, সুতরাং এলাজের জরুরৎও ছিল না।" "তোবা, তোবা। মণিয়াজান্, তোমার খসম হয় পাগল, নয় দেওয়ানা।" "সে কথা ছাড় ভাই,—আমাকে একজন হিন্দু ফকীরের নিকট লইয়া চল।"

মহেন্দ্রুতে একটা পুরাতন পুষ্করিণীর তীরে একদিকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীরা এবং অপর দিকে ফকীরেরা বাস করিত। সন্ন্যাসী ফকীর নিত্য আসিত, যাইত; তথাপি, সেই প্রাচীন পুষ্করিণীর উভয় তীর সর্ব্বদা সন্ন্যাসী-ফকীরে পরিপূর্ণ থাকিত। পুষ্করিণীর অদূরে তাঞ্জাম ও ফরীদ খাঁকে রাখিয়া মণিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইল। পুষ্করিণী-তীরে এক প্রাচীন তিন্তিড়ী-মূলে বৃহজ্জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী ধূনি জ্বালিয়া বসিয়া ছিলেন,—মণিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" সন্ন্যাসী তাহার বেশভূষা দেখিয়া কহিলেন, "পহেলে সেবা লাগাও!" মণিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি সেবা লাগাইব বাবা?" সন্ন্যাসী স্মিতবদনে কহিলেন, "দো-চার রোজ হাম্‌কো ভজন তো করো!" মণিয়া বিরক্ত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

নিকটে আর এক বৃক্ষতলে জনৈক অসংযত যুবা ব্রহ্মচারী নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া, তাহার প্রথম-যৌবন স্পর্শে বিকশিত কমনীয় কান্তির প্রতি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় চাহিয়া ছিল। মণিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?" যুবা সাগ্রহে কহিল, "একঠো কেঁও, বিশঠো পুছো, হাজারঠো পুছো। লেকেন বরঠো—" মণিয়া বিরক্ত হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। একে-একে সকল সন্ন্যাসীকে দূর হইতে দেখিয়া, সে অবশেষে পুষ্করিণীর এক কোণে এক বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইল। তিনি কহিলেন, "তোমার যদি অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিবার থাকে, তাহা হইলে অন্য সময়ে আসিও।" মণিয়া উত্তর শুনিয়া বুঝিল যে, এই স্থানেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে; সুতরাং সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী রজতমুদ্রা বাহির করিয়া ব্রহ্মচারীর পদপ্রান্তে রাখিল। ব্রহ্মচারী তাহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "অর্থ দিলে প্রশ্নের উত্তর পাইবে না।" মণিয়া লজ্জিতা হইয়া টাকাটি উঠাইয়া লইল; এবং প্রণাম করিয়া দূরে বসিল। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মচারী কহিলেন, "মায়ি, বলিয়াছি ত, অধিক কথা বলিবার সময় এখন নাই,—দুই-একটা কথা এখন যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিয়া লও।" মণিয়া থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমি বেশ্যাকন্যা,—কিন্তু আমার পিতা মুসলমান।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মণিয়া থামিল; কিন্তু ব্রহ্মচারী কথা কহিলেন না। তাহা দেখিয়া মণিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "বাবা, আমি কি হিন্দু হইতে পারি?" ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যদি উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া হিন্দু হইতে চাও, তাহা হইলে এখনই হইতে পার।" মণিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন করিয়া?" "শরীর, মন আর কথা হিন্দুর অনুকরণ করিও,—মুসলমানের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিও। ইহা যদি পার, পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও,—এখন যাও।" মণিয়া উঠিল। তাহার যৌবন-মাধুরী-মণ্ডিত দেহের লালিত্য-দর্শনলোলুপ বিংশতি-যুগল সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর নয়ন তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দু-একটী কথা

[শ্রীঅনুরূপা দেবী]

অদ্য আপনাদের মধ্যে দু-একটী কথা বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া, এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছি ; এ জন্য প্রথমেই ক্ষমা-ভিক্ষা করিলাম। আমি জানি, আজিকার এই সমাগতা মহিলামণ্ডলীর মধ্যে আমার অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকারে উন্নতিশালিনী অনেকেই আছেন, যাঁদের সমক্ষে আমার উপদেষ্ট্রীর পদ গ্রহণ শুধুই হাস্যকর নহে, পরন্তু ধৃষ্টতাও।

আমার শক্তি সামান্য, অবসর অল্প ; তথাপি, আজ যে দু-একটী কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছি, সে শুধু বন্ধুজনের আগ্রহে,—নিজের কোন বিদ্যাবুদ্ধির জাঁক দেখাইবার উদ্দেশ্যে নহে। অতএব, কেহ যদি একটা বড় জিনিসের প্রত্যাশা করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের সহিত জানাইয়া রাখিতেছি যে, তাঁহাকে একান্ত ক্ষুণ্ণ চিত্তেই ফিরিতে হইবে। স্নেহসম্পন্না আমার এক বন্ধুবরা "সমাজমধ্যে নারীর কর্ত্তব্য" বিষয়ে আমায় কিছু লিখিতে বলেন। কিন্তু এত বড় বিষয়ের আলোচনা করিতে পারার মত বিদ্যা-বুদ্ধি ও অবসর না থাকায়, উপযুক্ত বোধে, সে সম্বন্ধে যাহা কিছু জানান উচিত, তাঁহার উপরেই সে ভার অর্পণ করিয়া, আমার সামান্য বুদ্ধি-বিদ্যার উপযোগী দু-একটী কথা মাত্র বলিব। তবে যদি এই ভাবের আলোচনার উপকারিতা কেহ-কেহ বোধ করেন, এবং ভবিষ্যৎ কালে আবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

নর এবং নারী লইয়াই মানব-সমাজ। ইহাতে একের বিহনে যখন কেবলমাত্র অপরকে লইয়াই সমাজ গঠন অসম্ভব, তখন একের সম্বন্ধে কোন কথা ভাবিতে বা বলিতে গেলেই, অপরের সম্বন্ধেও সেই সঙ্গে চিন্তা বা আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। একজন বৈদেশিক পণ্ডিত বলিয়াছেন, "নর এবং নারী সমাজ রূপ পক্ষীর দুইটি পক্ষ। ইহাদের একজনকে বাদ দিয়া অপরকে যখনই উড়িবার (উন্নতি করিবার) চেষ্টা করিতে দেখি, তখনই আমার মনে দারুণ ক্লেশ বোধ হয়, এবং সফলতার সম্বন্ধে সন্দিহান হই।"—

আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা নারীকে নরের অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে কল্পনা করিয়াছেন ; এবং তাঁহাকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী রূপে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। এই 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' এবং 'সহধর্ম্মিণী' শব্দ দুইটি দ্বারা তাঁহাদের সমগ্র অধিকার যেরূপ সুস্পষ্ট এবং সুষ্ঠু রূপে প্রকাশ পায়, এমন আর অপর কিছুতেই নহে। আবার, শুদ্ধ মাত্র এই বাহ্য জগতেই নহে, সমুদায় বিশ্বকাণ্ডও যে এই উভয় শক্তির সম্মিলন-ফল, তাহা সমস্ত দর্শনশাস্ত্র শতমুখে প্রচার ও প্রমাণ করিতেছে। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ, ভক্তের শিবশক্তি, এমন কি একমেবাদ্বিতীয়ম,—এক এবং অদ্বিতীয়ের প্রচারক যে বেদান্তশাস্ত্র, তাহাতেও ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা নির্ম্মিত অথচ পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপারের তত্ত্ব বুঝাইবার পক্ষে মায়ার শরণাগত হইতে হইয়াছে।

অতএব শুদ্ধ জীব জগতেই নহে,—সমগ্র সৃষ্টি তত্ত্বের মূলেও সেই দ্বৈত ভাবের লীলা,—অবিচ্ছেদে এক কোথাও নাই। এইজন্যই পৌরাণিক পরম মহেশ্বর অর্দ্ধনারীশ্বর এবং মহাশক্তির পদতলে মহাশিব শবরূপী। এতদ্দ্বারা শাস্ত্রকারগণ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই দুই পরস্পর হইতে বিভিন্ন নহে, একেরই দ্বিধা বিভক্ত দুইটী রূপ মাত্র।

অতএব এই নব্য-শিক্ষার যুগে পুরুষ যখন নূতনের মধ্যে মগ্ন হইতেছে, তখন তাহার অর্দ্ধ—নারী সমাজেও যে এই নব্য-তন্ত্রতার স্রোত প্রবল ভাবে আঘাত করিবে, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে ; এবং ভাল হউক, মন্দ হউক,—ইহাকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই যে নূতন স্রোত দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এ স্রোত দেশের নদীর নিজের বক্ষ হইতে ক্রমশঃ উদ্ভূত হয় নাই। ইহা বৈদেশিক বন্যার অতর্কিত প্লাবন। এই নূতন স্রোতের বেগবতী ধারা আমাদের দ্বার ঘর ভাসাইয়া না দেয়, সেই দিকে আমাদের একটুখানি দৃষ্টি রাখাও অত্যাবশ্যক বলিয়া আমার মনে হয়। যেহেতু, নর এবং

নারীর পরস্পর সম্মিলনে গঠিত হইলেও, প্রাকৃতিক নিয়ম-বশতঃ, জীব-জগতের জননীগণের স্থান ঘরের ভিতর অংশে এবং পুরুষের বাহিরে। গলা ফাটাইয়া ইহার প্রতিবাদ-চেষ্টা করিলেও, এই প্রকৃতিদত্ত অধিকারের পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। কাজেই, প্লাবন যখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন স্বতঃই একটুখানি ব্যস্ত হইতে হয়।

"স্ত্রীশিক্ষা" বলিতে আজকাল আমরা সাধারণতঃ মেয়েদের স্কুল কলেজে লেখাপড়া শেখানকেই বুঝি। আজকাল এই প্রকারের শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে; এবং দিন-দিন ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে। এই সব মেয়েরাই অদূর-ভবিষ্যতে একদিন গৃহিণী এবং জননী হইবেন। নারীর শিক্ষা-দীক্ষা যাহা কিছু, সমস্তই যে তাহাদের এই দুইটী প্রধানতম কর্ত্তব্য সম্পাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া নির্ব্বাচিত হওয়াই উচিত, ইহা স্থূল দৃষ্টিতেও বুঝা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বালিকা-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে একান্তই উদাসীন; এবং দেশের গণ্যমান্য জননায়ক-বর্গও এত বড় চিন্তনীয় ব্যাপারে একাই চিন্তাশূন্য। এই কথাটা কি কেহই ভাবিয়া দেখেন না যে, যত উচ্চশিক্ষাই প্রাপ্ত হউন,—নর এবং নারীর কর্ম্মক্ষেত্র কখনই ঠিক এক হইতে পারে না। উভয়ের শারীরিক গঠন ও মানসিক বৃত্তি যে পরিমাণে বিভিন্ন, উভয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ও সেই হিসাবেই কতকটা বিভিন্ন রাখিতেই হইবে। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, শিল্পকলা, ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ ভাবে কিছু গণিত ও রসায়ন-শাস্ত্র, এবং উত্তম রূপে স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং গৃহ-কার্য্যই স্ত্রীশিক্ষার প্রধানতম বিষয় হওয়া উচিত। রাশি-রাশি অপ্রয়োজনীয় বই পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করাই নারীজীবনের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। এই পরীক্ষার ফাঁদে পড়িয়া ছেলেদের স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি এবং তাহার চরম ফল আয়ু কর্পূরের মত উবিয়া যাইতেছে; এই পরীক্ষায় ফাঁদে পড়িয়া মেয়েদের স্বাস্থ্য, লাবণ্য, স্ফূর্ত্তি ও সজীবতা জলের মত অপব্যয় হইতেছে। বাল্যবিবাহে, অকালমাতৃত্বে মেয়েদের শরীরের অবস্থা তো এর চেয়ে বেশী মন্দ ছিল বলিয়া মনে হয় না। পাঁচ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ভোর পাঁচটা (মর্ণিং স্কুলে) হইতে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত, নতুবা বেলা ৯॥ টা হইতে ৪টা অবধি, নাকে-মুখে দুটী ভাত গুঁজিয়া, গাড়ী-ঠাসা হইয়া, অনর্গল শুষ্ক কঠোর পাঠাভ্যাসের মধ্যে যেমন ছেলেদের, তেমনি মেয়েদের শরীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে। ছেলেদের তবু পথ-চলার অধিকার থাকায়, অনেকটা মন্দ ফল সত্ত্বেও আলো-বাতাসের সহিত একটা সম্পর্ক থাকে; মেয়েদের ভর্ত্তি গাড়ীতে মেয়ে উঠানো-নামানো করিতে-করিতে অনেকখানি সময়ই বন্ধ থাকিতে হয়। অবশ্য সকলেই কিছু অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে নহেন। টিফিন (জলখাবার) পেট ভরিয়া, অথবা সুপাচ্য বা সুখাদ্য, এই অন্ন-সমস্যার দিনে কম মেয়েরই ভাগ্যে ঘটে। ঘরেও সাতসকালে, বাচ্চাকাচ্চা সামলাইয়া, মায়েরাও কিছু পরি-পাটীরূপে আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন না। খাদ্যের মধ্যে, এ দরিদ্র দেশে ডাল-ভাত-তরকারীই প্রধান সম্বল। উহা চিবাইয়া খাইবার অবসর নাই,—গাড়ী আসিয়া পড়িবে। অজীর্ণ রোগ হইবার কিছু অপরাধ আছে কি? তার পর স্কুলে ও স্কুল হইতে ফিরিয়া ঘরেও সেই রাশিকৃত পড়ার চাপে পড়িয়া হাবুডুবু খাওয়া। এইরূপে অবসরাভাবে, গৃহস্থ-কন্যার উপযুক্ত কার্য্যকরী শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া, মেয়েটী এক-আধটা পরীক্ষায় পাশ করিল এবং ভগ্ন দেহ, পুঁথিগত বিদ্যা, ও স্কুলের পাঁচটী বিভিন্নাবস্থার সঙ্গিনীদের কল্যাণে বেশ একটু সৌখীন রুচি লইয়া, একটী দরিদ্র পরিবারের অর্দ্ধশিক্ষিত কেরাণীর গৃহে চলিয়া গেল। এ অবস্থায় মেয়েটীর জীবন বেশ শান্তিপূর্ণ হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় কি? অবশ্য সকল বিষয়েরই দু'-একটী ব্যতিক্রম থাকে, আমি তাহাদের কথা ধরিতেছি না। সাধারণতঃ ঐ ভাবের, অর্থাৎ এই পুরুষোচিত ভাবের শিক্ষা, এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা প্রাপ্ত আধুনিক সহুরে মেয়েদের কতকগুলি গুণের সহিত কতকগুলি দোষও যে জন্মিতেছে, ইহাকে অস্বীকার করিতে গেলে, সামাজিক সত্য ব্যাধির ঠিক মূল তত্ত্বানুসন্ধান করা হয় না; এবং যে রোগের প্রকৃতি-নির্ণয়ে ভ্রান্তি থাকে, তাহার প্রতিকার প্রায় অসাধ্য। অন্ততঃ বৈদ্যক শাস্ত্রের তো এই প্রকারই ব্যবস্থা।

নব্যশিক্ষিতা মেয়েদের সেকেলে [অশিক্ষিতা আমি বলিব না, যেহেতু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেকালে মেয়েদের স্কুল কলেজে না গিয়াও এমনভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, যাহা

শিখাইতে এম-এ ক্লাসেরও শক্তি নাই। উদাহরণ স্বরূপে রাণীভবানী, বিদ্যাসাগর-জননী, গুরুদাস-জননী, ভূদেব-জননী এবং ভূদেব বাবুর পত্নীর নাম করা যাইতে পারে। বিশ্ব-বিশ্রুত জ্ঞানী ও বিদ্বান্ স্বামী তাঁহার স্কুল-কলেজে-না-পড়া স্ত্রীর উদ্দেশে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক পারিবারিক প্রবন্ধে যে উৎসর্গ-পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সমস্ত বঙ্গরমণীরই পাঠ করা উচিত। উহাতেই প্রমাণ পাইবেন যে, যাঁহারা নব্য-শিক্ষা ব্যতীত যথার্থরূপে নব্য-শিক্ষিত এবং উচ্চ-শিক্ষিত স্বামীর জীবন এতদূর সুখময় করিতে পারেন, তাঁহারা কখনই অশিক্ষিতা ছিলেন না। আরও এক কথা, ফল দেখিয়াই বৃক্ষের শক্তিমত্তা প্রমাণিত হয়। সে কালের ঐ সব বাল্যে-বিবাহিতা, উচ্চ-শিক্ষার বহির্ভূতা মায়েদের গর্ভে যে সবল, সুদীর্ঘজীবী, অসাধারণ শক্তিমান সন্তান স্থান লাভ করিয়া দেশ ও জননীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, কোন নব্য-শিক্ষিতার সন্তানকে তো আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের স্থান পূর্ণ করিতে দেখিলাম না! শিক্ষাও তো আজ অনূন পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। তবে 'কালোহ্যয়ং নিরবধি'—পঞ্চাশ বৎসরেই হতাশ হইবার কারণ নাই; এবং যখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই—অর্থাৎ নানা কারণে আর সেকালের সে সংযততম পারিবারিক জীবন ফিরাইয়া আনা সম্ভব নহে, তখন অতীতের ক্রন্দন রুদ্ধ রাখিয়া জীবন্ত ও জাগ্রৎ বর্ত্তমানের সমস্যারই যথাসম্ভব সমাধান-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।]—মেয়েদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে কিছু প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে। আমি সেই সম্বন্ধেই দু-একটী কথা বলিব। জগৎ বৈচিত্র্যময়, প্রকৃতি বিভিন্ন। 'ভিন্ন রুচিৰ্হি লোকাঃ"—সকলেই যে আমার সহিত একমত হইবেন, এমন আশা বাতুলেই করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ ভিন্ন রুচির দোহাই দিয়াই নব্যশিক্ষার কয়েকটি ক্রটীর বিষয়ে কথা কহিতে ভরসা করিতেছি।

নব্য-শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনা যায়, উহারা ঠিক পূর্ব্বের মত ধর্ম্মভীরু হয় না। (অবশ্য এস্থলে সমাজ-প্রচলিত ব্রত-উপবাস, পূজাহ্নিক ও গুরুজনে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রভৃতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। নৈতিক চরিত্র নির্ভর করে কতকটা বংশ, পিতা-মাতা ইত্যাদিরই উপরে এবং অনেকটাই শৈশব-শিক্ষার শৈথিল্যজাত কুসঙ্গে।) ইহার কারণ, আমাদের ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজে ধর্ম্মশিক্ষার কোনই বালাই নাই। ঘরেও, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়া, মা-বাপ নিজে-দের সকল দায়মুক্ত বোধ করিয়া, ও-সকলের বালাই রাখেন না,—অথবা, তাঁহাদেরও তো ঐ একই দশা। বালিকা-ব্রত, শিবপূজা প্রভৃতি অনেকটা অবসরের অভাবে, কতকটা আলস্যে, একটু বয়স বাড়িলে বৈদেশিক শিক্ষা ও সঙ্গ প্রভাবে, তুচ্ছ বোধে পরিত্যক্ত হয়;—অথচ উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম-চর্চ্চারও ব্যবস্থা নাই। কাজেই ছেলেদের মত মেয়েরাও ধর্ম্মজ্ঞান-(আচার-বিচার ও পূজার্চ্চনা)বর্জ্জিত হইয়াই বাড়িয়া উঠে। খৃষ্টান ও ব্রাহ্মসমাজেও উপাসনার বিধি আছে,—কিন্তু হিন্দু-সমাজের তো মা বাপ নাই। কাজেই হিন্দু-সমাজের শিক্ষিত ছেলেমেয়ের পক্ষে সন্ধ্যা-পূজার্চ্চনা বড়ই লজ্জাকর হইয়া উঠিয়াছে। ব্রত উপবাসাদিতে যে নিয়ম-সংযমের প্রয়োজন, তাহাদের চরিত্র-গঠনে সেইটুকুরও আর তাহারা সহায়তা প্রাপ্ত হয় না।

নব্যশিক্ষিতাগণ পুরাতন দলের তুলনায় কিঞ্চিৎ অহঙ্কৃতা এবং অসরলা—এ নিন্দাটাও তাদের ঘটিতেছে। স্কুলে এবং কলেজে শিক্ষিতা হইলেই যে মেয়েরা কুটিলা হইবেন, এমন কথা বলি না; তবে তুলনামূলক সমালোচনা করিতে গেলে, ইহা এতই সুস্পষ্ট রূপে চোখে পড়ে যে, এ সম্বন্ধে আর বেশী স্পষ্ট করিয়া কোন কথা না বলিলেও চলে। প্রাচীনারা পরকে এক মুহূর্ত্তে আপন করিতে পারিতেন, নবীনারা আপনকেও বহুদিনে নিকটতম করিতে ত পারেনই না,—পরন্তু পর করেন। ইহা অকাট্য সত্য! ইহার একমাত্র কারণ, তাঁহারা নিজের প্রকৃতিকে চাপিয়া রাখিয়া, ছাঁচে ঢালাই করা নিক্তির তৌল ধরা কৃত্রিম শিষ্টাচারের আশ্রিতা হইতেছেন। তাঁহারা বয়স্যার সহিত প্রাণ খুলিয়া মিশিতে জানেন না। যাঁহারা তাঁহাদের বিশ্রম্ভালাপ কাণ পাতিয়া শুনিবেন, তাঁহারা তাহাতে পৃথিবীশুদ্ধ সজীব-নির্জ্জীবের সকল সংবাদ শুনিতে পাইবেন; শুনিতে পাইবেন না শুধু তাঁদের নিজেদেরই সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির আন্তরিক খবরটুকু। তাই এ কালের বন্ধুর, বন্ধুর সঙ্গে সহানুভূতির সম্পর্ক, শুধু একটা "আহা"তেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। উহাতে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা নাই। এখন দিন-দিন গণ্ডা-গণ্ডা এফ-এ, বি-এ, এমন কি এম-এরও অভাব নাই। ইহাতে অহঙ্কৃতাগণ নিজেদের

বিদ্যালোকে নিজেরাই ঝলসিতনেত্রা হইতে অবশ্য লজ্জিতা হইবেন; তবে "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী" এই যা ভয়। খুব বেশী উর্দ্ধে খুব বেশী মেয়ে উঠেন না; এবং যাঁহারা উঠেন, তাঁহারাও রক্ষণশীল সমাজের নহেন। তাঁহাদের ভয় স্বাস্থ্য এবং সাহেবীয়ানার প্রভাবান্বিত আধুনিকতা লইয়া একপ্রকারে দিন কাটিতে পারে। যেহেতু, তাঁদের সমাজবিধি অনুসারে পরের ঘরকে প্রায়ই তাঁদের আপন করিতে হয় না এবং বিবাহ করা-না করাটাও অনেকটা নিজেদেরই হাতে।

নব্য মেয়েদের গৃহকর্ম্মে অক্ষমতা ও তাচ্ছিল্যটা অবশ্য অনেকটাই অবস্থায় পড়িয়া হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার জন্য খুব বেশী দোষ দিবার নাই। স্কুল হইতে আসিয়া, স্কুলের পড়া সারিয়া,—তার উপর ইদানীং যেমন সকলকার সব কন্যাগুলিকেই চৌষট্টিকলাকুশলা করিয়া তোলার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে, সে বেচারাদের এই ঘোর কলির অন্নগত ক্ষীণপ্রাণে আর কতই সামর্থ্য, যে, ইহার উপর আবার রন্ধনাদি কার্য্যকরী বিদ্যালাভে মনোযোগী হইতে পারে? তবে যখন এ শিক্ষা না হইলে নয়, তখন মায়েরা যদি যত্ন ও সহানুভূতির সহিত এ বিষয়ে সচেষ্ট হন, তবে অন্ততঃ ছুটীর দিনেও একটু-আধটু রন্ধন শিক্ষা দিতে পারেন। এ ভিন্ন পান সাজা, ছোট ভাইয়ের লালনপালন, বাপের অল্পস্বল্প সেবা, মায়ের সামান্য কিছু সাহায্য এগুলির নিত্য অভ্যাস না রাখাই অনুচিত। এই সব প্রীতি-ভক্তির সমাবেশেই বাঙ্গালীর মেয়ের নিজস্ব জীবন গড়িয়া উঠিতে সাহায্য লাভ করে। বঙ্গের শিক্ষাগুরু ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গৃহকন্যাদিগকে, বিবাহের বয়ঃক্রম হইবার পূর্ব্বেই, প্রত্যহ একটু একটু করিয়া রন্ধন এবং গৃহস্থ গৃহের উপযোগী অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। এমন কি, এ বিষয়ে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য, যেমন বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে, তেমনিই এ বিষয়েও, প্রতিযোগী পরীক্ষা ও পুরস্কারের বন্দোবস্ত থাকিত। ছোট মেয়েদের দ্বারা বাপ-ভাইকে পরিবেষণ করিয়া খাওয়ানর অভ্যাস করাইলে, উহাদের, নিজেই ভালটা খাই—এ লোভটা জন্মিতে পারে না। পীড়িত ভাইবোনের কতকটা শুশ্রূষা ও তাহাদের প্রাথমিক শিক্ষাদান হইতে ভবিষ্যতে সন্তান-পালন সম্বন্ধে যেরূপ প্র্যাকটিকাল (কার্য্যকরী) জ্ঞানলাভ হওয়া সম্ভব, তেমন স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সতেরখানা বই পড়িলেও হইবে না। অবশ্য এ সব বিষয়ে যিনি শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহার নিজের শিক্ষা যেন অসম্পূর্ণ না হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, ঘাড়ে পড়িলে আপনিই সব শিখিয়া লইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে এবং এ যুক্তির মধ্যে আদৌ সহৃদয়তা নাই। ঠেকিয়া শেখার বিড়ম্বনা অনেক। যথাকালে বীজ বপন করিয়া সযত্নে জলসেচন করিলে অফলা হইবার অথবা কুফল লাভের আশঙ্কা খুব কমই হইয়া থাকে। বিশেষ, ভাগ্যলক্ষ্মীর চির চাঞ্চল্যের অপবাদ সনাতন কাল হইতেই শ্রুত হইয়া থাকে। এজন্য ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে কিছু কিছু কার্য্যকরী বিদ্যা সকলেরই শিখিয়া রাখা উচিত। এ দেশের ছেলেদের শিক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণ রূপে থিয়োরেটিকাল (ভাবপ্রবণ); যথেষ্ট প্র্যাকটিকাল (কার্য্যকরী) নহে বলিয়া আমাদের দেশের অনেক দেশহিতৈষী মহাত্মা আজকাল আক্ষেপ করিতেছেন, এ কথা অনেকেই জানেন। আমার মনে হয়, ছেলেদের মত না, বরং অধিকতর ক্ষতির কারণ উপস্থিত হইবে, যদি আমাদের মেয়েরা কার্য্য জগৎ ছাড়িয়া কেবলই ভাবলোকের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। শুনা যায়, ইয়োরোপীয় রাজপরিবারসম্ভূত সন্তানসন্ততিবর্গ সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অচপল আনুগত্যে সন্দিহান হইয়া স্বীয় জীবিকা অর্জ্জনের জন্য কোন না কোন একটা কার্য্যকরী শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট নাবিকের কার্য্যে সুশিক্ষিত। মহামহিম মোগল সম্রাট আকবর শাহ, আওরঙ্গজেব প্রভৃতি এবং মোগল রাজকন্যাবর্গও কেহ টুপী প্রস্তুত কেহ আলেখ্য লিখন, সুগন্ধি প্রস্তুত ইত্যাদি অর্থকরী বিদ্যা শুধুই শিক্ষা করিতেন, এমন নয়,—তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজ-নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, একথা ইতিহাস-অভিজ্ঞ পাঠিকাবর্গ অবগত আছেন।

বিলাসিতা বৃদ্ধি এক্ষণে আমাদের সমাজের প্রতি স্তরেই হইতেছে। এজন্য স্কুল-কলেজের শিক্ষাকেই প্রধানতঃ দায়ী করিতে চাহি না। তবে স্কুল-কলেজে সকল শ্রেণীর একবয়সী মেয়েদের সর্ব্বদা মেশামেশির জন্য, একের দোষগুণ যত শীঘ্র অন্যে সংক্রামিত হয়, অন্যত্র ততদূর হইতে পারে না। এই হেতু এ বিষয়ে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর একটুখানি দৃষ্টি রাখা আমার সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ধনী-কন্যাগণ 'শ্যামর লেদারের হিলওয়ালা লেডি সু', রেসমী ষ্টকিং, লম্বা-

চৌড়া বিচিত্র ফিতার ফুল ও জ্যাকেট, ফ্রক, পেটিকোটের নিত্য নূতনতর ফ্যাসানের আমদানী করিতে থাকিলে, বেচারী গরীবের মেয়েদের কচি মনেও সংক্রামক ভাবে ঐ সকলের উপর লোভ জাগ্রৎ হওয়া খুবই অস্বাভাবিক নহে। বিলাসিতা জিনিসটার দোষই ঐ। যাহা একের পক্ষে অনায়াসলভ্য এবং সহজভাবেই আচরণীয়, অন্যের পক্ষে হয় ত বা উহার ফল অশেষ অমঙ্গলের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। নিমন্ত্রণাদিতে যাহা ঘটিবে, তাহা কতকটা অপ্রতিবিধেয় (হয় ত তাহারও প্রতিবিধান আছে)। কিন্তু শিক্ষাকেন্দ্র স্কুল-কলেজে সকল মেয়েরই পরিচ্ছন্ন অথচ অনাড়ম্বর অর্থাৎ সকল অবস্থার মেয়েদের পক্ষে যাহা পাওয়া সম্ভব তেমন বেশেই আসা সঙ্গত। (বেশভূষা, যানবাহন ইত্যাদির অত্যধিক আড়ম্বরে আজকাল ধনী-দরিদ্রের ভেদটা অত্যন্তই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। অনেকেই হয় ত ভাবিয়া দেখেন না যে, এই প্রভেদই ইয়োরোপীয় মহা অনর্থের অর্থাৎ বল্‌সেভিজমের মূল।) এস্থলে বলাই বাহুল্য যে, শিক্ষয়িত্রী নিজেই উহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপা হইবেন। এক্ষণে এফ্-এ, বি-এ পাশ ব্যতীত বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী-নির্ব্বাচনে অপর গুণপণা দেখার প্রথা রহিত হইয়াছে। সেই হেতু মেয়েদের পক্ষে বিলাসিতা বর্জ্জন, বৈদেশিকতার প্রবল প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা প্রভৃতি কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। মেয়েদের শিক্ষাভার যাহাদের হস্তে, তাহারা নিজেরাই তো জগৎ ব্যাপারে একান্ত অপরিণত-বুদ্ধি স্কুলের মেয়ে। নিজেদের সদ্যপ্রাপ্ত পুঁথিগত বিদ্যামাত্র সঞ্চয় করিয়া আসিয়াই, শত-শত অপরিপক্বমতি বালিকার জীবন গঠনের সহায়তা করিতে হয়। আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে স্কুলের এবং গৃহের উভয় পক্ষীয় কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষেই কিছু চিন্তা করিবার আছে। যে জন্য বালিকার মাতৃত্ব সামাজিক অকল্যাণের হেতু বলা যায়, তাহারই কিছু-কিছু ত্রুটি এই অপ্রাপ্তবয়স্কা এবং অসম্পূর্ণ-শিক্ষাপ্রাপ্তা বালিকাকুলের হস্তে শত-শত কন্যার মাতৃব্রত ন্যস্ত করায় সংঘটিত হইতেছে না কি?

শিক্ষাদান কার্য্যটি নিতান্ত হাসিখেলার জিনিষ নহে। বিদ্যাদান যেমনি মহাদান, তেমনি মহাব্রত। জগতের সমুদয় মহৎ কার্য্যই অনায়াস বা অল্পায়াস-সিদ্ধ নহে; পরন্তু কৃচ্ছ্রসাধ্য। যুগযুগান্তরে, এবং শুধুই এদেশে নয়, দেশ-দেশান্তরেও, এই শিক্ষাদান কার্য্য ত্যাগ-সংযত-জীবন তাপস-তাপসী সম্প্রদায়ের হস্তেই ন্যস্ত ছিল। বৈদিক যুগের ঋষিদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৌদ্ধযুগেও সহস্র-সহস্র ভিক্ষু-ভিক্ষুণীই মানব-সমাজের শিক্ষাগুরুর পদে বৃত হইয়াছিলেন (তখন ধর্ম্ম এবং বিদ্যা স্বতন্ত্র বিভক্ত ছিল না)। ইয়োরোপ-খণ্ডেও ধর্ম্ম এবং লোকশিক্ষা, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীগণের ত্যাগ-দীক্ষিত চিত্তাশ্রয় করিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। আজিও চির কৌমার্য্যাবলম্বিনী খৃষ্টান কুমারীকল শুধু স্বদেশেরই নহে, দেশদেশান্তরেরও, সহস্র সহস্র অনাথ অনাথার রক্ষয়িত্রী ও শিক্ষয়িত্রী। এই সেদিনেও মাতাজী তপস্বিনীর অধীনে আদর্শ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কাল-ধর্ম্মে তপস্যা সঙ্কীর্ণতর হইয়া গিয়াছে,—একের অবর্ত্তমানে তাঁহার শূন্য স্থান পূর্ণ হওয়া কঠিন। এই সকল ১৮।২০ বৎসরের বালিকাগণকে সেই সকল নিষ্কাম ব্রতধারিণী মহাতাপসীগণের সহিত তুলনা আমি করিতে বসি নাই; এবং ইহাদের কাছে তেমনটি দাবী করিতে যাওয়া শুধু নির্ম্মমতাই নয়, বাতুলতাও। কিন্তু কথা এই যে, আমাদের দেশে যে মেয়ের ঘরে একটু বয়স্ক সপত্নী-পুত্র আছে—হয় ত তাহার বিবাহও হইয়া গিয়াছে—সে মেয়ে বিয়ের-কনে আসিয়াই যুবক পুত্র বা পুত্রবধূর সম্মানে (বা যেতে) তাহাদের মাতার যোগ্যা কতকটা প্রৌঢ়া সাজিয়া বসে,—এমনও তো ঘটিতে দেখা যায়। আর সেই যে পারে, সুখী সে ই হয়। তেমনি এই বয়সে বালিকা এবং জগতের মধ্যে একটী উচ্চতম পদে আরূঢ়া এই মেয়েগুলিকেও তাঁদের উচ্চপদের মর্য্যাদা-রক্ষার্থও কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে। নিজেরা স্নেহসম্পন্না, হৃদয়বতী ও বিলাস-বর্জ্জিতা হইলেই, তাঁরা এই ঘোর দায়িত্বে পরিপূর্ণ পদলাভের উপযুক্তা হইতে পারিবেন। ইংরাজীতে যাহাকে "প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিঙ্কিং" বলে, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর উচ্চাসন যিনি গ্রহণ করিবেন, এই তাঁহার মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। (অথবা ইহা সমুদয় শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত বলাই সঙ্গত)।

অবশেষে প্রধান কথা এই যে, নানা কারণে মানুষের ব্যয়ের দিকটাই অপর্য্যাপ্ত রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। মহার্ঘতার যেমন সীমা নাই, তেমনি শেষও নাই। নিজের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যিনি সুশৃঙ্খলার সহিত

সংসার চালাইতে পারেন, আজিকালিকার এই ঘোরতর সমস্যার দিনে 'গৃহলক্ষ্মী' অভিধান তাঁহারই লভ্য। গৃহ-সংস্কারে গৃহিণীর সাহায্য নহিলে চলে না। অশনে, বসনে সর্ব্বত্রই ব্যয়-সঙ্কোচের প্রয়োজন। দয়াধর্ম্ম আত্মীয়তাটাই শুধু না বাদ পড়িয়া যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া, অগ্রণী থাকিয়া, যদি সাধ্যমত স্বল্পব্যয়ে সংসার চালাইতে পারেন, তবেই তাঁহারা সুশিক্ষিতা নামের যোগ্যা,—নতুবা এমন অফলা বিদ্যার আদর বাড়িবে না। ইংরেজিয়ানার প্রকোপে আমাদের চাল-চলন অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার হস্ত হইতে ছেলেমেয়েদের রক্ষা করিবার জন্য—ম্যালেরিয়া বা দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে দেশরক্ষার চেষ্টার মতই, চেষ্টা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা জাতীয় জীবনের যেটুকুও বা দুর্দ্দশার বাকি আছে, তাও থাকিবে না।

পূর্ব্বেও মেয়েরা অলঙ্কারপ্রিয় ছিল। তাহাতে নারী-মনস্তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক গৃহস্থের গৃহে অসময়ের জন্য একটা সঞ্চয়ও থাকিত। কিন্তু এ যুগের নারী-বিমোহন যাবতীয় বস্তুজাতই ভুয়া। অলঙ্কার রূপে ইহারা ক্রয় কালীন্ বহুমূল্য এবং বিক্রয়কালীন্ মূল্যহীন;—মুক্তা-চুণী বা কাঁচ পাথর এবং অধিকাংশই রেশম-পশম ও লেশ-চিকনের গাদা। এই সমস্ত সম্পত্তি তো নহেই, অধিকন্তু বিপত্তি এই যে, এই সকল রাশি-রাশি আবর্জ্জনার বিনিময়ে দেশের কোটি-কোটি টাকা জলস্রোতের মত বৈদেশিক বিপণিজাত হইতেছে। তাও আবার এই হা-অন্নের দিনের মুখের অন্নগ্রাস শস্যের মূর্ত্তি ধরিয়া! অথচ এসব কথা যে বাঙ্গালীর মেয়ে না জানেন এমনও ত নয়। একদিন বিদেশী শিল্পবর্জ্জনের (বয়কটের) প্রতিজ্ঞায় ইঁহারাই অগ্রণী ছিলেন। এক্ষণে নিজেরা ভুলিয়া, নিজ নিজ সন্তানকে'ও অসহায় ভাবে বৈদেশিক বিলাসিতা-সমুদ্রে মগ্ন হইতে সহায়তা দিবা ধীর ভাবেই করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, সেদিনের অপেক্ষা আজ কি এদেশে সুদিনের অভ্যুদয় হইয়াছে? যদি শিক্ষায় চিত্তোন্নতি না হইয়া, স্বদেশের, সমাজের, স্বজনের এতবড় দুরবস্থার, অবনতির দিনে কাহারও প্রতি কোনই কর্ত্তব্য করিতে না শিখায়, তবে কি ফল সেই বিফল শিক্ষার গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া কোন স্বনামধন্য ভারবাহী জন্তু-বিশেষের অবস্থা লাভে! চলিত কথায় বলে, 'দুষ্ট গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালও ভাল।'—তাই বলি, কেবলমাত্র দুখানা ইংরেজী বাংলা উপন্যাস বা ইতিহাসের দুপৃষ্ঠা উল্টাইলেই—মাসিক পত্রে দুটা প্রবন্ধ লিখিলেই—নারীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না। নব্য-শিক্ষিতাকে বিবি বানাইলেই চলিবে না, দেবী করিতে হইবে। শিশুচিত্ত কাদার তালের মত,—উহাদের যে ছাঁচে গড়িবে, উহারা নির্ব্বিচারে তেমনি গঠিত হইবে। আমরা যদি শিব (শিব—মঙ্গল) গড়িতে আর কিছু গড়িয়া ফেলি, সে দোষ তাদের নয়, আমাদের।

সন্তানের শিক্ষার জন্য মা বাপকে অত্যন্ত শুচি ও সংযত হইতে হয়। যে আদর্শ তাহাদের সম্মুখে খাড়া করিবে, সে আদর্শের দেবতা তাঁহাদের নিজেদের হওয়া চাই। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্ত, বিশেষতঃ পরের চাইতে নিজের দৃষ্টান্তই সমধিক শিক্ষাপ্রদ। আমি যদি অনাচারী হই, আমার ছেলেকে সদাচারী হইতে বলিবার পূরা সাহস আমার বুকে আশ্রয় পাইবে না। আমার চিত্ত যদি গুরুজনে বিদ্বিষ্ট হয়, নিজ সন্তানের বশ্যতা আমি দাবী করিতে যাইব কোন মুখ দিয়া? আবার বলি, ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাইয়া অথবা গৃহ-শিক্ষকের হস্তে সঁপিয়া দিয়াই নিজ কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিবেন না। যাহাতে উহারা স্বধর্ম্ম-ভক্ত, পরধর্ম্ম-সহিষ্ণু, স্বজন-প্রেমিক, স্বদেশানুরক্ত, দরিদ্র-সেবক ও অনাড়ম্বর পবিত্র চরিত্র হইতে পারে, অর্থাৎ মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে, তেমন করিয়াই উহাদের শিক্ষা দিতে প্রাণপণ করুন। এ কার্য্যে পিতার অপেক্ষা মাতার সহায়তারই প্রয়োজন সমধিক। আর এইখানেই তাঁদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষার সাফল্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এইখানেই মাতৃত্বের মহাপরীক্ষা। আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ্যকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, এবং সবার জন্যই মঙ্গলময়ের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, যেন এই মহাব্রত,—এই মহাব্রত তিনি আমাদের ব্যর্থ না করেন, যেন মা নামে কলঙ্ক স্পর্শ না করে।

আমি স্কুল-কলেজের বিরোধী নহি। বরং নরনারী-নির্ব্বিশেষে ইতর ভদ্র সকলেরই জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের একান্ত পক্ষপাতী; এবং ব্যক্তিগত ভাবে উচ্চ অর্থাৎ কালেজিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করি না। কিন্তু উহার বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নহি; এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নারী-জন্ম শুধুই বি-এ, এম্-এ পরীক্ষা পাশেই

সার্থকতার চরম ফললাভে সমর্থ—এ বিশ্বাস আমার নাই। অতএব আমার বিশ্বাস মতে মেয়েদের জন্য এখন আমাদের অনেক বেশি ভাবিতে হইবে, খাটিতে হইবে,—উহাদের মঙ্গলামঙ্গল ভাল করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। অমঙ্গলের ভ্রান্ত পথে যদি পাঠান হইয়া গিয়া থাকে, ফিরাইয়া আনিয়া সুমঙ্গলের পথে শুভযাত্রা করাইতে হইবে। নিজের মেয়েটিকে বিবাহের বাজারের বাঁধা নিয়মে কনে-দেখানর মামুলী শিক্ষা দিলেই চলিবে না,—উহাকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সামাজিক শ্রেষ্ঠ জীবের অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং তদপেক্ষাও উন্নত দৃষ্টিতে জীব-জননী রূপে দেখিতে হইবে। যদি ইহার উপযুক্ত রূপে তাহাকে গড়িয়া দিতে না পারো, তবে 'মেকি টাকা' চালানোর মত 'খেলো' জিনিষ দান করার অপরাধে ইহ পর দুই লোকেরই দরবারে তোমার সাজার ব্যবস্থা হইয়া রহিল, নিশ্চিত জানিও। কারণ, এই যে বিদেশী ঢঙ্গের পুরুষোচিত শিক্ষা মেয়েদের জন্য বিহিত হইয়াছে, ইহা সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত না হইলে, আমাদের মেয়েদের গার্হস্থ্য জীবনের ভবিষ্যৎ খুবই সুখোজ্জ্বল বলিয়া আমার তো বিশ্বাস হয় না। অবশ্য যদি না আমি ভ্রমে পড়িয়া থাকি।

স্মৃতির টান

[শ্রীমহিলাসুন্দরী গুহ-মজুমদার]

(১)

নাটক-নভেল পড়িতে গেলেই নিজের জীবনের কথা মনে পড়িয়া যায়। মানুষের জীবনটাই একটা নাটক ;—ক্ষমতা না থাকিলেও, দেখিয়া-শুনিয়া গত জীবনের ঘটনাটা লিখিতে ইচ্ছা করে।

এণ্ট্রান্স পাস করিবার পর ৺পূজার বন্ধে যখন আমরা পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন আমার বয়স সতর। ছুটির কয়েকটা দিন সেখানে বেশ আমোদেই কাটিয়াছিল। প্রত্যহ আমরা সমুদ্র-তীরে বেড়াইতে যাইতাম। একদিন মা এবং ছোট ভাই-ভগিনীগুলিকে লইয়া বেড়াইতেছি,—দেখিলাম, অদূরে কয়েকটী স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকা সমুদ্রে স্নান করিতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জ্জনের সহিত তাহাদের কৃত্রিম আর্ত্তনাদ এবং হাসির কলরব মিশিয়া যাইতেছে। সমুদ্র-স্নানে যে কি আনন্দ, তাহা যাঁহারা স্নান করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। স্নান করিতেও যেমন আনন্দ, স্নান দেখিতেও তেমনই আনন্দ হয়। মা দাঁড়াইয়া তাহাদের স্নান দেখিতে লাগিলেন, আমি সরিয়া গেলাম।

কিছুক্ষণ পরে মায়ের শঙ্কিত আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া দেখি,—স্নানরতা স্ত্রীলোকগুলি সভয়ে আর্ত্তনাদ করিতেছেন। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—"শচীন, ওদের একটী ছোট মেয়ে ঢেউতে ভেসে গেল ;—শীঘ্র তোল।" মায়ের কথা শেষ না হইতেই, আমি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ভীষণ তরঙ্গ-স্রোতে ক্ষুদ্র বালিকাটী অনেক দূরে ভাসিয়া গিয়াছিল। অনেক কষ্টে তাহাকে তীরে তুলিয়া আনিলাম।

বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল মাত্র। ভাল জল আনিবার জন্য নিকটস্থ বাড়ী লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া গেলাম। জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখি, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। মা বলিলেন, "তাঁহাদের বাড়ী নিকটেই ; আজ তাঁরা বিকালে আমাদের বাড়ী আসিবেন।"

কিন্তু তাঁহাদের সহিত আর দেখা হইল না ; সেইদিন কলিকাতা হইতে এক আত্মীয়ের অসুখের তার পাইয়া সন্ধ্যার গাড়ীতেই বাড়ী ফিরিতে হইল।

(২)

মা সকলের নিকট এই গল্প করিলেন। আমার জীবনেও এরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই ; তাই আমিও তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব বোধ করিতাম ; এবং বন্ধু-বান্ধবের নিকটে এই গৌরবজনক গল্প করিতেও ভুলিতাম না।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু মোহিত মাঝে-মাঝে এই বিষয় লইয়া 'বিদ্রূপ' করিয়া বলিত—"তুমি যে জলমগ্না সুন্দরীর কথা ভুলিবে না দেখছি।" সে যাহাই বলুক, তখন আমার মনে অন্য কোন ভাবের উদয় হয় নাই।

কিন্তু কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থলে যখন বাহ্য চাঞ্চল্য দূর হইয়া চিত্ত চাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠিল, তখন সর্ব্বদা প্রাণ যেন কি একটা চাহিত, তাহা আমি নিজেই বুঝিতাম না। তখনকার সেই চঞ্চল চিত্তকে স্থির রাখিবার জন্য, সেই জলমগ্না বালিকার বিষয়ে নানাবিধ কল্পনা করিয়া বেশ তৃপ্তি বোধ করিতাম।

ক্রমে-ক্রমে এই ভাবটা যেন আমায় পাইয়া বসিল। আমি অনেক সময়ে কাজে উদাসীন হইয়া, তাহার কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিতাম। অঙ্কের খাতার পৃষ্ঠায় দুই-একটা প্রেমের কবিতাও লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

মোহিত একদিন দেখিয়া খুব হাসিল, এবং পরিহাস করিয়া বলিল, "যাহার নাম পর্য্যন্ত জান না, তার জন্যে আবার এত বিরহ কি করে হয়, বুঝতে পারি না!"

ক্রমে-ক্রমে মোহিতের কাছে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ফেলিলাম; প্রাণের আবেগ, বেদনা, সুখ সবই তাহার নিকটে বলিয়া তৃপ্ত হইতাম। সে মনে-মনে কি ভাবিত, জানি না। মুখে আমাকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিত; এবং আমার দুঃখে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিত।

এইরূপ কল্পনা লইয়া দিনগুলি বেশ কাটিতেছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় গোলমাল হইয়া যাইত; কারণ, যাহাকে লইয়া এত কল্পনা, তাহাকে শুধু একটী দিন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিলাম। সে মূর্ত্তিও মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট হইয়া যাইত।

(৩)

একদিন ছুটীর বারে সন্ধ্যার সময় পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাবা আমার খাতাগুলি দেখিতেছেন। আমি সর্প-দৃষ্ট ব্যক্তির মত সভয়ে পিছাইয়া আসিলাম। বাবা গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,—"শচীন!"

ভয়ে কাঁপিতে-কাঁপিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বাবা বক্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ দিকে আয়।"

তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলে, (বলিতে লজ্জা হয়) আমার কাণ ধরিয়া বলিলেন, "আঁকের খাতায় এ সব কি?"

আমি নিরুত্তর। তখন তিনি পুনরায় কাণটী ধরিয়া সজোরে ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন, "লেখাপড়ার সময় ফের যদি এই রকম বাঁদরামী কর, তবে চাবুক খাবে, মনে থাকে যেন।"

বাবা চলিয়া গেলে, মনের দুঃখে অনেকক্ষণ কাঁদিলাম। পরে স্থির করিলাম, আর সে কথা ভাবিব না; মন দিয়া লেখা পড়া করিব।

জানি না, কাহার উপর রাগ করিয়া খাতাগুলি পুড়াইয়া ফেলিলাম। বলা বাহুল্য, সেদিন আর পড়া বা নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাণটা যখন সুস্থ হইল, তখন আমার মন ও সকল ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাতে, আবার সেই চিন্তা আমায় অধিকার করিয়া বসিল। জোর করিয়া সে চিন্তাকে দূর করিতেও প্রাণ যেন আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মনকে প্রবোধ দিয়া, আবার তাহার স্মৃতির কল্পনা হৃদয়ের গোপন স্থলে স্থান দিলাম। শাসনে সে চিন্তা দূর হইবার পরিবর্ত্তে আরো যেন দৃঢ় হইল। এখন বাহ্যিক কিছুই প্রকাশ করিতাম না বটে, কিন্তু অহর্নিশ তাহার চিন্তা মনে জাগিয়া থাকিত। জানি না, আমার ব্যবহারে কি দেখিয়া মা মাঝে মাঝে বলিতেন, "তোর কি হয়েছে?" আমি 'কিছু নয়' বলিয়া চাপিয়া যাইতাম।

যথা সময়ে আই-এ পাশ করিলাম। মা আমার বিবাহের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। বাবা একদিন শুনিয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন, "এখন ও-সব কথা তুলো না।"

কথা চাপা পড়িয়া গেল। আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম।

(৪)

বি-এ পরীক্ষার পর বাবা নিজেই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন; আমার মনটা দমিয়া গেল। মোহিতকে মনের কথা সব খুলিয়া বলিলাম। মোহিত বলিল, "সে খেয়াল ছেড়ে দাও ভাই। যার নাম পর্য্যন্ত জাননা—তার সন্ধান কেমন করে করবে? যদিই সন্ধান পাও, তবে সে কি জাতি তা' কে জানে। আর এতদিনে কি তার বিয়ে না হয়েছে?"

সব দিক দেখিয়া বুঝিয়া আমিও মৌন হইলাম; কিন্তু প্রাণটা কাঁদিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—নাই বা তাহাকে পাইলাম, তার স্মৃতি লইয়া জীবনটা কাটাইতে পারিতাম। এতদিন ধরিয়া হৃদয়ে যাহার আসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সে স্থানে কি আর কাহাকেও বসাইতে পারিব? হয় ত নিজের সহিত আর একটা জীবনের সুখ নষ্ট করিব।

এ দিকে পরীক্ষার খবর না বাহির হইতেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল। শুনিলাম, এক ডেপুটীর কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইবে। বৌদিদি'ও মা দেখিয়া আসিলেন। বৌদি আমায় জানাইলেন, মেয়েটী না কি খুব শিক্ষিতা,—নাম পরিমল। সাধারণে তাহাকে 'পরী' বলিয়া ডাকে; দেখিতেও না কি হাফ-পরী।

আমার বিবাহের আনন্দ-সমারোহ আরম্ভ হইল; কিন্তু আমার প্রাণ ইহাতে আরও বিষন্ন হইয়া পড়িল।

শুভদৃষ্টির সময় দেখিলাম—সত্যই মেয়েটী সুন্দরী। সত্য কথা বলিতে কি, সে আমার নয়নমন আকর্ষণ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অন্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত আসনখানি সে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিল।

আমার এখনকার অবস্থা দেখিয়া মোহিত মাঝে-মাঝে বলিত "কি হে, তোমার জলমগ্না সুন্দরী কোথায়? এখনও তাহাকে চাও না কি?" আমি লজ্জিত হইয়া সে কথা চাপা দিতাম।

(৫)

এবার পূজার বন্ধে আমরা আবার পুরীতে যাইবার সঙ্কল্প করিলাম। শুনিয়া মোহিত বলিল,—"কি হে, আবার পুরী কেন, এখনও সেই জলমগ্নার সন্ধানে না কি?"

আমি বলিলাম, "ধরে নাও, তাই।"

যথা সময়ে গাড়ী রিজার্ভ করিয়া আসিলাম। কাল আমরা রওনা হইব। রাত্রে পরিমলকে বলিলাম, "তোমার আহ্লাদ হচ্ছে না?"

পরিমল বলিল, "হচ্ছে বই কি।"

আমি বলিলাম, "সমুদ্রে নাইতে পারবে?"

পরিমল সভয়ে বলিল, "না, সেটী পারব না।"

আমি বলিলাম, "কেন, তুমি কখন সমুদ্র দেখ নি বুঝি।"

পরিমল বলিল, "সমুদ্র দেখা ছেড়ে, একবার সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিলাম!"

আমি বিশেষ কৌতূহলী হইয়া বলিলাম, "কি রকম, শুনি,—কোথায় ডুবে গিয়েছিলে?"

পরিমল বলিল, "যখন আমি দশ বছরের মেয়ে, তখন দিদিমার সঙ্গে একবার পুরী গিয়েছিলাম। সকলে মিলে সমুদ্রে নাইতে-নাইতে আমি ঢেউয়ের টানে ভেসে গেলাম।"

আমি বলিলাম, "তার পর, কে তোমাকে তুল্লে?"

পরিমল বলিল, "আমি ত নুন-জল খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি—সেই সময় একটী ছেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিল,—সেই না কি তুলেছিল।"

পরিমলের কথা শুনিয়া, আমি আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া বলিলাম,—"বল ত, সেটা কি মাস?"

পরিমল বলিল, "আশ্বিন মাসে, পূজার পরেই।"

আমি তাহাকে আবেগে বক্ষে চাপিয়া বলিলাম,—"যে তোমায় তুলেছিল, সে আর কেউ নয়—তোমার এখনকার বর।"

পরিমল সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন যখন মোহিতের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলাম—সে বলিল, "এ রকম বড় দেখা বা শোনা যায় না, —এ শুধু তোমার স্মৃতির টানেই এসেছে।"

কোন কারণে সামান্য ঝগড়া হইলে, আজ পর্য্যন্ত পরিমল, "তোমার জলমগ্না সুন্দরীর কাছে যাও না" বলিয়া আমাকে লাঞ্ছনা করে। বলা বাহুল্য, ঝগড়ার সময়, সে-ই যে আমার জলমগ্না সুন্দরী, তাহা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না।

পেশবাদিগের রাজ্যশাসন-পদ্ধতি

রাজস্ব-নীতি।

[অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম-এ, পি-আর-এস]

১০

বাজে জমা

ভূমিকর ব্যতীত মারাঠা প্রজাদিগকে আরও অনেক কর দিতে হইত। এই সকল অতিরিক্ত করের কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু-যুগ হইতে, এবং কতকগুলি মুসলমান-শাসনের সময় হইতে প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক কর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভব হইবে না, তাই নিম্নে এলফিনষ্টোন সাহেবের রিপোর্ট হইতে পেশবা-যুগে প্রচলিত আবওয়াব বা বাজে জমার একটা তালিকা উদ্ধৃত করা গেল। এতৎ-প্রসঙ্গে এইটুকু মনে রাখা আবশ্যক যে, এই করগুলি একই জায়গায় অথবা একই সময়ে আদায় করা হইত না। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের অধিবাসিগনকে বিভিন্ন রকমের বাজে জমা দিতে হইত,—সেই সমস্ত একত্র করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

১। দহক পট্টি—প্রতি দশ বৎসরে এক বৎসরের খাজনা। এই কর দেশমুখ ও দেশপাণ্ডের জমির উপর ধার্য্য হইত।

২। হক চৌথাই—প্রতি বৎসরের খাজনার চতুর্থাংশ।

৩। মহার মহলী—মহারদিগের ইনাম জমির উপর কর।

৪। মিরাস পট্টি—তিন বৎসর অন্তর দেয় মিরাসদার-দিগের উপর এই কর ধার্য্য হইত।

৫। ইনাম তিজাই—ইনামদারেরা ইনাম জমির সরকারী অংশের এক-তৃতীয়াংশ সরকারে দিতেন,—এই করের নাম ইনাম তিজাই।

৬। ইনাম পট্টি—কখন-কখনও সরকারের অতিশয় অভাবের সময় ইনামদারদিগের নিকট হইতে এই কর আদায় করা হইত।

৭। পাণ্ডি গল্লা—১২ বৎসরে একবার শতকরা ১২৲ তঙ্কার উপর অতিরিক্ত আদায় করা হইত।

৮। বিহির হুণ্ডা—কূপের জলে যে সকল জমির শস্য হয়, তাহার উপর অতিরিক্ত কর।

৯। ঘর পট্টি—ব্রাহ্মণ ও পল্লী-সমাজের কর্ম্মচারী ব্যতীত প্রত্যেক গৃহস্থের দেয়।

১০। বট ছাপাই—পেশবা-সরকার প্রত্যেক বৎসর বাটখারা প্রভৃতি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করিতেন; এবং এইজন্য দোকানদারদিগকে বট ছাপাই নামক কর দিতে হইত।

১১। তাগ—পাল্লা ঠিক আছে কি না দেখিবার জন্য কর।

১২। লগন টক্ক—বিবাহ কর।

১৩। পাট দাম—বিধবা বিবাহের কর।

১৪। মৈস পট্টি—প্রত্যেক গোয়ালার নিকট হইতে দুগ্ধবতী মহিষী-প্রতি ১৲ হিসাবে কর আদায় করা হইত।

১৫। বকরা পট্টি—মেষ ও ছাগের কর।

১৬। ফরমাস—কখন-কখনও বেগারের পরিবর্ত্তে শিল্পীদিগের নিকট হইতে তাহাদের কারখানায় উৎপন্ন পণ্য গ্রহণ করা হইত,—তাহার নাম ফরমাস।

১৭। বন চরাই—সরকারী ময়দানে বা জঙ্গলে পশু চরাইবার জন্য দেয় কর।

১৮। ঘাস কাটানি—সরকারী জমির ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতির মূল্য।

১৯। দেবস্থান দাবী—দেব-মন্দির হইতে প্রাপ্ত আয়।

২০। খর বুজওয়ারী—নদী-তীরের তরমুজের ক্ষেতের কর।

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত রূপেও সরকারী তহবিলের অভাব কখন-কখনও পূরণ করা হইত—

১। চেতুল মহল—উত্তরাধিকারীহীন সম্পত্তির আয়। এই সকল সম্পত্তি স্বভাবতঃই সরকারী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

২। বতন জাপ্ত—জমিদার বা অপর কোন বতনদারের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইলে, বা ঐ সকল সম্পত্তির উপর সরকারী ক্রোক দেওয়া হইলে, তাহার আয়ও সরকারী তহবিলভুক্ত হইত।

৩। নজর বা উত্তরাধিকারের কর (Succession duty) জায়গীরদার বা সরকারী কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর সকলকেই উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তির জন্যই একবার এই কর দিতে হইত।

৪। কোতোয়ালী—বাজে জমা প্রায় সবই কোতোয়ালীর অন্তর্গত; অতএব ইহাকে একটী কর না বলিয়া কর-সমষ্টি বলাই উচিত। কোতোয়ালীর অন্তর্গত করগুলির মধ্যে ঘর বিক্রয়ের করটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। বিক্রীত গৃহের মূল্যের ষষ্ঠাংশের কিঞ্চিদধিক পেশবা-সরকার পাইতেন।

গ্রামবাসিগণের নিকট হইতে এই সকল বাজে জমা বা অতিরিক্ত কর পাটিলই আদায় করিতেন; সহচর স্বরূপ ইহার জন্য একজন অতিরিক্ত সরকারী কর্ম্মচারী থাকিত। কখন-কখনও বাজে জমাগুলি ইজারাও দেওয়া হইত; কারণ, সরকারী অভাব। সাধারণ উপায়ে এই অভাব মোচন না হইলে, আবার পেশবা-সরকার কখন-কখনও জাস্তি পট্টি বা অতিরিক্ত কর হিসাবে প্রজার নিকট হইতে আরও কিছু টাকা আদায় করিতেন। কখন-কখনও তাঁহারা কর্জ্জ পট্টি চাহিতেন। এই কর্জ্জপট্টি নামেই ঋণ; প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডের benevolence forestএর মত এই টাকাকে জবরদস্তীর দান বলিলেই চলে।

বাজে জমার এত বড় একটা লম্বা ফর্দ্দ দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে যে, মারাঠা প্রজাগণের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। বাস্তবিক কিন্তু পেশবা-সরকারের রাজস্ব নীতির মূল সূত্রের কখনও ব্যত্যয় হইত না। তাঁহারা জানিতেন; প্রজার নিকট হইতে তাহাদের সাধ্যাতিরিক্ত কর দাবী করা হইবে না,—সাধারণ করও নহে, বাজে জমাও নহে। তাই বাজে জমা আদায়ের সময়েও প্রজার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করা হইত। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে পেশবা-সরকার হইতে সাতারার কৃষ্ণরাও অনন্তের নিকটে একখানি চিঠি লেখা হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"মোচরা গণেশ বেহেরের নিবাস সাতারায়। হুজুর অবগত হইয়াছেন যে, তুমি তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে ঘরপট্টির জন্য ভয়ানক তাগাদা দিতেছ। দুই বৎসর হইল মোরগিরির নিকটে এই ব্যক্তি ডাকাতের হাতে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। তাহার পর তাহার ভ্রাতাও দস্যুহস্তে হত হইয়াছে। সুতরাং বেহেরে এখন বড়ই দুরবস্থায় পড়িয়াছে। আমরা তাহার প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া তাহার ঘরপট্টি মাপ করিলাম। এইজন্য অতঃপর তুমি তাহার পরিবারবর্গকে তাগাদা করিও না।" সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ঘরপট্টি মোটেই দিতে হইত না; এবং কোকণের ব্রাহ্মণ ও প্রভুদিগের নিকটেও এই কর আদায় করা হইত না। সাধারণতঃ পেশবা যুগে মিরাস জমি ১০ গুণ বহারে বিক্রয় হইত। জমির এই উচ্চমূল্য হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাজে জমা দিয়াও প্রজার বেশ লাভ থাকিত।

কোন কোন বাজে জমা আবার সাধারণ প্রজার হিতার্থই কল্পিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বন চরাইর নাম করা যায়। বনচরাই খুব পুরাতন কর। মুসলমান শাসনকালেও ইহার প্রচলন ছিল। তারিখ ই-ফিরোজশাহী আইন-ই আকবরী ও খাফি খাঁর গ্রন্থে এই করের উল্লেখ আছে। ফিরোজশাহ ও ঔরংজীব এই কর রদ করিয়াছিলেন। পেশবাগণ কিন্তু এই কর সাধারণ প্রজার অসুবিধা নিবারণের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেন। মহারাষ্ট্রে একদল পেশাদার মেষপালক বা খিলারী ছিল। এই খিলারীদিগের পশুপাল অনেক সময়েই লোকের ক্ষেতে পড়িয়া শস্যহানি করিত। পেশবা-সরকার এই জন্য খিলারীদিগকে পশু চরাইবার জন্য পরোয়ানা লইতে বাধ্য করিতেন। বলা বাহুল্য, এই পরোয়ানার জন্য খিলারীদিগকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে হইত; এবং তাহাদের পালের পশুসংখ্যাও সরকারী পরোয়ানায় স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিত। পরোয়ানায় অতিরিক্ত মেষ রাখিতে হইলে, সরকারে শতকরা ৬৲ হিসাবে কর দিতে হইত। সাধারণ রায়তের গরু, বাছুর, মেষ বা ছাগের জন্য বনচরাই দিতে হইত না। এই কর সত্ত্বেও খিলারীদিগের উপদ্রব এমন বাড়িতেছিল যে, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে শিরওয়াল প্রান্তের সকল খিলারীর পশুই সরকারে

বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে সরকারী পরওয়ানার সহিত মিলাইয়া কতকগুলি পশু ফেরত দেওয়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু পরোয়ানার অতিরিক্ত একটী মেষও ঘিলারীরা ফিরিয়া পায় নাই।

বাজে জমা আদায় উপলক্ষে পেশবা-সরকারকে রাজ্যের ঘরবাড়ী ও পশু সংখ্যার সঠিক হিসাব রাখিতে হইত। কারণ, বিনা পরিদর্শনে কর গ্রহণের রীতি তখন ছিল না। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে খোষালে পরগণার গৃহ ও মহিষের সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্য একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সরকার তাহাকে পূর্ব্ব বৎসরের ঘর ও জানোয়ারের শুমারীর কাগজ দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। পর বৎসর পালা, অবষ্টমী, নাগোঠনে, গোশালে চিরওয়ারি এবং তলে তরফের ঘর ও জানোয়ার শুমারীর জন্য অনেকগুলি কর্ম্মচারী প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে বাজে জমার হার ও পরিমাণ নির্ণয় উপলক্ষে পেশবা সাম্রাজ্যের statistics সংগৃহীত হইয়াছিল।

১১

জঙ্গল বিভাগ।

বন বিভাগ হইতেও পেশবা সরকারের কিছু আয় হইত। তবে সে আয়ের পরিমাণ খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে এক ব্যক্তি খোসালা পরগণার সমস্ত তালগাছের (অবশ্য সরকারী সম্পত্তি) ইজারা মাত্র ১৫৪৷৵ জমায় লইয়াছিল। সরকারী জঙ্গলের কাঠ বেচিয়াও বেশী টাকা পাওয়া যাইত না—জ্বালানি কাঠ ত এক বলদের বোঝা।০ দিলেই কাটিয়া আনা যাইত। বনে জঙ্গলে মৌচাক হয়, চাকের মধু হইতেও সরকারী তহবিলে যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তি ছিল। কিন্তু এই সমস্ত মিলিয়াও এত অল্প আয় হইত যে, টাকা অপেক্ষা জঙ্গলের উৎপন্ন দ্রব্যের খাতিরেই পেশবা সরকার জঙ্গল বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সামরিক প্রয়োজনের হিসাবে জঙ্গল মহলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাখা হইতেছে কুরণ—কুরণ ঘাসের জমি। সরকারী জমিতে ঘাস রাখা হইত অশ্বারোহী ফৌজের প্রয়োজনে। জিবাজী কৃষ্ণ নামক একজন কুরণের মামলতদারের নিয়োগপত্রে নিম্নলিখিত কর্ত্তব্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল।

১। প্রতি বৎসর তাহাকে পুণায় সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৫ লক্ষ আঁটি ঘাস দিতে হইবে এবং পুণার ৫।৬ ক্রোশের মধ্যে আরও ১৫ লক্ষ আঁটি মজুদ রাখিতে হইবে। পেশবার কর্ম্মচারীদিগের পত্র দেখাইলেই ঐ ঘাস ঘোড়া বা উটের আস্তাবলে দিতে হইবে।

২। পুণার ১৫—২০ ক্রোশের মধ্যে সরকারী বেসরকারী সমস্ত কুরণের ভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র সরকারী কুরণ করিতে হইবে।

৩। পুণায় প্রতিবৎসর সরকারী ব্যবহারের জন্য ১৬০০ খণ্ডি জ্বালানি কাঠ ও ১৬০ খণ্ডি কয়লা দিতে হইবে।

৪। বেসরকারী কুরণ হইতে যে সকল কাঠ জ্বালানি কাঠ, ঘাস, বাঁশ, পাতা ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহা হইতে মালিকের যাহা প্রয়োজন হয় তাহা তাহাকে দিবে। এবং সরকারী প্রয়োজনে যাহা লাগে তাহা রাখিয়া, বাকী জিনিস সমস্ত বিক্রয় করিবে। বিক্রয় লব্ধ অর্থ সরকারী তহবিলে জমা দিবে।

৫। যে সকল বণিক বলদে করিয়া কাঠ লইয়া যায়, তাহাদের নিকট বোঝা প্রতি।০, অথবা সম্ভব হইলে, বেশী আদায় করিবে। যে সকল রাখাল কুরণ জমিতে পশু চরায় তাহাদের নিকট হইতে বনচরাই আদায় করিবে এবং আদায়ী টাকা সরকারে জমা দিবে। (মূল দলীলের জন্য পেশবাদিগের ডায়েরী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৬ পৃঃ দেখুন।)

সরকারী কর্ম্মচারীরা ঘরবাড়ী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ জঙ্গল মহল হইতে বিনা পয়সায়ই লইতে পারিত। আবার দুঃস্থ প্রজারাও যে এইরূপ সরকারী সাহায্য না পাইত তাহা নহে। তলবাড়নিবাসী মহারদিগের গৃহদাহ হইলে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের জন্য তাহারা চাকণ তরফের সরকারী জঙ্গল হইতে ৭৫০টি বাঁশ বিনা মূল্যে পাইয়াছিল। জন সাধারণের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক কাযের জন্যই সরকারী জঙ্গল মহলের উৎপন্ন দ্রব্য পেশবা-সরকারের অনুমতি লইয়া বিনামূল্যে আনা যাইত, আর সে অনুমতি চাহিয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই।

১২

টাঁকশাল

সকল রাজারই টাঁকশাল হইতে অল্লাধিক আয় হয়,—পেশবাদিগেরও হইত। পেশবা-যুগে টাঁকশাল একেবারে

একটী সরকারী বিভাগ ছিল না,—টাঁকশালের কায, টাঁকশালের তত্ত্বাবধান করিত সাধারণ সোণারেরা। এই ব্যবস্থার মূলে মারাঠাদিগের তথা হিন্দুদিগের প্রাচীন নীতির প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারপতি রাণাডে লিখিয়াছেন।—The Hindu financier whose opinions were so prominently referred to in one of the articles on Indian affairs published in a recent issue of the London Times reflected the views of his country men faithfully enough, when he observed that "No Government has the right to close its mints or to say that the currency of the country was either deficient or redundant. That was a question solely for the bankers, traders and merchants to consider. If they do not require money, they will not purchase bullion to be coined. The duty of Government is merely to assay all Bullion brought to the mint for coinage and to return the value of bullion in money." সম্প্রতি লণ্ডন টাইমসে ভারতবর্ষের সম্পর্কে একটী প্রবন্ধে যে হিন্দু অর্থনীতি-বিদের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগের মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন সরকারেরই টাঁকশাল বন্ধ করিবার অথবা দেশে মুদ্রার সংখ্যা কম কি বেশী হইয়াছে তাহা বলিবার অধিকার নাই। সে প্রশ্নের বিচার কেবল পোদ্দার, সওদাগর ও বণিকেরাই করিতে পারেন। যদি তাঁহাদের টাকার প্রয়োজন না থাকে, তবে তাঁহারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার জন্য ধাতু কিনিবেন না। সরকারের কর্ত্তব্য, টাঁকশালে যত ধাতু আসে, তাহার বিশুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে টাকা দেওয়া। ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যে অন্ততঃ ছত্রিশ রকমের স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। তাঁহার শিবরাই পয়সা এখনও অনেক পাওয়া যায়। এক এবট সাহেবই ২৫০০০৲ শিবরাই পয়সা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর স্বর্ণমুদ্রা বা শিবরাই হোন এখন পর্য্যন্ত দুইটির বেশী পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তিনি ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন রাজার সুবর্ণ ও রজত-মুদ্রা যে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করিতেন, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। ইংরেজ দূত অক্সিনডেনকে তিনি নিজেই এই কথা স্পষ্টই বলিয়াছেন। অক্সিনডেন প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, বোম্বাইর ইংরেজ কোম্পানীর মুদ্রা শিবাজীর রাজ্যে চালাইবার অনুমতি দেওয়া হউক, বোম্বাইতেও শিবাজীর মুদ্রা চলিবে। উত্তরে ছত্রপতি মহারাজ বলিয়াছিলেন,—তিনি তাঁহার রাজ্যে কোন প্রকারের মুদ্রার প্রচলনই নিষেধ করেন না ; অপর পক্ষে তিনি তাঁহার প্রজাদিগকে (অপকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণ করিয়া) ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য করিতে পারেন না। যদি ইংরেজের মুদ্রা ওজনে ও বিশুদ্ধিতে মুঘল ও অন্যান্য রাজাদিগের মুদ্রার সমান হয়, তবে তিনি তাহার প্রচলন নিষেধ করিবেন না। He forbids not the passing of any manner of coins, nor on the other side can he force his subjects to be losers; but if our coin be as fine an alloy and as weighty as the Mugal's and other princes' he will not prohibit. (Fryer, A new account of East India and Persia.) এই অবাধ মুদ্রা প্রচলন নীতির ফলে অনেক বিদেশী মুদ্রাও শিবাজীর রাজকোষে স্থান পাইয়াছিল। রাণাডে বলেন যে, এই কারণেই মারাঠা সাম্রাজ্যে এত বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল যে, ইংরেজ বিজয়ের পর, ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের ব্যবহারের জন্য একটী তালিকা তৈয়ারী করা হইয়াছিল ; ঐ তালিকায় ৩৮ প্রকারের স্বর্ণমুদ্রা ও একশত সাতাশেরও অধিক রৌপ্যমুদ্রার নাম পাওয়া যায়। (In an official table published for the guidance of the civil courts in the Bombay Presidency, the names of no less than thirty eight gold coins and over one hundred and twenty seven silver coins are mentioned as still so far current in different parts of this Presidency as to make it worth while to give the relative intrinsic values of these local currencies in exchange for the Queen's coin.")

পেশবা-সরকার নিজেদের হাতে টাঁকশালগুলি রাখিতেন

বলিয়া যে লোকের মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অবাধ স্বাধীনতা ছিল, তাহা নহে। টাঁকশাল খুলিবার জন্য সরকারী সনদের দরকার হইত; আর সনদ পাইতে হইলেই কিছু দক্ষিণা দিতে হইত। দক্ষিণার কোন নির্দ্দিষ্ট হার ছিল না। কিন্তু দক্ষিণার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, সনদ লইয়া কোন সোণারই রাজার নামের মুদ্রার উৎকর্ষের হানি করিতে পারিত না। ধাতুর পরিমাণ ও মুদ্রার ওজন তাহাকে ঠিক রাখিতেই হইত, নহিলে সাজা হইত। একখানি সনদ পড়িলেই এই প্রথা বেশ ভাল করিয়া বুঝা যাইবে। সনদ খানির তারিখ ১৭৪৪; এবং বিচারপতি রাণাডের মতে এইখানিই এতৎসম্বন্ধীয় প্রাচীনতম দলীল।—"বালাজী বাপুজীকে ১০ মাসা ওজনের পয়সা তৈয়ার করিবার জন্য নাগোঠনে গ্রামে একটী টাঁকশাল খুলিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে। ঐ ওজনের পয়সা তৈয়ার করিতে হইবে। পয়সার ওজন কম হইলে তাহার জরিমানা হইবে।" বালাজী বাপুজী কি দক্ষিণায় কত বৎসরের জন্য টাঁকশাল খুলিবার অধিকার ক্রয় করিয়াছিলেন, সে সংবাদও ঐ সনদেই পাওয়া যায়। প্রথম বৎসরে তাহাকে ১২৷৷০ হিসাবে চারি কিস্তিতে মোট ৫০৲ দিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে চারি কিস্তিতে ৭৫৲ ও তৃতীয় বৎসরে চারি কিস্তিতে ১০০৲ এই টাকশালের সনদের জন্য সরকারী তহবিলে গিয়াছিল। সুতরাং বালাজী বাপুজী মাত্র তিন বৎসরের জন্য পয়সা নির্ম্মাণের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। রাণাডে বলেন যে, ছত্রপতি শাহু ও কোহ্লাপুরের ছত্রপতিদিগের সরকারী টাঁকশাল ছিল।

পেশবা সরকার বিনা আপত্তিতে টাঁকশাল খুলিবার সনদ দিতেন বলিয়া, বেসনদ টাঁকশাল অথবা অপকৃষ্ট মুদ্রা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু টাকা জাল করিবার প্রবৃত্তি নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও সকল দেশেই প্রবল। পেশবা-সরকার আবার টাঁকশাল নিজেদের হাতে রাখেন নাই। টাকা তৈয়ারী করিবার যন্ত্রও তখন এখনকার মত উন্নতি লাভ করে নাই; গোলাকার ধাতুখণ্ড ছাঁচের উপর রাখিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটাইয়া পেশবা-যুগের মুদ্রা প্রস্তুত করা হইত। কাজেই, অনেক লোকই নিজেদের বাড়ীতে টাঁকশাল খুলিয়া টাকা-মোহর প্রভৃতি তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিল। ধারোয়ারের প্রান্তে ত ঘরে-ঘরে টাঁকশাল বসিয়া গেল। তাহারা টাঁকশাল খুলিত লাভের জন্য; সুতরাং প্রচলিত মুদ্রার বিশুদ্ধি বা নিয়মিত ওজনও অব্যাহত রহিল না। পাণিপথের যুদ্ধের কয়েক মাস পূর্ব্বে পেশবা বালাজী বাজীরাও পাণ্ডরঙ্গ মুরারি নামক এক ব্যক্তিকে লিখিয়াছিলেন—ধারোয়ার প্রান্তে যে সকল টাঁকশাল আছে, তাহাতে অপকৃষ্ট হোন, মোহর, ও টাকা প্রস্তুত হয়। পুরাতন টাঁকশালগুলিতে বিশুদ্ধ মুদ্রা নির্ম্মিত হইত। সম্প্রতি জমিদারেরা ঘরে-ঘরে টাঁকশাল খুলিয়া খারাপ টাকা চালাইতেছে। ইহার প্রতিকার স্বরূপ পেশবা পাণ্ডরঙ্গকে আদেশ করিতেছেন যে, ধারোয়ারের সকল টাঁকশাল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি নিজের তত্ত্বাবধানে ধারোয়ারের কেন্দ্রস্থানে একটী টাঁকশাল খুলিবে ও টাকা প্রস্তুত করিবার মজুরী হাজারকরা ৭৲ হিসাবে লইবে। ঐ টাকার মধ্যে ৬৲ সরকারী তহবিলে যাইবে ও ১৲ তোমার পারিশ্রমিক। কিন্তু প্রথম-প্রথম পোদ্দারদিগকে এই সরকারী টাঁকশালায় আকৃষ্ট করিবার জন্য এক বৎসর বিনা পারিশ্রমিকে টাকা প্রস্তুত করিয়া দিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ইহাতেও যখন অপকৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হইল না, তখন পেশবা জ্যেষ্ঠ মাধবরাও সকল কামাবিশদার, জমিদার ও মহাজনদিগের উপর হুকুম জারি করিলেন যে, অতঃপর সরকারী তহবিলে নূতন মুদ্রা ব্যতীত পুরাতন মুদ্রা গ্রহণ করা হইবে না। বেসনদী টাঁকশালের আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। এইটুকু মনে রাখিলেই চলিবে যে, পেশবা-সরকার টাঁকশালগুলির কেবল সাধারণ ভাবে তত্ত্বাবধান করিতেন মাত্র। দেশের মুদ্রার সংখ্যা বাড়াইবার বা কমাইবার চেষ্টা তাঁহারা কখনও করেন নাই।

আজকাল আমরা কাগজের টাকার সহিত খুব পরিচিত। কাগজের টাকার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, ইহা খুব হালকা; সুতরাং অনেক টাকাও বহিয়া লইয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না। পেশবা-যুগে এই জন্য হুণ্ডির খুব প্রচলন হইয়াছিল। দূর দেশ হইতে টাকা পাঠাইতে হইলে লোকে হুণ্ডিই পাঠাইত। সরকারী কর্ম্মচারীরাও সরকারী তহবিলের টাকা হুণ্ডি দ্বারাই চালান দিতেন। বেশী টাকার ত কথাই নাই,—অল্প টাকার নোটের মত অল্প টাকার হুণ্ডিও তখন খুবই চলিত। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ

কাশিনাথ রাজবাড়ে সম্পাদিত মারাঠাদিগের ইতিহাসের উপাদানের ১০ম খণ্ডে গণেশভট নামক এক ব্যক্তির একখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ চিঠিতে গণেশভট লিখিয়াছেন যে, তিনি ১৩৷৷০ সাড়ে তের টাকা হুণ্ডিতে পাঠাইতেছেন।

১১

শুল্ক

পেশবা সাম্রাজ্যে প্রচলিত শুল্কগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। (১) মোহতর্ফা অথবা ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে গৃহীত ব্যবসায় কর। (২) জকাত অথবা ক্রয় বিক্রয়, আমদানী রপ্তানী কর। চারিখানি দলীল হইতে মোহতর্ফার একটী সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ার করা যায়। (১) ১৭৫২—৫৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত রেওদণ্ডার কামাবিশদারের নিকট লিখিত পত্র। (২) ঐ বৎসরই নাথুরাম চৌধুরীর নামীয় পত্র। (৩) ১৭৫০—৫১ খৃষ্টাব্দে জাঞ্জিরা রেওদণ্ডার ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে প্রদত্ত সনদ। (৪) ১৭৫২—৫৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীধর জিবাজীকে প্রদত্ত সনদ।

প্রথম দলীলখানিতে রেওদণ্ডার কামাবিশদারকে নিম্নলিখিত হারে মোহতর্ফা আদায় করিতে বলা হইয়াছে—

১। কোলীদিগের নিকট হইতে পাল্কীর আয়তন অনুসারে পাল্কী-প্রতি ৮৲, ৫৲ ও ২৲ হিসাবে কর লইবে। (মহারাষ্ট্রের অনেক পার্ব্বত্য পথে গাড়ী চলে না; ঐ সকল যায়গায় পাল্কীতে করিয়া পণ্য দ্রব্য বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

২। দোকানদারদিগের নিকট হইতে বার্ষিক দোকান-প্রতি ৫৲ ৬৲ ও ৭৲ হিসাবে।

৩। লোহকারদিগের নিকট হইতে দোকান-প্রতি বার্ষিক ৪৲ ৫৲ ও ৬৲ হিসাবে।

৪। চামারদিগের নিকট হইতে দোকান-প্রতি বার্ষিক ৪৲ হিসাবে।

৫। তৈলিকদিগের নিকট হইতে ঘানি-প্রতি বার্ষিক ৫৲ ৬৲ ও ৭৲ হিসাবে।

৬। সোণারদিগের নিকট হইতে দোকান প্রতি বার্ষিক ৩৲ হিসাবে।

৭। কুমারের নিকট হইতে চাক-প্রতি বার্ষিক ৩৲ হিসাবে।

৮। সাজিনির্ম্মাতাগণের নিকট হইতে ঘর-প্রতি বার্ষিক ৩৲ হিসাবে।

৯। গোন্ধলী (বসন্তের দেবীর উপাসক)দিগের নিকট হইতে বার্ষিক ৩৲ হিসাবে ব্যবসায়-শুল্ক।

১০। প্রত্যেক ছোট সওদাগরী নৌকা-প্রতি।০ ও বড় নৌকার প্রত্যেকখানার জন্য ॥০ হিসাবে কর আদায় করিবে। নাথুরাম চৌধুরীকে বেলদার (পাথরের মিস্ত্রী)-দিগের নিকট হইতে তাহাদের আয়ের শতকরা ৫৲ হিসাবে মোহতর্ফা আদায় করিতে বলা হইয়াছিল। রেওদণ্ডার ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী মোরজী শিন্দের সনদে রাজমিস্ত্রী, পাথরের কারিগর ও খনকদিগের মোহতর্ফার হার দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ব্যবসায়ের জন্য মাসে মাসে এক দিনের আয় সরকারী ট্যাক্স স্বরূপ দিতে হইত। শ্রীধর বাবাজীর সনদে, কাপড় ও মসলার বণিকদিগের নিকট হইতে বলদ-প্রতি (ইহারা বলদে চাপাইয়া পণ্য লইয়া যাইত) ১।০ হিসাবে কর আদায় করিতে বলা হইয়াছে। মোহতর্ফার তালিকা এইখানেই শেষ। জকাতের পরিচয় আগামী বারে দিব।

মনের কথা

[শ্রীপ্রতিভা দেবী]

মনের কথা বলবার বন্ধু যখন না থাকে, তখন লোকে লেখনীর আশ্রয় নেয়; সুতরাং, বন্ধুর অসদ্ভাব হওয়ায়, আমি আজ এই পুরানো খাতাখানিকে বন্ধুর পদে বরণ করলুম। আমার জীবনে একটা কথা এমন সত্য, এমন প্রচুর হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাকে প্রকাশ না করলে আমার নিস্তার নাই। জীবন-কাহিনী লিখতে রুচি নেই,—জীবনে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে; শুধু যে সত্যটি জীবনে-মরণে আমার সম্বল হয়ে উঠেছে, সেইটিতে বারবার মাথা ঠেকাচ্ছি।

মনে হয়, বুঝি জন্মে পর্য্যন্ত আমি ঝড়ের মধ্য দিয়ে ছুটেছিলুম। একটা অন্যায় অবিবেচনা ও ব্যস্ততার সঙ্গে ছুটতে-ছুটতে যেদিন আমি প্রথম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালুম, ঠিক সেইদিনটাতেই আমি আমার অতীতের দিকে চেয়ে তার বিচার করতে পেরেছিলুম। আমাদের পাশের বাড়ীর রুগ্ন লোকটি তার কালো চোখের ক্লান্ত দৃষ্টি দিয়ে আমার আজীবন আঁধার করা অন্তরে যেন মঙ্গলদীপ জ্বেলে দিয়েছিল।

সংসারের সব কাজের সঙ্গে রান্নাটাও আমাকেই সারতে হ'ত। আমার রান্নাঘরের জানলার সামনেই ছিল তার ঘরের জানলা। আমি যখন তরকারীর পাঁচফোড়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতুম, সে তখন তার জানলার ধারে একখানা হাতা-ভাঙ্গা পুরানো কাঠের চেয়ারে বসে, বি-এ ক্লাসের কি-কি সব বইএর মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকতো। দুজনে আমরা দুজনকে লক্ষ্যই করতুম না। আমার জানলার লোহার তারের জাফ্‌রিটা রাধাচক্রের মত দুজনের দৃষ্টির পথ রুদ্ধ করে থাকতো। হঠাৎ একদিন তার সেই একনিষ্ঠ ভাব ভেঙ্গে গেল। জানলার কাছটায় ঝুঁকে পড়ে আমি সেদিন একখানা থালায় কতগুলো ডাল বেছে নিচ্ছিলুম,—আর বোধ হয় মুদির উপর চটে উঠে, দু'চারটা বকুনী দিচ্ছিলুম। অকস্মাৎ সামনের জানলায় পড়ার গুণগুণ ভাঙ্গা আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। চোখ তুলে দেখি, তার বড়-বড় দুই কালো চোখের উজ্জ্বল কৌতুক-দৃষ্টি জাফ্‌রিটার ফাঁক দিয়ে গলে, আমারি মুখের উপর এসে পড়েছে। আমি একটু হেসে, মাথা নীচু করে, আবার ডাল বাছতে লাগলুম। লজ্জাহীনা আমি, সরে যাওয়ার কথাটা আমার মনেই পড়ল না। সমস্ত লোককে আমি একটু তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করে চলতুম, আমার চরিত্রে তখন শেষ রিপুটা সর্ব্বদা সজাগ হয়ে থাকতো। তার পর থেকেই ঐ লোকটির সঙ্গে প্রায় চোখোচোখি হতে লাগল। ভাবভঙ্গী দেখে মনে হতো, সে তার পড়ার সঙ্গে চাওয়াটা বেশ মিশিয়ে নিয়েছে।

ছোটবেলা থেকে "ঘা" খেয়ে-খেয়ে আমার মেজাজটা বড় কঠিন হয়ে উঠেছিল,—হাস্যরসের অনেক মজার-মজার কথা আমার কড়া মেজাজে ঠেকে বিফল হয়ে যেতো। কিন্তু সেদিন লোকটির চকিত চাহনি দেখে বড় হাসি আসছিল। আমি একটু রগড় করে চেঁচিয়ে চাকরটাকে বল্লুম, "ওরে নিবারণ, আমার রান্নাঘরের জাফ্‌রিটা খুলে দিস তো; নৈলে বড় অসুবিধা হয়।" বলেই উঁকি দিয়ে দেখি, সে মুখখানা নীচু করে বইয়ের দিকে চেয়ে আছে;—তার ফর্সা মুখের যেটুকু আমি দেখতে পাচ্ছিলুম, সেইটুকু কাণের কাছ অবধি লাল হয়ে উঠেছে। মনে-মনে একটু অনুতাপ হতে লাগল।

এর পর থেকে সে বোধ হয় আর চাইত না। কিন্তু সে চাইছে কি না জানবার জন্যে আমাকেই অনেকবার চাইতে হত। একদিন এই রকম অবস্থায় বৌদি ঘরে ঢুকে অবাক্ হয়ে বল্লেন, "ও কি হচ্ছে রমা?" আমি চমকে মুখ ফিরিয়ে বললুম, "লোকটা কেমন নাকি সুরে পড়ছে, তাই শুনছি।"

জীবনে বোধ হয় সেই প্রথম মিছে কথা বলেছিলুম। যার কাছে মিথ্যা বলছি, মনে-মনে তার কাছে খাট হতে হয় বলে, আমি কোনদিন মিছে কথা বলতে যাইনি। বৌদি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "যার যা খুসি করুক না, তুমি বিধবামানুষ, ও-সব দিকে চোখ কেন?" ঠিক এই রকম কথা আমার সহ্য হত না। যার যা খুসি সে তাই করতে

পারে;—শুধু আমি বিধবা বলে আমার খুসির সামনে মস্ত বড় এক আড়াল রাখতে হবে! আমিও খুব কড়া-কড়া দু'চার কথা শুনিয়ে দিলুম। বৌদিদি না পেরে উঠে, রণে ভঙ্গ দিলেন। আমি বিধবা, আমার চারিদিকে তাই শুধুই "না!" আর যারা এই "না"র সৃষ্টি করেছে, তাদের চারিদিকে—থাক্!

ঘৃণা! ঘৃণা! মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠতো; এবং অন্য কোন পথ অবলম্বন না করে, সে তার নিজের গড়া পথেই চলতো।

মনে পড়েছে, বিদ্যাসাগরের উপর আমার গাঢ় ভক্তি দেখে, বৌদিদি একদিন বিদ্রূপ করে বিয়ের ইঙ্গিত করেছিলেন। আমি তাতে জবাব করেছিলুম, "বিয়ে কর্ত্তে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাত্র কোথায়? দেশে কি মানুষ আছে!" এত বড় তেজের কথা শুনে, বৌদির মুখে আর কথা সরে নাই।

অভাগ্য, যে, বিদ্যাসাগরের উপর মেয়েদের কৃতজ্ঞতা লোকের চোখে এমনি বিকৃত হয়ে দেখা দিয়েছিল; যেন তিনি বিধবা-বিয়ে ছাড়া মেয়েদের আর কোন উপকার করেন নাই।

আমাদের সেদিনের কলহের কলরব সেই ছেলেটির কাণে গিয়ে পৌঁছেছিল, সে সম্বন্ধে কোন ভুল নাই; কিন্তু তার মনে গিয়ে পৌঁছল কি না, ঠিক বলতে পারি না। এর পর থেকেই কয়েক দিন ধরে বেহুঁস জ্বর হয়ে বিছানায় পড়লুম। বৌদিদি অনেক বকাবকি করে বামুন আনালেন; এবং আমার আর যাবার কোনও চুলা নাই দেখে, বারবার অবাক্ হয়েও বাক্‌শক্তি হারালেন না।

দিন দুই পরে যখন জ্বর ছাড়ল, বিছানায় উঠে বসে দেখি, দেহ ও মন দুই-ই অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। মনে হলো, যেন একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতি পেলে, আমি কৃতার্থ হয়ে যাবো। হায়, সে সব কোথায়! আমায় একটু স্নেহ করে এমন কেউ তো নেই,—কখনো কি ছিল? চক্ষু মুদে মা-বাবার মুখ মনে করবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু সে মুখ কেমন ছিল, স্মরণ হয় না। স্বামীর মুখ মনে পড়ে,—দশ বৎসর আগে সে মুখ দেখেছিলুম, কিন্তু ভুলি নি। পাকা-পাকা দাড়ি-গোঁফসমাচ্ছন্ন, দন্তহীন, টোল-খাওয়া মুখখানা দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি পিতামহ প্রজাপতি স্বয়ংই আমায় কৌমার্য্য-কূপ হতে উদ্ধার করতে এলেন! যে মুখ দেখে তখন ভয়ে শিউরে উঠেছিলুম, আজ তা' থেকে স্নেহমমতার দাবি করতে আমার হাসি এলো,—আমি কি পাগল হয়ে গেলুম না কি? তবে একটা কথা মনে উঠে যে, ষাট বছরেও যারা দশ বছরের মেয়ের সঙ্গে প্রেমালাপে সাহস করে, তারা আর কিছু নাই হোক, আদর্শ প্রেমিক বটে!

অন্তরের এই সব দুর্ব্বলতা এড়াবার জন্যে ধীরে ধীরে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। বাইরের লোক-চলাচল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলুম,—এমন সময় পাশের বাড়ীর সেই লোকটি বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলুম, কোলে আমার দাদার ছেলে মনু! জানলার মধ্যে থেকে কেবল তার মুখখানাই দেখতুম,—সর্ব্বাঙ্গ দেখবার সুযোগ পাই নি,—আজ চেয়ে দেখলুম, কি রোগা! লম্বা চেহারা, রং খুব সাদা, যেন রক্তহীন। মুখখানা অত্যন্ত কৃশ, চোখের দৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে ভরা। মনুর সঙ্গে লোকটি আলাপ করছিল,—হঠাৎ একটা কথা আমার কাণে আসাতে চমকে উঠলুম,—এ তো আমারি কথা! আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, এ কি কাণ্ড! মনু তার ছোট্ট মাথাটি নেড়ে জবাব দিতে-দিতে অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, "তুমি পিছিমাকে ভালবাছ, না? আমিও বাছি।" লোকটার কাগজের মত সাদা মুখ এক মুহূর্ত্তে লাল হয়ে উঠল। সে মনুর মাথাটা চুম্বন করে, চারিদিকে চেয়ে দেখতেই, উপরে বারান্দায় স্তম্ভিত আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। আমাকে দেখে সে অত্যন্ত চমকে উঠল। আর আমি, আমি যেন পাথরের মত অচল হয়ে গিয়েছিলুম। তার কালো চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মুখ ফেরালুম,—সে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। আমিও খানিক পরে স্বপ্নাবিষ্টের মত ঘরে ফিরে এলুম। এ কি শুনলুম! আমার ক্লান্ত মন ঐ একটা কথার ভারে নত হয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। ছি-ছি! কি দুর্ব্বল আমি! আমার সে দৃঢ়তা কোথায় গেল? দুর্ব্বল মনের মাঝে ঘুরে-ফিরে সেই সর্ব্বনেশে কথাটাই বার-বার উঠতে লাগল। দিন-কতক পরেই আবার আমার রান্নাঘরের শূন্য সিংহাসন অধিকার করে বসলুম।

আমার সেই কঠোর, উগ্র স্বভাব সহসা এমন কোমল

হয়ে উঠল যে, বাড়ীর সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। এখন আর কারো কথার প্রতিবাদ কর্ত্তে ইচ্ছা হত না; মনে হত, যেন শরীরের অবসাদে মন পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমার এই স্তব্ধতায় সামনের জানলার লোকটি বোধ হয় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতো। আমার বোধ হত, যেন সে একটু কিছু পরিচিত শব্দ শোনবার জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে যখন তার শ্রান্ত, কোমল দৃষ্টি এ ঘরের মধ্যে এসে পড়ত, তখন আমি যেন জানতেই পারি নি, এমনি ভাবে অন্য দিকে চেয়ে কাজ করতুম। আমি জানতুম, চোখ পড়লেই সে সরে যাবে; কিন্তু তার এই ভিক্ষাটাতে 'না' বলতে আমার মায়া হত।

ওদের বাড়ীর গিন্নির সঙ্গে আমাদের অল্প স্বল্প আলাপ ছিল। একদিন তিনি কথায়-কথায় বললেন, তাঁর এক গরীব ভাসুর-পো তাঁর বাড়ীতে থেকে লেখাপড়া করে; কিন্তু তার কাশির ব্যায়রাম আছে বলে, তাঁরা বড় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকেন। কি করবেন, মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারেন না,—মহা মুস্কিল। আমি বুঝলুম, এই গরীব ভাসুর-পো টি কে। অমন একটা শক্ত অসুখ শুনে, বেচারার জন্যে সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরে উঠল। সে আমারি মত অনাদৃত, লাঞ্ছিত,—জগতে তাকে স্নেহ করবার কেউ নেই।

তখন মনে করতুম, আমি পৃথিবীতে একটা ঘূর্ণি ঝড়ের মত এসেছি,—আমার সুখ নেই, দুঃখও নেই। পৃথিবীর বুকে শুধু একটা উদ্দেশ্যহীন, তাণ্ডব নৃত্য করতেই আমার জন্ম হয়েছে।

তখন জানতুম না, বুঝতুম না যে, এখান থেকে কেউ শুধু হাতে ফিরে যায় না,—একটা চিহ্ন, একটা বেদনা তাকে গ্রহণ করতে হবে। তাই ক্রমাগত কয়দিন ধরে তার বন্ধ জানালার দিকে চেয়ে-চেয়ে, যখন আমার প্রাণ বুকের খাঁচায় আছাড় খেতে থাকতো, তখনো আমি একবার ভাবতুম না,—এ আমার কি!

যেদিন সকালে সে জানলাটা খুলে, সেই ভাঙা চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসল,—আমার মনে পড়ে, আমি তৃষিতের মত আমার সর্ব্বশক্তি চোখে এনে, তার দিকে চেয়ে রইলুম। একখানা র‍্যাপারে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে বসে, ক্রমাগত কাশতে লাগল। সে কি বিশ্রী কাশি!—বেদনায় ফ্যাকাসে মুখখানা নীল হয়ে যেতে লাগলো। সহানুভূতিতে আমার দুই চোখ ভরে জল এলো। হঠাৎ সে চোখ তুলে, বিস্মিতের মত আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল,—আমিও অশ্রু-অন্ধ দৃষ্টি বাধা অগ্রাহ্য করে চেয়ে রইলুম।

সেই এক দিন। তার পর তার সেই জানলা আর খুলল না। আমার মন তার রুদ্ধ জানলায় নিষ্ফল আঘাত করে অবসন্ন হয়ে পড়লো। খুব কাণ পেতে আমি শুনতে পেতুম, ঘরের মধ্যে প্রবল কাশির ধমকে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার মন অসহায় রুগ্নের জন্য আকুল হয়ে উঠতে লাগল; কিন্তু উপায় কই? এক-একবার হৃদয়ের অশান্ত উচ্ছ্বাসে অবাক হয়ে ভাবতুম, আমার হল কি?

ক'দিন পরেই দেখলুম, ও-বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সবাই ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে গাড়ী বোঝাই হয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। কে একজন লোক সেই রোগী আর বাড়ী দেখবার জন্য রইল। তাদের বাড়ীখানা পড়োবাড়ীর মত স্তব্ধ, ভয়ানক হয়ে উঠল।

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় রান্না সেরে নিয়ে, কাপড় ছেড়ে, আমি সটান বৌদির কাছে গিয়ে বললুম, "আমি যাচ্ছি।" বৌদি অবাক হয়ে বললেন, "কোথায় গো?"

অম্লান মুখে বলে ফেললুম, "পাশের বাড়ী,—জান তো ওরা সবাই রোগীকে ফেলে চলে গেছেন।"

বৌদি সভয়ে চীৎকার করে বললেন, "ওমা, এ কি সব্বোনেশে কথা গো! ঐ মেলেচ্ছ ব্যামো, আমার ছেলেপুলের ঘর!" আমি এ সব কথায় ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে চলে যাবার উপক্রম করলুম। বৌদি ছুটে এসে আমার হাতটা চেপে ধরে বললেন, "তুমি কি পাগল হলে রমা? ঐ সোমত্ত ছেলের সেবা কত্তে গেলে লোকে বলবে কি?" লোক-নিন্দা! বৌদির এই তুচ্ছ কথাটার জবাব করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। বৌদি জানতেন, অন্য-অন্য অনেক জিনিসের মত লোক-নিন্দাটাও আমি দুই পায়ে মাড়িয়ে চলতুম,—তাই আমার এই উপেক্ষা দেখে, একেবারে রেগে আগুন হয়ে, যা' তা' বলতে লাগলেন। আমি একটু হেসে, বৌদির হাত ধরে বললুম, "তোমাদের সমাজকে কি আমি কোন দিন ভয় করতুম বৌদি, যে আজ আমার এই আর্ত্তের সেবার ইচ্ছা তার জন্যে ঠেকিয়ে রাখব!" বৌদি কি বলতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু আমি তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে নীচে নেমে এলুম। বাইরের কবাটটা খুলে রাস্তায় নেমে

আবার সেটাকে বন্ধ করে দিলুম। আমি জানতুম, হয় তো এই দরজা আমার জন্যে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল,—কিন্তু উপায় কই? পাশের বাড়ীর দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল,—ভিতরে ঢুকে সেটাকেও বন্ধ করে দিলুম। উঃ! বাড়ীটার ভিতরে কি অন্ধকার! সেই অজানা ঘরের মধ্যে দেয়াল ধরে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চললুম,—একটা বিশ্রী সাঁতা গন্ধ এসে নাকে ঠেকতে লাগল। কাছেই তার ঘর, কবাটের ফাঁক দিয়ে একটুখানি ম্লান আলো বাইরের গাঢ় অন্ধকারের উপর এসে পড়েছে। আমি সেইখানে থম্‌কে দাঁড়ালুম,—আমার সর্ব্বদেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভিতরের অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, সামনেই চৌকির উপর সে শুয়ে আছে,—তার মুখখানা বিছানার চাদরের মত সাদা। পাশে বসে একজন কে বুকে একটা কি মালিশ কচ্ছে। আমি একটু একটু করে দরজাটা খুলে ফেললুম। লোকটা চমকে বলে উঠল, "কেও!" আস্তে আস্তে উত্তর দিলুম, "আমি।" লোকটা আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইল। হঠাৎ বিছানা থেকে রোগা মাথা তুলে ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করে উঠল, "কে,—কে?" তার মৃত্ত কণ্ঠে ঘরখানা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। বুঝলুম, আমার আসা বৃথা হয় নি। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে, সে যেন উন্মাদের মত চেয়ে রইল। তার এই অদ্ভুত দৃষ্টির সামনে আমি একেবারে জড়সড় হয়ে গেলুম। সে চোখে কোথায় রোগের ক্লান্তি, আর কোথায় অসহায়ের নির্ভরতা! সে যে কি, আমি তা বোঝাতে পারি না।

একটা নিশ্বাস ফেলে, সে তার কঙ্কাল-সার হাতখানা বাড়িয়ে বললে, "সত্যই তুমি এলে,—আমিও তাই ভেবেছিলুম।" আমি তার তপ্ত হাতখানা হাতে নিয়ে এক ধারে বসলুম।

ধীরে-ধীরে লোকটা বেরিয়ে গেল;—শুধু আমরা দুটী প্রাণী—স্তব্ধ, বাক্যহারা হয়ে পরস্পরের প্রতি চেয়ে রইলুম। সেই অর্দ্ধ-অন্ধকার সাঁতা ঘরখানা ছাড়া সমস্ত বিশ্ব আমাদের জ্ঞান হতে লুপ্ত হয়ে গেল।

সেই স্তব্ধতার মাঝখানে যখন প্রদীপটা নিভে গেল, তখন আমার চৈতন্য হল, যে জীবন-দীপটি আমার সামনে মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছে, সেও তো নির্ব্বাণোন্মুখ। এই অসহ চিন্তাটা যেন বোঝার মত বুকে চেপে ধরতে লাগল। আমি উঠে একটা জানলা খুলে দিলুম। রাত্রি বেলাকার ঠাণ্ডা বাতাস হুহু করে ঘরে ঢুকে পড়ল। সে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বলে, "আঃ!"

আলো জ্বেলে ফিরে এসে বসতেই, ঘরের কোণে একটা টেবিলের উপর স্তূপাকার বইগুলোর দিকে চেয়ে বল্লে, "তোমায় যখন দেখি নি, তখন এইগুলো আমার সর্ব্বস্ব ছিল,—কিন্তু এখন—" কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে মৃদু হেসে চেয়ে রইল। তার এত পরিবর্ত্তন কে ঘটিয়েছে? সে আমি! অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, আমি! আমার এত শক্তি কি করে হল যে, একটা লোকের মনের গতি এমন করে বদলে দিলুম! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! তার রুক্ষ চুলের ভিতর হাত দিয়ে এই কথাই বারবার ভাবছিলুম। ধীরে ধীরে আমার হাতখানা সে বুকের উপর চেপে নিয়ে, অস্পষ্ট কণ্ঠে বললে, "ওঃ! যদি আরো কিছু দিন বাঁচতুম!" তেমন কণ্ঠ আমি জীবনে কখনো শুনি নি! চমকে মুখ নীচু করে দেখলুম, তার নিষ্প্রভ দুই চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত বুক উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার চোখের জল ঝরঝর করে ঝরে পড়ল। হা ভগবান! আরো কিছুদিন ধরে রাখবার কি কোনও উপায় নাই!

আমার কান্না অনুভব করে, সে মুখ ফিরিয়ে আকুল হয়ে বলে উঠল, "আমায়—আমায় বসিয়ে দাও।" আস্তে-আস্তে তাকে বসিয়ে দিলুম। সে সেই বসার পরিশ্রমটুকুতে এলিয়ে পড়ল,—কেবল বাধাহীন চোখের জল টপ-টপ করে ঝরতে লাগল।

অকস্মাৎ সবেগে ফিরে, সে আমার মাথাটা প্রাণপণ আকর্ষণে বুকে চেপে ধরল। তার পরই ধীরে-ধীরে সব শেষ!

তার জন্যে সমাজহীন, গৃহহীন হয়ে, আজ এই আশ্রমে এসে পড়েছি; কিন্তু তবু সে যে আমাকে একটু সেবা করবার সুযোগ দিয়েছিল, তাইতেই আমি কৃতার্থ। সে-ই আমার প্রাণে প্রেরণা দিয়ে গিয়েছে—আর্ত্তের সেবাই প্রধান ধর্ম্ম! সমাজ তা মানতে চায় না—বলে আমি কুলত্যাগিনী! কিন্তু যিনি আর্ত্তের বন্ধু, তিনি জানেন—আমি সতী; আমি আকুল হৃদয়ে মরণাহত আর্ত্তের সেবা করতে গিয়েছিলাম—কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নহে!

নীলগিরি

[শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি-এল]

মান্দ্রাজের দারুণ গ্রীষ্মে শরীর ও মন একান্ত অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; এমন সময় সহসা কয়েক দিনের জন্য উতকামন্দে যাইবার সুযোগ উপস্থিত হইল।

উতকামন্দ নীলগিরি পর্ব্বতমালার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত – নীলগিরি জেলার প্রধান সহর (headquarters)। বাঙ্গালায় যেমন দার্জ্জিলিং, মান্দ্রাজে তেমনি উতকামন্দ —সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৈল-নগরী এবং লাট সাহেবের গ্রীষ্ম-যাপনের স্থান। দাক্ষিণাত্যে ইয়োরোপীয়দিগের বাস-যোগ্য পাহাড় আরও আছে; কিন্তু নীলগিরি—"সকল গিরির সেরা।" শুধু তাহাই নহে,—তাঁহাদের মতে উতকামন্দ – আদরের ডাক-নাম "উটী" – Queen of Hill Stations; অর্থাৎ "শৈল-পুরীর রাণী মোদের উটী আদরিণী।" নগরের কর্ম্মক্ষেত্রে যখন নিদাঘ তাপে "প্রাণ আই ঢাই" করিতে থাকে, তখন উটীর "থরথর কম্পিত মর্ম্মর-মুখরিত পুলকাকুল 'আইভি'-বল্লী-বিতানে" নিত্য নব আনন্দ—নব উৎসব। সুতরাং, গ্রীষ্মাগমে শুধু শৈলপ্রিয় ইয়োরোপীয়গণের নহে, – অনেক আধুনিক রুচিগ্রস্ত এ দেশীয় নর-নারীর হৃদয়ও

উটীতে ছুটিতে ছট্‌ফট্‌ করে দিবারাতি
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ বিহগ ধায় মাতি।

অবস্থা বুঝিয়াই ব্যবস্থা। আমাদের দেশে শরৎকালে পূজার ছুটি, মান্দ্রাজে গ্রীষ্মকালে "দীর্ঘ অবকাশ।"— বড়-বড় উকীল, ব্যারিষ্টার, জজ প্রভৃতি এই সময়টা উটীতেই যাপন করেন। এ হেন উটী দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে কাহার না সাধ হয়? তাড়াতাড়ি কিছু শীতবস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, ১০ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৮টায় মেটুপলিয়াম মেইলে উটী যাত্রা করিলাম। মান্দ্রাজ হইতে ৩২৮ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে, নীলগিরির পাদমূলে মেটুপলিয়াম। দার্জ্জিলিঙের পথে যেমন শিলিগুড়ি, উটীর পথে তেমনি মেটুপলিয়াম,— নাম দুইটিও একার্থ-বোধক।

পরদিন বেলা ১০টায় মেটুপলিয়ামে পৌঁছিয়া উটীর গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। এই পার্ব্বত্য গাড়ীগুলি অনেকটা ট্রামগাড়ীর মত—প্রতি কক্ষে দুইখানি করিয়া বেঞ্চ্‌। যাত্রিগণের জন্য মাত্র দুই শ্রেণীর গাড়ী আছে-প্রথম ও তৃতীয়। পাহাড়ে উঠিবার সময়ে এঞ্জিনটি ট্রেণে পশ্চাতে যুড়িয়া দেওয়া হয়। কুনুর পর্য্যন্ত (১৭ মাইল পথ অত্যন্ত খাড়া; সেইজন্য দুইটি রে'লের মধ্যে, একটি অতিরিক্ত রে'ল পাতা আছে। এই রেইলটি খাঁয কাটা;— ব্রেক্‌ চাপিয়া ধরিবামাত্র, গাড়ীর একটী স্বতন্ত্র চাকা এই খাঁযে এমনি আটকাইয়া যায়, যে, ট্রেণ গড়াইয়া নামিতে পারে না। ট্রেণের সম্মুখ ভাগে একজন ব্রেক্‌ম্যান ব্রেক্‌টি ধরিয়া সর্ব্বদা সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

মেটুপলিয়াম হইতে দুই-তিন মাইল সম্মুখে যাইয়াই ট্রেণ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল। দূর হইতে পর্ব্বতটিকে ধূসর ও বন্ধুর শিলা-স্তূপ মনে হইতেছিল। কিন্তু ট্রেণ পর্ব্বতের পথে উঠিতে আরম্ভ করিলে, দৃশ্যপট যেন মায়াবলে সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পাহাড় কাটিয়া রেল-পথ প্রস্তুত হইয়াছে – দুই ধারে নিবিড় অরণ্য। মাঝে-মাঝে রেলওয়ে লাইনের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কুলীদিগের কুটীর। কোন-কোন স্থানে উপর হইতে ঝরণার জল বেগে নিম্নে আসিয়া পড়িতেছে। বাস্তবিক, রেল-পথের এই রমণীয় দৃশ্য দেখিলেই, উতকামন্দ-যাত্রা সফল মনে হইবে।

প্রায় ২টার সময় কুনুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। পাহাড়ের গায়ে সহরটি যেন ছবির মত সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কুনুর সমতল ভূমি (sea level) হইতে ৫১১৬ ফিট উচ্চ। উটী এখান হইতে ১৫০০ ফিট উচ্চ;– দূরত্ব ১২ মাইল। এখান হইতেই গরম কাপড় পরিয়া উটীর শীতের জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। কুনুরের Pasteur Institute দক্ষিণ-ভারতে জলাতঙ্ক রোগের একমাত্র চিকিৎসাগার। লর্ড কার্জ্জনের আমলে একজন আমেরিকান ধনকুবেরের অর্থ-সাহায্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহরটি বেশ স্বাস্থ্যকর—অথচ অতিরিক্ত ঠাণ্ডা নহে—যেমন দার্জ্জিলিঙের

পথে কর্সিয়ং। যাঁহারা অত্যধিক শীত সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহারা স্বাস্থ্যলাভের জন্য উটীর পরিবর্ত্তে কুনুরে আসিয়া থাকেন। কুনুরে চারি দিকেই বাসভবন-সংলগ্ন সুন্দর-সুন্দর বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। Sim's Park নামক উদ্যানটি প্রধান দর্শনীয় স্থান।

উটী ও কুনুর ব্যতীত, নীলগিরি পর্ব্বতে ইয়োরোপীয়দিগের আর একটী শৈল-নিবাস আছে,—উহা "কোটাগিরি,"—কুনুর হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ১২ মাইল দূরে। এই স্থানটি কুনুর অপেক্ষাও স্বাস্থ্যকর—৬৫০০ ফিট উচ্চ; কিন্তু রেলওয়ে না থাকায়, সাধারণের অধিগম্য নহে। মেটুপলিয়াম হইতে কুনুর পর্য্যন্ত রেলওয়ে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে খোলা হইয়াছিল; আরও কয়েক বৎসর পরে উহা উটী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রেলওয়ে কুনুর সহরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক কলনাদিনী নির্ঝরিণীর ধার দিয়া উত্তরাভিমুখে গিয়াছে। কুনুরের সংলগ্ন ওয়েলিংটন ষ্টেশনে ব্রিটিশ সৈন্যাবাস। ইহার ৩ মাইল দূরবর্ত্তী আরাভানকাড় উপত্যকায় গবর্ণমেণ্টের কর্ডাইট্ ফ্যাক্টরী। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই বৃহৎ কারখানা খোলা হইয়াছে। রেলগাড়ী হইতে, নিম্নদেশে বহু বিস্তৃত কারখানা ও পাহাড়ের উপর কর্ম্মচারিগণের বাসগৃহসমূহ একটী সুন্দর নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

আরও ৭০০ ফিট উচ্চে কেটি ষ্টেশন; পর্ব্বতের ক্রোড়ে প্রবাসী বৃটিশ সৈনিকদিগের পরিবারবর্গের আশ্রম। ইহার পরের দুইটি ষ্টেশন—লভ্-ডেল্ (Lovedale) ও ফার্ণহিল্ (Fernhill) উটী সহরেরই উপকণ্ঠ। ফার্ণ-হিল্ হইতে একটী সুড়ঙ্গ (tunnel) অতিক্রম করিয়া, উটী-হ্রদের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া, বেলা পৌনে চারিটার সময় ট্রেন ষ্টেশনে প্রবেশ করিল। তখন বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করিয়া, আমার গন্তব্য স্থান stone house hillএ উপনীত হইলাম।

উটী পর্ব্বতপ্রাচীরে ঘেরা একটী অধিত্যকা,- কেবলমাত্র পশ্চিম দিকই অবারিত,—ঐ দিকে হ্রদ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে উটী-হ্রদের উচ্চতা ৭২২৮ ফিট। উটী সহরের সীমানার মধ্যে কয়েকটি পাহাড় আছে,—সরকারী আফিস-আদালত এই সকল পাহাড়ের উপর স্থাপিত। ষ্টেশন হইতে বাজার ও ঘোড়দৌড়ের মাঠের মধ্য দিয়া একটী প্রশস্ত ও প্রায় সমতল রাজপথ (Commercial Road) পূর্ব্বদিকে "চেরিংক্রস্" নামক চৌমাথায় আসিয়াছে। এখান হইতে একটী পথ ডা'ন দিকে কুনুর, এবং অন্য একটী বাম দিকে গবর্ণমেণ্ট হাউস্ অভিমুখে গিয়াছে। সম্মুখে "ষ্টোনহাউস্" পাহাড়।

নীলগিরি পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতাবলীর মিলন-ভূমি। পূর্ব্বে ইহা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে, টিপু সুলতানের পতনের পর, এই পাহাড় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন হয়। কিন্তু ১৮১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন ইংরাজ নীলগিরি-শিখরে পদার্পণ করেন নাই। উতকামন্দে ইয়োরোপীয়দিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের কল্পনা শত বর্ষ পূর্ব্বে কইম্বাটুর জিলার তদানীন্তন কলেক্টার জন সলিভান সাহেবের মনে উদয় হয়; এবং তিনি গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিস্তর লেখালেখি করিয়া, তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সূত্রপাত করেন। উতকামন্দের জলবায়ু যে ইয়োরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সলিভান নিজেই এখানে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করেন। পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া উহার নাম হয়—Stone house "পাথরের কুঠী।" ইহাই উতকামন্দ সহরের সর্ব্বপ্রথম বাড়ী। এই গৃহটি এখনও বর্ত্তমান আছে। উহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি। এই বাড়ীর নাম হইতেই পাহাড়টির নাম হইয়াছে "ষ্টোন্‌হাউস হিল্।"

উটীতে স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপিত হইলে, নীলগিরির ইংলণ্ড-সুলভ শৈত্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে ইয়োরোপীয়গণ সহজেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহীশূর রাজ্য-শাসন-সংক্রান্ত নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যে আসিয়া কিছুদিন উটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। মাসিক ১০০০ টাকা ভাড়া দিয়া যে গৃহে তিনি বাস করিয়াছিলেন, উহাই পরবর্ত্তীকালে উটীর ইয়োরোপীয় "ক্লাব"-ভবনে পরিণত হইয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি চিকিৎসকগণের পরামর্শে স্বাস্থ্যলাভের জন্য কলিকাতা হইতে নীলগিরি পর্ব্বতে আসিয়া, উটী, কুনুর ও কোটাগিরি—তিনটি স্থানেই কয়েক মাস করিয়া বাস করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণর গ্রীষ্মকাল উটীতে যাপন করিতে আরম্ভ করায়, ক্রমশঃ উটী মান্দ্রাজ প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী হইয়া উঠিল। তখন শাসন-সৌকর্য্যের জন্য মালাবার ও কইম্বাটুর এই দুইটি জিলার এলাকা খর্ব্ব করিয়া নীলগিরিকে একটী

স্বতন্ত্র জিলা করা হইল। বর্ত্তমান নীলগিরি জিলার উত্তরে মহীশূর রাজ্য, পশ্চিমে মালাবার, এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে কইম্বাটুর জিলা। ইহার বিস্তৃতি পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪০ ও উত্তর দক্ষিণে ২০ মাইল। উটীর সোজাসুজি ৬০ মাইল পূর্ব্বে আরব সমুদ্র।

ষ্টোন্‌হাউস হিলের সর্ব্বোচ্চ স্থানে সরকারী দপ্তরখানা—সেক্রেটারিয়াট। বৎসরের অনেক সময় এখান হইতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হয়। পাহাড়ের পার্শ্বদেশে সরকারী ছাপাখানা ও কর্ম্মচারিগণের বাস গৃহ। ইহার উত্তরে "বোটানিক গার্ডেন"—এবং এই উদ্যানসংলগ্ন পাহাড়ে লাট সাহেবের প্রাসাদ—"গবর্ণমেণ্ট হাউস।" ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য আরব্ধ হয়। ইহাতে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

এখানকার গবর্ণমেণ্ট (বোটানিক) গার্ডেন প্রকৃতি ও মানবের সহযোগিতায় অতি বিচিত্র শোভাসম্পন্ন হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার একদিকে সমতল উপত্যকা—অন্য দিকে উচ্চ পর্ব্বত-শিখর। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সবজী-বাগান রূপে ইহার গোড়াপত্তন হয়। পৃথিবীর নানা শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাণ্ড্‌ষ্ট্যাণ্ড, "ফার্ণ হাউস", "গ্রীন হাউস" ব্যতীত, স্থানে-স্থানে লতাকুঞ্জ ও উদ্যান মধ্যে সুরম্য জলাশয়, পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া ঝরণার জল আসিয়া নামিতেছে। আমি উটীতে পৌছিবার দুই-তিন দিন পরেই এই বাগানে নীল গিরির বার্ষিক পুষ্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল। স্বয়ং লাটসাহেব উহার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে, এই দিন অপরাহ্ণে বৃষ্টির উৎপাত ছিল না। উটী-প্রবাসী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উৎসব-বেশে সজ্জিতা মহিলাবৃন্দের সমাগমে এই ফুলের মেলা যে গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। অনেক প্রকার বিলাতী ফুল, ফল ও তরি তরকারী এই প্রদর্শনীতে আনীত হইয়াছিল। প্রায় সকল জাতীয় বিলাতী ফলই নীলগিরির কোন-না-কোন অঞ্চলে উৎপন্ন হইতেছে।

সপ্তাহে একদিন—মঙ্গলবার—উটীতে "শাণ্ডী" অর্থাৎ হাট বসে। নীলগিরিজাত বিবিধ ফলমূল ও শাকসব্‌জী এই হাটে আমদানী হয়। উটীতে আসিয়া অন্ততঃ একবার "শাণ্ডী" দেখা উচিত। মেম সাহেবদিগের তো কথাই নাই, অনেক পদস্থ ভদ্রলোকেও নিজে দেখিয়া পছন্দমত তরিতরকারী কিনিবার জন্য প্রতি সপ্তাহে এই হাটে আসিয়া থাকেন।

উটী সহরের সর্ব্বত্র এত ইউক্যালিপ্টাস্ গাছ দেখা যায় যে, ইহাকে ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের দেশ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশীয় সাধারণ লোকে ইহাকে "কর্পূর গাছ" এবং সাহেবেরা Blue gum বলিয়া থাকেন। যদি কোন আগন্তুক উটী দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, অগণ্য 'ব্লু গাম' বৃক্ষশ্রেণীর নীলিমা লক্ষ্য করিয়াই পর্ব্বতের নাম রাখা হইয়াছে "নীলগিরি," তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নীলগিরির সঙ্গে এই গাছের সম্বন্ধ খুব বেশীদিনের নহে। ইহার আদি জন্মভূমি অষ্ট্রেলিয়া। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে উটী পাহাড়ে এই বৃক্ষ রোপণ আরম্ভ করা হয়। ইহাদের বংশবৃদ্ধি অসাধারণ। সরকারী বন বিভাগ কর্তৃক প্রতি ১০ বৎসর অন্তর গাছগুলি কাটিয়া ফেলা হয়,—কিন্তু উহারা আবার দ্রুত বাড়িয়া উঠে। এই বৃক্ষের জন্য উটীতে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব নাই; এমন কি, রেলগাড়ীর এঞ্জিন চালাইবার জন্যও কয়লার আবশ্যক হয় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে এই জাতীয় আরও দুই একটি গাছ নীলগিরিতে আমদানি করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের বংশ এরূপভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের পাতা হইতে "ইউক্যালিপ্টাস্ তৈল" প্রস্তুত হয়। ঔষধ হিসাবে মান্দ্রাজ অঞ্চলে এই তৈলের খুব আদর। অনেকের এইরূপ বিশ্বাস যে, ইউক্যালিপ্টাস্ বনের নিকটবর্ত্তী স্থানেও ম্যালেরিয়া থাকিতে পারে না। নীলগিরি-শিখর এই বৃক্ষে ছাইয়া গেলেও, কুন্নুরের নিম্নে ইহা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

উটী সহরের আশে-পাশে, পাহাড়ের ঢালু গাত্রে কয়েকটি চা বাগান দেখিতে পাইলাম। কিন্তু সহরের মধ্যে যেখানে ফাঁকা জমি, সেইখানেই আলুর চাষ করা হইয়াছে। বন্য ফুলগাছের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য অতসী ও ধুতুরা দেখা গেল।

উটী হ্রদের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই বিস্তীর্ণ সরোবর উটীর রমণীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু এটি প্রাকৃতিক হ্রদ নহে, দুই পাহাড়ের মধ্যে বাঁধ বাঁধিয়া উহার একদিকের নিম্নভূমিকে জলাশয়ে পরিণত করা হইয়াছে।

ইহাও উটীর আবিষ্কর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা সলিভান সাহেবের চেষ্টার ফল। হ্রদ প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইবার সুন্দর পথ আছে,—উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ মাইল। এই জলাভূমির পূর্ব্বদিক ক্রমশঃ ভরাট করিয়া ঘোড়দৌড়ের মাঠ প্রস্তুত হইয়াছে। নারীকে সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া হ্রদ-প্রান্তর-উদ্যান-শোভিতা উটীকে বলা চলে—

শুধু প্রকৃতির সৃষ্টি নহ, হে নগরী,
মানুষ গড়েছে তোমা সৌন্দর্য্য আহরি'
আপন কল্পনা হ'তে।—

উচ্চতায় উটী ও শিমলা পাহাড় সমান। দার্জ্জিলিং উটীর চেয়ে প্রায় ১৫০ ফিট উচ্চতর এবং বেশী ঠাণ্ডা। উটী যে সাহেবদিগের এত প্রিয়, তাহার কারণ, ইহা উচ্চ পর্ব্বতের ঢালু পার্শ্বদেশমাত্র নহে। এখানে "গল্‌ফ্‌" "পোলো" প্রভৃতি খেলিবার ও ঘোড়দৌড় করিবার ময়দান আছে, অশ্বারোহণে শিকার করিবার, এমন কি, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিবার সুবিধা আছে; এবং পর্ব্বত-সানু হইলেও এখানকার পথে মোটর গাড়ী চলিবার বাধা নাই। বাস করিবার পক্ষে এত সুখ সুবিধা অন্য পাহাড়ে নাই। কিন্তু দার্জ্জিলিঙের লঘু মেঘের চঞ্চল লীলা এবং চিরতুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী গিরি-শৃঙ্গের বিরাট সৌন্দর্য্য নীলগিরিতে দেখিতে চাহিলে অবশ্যই নিরাশ হইতে হইবে। সেই দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয়ের সঙ্গে অন্য পর্ব্বতের তুলনা চলে না। "কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?"—দেখিলেই মনে হয়।

"পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ রবি, তুচ্ছ সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে!"

উটী "শৈল-নগরী-কুল রাণী" বলিয়াই বোধ হয় যত রাজা-মহারাজা ইহার এত অনুরক্ত। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রায় সমস্ত বড় জমিদারই এখানে বাড়ী করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষের তিনজন প্রধান নৃপতির গ্রীষ্মাবাস উটীতে আছে। এই তিনটি রাজ-ভবনই উটীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে "ফার্ণহিল" পাহাড়ে অবস্থিত। নিজামের গৃহ বহু দিন যাবৎ "পোড়ো বাড়ী" হইয়া রহিয়াছে;—কারণ, বর্ত্তমান নিজাম এযাবৎ একবারও উটীতে আসেন নাই। কিন্তু মহীশূরাধিপতির এবং বরদারাজ গায়কোবাড়ের প্রাসাদ দুইটী দেখিবার উপযুক্ত। মহীশূর-প্রাসাদ ফার্ণ হিল ষ্টেসনের প্রায় সংলগ্ন; উহার নাম "ফার্ণ হিল।" এটি যথার্থই রাজপুরী—সুবিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান মধ্যে মহারাজা ও মহারাণীর স্বতন্ত্র অট্টালিকা। রাজপুরী বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। নিকটে "ভবানী-প্রাসাদ" নামে আর একটী গৃহ আছে—ইহা মহারাজার অতিথি-ভবন। আমরা যখন ফার্ণ-হিল দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন যোধপুরের মহারাজা এই প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। শুনিলাম, সেবার কবিবর রবীন্দ্রনাথ উটীতে আসিয়া এই গৃহে বাস করিয়াছিলেন।

গায়কোবাড়ের নিকেতনের নাম Woodstock—দেখিতে অনেকটা বাগান বাড়ীর মত। গৃহটি একতল, ইয়োরোপীয় ধরণে পারিপাটীরূপে সজ্জিত। একদিকে মহারাজা ও অন্য দিকে মহারাণীর বাসের জন্য কক্ষ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তাঁহারা কিন্তু প্রতি বৎসর উটীতে আসেন না। তত্ত্বাবধারকের অনুমতি লইয়া আমরা গৃহের ভিতরে যাইয়া বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের সাজ সজ্জা দেখিলাম। এই প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান আয়তনে খুব বড় না হইলেও দেখিতে অতি মনোহর।

ফার্ণহিল হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে "লভ্‌ডেল্"। এখানে ব্রিটিস সৈনিকদিগের সন্তানদের জন্য Lawrence Asylum নামক আশ্রম। বহুদূর হইতে উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে আশ্রমের গির্জ্জা দৃষ্টিগোচর হয়। এই আশ্রমে বালক ও বালিকাদিগের স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। লেখাপড়া ব্যতীত, ছাত্রদিগকে জীবিকা উপার্জ্জনের উপযোগী নানা শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

"ষ্টোনহাউস্ হিলের" ৩ মাইল পূর্ব্বে ডোড্ডা-বেট্টা। বস্তুতঃ "ষ্টোনহাউস" পাহাড় ডোড্ডা বেট্টা পর্ব্বতেরই একটী শাখা।

হিমালয়ের দক্ষিণে, একমাত্র ত্রিবাঙ্কুরের পর্ব্বতমালার আনিমুদী নামক শৃঙ্গ ব্যতীত, ডোড্ডা-বেট্টার ন্যায় উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ভারতবর্ষে আর নাই। 'ডোড্ডা-বেট্টা' নামের অর্থ "বড় পাহাড়।"

ইহার উচ্চতা ৮৭৬০ ফিট। উটীতে আসিলে প্রায় সকলেই এই পাহাড়ে বেড়াইতে যান। সুতরাং, একদিন প্রাতে আমরা কয়জনে মিলিয়া ডোড্ডা-বেট্টা যাত্রা করিলাম।

পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতে যে কষ্ট হয় নাই, ইহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই শিখর হইতে নীলগিরি পর্ব্বতমালার যে বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইলাম, তাহাতে সকল শ্রম সার্থক মনে হইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গিরিশিখরে একটী Meteorological Observatory (আবহ-পরীক্ষা-মন্দির) স্থাপিত হইয়াছিল; উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শূন্য গৃহটি এখনও বর্ত্তমান আছে। গৃহটি একতলা খোলা ছাতের উপরে একটী মঞ্চ, সিঁড়ি দিয়া ছাতে উঠিয়া খানিকক্ষণ বসিবামাত্র শীতল বাতাসে সকল ক্লান্তি দূর হইল। এই মঞ্চে উঠিয়া একবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। ইহার পূর্ব্বে ওয়েলিংটন, কুনুর, কোটাগিরি, পশ্চিমে উটী, দক্ষিণে কেটী উপত্যকা ও উত্তরে মহীশূরের মালভূমি। কিন্তু আমরা উত্তরে চাহিয়া কেবল পুঞ্জ-পুঞ্জ শুভ্র মেঘের অনন্ত সমুদ্র দেখিলাম—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

উটী-প্রবাসী সৌখীন ব্যক্তিরা মাঝে-মাঝে দল বাঁধিয়া বন-ভোজনের জন্য ডোড্ডা বেট্টা শিখরে আগমন করেন। আমার সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন উৎসাহী যুবক ছিলেন। ডোড্ডা বেট্টা শিখরে বসিয়া চা পান করিবেন বলিয়া, তাঁহারা চায়ের সরঞ্জাম বহিয়া আনিয়াছিলেন। নিকটে লোকালয় নাই। শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালা হইল এবং কিছুক্ষণ পরে চা তৈরি হইল। চা-পানরূপ 'অনুকল্প' দ্বারা বন-ভোজনের সাধ পূর্ণ করিয়া ডোড্ডা বেট্টা হইতে ফিরিবার পথে আমরা "টাইগার হিল" পাহাড়ে নামিলাম। এই পাহাড়ে গবর্ণমেণ্টের রক্ষিত বনে সিঙ্কোনা গাছের আবাদ হয়। কুইনাইন প্রস্তুত করিবার জন্য এই বৃক্ষের চারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকা হইতে প্রথমে উটীতে আনীত হইয়াছিল। সিঙ্কোনা বৃক্ষের ছাল হইতে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার জন্য উটী হইতে ২০ মাইল দূরে "নাড়ুবাট্টম্" নামক স্থানে গবর্ণমেণ্টের একটী কারখানা আছে। আমাদের দলের একজন সিঙ্কোনা গাছের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া লইলেন,—ইহার পাতা সিদ্ধ করিয়া লইলেই না কি জ্বরের ঔষধ প্রস্তুত হইবে।

নীলগিরির প্রাচীন অধিবাসী টোডা-জাতি ও তাহাদের রীতি-নীতির বিবরণ একাধিকবার বাঙ্গালা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের বসতি অর্থাৎ একস্থানে চারি-পাঁচখানি কুটীরের সমষ্টি, "মান্দ্" নামে পরিচিত। 'উতকামন্দ' নামটির মধ্যে এই "মান্দ" শব্দটি আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে;—যদিও কেহ-কেহ সংস্কৃত 'উদক-মণ্ডল' হইতে "উতকামন্দ" নামের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে টোডা জাতিই উটী পাহাড়ের মালিক ছিল। উটী মিউনিসিপালিটীর এলাকার মধ্যে এখনও দুইটি "মান্দ্" আছে। বোটানিক গার্ডেনের উপরে পর্ব্বত-শীর্ষে টোডাদের "মান্দ্" দেখিতে একদিন যাওয়া গেল। ইহাদের কুটীর দেখিতে ঠিক নৌকার ছইয়ের মত। সম্মুখে একটীমাত্র দ্বার—এত সংকীর্ণ যে, হামাগুড়ি না দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা অসাধ্য। আলো এবং বাতাসের জন্যও অন্য পথ নাই। একটী কুটীরে সমস্ত পরিবার একত্র বাস্ করে, রন্ধনও উহার মধ্যে করিয়া থাকে।

নৃতত্ত্ব-বিশারদগণ টোডা-জাতি সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করিয়াছেন; কারণ, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও, চেহারা, পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে অন্য কোন পার্ব্বত্য জাতির সহিত ইহাদের সাদৃশ্য নাই। ইহারা দীর্ঘাকার, মস্তক ও লম্বা ছাঁদের, নাসিকা রোমানদিগের ন্যায় সুগঠিত। পুরুষেরা দীর্ঘকেশ ও শ্মশ্রু রাখে; এবং কোথাও যাইতে হইলে, শরীর আবৃত করিবার জন্য একখানি চাদর ব্যবহার করে। ইহারা সাধারণতঃ নির্ভীক, কিন্তু অলস-প্রকৃতি। জীবিকার জন্য মহিষ পালন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার কার্য্য করে না। ইহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় মহিষবধ আবশ্যক। এই জাতির মধ্যে বহু-পত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত। এক ভাই যে বালিকাকে বিবাহ করিয়া আনে, পঞ্চ-পাণ্ডবের ন্যায় সকল ভাই তুল্যরূপে তাহার স্বামী। এক সময়ে টোডাদের মধ্যে বালিকা-শিশু হত্যা করিবার প্রথা ছিল; এখনও পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে, টোডা-জাতির লোক-সংখ্যা মোট ৭৪৮। পুরুষ ৪২৬ ও স্ত্রী ৩২২। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে এই অদ্ভুত বিবাহ-প্রথা শীঘ্র লোপ পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

টোডা-পত্নীর পতির সংখ্যা যতই হউক না কেন, উহাদের একজন মাত্র সন্তানের পিতা বলিয়া পরিগণিত। আর্য্য-সমাজের সীমন্তিনীর 'সীমন্তোন্নয়ন' সংস্কারের ন্যায়, সন্তান-সম্ভাবিতা টোডা-নারীর সপ্তম মাসে "ধনুঃ স্পর্শ"
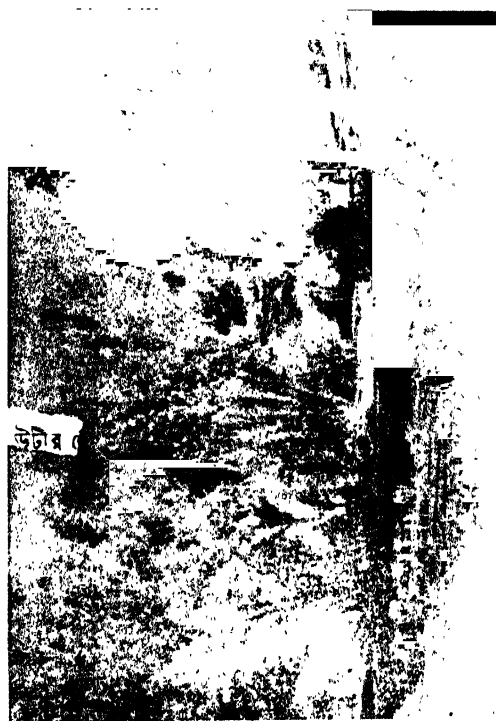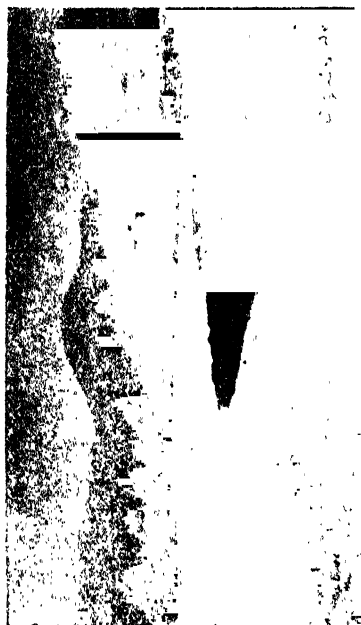
কুনুর বাজার

কুনুর উদ্যান

নীলগিরি রেলপথ

নীলগিরি রেলপথ—অপর দৃশ্য

উতকামন্দ হ্রদ

টোডা কুটীর

উতকামন্দ—গবর্ণমেন্ট উদ্যানে প্রকৃতির লীলা ও মানুষের হাতের শিল্প

সিমস পার্ক

হ্রদ-পার্শ্বস্থ রেলপথ

(হ্রদের ধার দিয়া ট্রেণ উতকামন্দে প্রবেশ করিতেছে)

ডোড্ডা বেট্টা গিরিশিখর

"চেরিং ক্রস"

["মাউণ্ট প্লেজ্যাণ্ট" পাহাড়ের পূর্ব্ব-সীমানার চৌরাস্তা। পাহাড়ের শিখরে মান্দ্রাজের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্‌সের আপিস দেখা যাইতে

বোটানিক গার্ডেনের একাংশ

নামক একটা অনুষ্ঠান আছে। ভাবী সন্তানের পিতা কে গণ্য হইবে, তাহা এই সময়ে স্থির হইয়া যায়। অমাবস্যার দিনে গর্ভিণী আত্মীয় স্বজন-এবং একজন পতি সহ "মান্দের" নিকটবর্ত্তী কোন বনে গমন করে। সেইখানে পতি একটী পাহাড়ী গাছের গুঁড়িতে ত্রিকোণাকৃতি কোটর খুদিয়া সেই কুলঙ্গিতে একটী জ্বলন্ত প্রদীপ রাখিয়া দেয়। পত্নী বৃক্ষতলে ঐ প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া থাকে। অতঃপর পতি গুরুজনের অনুমতি লইয়া, 'তীর ধনু' সংগ্রহ করিতে যায়; এবং বন হইতে এক প্রকার গুল্মের ডাল দ্বারা 'ধনু' ও কুশজাতীয় তৃণ দ্বারা 'তীর' নির্ম্মাণ করিয়া ফিরিয়া আসে। পত্নী মন্ত্রোচ্চারণের ন্যায় তিনবার জিজ্ঞাসা করে, "এটি কাহার ধনু?" পতি নির্দ্দিষ্ট উত্তর দিয়া, ঐ নকল ধনুর্ব্বাণ পত্নীর হস্তে প্রদান করে এবং পত্নী উহা মস্তকে ও ললাটে স্পর্শ করাইয়া বৃক্ষমূলে রাখিয়া দেয়। অতঃপর পতিবর্গের মধ্যে এই পুরুষই সামাজিক হিসাবে গর্ভস্থ সন্তানের পিতা। ভবিষ্যতে এই নারীর গর্ভে যত সন্তান হইবে, এই ব্যক্তি তাহাদেরও পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইবে। অন্য কোন পতি কর্ত্তৃক এই অনুষ্ঠান দ্বিতীয়বার সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত, ধনুর্ব্বাণ-দাতার মৃত্যুর পরেও পত্নীর ভাবী সন্তানের পিতৃত্ব তাহারই বজায় থাকে। 'সপতি'গণ সহোদর হইলে, সচরাচর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পত্নীকে ধনুর্ব্বাণ অর্পণ করে; অন্যথায় উহাদের মধ্যে একজনকে এজন্য নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়।

টোডা স্ত্রীলোক

"ইউক্যালিপ্টাস" বৃক্ষের শ্রেণী

প্রত্যেক টোডা-নারীর পক্ষেই "ধনুঃস্পর্শ" সংস্কার একান্ত আবশ্যক। যে টোডা-গৃহিণীর জীবিত অবস্থায় ধনুঃশর গ্রহণের সৌভাগ্য হয় নাই, তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে একজন পতি শবদেহের হস্তে ঐরূপ ধনুর্ব্বাণ স্থাপন করিয়া এই আচার পালন করে। অবিবাহিতা বালিকার মৃত্যু হইলে, একজন বালক-শিশু দ্বারা এই ক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরম নিষ্ঠাবান নাম্বুতিরি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও ইহার অনুরূপ একটী প্রথা আছে। দ্রাবিড়দেশে সকল জাতির মধ্যেই কন্যার গলায় 'তালি' নামক একখানি ক্ষুদ্র আভরণ বাঁধিয়া দেওয়া বিবাহ-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমাদের দেশের শাঁখা-সিঁদুরের ন্যায় এই "তালি" স্বামীর সাধব্যের নিদর্শন। বর অভাবে যে নাম্বুতিরি কুমারীকে চিরকাল অবিবাহিতা

থাকিতে হয়। মৃত্যুর পরে কোন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাহার গলায় "তালি" বাঁধিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত শবদেহের সংকার হইতে পারে না।

টোডা ভিন্ন নীলগিরিতে আরও দুইটি পার্ব্বত্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়; (১) 'বাদাগা'—ইহারা কৃষিজীবী, এবং (২) 'কোটা'—শ্রমশিল্পজীবী। কিন্তু আমি নৃতত্ত্ববিদ্ নহি; সুতরাং অনধিকার-চর্চ্চার মাত্রা আর বাড়াইতে চাহি না।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থান হইতে হঠাৎ উচ্চ পর্ব্বত-শিখরে আসিলে, প্রথম কয়েকদিন সাবধানে থাকা আবশ্যক। উটীতে পদার্পণ মাত্রই আমি সর্দ্দির আক্রমণ এড়াইতে পারি এখানে থাকিতে পারে না। অনেকে এই জন্য বাধ্য হইয়া উক্ত সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সমিতি-গৃহেও বেশী লোকের স্থান হইতে পারে না। দার্জ্জিলিঙের জুবিলী স্যানিটারিয়ামের মত একটী স্বাস্থ্য-নিকেতন এখানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মস্ত একটা অসুবিধা দূর হয়। তবে, নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় যাঁহারা উটী আসিতে চাহেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, হৃদ্‌রোগ অথবা শ্বাসযন্ত্র সম্বন্ধীয় রোগে, উটীর বায়ু উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করে। যকৃৎ সম্বন্ধীয় রোগেও এখানে কোন উপকার পাওয়া যায় না।

কুনুর - পাশ্চর ইনষ্টিটিউট

উটকামন্দ - লাট প্রাসাদ

নাই। সেই জন্য দুই-তিন দিন আমাকে গৃহে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তখন মনে হইত, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল; পাহাড়ের এই প্রবল শীতের চেয়ে সমুদ্র-তীরের গ্রীষ্মই ভাল ছিল। ক্রমশঃ যখন উটীর আবহাওয়া বেশ সহ্য হইয়া আসিল, তখন মান্দ্রাজে ফিরিবার দিন আর ঠেকাইয়া রাখা চলে না। অগত্যা, স্বর্গ হইতে বিদায়-প্রার্থীর ন্যায় মনে-মনে কহিলাম,—

থাক স্বর্গ হাস্য-মুখে, কর সুধাপান
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদের সুখস্থান,
মোরা পরবাসী—

উটীর শোভা ও সৌন্দর্য্য যতই উপভোগ্য হউক, এখানে আমাদের ন্যায় প্রবাসীর জন্য কোন আশ্রম নাই। এক Lawley Institute আছে; কিন্তু মেম্বার ভিন্ন অপর কেহ

মান্দ্রাজে ফিরিবার সময়ে, উটী হইতে কুনুর পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া, কুনুর হইতে মেট্টুপলিয়াম্ পর্য্যন্ত একজন ইংরেজ সহযাত্রীর মোটর গাড়ীতে আসিবার সুযোগ হইয়াছিল। পর্ব্বতের বক্র পথ ঘুরিয়া মোটর এরূপ বেগে নিম্নে নামিতে লাগিল যে, কিছুক্ষণ পরে মাথা ঘোরা অনুভব করিতে লাগিলাম। বিপদের আশঙ্কাও যে ছিল না, এমন নহে। বায়স্কোপের ছবিতে পাহাড়ের ঢালু পথে মোটরের দ্রুত গতি অনেকবার দেখিয়াছি; এবার নিজেই মোটরে চড়িয়া ৫৬০০ ফিট উচ্চ পাহাড় হইতে অবতরণ করিলাম। কুনুরের নীচে পথের ধারে কফি-বাগান; কফি গাছে এখন ফুল হইয়াছে, কেবল দুই-চারিটি গাছে লালরঙের ফলও দেখা গেল। একস্থানে মোটর হইতে নামিয়া বহু ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে জল-প্রপাতের দৃশ্য দেখিলাম। ক্রমশঃই
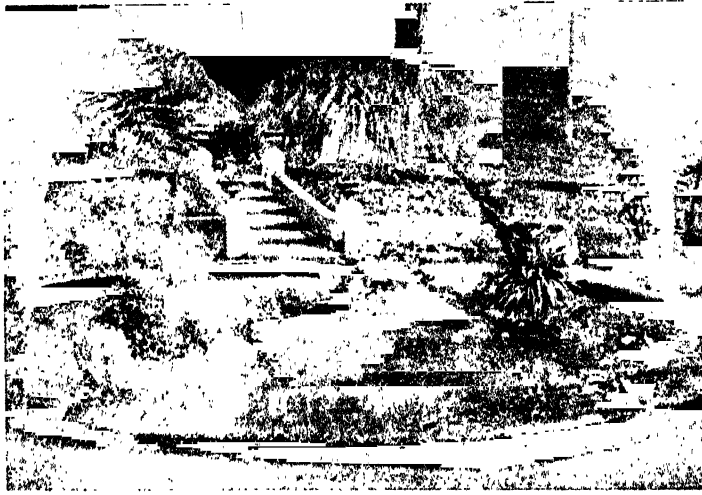
উতকামন্দ—সরকারী উদ্যান

শীতের প্রভাব কমিয়া আসিতেছিল। নীলগিরির নিম্নভাগে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উষ্ণদেশে কৃষিক্ষেত্র। রবারের গাছ ও অন্যান্য বিদেশীয় গাছ ভিন্ন ক্রমশঃ আম কাঁঠাল কলা ইত্যাদি পরিচিত ফলের গাছ দেখিতে পাইলাম। পাহাড়ের পাদমূলে বিস্তৃত সমতল ভূমিতে সুপারি গাছের বাগান। এত সুপারি গাছ এক স্থানে আর কোথাও দেখি নাই। সুপারি বন হইতে সুন্দর একটী গন্ধ বাতাসে মিশিয়া আসিতেছিল। এখান হইতে ২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আমরা মেট্টুপলিয়াম্ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। দেখিলাম, কনুরে যে ট্রেণ ছাড়িয়া আসিয়াছি, উহা আসিবার তখনও ৪২ মিনিট বাকি। আবার সেই গ্রীষ্মের রাজ্য;—উটীর দুঃসহ শীত এখনই নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ইমান্‌দার

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া]

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু ত্রিতল হইতে নামিয়া আসিয়া, দ্বিতলের সিঁড়ির দুয়ারে পা দিয়া, সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সিঁড়িতে বসিয়া, দুই হাঁটুর উপর মুখ গুঁজিয়া, মানদা হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে,—পাশে গঙ্গাজলের ঘট ও রায় মহাশয়ের সেই পত্রখানা মুক্ত বক্ষে পড়িয়া আছে!

জপের আসন হইতে উঠিবার সময়ে যে বিপুল প্রশান্তিতে সুমতি দেবীর মন ভরিয়া গিয়াছিল,—সে প্রশান্তির বুকে ইতিমধ্যেই অনেকগুলি ক্ষত-ব্যথা জমিয়াছিল। মানদার কান্না দেখিয়া সহসা তিনি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না,—শুধু বেদনার্ত্ত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির মত নির্ব্বাক হইয়া গেলেন! সুনীল কিন্তু নিস্তব্ধ থাকিবার পাত্র নয়,—ঝড় বেগে গিয়া, চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া, পড়িতে আরম্ভ করিল,—মানদার অনুমতি গ্রহণের অপেক্ষা রাখিল না।

মানদা রোদন-সিক্ত চক্ষু তুলিয়া, কুণ্ঠা-ভীত স্বরে বলিল, "ছিঁড়ে ফেল মামা……ও পড়ে আর কি করবে বাবা?"

চিঠি পড়িতে পড়িতে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সুনীল বলিল, "করবার

ক্ষমতা কি বাবা? উদ্ধত, অন্যায় অত্যাচারের পায়ে ফুল-চন্দন ঢেলে পূজা না কর্‌লে যাদের জাত যায়, ধর্ম্ম যায়,—আমি তাদেরই একজন! দিদি, সহ্য করতে পারবে আর? পড়ে' শোনাব চিঠিখানা? চিঠির ছত্রে-ছত্রে কি জঘন্য কুৎসা, কত মর্ম্মঘাতী দুর্ব্বাক্য—শুনবে একবার?"

শুষ্ক কণ্ঠে সুমতি দেবী বলিলেন, "শোনাও। আমি সব শোন্‌বার জন্যে তৈরী হয়েই আছি।"

উত্তেজিত হইয়া নিদারুণ শ্লেষের সহিত সুনীল বলিল, "পরাক্রান্ত পূজ্যপাদ ক্ষমতাবানদের যত বড় দুর্ব্ব্যবহারই হোক্‌,—পশুত্বের চরম পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত-নতশিরে, নির্ব্বিবাদে সইতে হবে?"

অতি শান্ত স্বরেই সুমতি দেবী বলিলেন, "হঁ, আমাদের অভিশপ্ত অদৃষ্টের বিধান-ই এই! শুধু নিজের মুখ পানে চেয়ে কেঁদে কি করব সুনীল,—সে কান্নায় অশান্তি আক্ষেপ শুধু বেড়েই উঠে। তাই প্রাণপণ শক্তিতে কান্নাটা চেপে রাখতেই চাই!—তুমি চিঠি পড়,—ওর অর্থ বুঝেছি, তবু ভাল করেই শুনি।"

মানদা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে বলিল, "চারিদিক থেকে এমন করে দগ্ধে মারলে, বাঁচি কেমন করে মাসিমা!"

সুমতি দেবীর মুখে গভীর বেদনায় করুণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। একটু থামিয়া হতাশ, ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "বাঁচা? বড় ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের কথা উচ্চারণ করেছিস্ মা! যারা শুধু চোখ বুজে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলকেই মানে,—চোখ খুলে এজন্মের কর্ম্মবলকে দেখতে চায় না, মানতে চায় না, গ্রাহ্য করতে চায় না,—তাদের ভেতর দাঁড়িয়ে ও-কথার কি উত্তর দেব মা? সোজা এক সনাতন বাক্য আছে—প্রারব্ধ!"

সুনীল দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "কিন্তু আমি বলব—না! পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আড়ষ্ট, জড়বুদ্ধির হাতে মনের রাশ ছেড়ে-দিয়ে—অগাধ আলস্যে অন্যায়ের অত্যাচার সহ্য করবার জন্য গরজে পড়ে প্রারব্ধের দোহাই আমি দেব না।—তুমি সত্যশাস্ত্র যা—সে শাস্ত্র খোল, দেখবে সে শাস্ত্র বলছেন, ওর নাম প্রারব্ধ নয়, ওর নাম জড়তা, মূঢ়তা!"

ব্যথিত হাস্যে সুমতি দেবী বলিলেন, "সে শাস্ত্র খুলে, তোদের লোকাচারের প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে মেলাতে গেলে, এখনি মাথার ওপর যে শতবজ্র গর্জ্জে উঠবে ভাই!"

সুনীল রুক্ষ স্বরে বলিল, "ঐ তো! মরবার ভয়েই তাড়াতাড়ি জীবন্মৃত হয়ে পরিত্রাণ পেয়ে বেঁচেছ! সত্যি কথা বলতে গেলে, এখনি অনেক মর্ম্মান্তিক সত্যিই বেরুবে,—বুক ফেটে! কিন্তু না বলেও থাকতে পারছি নে।—ধার্ম্মিকতার আড়ম্বর দেখাবার জন্যে, এত নিরীহ, এত সহিষ্ণু, এত শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠেছ তোমরা, যে, অসহনীয় অন্যায়, মর্ম্মান্তিক অশান্তি-উৎপীড়নের হাহাকার অকাতরে কাণ পেতে শুনেও, স্বচ্ছন্দে উদাসীন হয়ে রয়েছ! তোমাদের কতকগুলো সনাতন সামাজিক পদ্ধতির অকাট্য সত্য চমৎকারিতা ব্যাখ্যা করতে গেলে, আমারও মাথার ঠিক থাকবে না, তোমারও থাকবে না;—কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার জন্যে এই যে অসহ্য সহিষ্ণুতা, অসীম শান্তি-প্রিয়তা, উৎকট ধর্ম্মজ্ঞান, একে—" সুনীল সহসা থামিল।

সুমতি দেবীর মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। সুনীল মাঝখানে থামিতেই, অকস্মাৎ তিনি তীব্র স্বরে বলিলেন, "দে সুনীল, দে,—পারিস্ তো অকপট প্রাণে, মুক্তকণ্ঠে, আমাদের এই উৎকট ধর্ম্মজ্ঞানকে অভিশাপ দে! আমাদের ঐ যে ধার্ম্মিকতার আড়ম্বর, ওটা অকপট স্বার্থ-পরতার নামান্তরই বটে;—যে অস্বীকার করে করুক, কিন্তু আমি অস্বীকার করব না।—অন্ততঃ আমাকে যে সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করে চলতে হয়েছে, এ পদ্ধতির মধ্যে আর সব লৌকিক বিধান পালনের ব্যবস্থা বেশ স্থূল; কিন্তু স্পষ্ট দেখছি, যথার্থ ন্যায়ধর্ম্ম পালনের ব্যবস্থাটা বড় অতিরিক্ত মাত্রায় সূক্ষ্ম! কাযেই অতি-বুদ্ধিমানরা, নিজেদের সুবিধামত ভাবে সে ধর্ম্মটা পালনের ব্যবস্থায়—'থাকা-না-থাকা সমান' রূপেই ব্যবহার করে যান!—কারুর আপত্তি-বিপত্তি গ্রাহ্য করেন না।"

সুমতি দেবী থামিলেন। ক্ষণেক নীরবে কি ভাবিয়া, শ্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "জ্বালাতন হয়ে উঠেছি সুনীল! অতি শান্তিপ্রিয় হয়ে দাঁড়ান'র ফলে, সংসারে মানুষ ভুল বুঝে, অনেক অশান্তিকে যে কত বেশী বাড়িয়ে তোলে, সেটা ক্রমশঃ খুব কঠোর ভাবেই বুঝতে পারছি। অনেক দিক থেকে অনেক ঘা খেয়ে, আজ আমার ব্যথিত মনের ওপর যে তীব্র সত্যের অভিজ্ঞতা নিষ্ঠুর জ্বালায় জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, তার কাছে মাথা হেঁট করে,—আজ আমার স্বীকার

করতে-ই হচ্ছে,—সংসারে যারা না বুঝে ভুল করে, তাদের ভুলকে যেমন সদয় ক্ষমার সঙ্গে সহৃদয় ভাবে সংশোধন করা দরকার—যারা বুঝে-সুঝেও, শুধু ক্ষমতার জোরে উদ্ধত দম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে—নির্ব্বিচারে অন্যায় অত্যাচার করতে চান, তাঁদের অন্যায় দম্ভকে কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করাও তেমনি দরকার। না হলে সব দিকে সামঞ্জস্য থাকে না।—থাকতে পারে না।"

সুনীল বলিল, "বুঝতে শিখেছ এত দিনের পর?—বাঁচলুম! কিন্তু ওতে কি-ই বা হবে? কোন কায ত তোমাদের দ্বারা হবে না! তা নইলে, এতদিন ধরে' মদন গোপালের বাড়ীতে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, যে সব অধর্ম্ম-অনাচার হয়ে গেছে, সেগুলো চোখের ওপর দেখেও চুপ করে থাক? ঠাকুর্দ্দার পুণ্য কীর্ত্তির পুণ্য দম আটকে মরে যাচ্ছে,—যাক্, পুণ্যের বুকে ছুরী বসিয়ে তবু প্রাণহীন কীর্ত্তিটাকে বজায় রাখতে হবে, তোমাদের প্রিন্সিপল্ হচ্ছে এই ত?—নিষ্কাম ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, নিষ্কর্ম্মা ব্রতটা তোমরা বেশ চমৎকার পালন করছ! তুমি যে কেনই গীতা পড় দিদি—"

বাধা দিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "ওর জন্যে আমারো যথেষ্ট আক্ষেপ আছে। কিন্তু জন্মগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পৃথিবীর সকল বিষয়ে অকর্ম্মণ্য, নির্জ্জীব হয়ে থাকা যাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাদেরও ভৎর্সনা করাই মিছে!—পৃথিবীর কোন ভাল বিষয়ে চেষ্টা-চিন্তার অধিকার কি আমাদের আছে ভাই?"

সুমতি দেবীর চোখে জল আসিতেছিল,—সামলাইয়া লইয়া, তিনি মানদার পাশে বসিলেন। মানদার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন—"এই যে সব অভাগা জীব, এদের ব্রহ্মচারিণীর সাজ পরিয়ে দিয়েই তোমাদের কর্ত্তব্য চুকে যায়,—সে সজ্জার উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষা, উচ্চ জ্ঞানালোচনার কোন সুযোগ এদের দেওয়ার কোন দায়িত্ব তোমরা কেউ রাখ না;—কিন্তু প্রত্যেকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি উদ্যত করে শুধু ছিদ্র খোঁজ,—সাজটার আনুসঙ্গিক বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলা এরা ঠিক নিয়মিত ভাবে পালন করছে কি না। যেন বাইরের সাজসজ্জা, চালচলনটাই যথাসর্ব্বস্ব, আর কোন কিছুতে এদের অধিকার নাই।—কত বড় ভুল! কাশীতে এসেছি—নির্জ্জনে, শান্তির মধ্যে বাস করে, দিনকতক একটু শিক্ষা, সাধনা, চর্চ্চার জন্যে,—এই অপরাধে আমার মাথার ওপর কি তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ হয়েছে বল দেখি! তোমার মাথাও বাদ যায় নি,—কতখানি ঘা খেয়ে, কি রকম বিচলিত হয়ে উঠেছো,—বুঝে দেখো। এই অবস্থায় যাদের বাস,—তারা ব্যবহারিক জগতের কাযে,—বাক্যে-ব্যবহারে কোন শুভ উদ্দেশ্যের সাফল্য-উদ্বোধনের চেষ্টা করলে আর রক্ষা আছে? আমাদের অধিকার-সীমা অতি সঙ্কীর্ণ,—এখানে কোন কল্যাণের সাড়া আসা নিছক্ বিদ্রোহিতা-অপরাধ! এখানে কিসের সাড়া থাকলেই শুধু নির্ব্বিরোধে শান্তি পাওয়া যায় জানিস্—জীবন্মৃত জীবনের নিঃশব্দ ব্যথা-স্পন্দন বহনের জন্য—অসীম ধৈর্য্যশক্তি!"

হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "শ্যামলকে এখনো জল খেতে দেওয়া হয় নি, ভুলেই গেছি। এস শ্যামল, মানু উঠ মা, আজ দ্বাদশী—"

কোঁচার কাপড়ে কপালের ঘাম মুছিতে-মুছিতে সুনীল বলিল, "শ্যামল এসে পড়েছে,—আর ভাবনা নাই,—আমি আজই রওনা হব। ঠাকুরবাড়ীর বন্দোবস্ত শীগ্রীই করতে হবে। মিত্তির মশাই আমায় যাবার জন্যে তাড়া দিয়েছেন, বুঝলে। আর মানু মা, তোমার এই চিঠিখানা আমি নিলুম,—আমার দরকার আছে।"

প্রস্থানোদ্যতা সুমতি দেবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কি দরকার?"

শুষ্ক মুখে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া সুনীল বলিল, "তুমি তোমার মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা নিয়ে পরকালের স্বার্থসাধনে ডুব মেরেছ,—ইহকালের মানুষগুলার স্বার্থ, অনর্থের খোঁজ খবরে তোমার আর দরকার কি? তুমি সবই উপেক্ষা করে চলেছ,—কিন্তু আমার তা করলে চলবে না। তোমার মত কর্ত্তব্য অভিমানের ভয়ে, আমি কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে ছেড়ে দিতে রাজী নই!"

সুমতি দেবী এতক্ষণের পর যেন স্বস্তি পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। স্বভাব-সিদ্ধ স্নিগ্ধ হাস্যে বলিলেন, "শুভ, শুভ! কিন্তু কর্ত্তব্যটা ঠিক বিবেকানুমোদিত হয় যেন! অনর্থ ঘটাবার জন্য চেষ্টা করার নাম কুপৌরুষ—স্বেচ্ছাচার!"

সুনীল উত্তর দিল, "নিশ্চয়! কিন্তু অবশ্য-কর্ত্তব্যকে

সযত্নে পালন করার নামই পৌরুষ,—একথাও তোমার মুখেই শুনেছি। আমার কাকা যখন ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে, তোমাদের মিথ্যা অপবাদ রটনা করাই তাঁর অবশ্য-কর্ত্তব্য ধরে নিয়েছেন, তখন সেটার প্রতিবিধান করবার জন্যে আমার অবশ্য-কর্ত্তব্যও কিছু আছে। সেটাও প্রতিপালন করা চাই।" চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া, হাসিমুখে পুনশ্চ বলিল, "আর বিবেকের কথা বলছ? তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমার ভগবানের রূপ আমি যেন তিল-ছাপা জপের আসনের মধ্যেই শুধু দেখি না, সে রূপ আমি যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখি শুধু আমার বিবেকে, আমার কর্ম্মে, আমার সত্যনিষ্ঠায়, আমার শক্তি সাধনায়—"

গভীর শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সুমতি দেবী বলিলেন, "আঃ সুনীল, আশীর্ব্বাদ করি, তোরা তাই হ'। তোদের সকলের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাই হোক,—দেশের মরণাহত প্রাণকে তোরা বাঁচিয়ে তোল,—ভগবান তোদের আশীর্ব্বাদ করবেন।......আমায় কিন্তু আজ যাবার আগে ভাস্করানন্দ স্বামীর সমাধি-ভবনটি আর একবার দেখিয়ে দিয়ে যাস ভাই,—তুই চলে গেলে আর ত বেরুনো হবে না।" বালিকার মত আবদারের স্বরে শেষ কথাটা বলিয়া হাসিমুখে তিনি চলিয়া গেলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মিত্র মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া সুনীল সেই দিনই তেজপুর রওয়ানা হইল। তেজপুরে পৌছিয়া সুমতি দেবীকে টেলিগ্রামে জানাইল, সে নিরাপদে গিয়া পৌছিয়াছে; কিন্তু তাহার আগমন-সংবাদ পাইয়া রায় মহাশয় ও মোক্ষদা গ্রাম ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছেন।

কয়দিন পরে সুনীলের পত্র আসিল। রায় মহাশয়ের কোন সংবাদ নাই। রায় মহাশয়ের স্ত্রী মহা বিপদে পড়িয়াছেন। একটী পুত্র রোগে মরণাপন্ন। সুনীলের কাছে ক্ষমা চাহিয়া তিনি সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—সুনীল অর্থ-সাহায্য করিয়াছে। রায় মহাশয়ের সন্ধান তাঁহারা কিছুই জানেন না,—তিনি হঠাৎ এক-বস্ত্রে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় এই দুস্থ বিপন্ন জ্ঞাতি-পরিবারকে সাহায্য করা সুনীলের অবশ্য উচিত। সুনীল তাহাদের সঙ্গে কিছুমাত্র অসদ্ব্যবহার করে নাই,—যথাসাধ্য মঙ্গল-চেষ্টাই করিয়া চলিতেছে। তবে রায় মহাশয়কে পাইলে বুঝিয়া লইবে।—সুনীল বিশ্বস্ত সন্ধানে অবগত হইয়াছে, মোহন্তের সাহায্যে মিথ্যা হুজুগের সৃষ্টি করিয়া, রায় মহাশয় মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে সহকারিণী করিয়া, খুব একটা তুমুল কাণ্ড বাধাইবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু গ্রামের অনেকগুলি নির্ব্বোধ তাঁহাদের সে সৎ চেষ্টার মহিমা বুঝিতে পারিয়াছিল। মিত্র ও মণ্ডল খাতিরে পড়িয়া চুপ করিয়া ছিল। ইহার পরই মোহন্ত মহাশয়ের চরিত্রাবহার প্রমাণ হওয়ায়, তিনি সদ্যঃ বিদায় প্রাপ্ত হন।

সুনীল অতিথিশালার ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছে, অতিথি-সেবার সমস্ত আয় সে দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডে দান করিয়া দিয়াছে। রাবণ খুঁজিয়া আনিয়া লঙ্কাকাণ্ডের বিপ্লব বাধান অপেক্ষা এই নিরুপদ্রব ব্যবস্থাই ভাল। দিদি যেন ইহাতে ক্ষুণ্ণ না হন। সুনীল লেখাপড়া শেষ করিয়া আসিয়া যখন গ্রামে বাস করিবে, তখন অতিথিশালার সুব্যবস্থা করিয়া দিবে,—আপাততঃ দেশের দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে সাহায্য দানই ভাল। অতিথি-সেবার ব্যবস্থা উঠাইয়া দিলেও, দেবসেবার ব্যবস্থা সে ঠিক রাখিয়াছে। পূজার জন্য স্বতন্ত্র পূজক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে।

অতিথি-সেবার ব্যবস্থা সমূলে লোপ হওয়ার সংবাদে সুমতি দেবী মনে দারুণ আঘাত পাইলেন। পিতামহের ঐ পুণ্য প্রতিষ্ঠানটি পিসিমার ও পিতার মনের দিক হইতে তিনি চিরদিনই গভীর শ্রদ্ধাবত মমতার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছেন,—সে প্রতিষ্ঠান আজ যে অবস্থান্তরিত হইল, সে কেবল তাঁহাদের অযোগ্যতার দোষে! আজ যদি তিনি সুনীলের জ্যেষ্ঠা সহোদরা না হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতেন, তবে অবহেলায় ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেন; কিম্বা আজ যদি তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ নির্ভর দণ্ড,—সেই প্রেমময় পতি-দেবতা জীবিত থাকিতেন, তবে নিজের কোন অক্ষমতার জন্য কিছুমাত্র আক্ষেপ করিবার কারণও তাঁহার ঘটিত না!—কিন্তু এই যে দারুণ দুর্ব্বিষহ অবস্থা,—শক্তি সত্ত্বেও শক্তির সদ্ব্যবহারের অধিকার-বঞ্চিত, অভিশপ্ত, অকর্ম্মণ্য, পঙ্গু জীবন,—ইহার মধ্যে সচেতন প্রাণ লইয়া বাস করিয়া,—সাধারণ মানুষের মত সুখ, দুঃখ, ন্যায়ান্যায় বিচার বোধ সত্ত্বেও,—শুধু অন্যায়কে

সহ্য করিবার গরজে—পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজনের আহ্বান, সমস্ত অভাব-অনুযোগের আর্ত্তনাদ নিষ্ঠুর উপেক্ষায় ঠেলিয়া সরাইয়া,—শুধু দেশাচারের মুখ চাহিয়া,—শুধু লোকাপবাদের তীব্র নির্য্যাতনে নিষ্পিষ্ট হইয়া,—এই যে অচেতন জড়ের মত জীবন যাপন, ইহা বড় কষ্টকর! কিন্তু উপায় নাই!—সত্য ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া, এই লৌকিক বিধানের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া,—প্রকৃত প্রয়োজনের দিকে এতটুকু হাত বাড়াইবে,—সে সাহস, আর যে দেশের লোকের পক্ষে যত সহজ, যত স্বাভাবিক হউক—এ দেশের লোকের পক্ষে বড় ভয়াবহ অস্বাভাবিক! এখানে বুঝিবার মত প্রাণ হয় ত যথেষ্ট পরিমাণে আছে,—ভাবিবার মত মাথাও হয় ত যথেষ্ট সংখ্যক আছে;—কিন্তু কাজ করিবার মত উৎসাহ-বলিষ্ঠ, একনিষ্ঠ, দৃঢ়ব্রতী হৃদয়—লক্ষে এক মেলা দুষ্কর! সকলেই—সব জানিয়া, সব বুঝিয়া,—নিরীহ নির্ব্বোধ সাজিয়া, নিরাপদ জড়ত্বের উপাসনায় আত্মসমর্পণ করিয়াছে! কি চমৎকার রহস্য!

বেদনার নিশ্বাস ফেলিয়া সুমতি দেবী জপের মালা লইয়া বসিলেন। বিষাদ-ক্ষুব্ধ চিত্তের সমস্ত চিন্তাস্রোত এক কেন্দ্রে সংহত করিয়া, একটা পবিত্র ভাব-সত্তার দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া,—নিজের আত্মার কল্যাণ-কামনার সঙ্গে, জগতের সমস্ত আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া একটু শান্তি পাইলেন।

কয়দিন পরে সুনীলের আবার পত্র আসিল। রায় মহাশয়ের পুত্র ভাল আছে। মোক্ষদা ঠাকুরাণীর কিঞ্চিৎ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি কন্যাসহ যোগিনী সাজিয়া কোন এক যোগীবেশধারী মহাপুরুষের সঙ্গে দূর গ্রামে শিবতলায় যোগ-সাধন করিতে গিয়াছিলেন,—কিন্তু গ্রাম্য গোঁয়ারদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা বেশীদিন আত্ম-গোপন করিয়া টিকিতে পারেন নাই,—প্রহৃত হইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছেন,—কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না।

অতিথিশালায় মোহান্ত মহাশয় যে থিয়েটারের আড্ডা বসাইয়াছিলেন, সে আড্ডা উঠাইতে গিয়া সুনীল কতকগুলা অদ্ভুত সংবাদ পাইয়াছে। থিয়েটারের চাঁই মোহান্ত মহাশয়ের সঙ্গে থিয়েটারের দুইজন মাতব্বর সভ্য, নজরু ও ভুবন গোয়ালা সেই এক রাত্রেই কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে! শুনা যাইতেছে, তাহারা না কি ফৈজুর বিরুদ্ধে অনেক রকম গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লাগিয়াছিল,—এমন কি, ফৈজুকে হত্যা করিবার মন্ত্রণাও তাহাদের মধ্যে চলিত। সঙ্কটপুর হইতে নীলকণ্ঠ বাবু না কি একজন পাকা বদমাইস গুপ্তচর পাঠাইয়াছিলেন। সে না কি ভোজালী প্রভৃতি কয়েকটা মারাত্মক অস্ত্র আনিয়াছিল। থিয়েটারের ছোকরাগুলিকে সে পাঁচশত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়াছিল,—ফৈজুকে খুন করিবার জন্য! তাহারা ভয়ে স্বীকৃত হয় নাই,—শুধু নজরু ও ভুবন স্বীকৃত হইয়াছিল। মণ্ডলের শাসনের তাড়ায় থিয়েটারের ছেলেদের কাছে এখন একে-একে এই সব খবর বাহির হইতেছে। কিন্তু সুনীল এ সব অদ্ভুত গল্প বিশ্বাস করিতে ইচ্ছুক নহে,—ঐ সব কাণ্ড-জ্ঞানহীন মিথ্যাবাদী উল্লুকের কথার কোন মূল্য নাই, উহারা সব বলিতে পারে! শুনা যাইতেছে, নজরু ও ভুবন সঙ্কটপুরে গিয়া লুকাইয়া আছে, কিন্তু প্রমাণাভাব!

পত্র শেষে 'সৎ মা ছাড়া আর সকলকে প্রণাম' জানাইয়া উপসংহারে সুনীল লিখিয়াছে,—

"আর একটা সুখবর দিই। ফৈজুর একটী পুত্র হয়েছে। ছেলেটি বেশ সুন্দর হয়েছে। তারা ভাল আছে।

"ফৈজুকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলুম। কর্ত্তা কদিন ধরে পিঠের ফোড়ার জন্য বিছানায় পড়ে ধুঁকছিলেন,—হঠাৎ লোক-মুখে খবর পান,—ও-তরফের লোকজন এসে, মিথ্যা মাছ-চুরির ওজুহাতে দু'জন জেলের মেয়ে, আর এক বুড়ো জেলেকে ধরে নিয়ে থানায় দিতে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ উঠে একজন নগদীকে সঙ্গে নিয়ে—ছুট্! রাস্তায় আমাদের লোকের সঙ্গে দেখা! কর্ত্তা খবর শুনে, একবার দাঁড়িয়ে শুধু জিজ্ঞাসা করেছেন, "তারা ভাল আছে তো?"—তার পর আর দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ হয় নি,—তাকে বসতে বলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়!

"থানা থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি করে তাদের ছাড়িয়ে আনতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিল। রোগা শরীরে ধুঁকতে-ধুঁকতে আধমরা অবস্থায় কাছাড়ী-বাড়ী পৌঁছে, তার পর ধীরে-সুস্থে খোঁজ-খবর নিয়েছে। ছোটবাবুর ওপর ফৈজুর অগাধ ভালবাসার কথা জান ত? আমি গ্রামে এসেছি শুনে, পরম নিশ্চিন্ত হয়ে সে স্থির-সিদ্ধান্ত করে বসেছে,

তা'হলে আর এক্ষেত্রে অনর্থক কোলাহল করবার জন্ত তার আসার কোন দরকার নাই! সে আসে নি। আমায় কৈফিয়ৎ লিখে পাঠিয়েছে, 'জয়দেবপুরে এখন বড়ই গোলমাল। ও-তরফে একজন ভারী ফন্দীবাজ পাজী কর্ম্মচারী এসেছে,—সে নিরীহ প্রজাদের ওপর বড়ই অত্যাচার করছে। ফৈজু অসুখে পড়ে আছে, খবর পেয়ে, স্বচ্ছন্দে মাছ-চুরির মামলা সাজিয়ে, অনর্থক তিন জনকে শাস্তি দেওয়াবার চেষ্টায় ছিল। ফৈজু এখন যদি একদিনের জন্ত সরে আসে, তা'হলে এখনি আবার সাপ-চুরি, ব্যাং-চুরির মামলা তৈরী হবে, এবং অকারণ নিরপরাধ দুর্ব্বল লোকেরা সাজা পাবে। অতএব ফৈজু আস্‌তে অক্ষম। ছোটবাবু যেন ফৈজুর বাবাকে সব বুঝিয়ে বলে, ফৈজুর দোষটা মাপ করিয়ে দেন। কিন্তু আমি কি বোঝাব বল? আমাদের সর্দ্দার মশাই হচ্ছেন দুর্ব্বাসা ঋষির দ্বিতীয় সংস্করণ! পুত্রের কৈফিয়ৎ শুনে রাগে আগুন হয়ে বল্লেন,—"তুমি লিখে দাও বাচ্চা, সে বাদশা-জাদা সেইখানে দাঙ্গা নিয়ে মেতে থাক,—তাকে আস্‌তে হবে না।"—নিরীহ মধ্যস্থ আমি,—অগত্যা "বাদশা-জাদাকে" তাই রিপোর্ট করলুম্! এদের পিতাপুত্রের মাঝখানে পড়ে, আমি বেশ মজার লোক হয়ে দাঁড়িয়েছি,—নয় দিদি?

"শ্যামলের ইংরেজি পড়ার জন্ত যে মাষ্টার ঠিক করে এসেছি, শ্যামল তার কাছে যেন নিয়মিত পড়ে। তুমি লক্ষ্য রেখো।"

মোক্ষদার সংবাদ শুনিয়া রায়-পিসিমা রাঁধিতে-রাঁধিতে খুন্তি আস্ফালন করিয়া উচ্চকণ্ঠে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ভগমান আছে, ভগমান আছে! এবার নয়ে নচ্ছারে, দশে ধম্মে দেখুক্! সতীলক্ষীদের রূপ নিয়ে, বয়েস নিয়ে, 'কু-আকার' ছড়িয়ে বেড়ানো......ওকি ধম্মের বুকে সয়!"

রাঙা জ্যাঠাইমা তরকারী বনাইতে-বনাইতে বলিলেন, "কথাতেই আছে,—কুকুর যদি বাদ্‌শা হয়, মতি দোলে কাণে,—তবুও সে তাকিয়ে-তাকিয়ে চায় ছেঁড়া জুতোর পানে!"

সুমতি দেবী কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে, নতশিরে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। পিছনে মোক্ষদার চরিত্র-সমালোচনা-স্রোত অবাধে চলিতে লাগিল।

কয়দিন পরে সুনীলের আর একখানা পত্র আসিল। অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে সে লিখিতেছে, "দিদি, মস্ত সুসংবাদ! ফেরারী আসামী হরিহর এতদিনের পর ফৈজুর হাতে ধরা পড়েছে। পরশু রাত্রে জনকতক লাঠিয়াল নিয়ে জয়দেবপুরে আমাদের কাছারী-বাড়ী লুঠ করতে এসেছিল—উভয় পক্ষে খুব লাঠালাঠি হয়ে গেছে। উভয় পক্ষের তিন-চারজন লোক আহত হয়েছে। ফৈজুও পিঠের দিকে আহত হয়েছে। ফৈজুর নগদী হক সর্দ্দার মৃতবৎ হয়েছে। আমি মিত্তির মশাইকে নিয়ে এখনি জয়দেবপুর চল্লুম।"

শ্যামল বিকালে জল খাইতে বসিয়া যখন 'মামু দিদিমণি'র কাছে জয়দেবপুরের সংবাদ পাইল,—তখন সে আহ্লাদে প্রথমটা নাচিয়া উঠিল; কিন্তু পরক্ষণেই দারুণ দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল! হায়, এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে সে কি না ফৈজু মামুর সঙ্গী থাকিতে পাইল না! আসল কাণ্ডগুলাতেই সে ফাঁক পড়িয়া যাইতেছে! আর হরি-হরেরই বা আক্কেল কি? শ্যামল এতদিন সেখানে রহিল—তখন ডাকাতি করিল না—আর যেমন সে সরিয়া আসিয়াছে অমনিই......।

সুমতি দেবী উপর হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্যামল কাঁদিয়া-কাটিয়া, মুখখানা হাঁড়ি করিয়া, গুম্ হইয়া বসিয়া আছে। কারণ কি জিজ্ঞাসা করিতেই, শ্যামল সুগভীর আক্ষেপের উচ্ছ্বাসে সশব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া, ক্ষুব্ধ করুণ কণ্ঠে বলিল, "আহা মা, আপনার যদি আর একটা ছেলে থাকত মা,—তা'হলে মা—তার জিম্মায় আপনাদের রেখে আমি আজই জয়দেবপুর চলে যেতুম মা!"

পুত্রের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্রাখর্য্যে প্রীত হইয়া মা শুধু একটু হাসিলেন!

রাখী-বন্ধন

[শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বি-এ]

চিতোরের রাণা বিক্রমজিৎ যুবা, গর্ব্বিত মদে,
অতি উদ্ধত, রূঢ়, কর্কশ—নীতিরে দলেছে পদে।
সর্দ্দার ছাড়ি রাণার প্রসাদ পাইক সকলে পায় ;
বিরূপ প্রজারা,—সর্দ্দারগণ বলে এ কি হ'ল হায়!
তোরণ-সমুখে দস্যু আসিয়া পশু লুটে লয় বলে ;
ডাকিলে, কোটাল, উপহসি বলে, "পাঠাও পাইক দলে।"
আঁখিজল-মাখা হাসি বলে প্রজা "পপ্পা বাইকারাজ" ;
শৃঙ্খলহীন চিতোর রাজ্য ভেঙ্গে যেন পড়ে আজ।
গুর্জ্জর-ভূপ বাহাদুর ভাবে এই ভাল অবসর—
মজাফর খাঁর অপমান-ঋণ শোধিতে চিতোর পর।
সাজিল আহবে ; মিলে তার সনে মণ্ডুর সেনাগণ,
"নল্‌গোলা"* লয়ে আসিয়া মিলিল লাব্‌রী ফেরেঙ্গান।
বুন্দির মাঝে লৈচা পল্লীতে ছিল চিতোরের রাণা,
সদলে তথায় গিয়া বাহাদুর বীরদাপে দিল হানা।
হলেও মলিন শিরায় তাহার বাপ্পা-শোণিত বহে,—
হীন শত্রুর বৃথা বীর-দাপ রাণা কি নীরবে সহে?
অনুচর সহ বিক্রমজিৎ যুঝিল অরাতি সনে,—
বিজয়-লক্ষ্মী বিমুখ হইল,—ভঙ্গ দিল সে রণে।
গুর্জ্জর ভূপ উল্লাসে ভাসি অনুচরে ডাকি কয়,
"হও আগুয়ান, চিতোর দুর্গ করিয়া লইব জয়।"
শিশোদিয়া-রবি দেখি বিপন্ন বীর সর্দ্দারগণ
ছুটিল চিতোরে, রক্ষিতে তারে দৃঢ়-দেহ, দৃঢ় মন।
সুরয মলের তনয় বাঘজি দেওলা ছাড়িয়া আসে ;
বুন্দি-তনয় আবু ও ঝালর দাঁড়াইল তাঁর পাশে।
রাজোয়াড়া জুড়ি এল বীরগণ, ডাকিয়া কহিল সবে,
"জন্মভূমির চিরগৌরব—চিতোর বাঁচাতে হ'বে।"
অযুত বীরের গভীর কণ্ঠে বাজিল জীমূত-রবে—
"জন্মভূমির চিরগৌরব চিতোর বাঁচাতে হ'বে।"
চতুর লাব্‌রী রচিল রন্ধ্র চিতোর-প্রাকার-গায়,
গুর্জ্জর-সেনা রন্ধ্র-মুখেতে দুর্গে পশিতে যায়।
রোধিল রন্ধ্র বুন্দির সনে পাঁচশত হরবীর—
হৃদয়-রক্তে রঞ্জি পাষাণ, কাটিয়া অরাতি-শির!

সত্য ও দুদু বক্ষঃ পাতিয়া রোধিল রন্ধ্রমুখ,
দুর্জ্জয় অরি আসে আগুসরি তবুও নহে বিমুখ।
রাঠোর-তনয়া জয়াহীর বাঈ বহু অনুচর সনে
কোমল অঙ্গে বর্ম্ম আঁটিয়া যুঝিল জীবন-পণে।
"বড় দুর্দ্দিন!" কহিল সকলে, "চিতোরে নাহিক রাণা,—
রাণা বা তাঁহার প্রতিনিধি বিনা চিতোর রক্ষা মানা।"
"রাণা-প্রতিনিধি," ডাকিল সকলে, "কে বল হইবে আজ,—
অমর মৃত্যু কে লবে বরিয়া, কে হ'বে হৃদয়-রাজ?"
বীরের তনয় বাঘজি দেওল বংশ-গৌরব স্মরি,
ফুলমালা সম স্থির মৃত্যুরে নিজ শিরে নিল বরি।
বীরকণ্ঠের "জয় জয়" সহ উঠিল বাঘজি শিরে ;
মিবার-পতাকা—রাণার চাঙ্গি—নিন্দিয়া প্রভাকরে,
তবুও অরাতি না হইল ক্ষয়, ক্রমে আশা হলো হীন ;
গম্ভীরে সবে কহিল, "আজি রে চিতোরের শেষ দিন"।
ঘোষিল চৌদিকে "রাজপুত নারী 'জ্বলিত চিতার 'পরি—
আচরিবে আজ জওহর-ব্রত অগ্নি সাক্ষী করি।"
একটী রমণী তবু না ছাড়িল চিতোর-রক্ষা আশা,—
সঙ্গ মহিষী, উদয় জননী, হর-অর্জ্জুন-স্বসা ;
কর্ম্মবতীর রাখীবন্ধ-ভাই হুমায়ূন বীরবর,
তাঁহার নিকট কাঁচুলী সহিত পাঠান বার্ত্তাহর।
সুরতান-করে সপিয়া তনয়ে, জ্বলিত চিতার পাশে,
কর্ম্মবতী সে রহিল বসিয়া রাখীবন্ধ ভাই আশে।
পিতার আদেশে হুমায়ূন যবে বঙ্গ-বিজয়ে রত—
ভগিনীর দেওয়া স্বর্ণ-কাচুলী হইল হস্তগত।
রাখী-সম্মান, ভগিনীর মান, বীর হুমায়ূন জানে,
ছাড়িয়া বঙ্গ, ছাড়ি সব কাজ, ছুটিল চিতোর পানে।
গুর্জ্জর-ভূপে দিল খেদাইয়া, মণ্ডু জিনিল রণে ;
বিক্রমজিতে আদরে বসাল চিতোর সিংহাসনে।
উচ্চে গাহিল রাজপুত বীর গুণচোর † তারা নয়,
জয় হুমায়ূন, রাখীবন্ধ-ভাই, জয়-রে রাখীর জয়।"

* নল্‌গোলা—রাজপুত ভাষায় কামান।

† গুণচোর—"অকৃতজ্ঞ। রাজপুতগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় পাপ দুইটি—"গুণচোর" ও "সংচোর"—অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় ইহাই ঠিক।

নিখিল প্রবাহ

[শ্রীনরেন্দ্র দেব]

১। চিত্রে সঙ্গীত

ভারতীয় চিত্রকলার বর্ত্তমান সম্রাট—শিল্প সৌন্দর্য্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর অবনীন্দ্রনাথ একবার কোনও শিক্ষানবিশের অঙ্কিত 'আরতির' চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "ওহে, তোমার এ ছবিতে ধূপধুনোর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু আরতির বাজনা তো শোনা যাচ্ছে না!" অর্থাৎ—কেবল বাজনা বাজিতেছে, আঁকিলেই চলিবে না,—এমন আঁকা চাই যে, চিত্র-দর্শনে দর্শকের মনে যেন বাদ্যের ধ্বনিটিও ধরা পড়ে! পাশ্চাত্য শিল্পীগণের অঙ্কিত কয়েকখানি সঙ্গীতের চিত্রে উল্লিখিত প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। সার এড্ওয়ার্ড বার্ণ্ জোন্সের অঙ্কিত 'প্রেম সঙ্গীত' চিত্রখানি দেখিতে-দেখিতে, কাণের ভিতর যেন গানের সাড়া আসিয়া পৌঁছায়। আইজাক স্নোমানের 'প্রণয়গীতি' নামক চিত্রখানিতেও এই সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়। দান্তে গেব্রিয়েল রসেটীর অঙ্কিত 'মেরিয়ানা' চিত্রে, গায়ক ও শ্রোতার প্রতিকৃতির মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য সন্নিবেশিত যে, দেখিবামাত্র গানের সেই চিরপরিচিত সুরটি যেন অন্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে! 'মেরিয়ানা' মহাকবি সেক্সপীয়রের Measure for Measure নাটকের একটী প্রধান চরিত্র। মেরিয়ানার কিশোর অনুচর যেখানে তাহার নিকটে বসিয়া গাহিতেছে—"নাও, ওগো! নাও, নাও, সরাইয়া তব ওষ্ঠটি অধরপুট!" এ সেই আকুল করা গানের চিত্র। মেরিয়ানার চোখে-মুখে গানের সেই আকুলতা চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে; এবং বাল পরিচারকের মুখ হইতে সঙ্গীতের বাণী ও ধ্বনি যেন স্পষ্টই শোনা যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। টমাস্ ওয়েবষ্টার্-অঙ্কিত "গেঁয়ো গির্জ্জের গান" চিত্রখানিতে প্রত্যেক লোকটীর মুখে গানের যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব! গানের সঙ্গে-সঙ্গে, যে দুইজন পল্লীবাসী বাঁশী বাজাইতেছে, তাহাদের মুখের সে বিচিত্র একাগ্রতায়, চিত্রের ভিতর হইতে যেন বংশীধ্বনিটীও কাণে আসিয়া পৌঁছায়। ক্রিষ্টফার্ ক্লার্কের অঙ্কিত "দূরে—বহু দূরে সেই টিপারারি" (It is a long, long way to Tipperary) গানটি যে ইংরাজ সৈন্যদলের অত্যন্ত প্রিয় সঙ্গীত, তাহা চিত্র দর্শনে বেশ বুঝিতে পারা যায়। মাইকেলের অঙ্কিত "ওল্ড ল্যাঙ্ সায়েন্" (Auld Lang Syne) সঙ্গীতটিও তাই। জে পিল্‌সের অঙ্কিত ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত (La Marseillaise) 'লা মার্শেলজ্' চিত্রখানিও অতি অপূর্ব্ব ভাব-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালী। ১৭৯২ সালে ফরাসী বিদ্রোহের সময়ে চার্লস্ রুজ দি লায়েন্ একদিন সান্ধ্য ভোজের পর সহসা অনুপ্রাণিত হইয়া দারুণ উত্তেজনায় এই চিরস্মরণীয় গান রচনা করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের বালক, বৃদ্ধ যুবা, নরনারী নির্ব্বিশেষে এই গান গাহিতে গাহিতে উন্মত্ত হইয়া উঠে। বিদ্রোহীরা 'টুইলারীর' রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিবার সময়ে সর্ব্বপ্রথম এই গান প্রকাশ্য রাজপথে গাহিয়াছিল; এবং সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই গানই ফরাসীদের জাতীয় সঙ্গীত রূপে চলিয়া আসিতেছে। শিল্পী তাঁহার চিত্রে আঁকিয়াছেন 'রুজ দি লায়েন্' স্বয়ং তাঁহার রচিত 'লা মার্শেলজ্' গাহিতেছেন। অনুপ্রাণিত রচয়িতার প্রত্যেক অঙ্গে যে বিপুল উত্তেজনার জীবন্ত ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, উহাই 'লা মার্শেলজ্' সঙ্গীতের যথার্থ প্রতিরূপ।

(Windsor)

২। জাপানে নারী-বিদ্রোহ

ইয়োরোপের সঙ্গে সঙ্গে জাপানেও মহিলাগণ সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রাচ্যের প্রাচীন রীতি অনুসারে যুগযুগান্ত ধরিয়া তাঁহারা নারীর অনেক ন্যায্য অধিকার হইতেও বঞ্চিতা ছিলেন; কিন্তু আজ জগতের নারী সমাজে এক নূতন জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে;—এমন কি, ভারতের অসাড় নারী সম্প্রদায়কেও আজ উহা চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের ন্যায় জাপানেও এক বিরাট স্ত্রী মহামণ্ডল আছে। সম্প্রতি এই স্ত্রী-মহামণ্ডল

হইতে নারীর অধিকারের দাবী লইয়া এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। গত কয়েকটি অধিবেশনে তাঁহারা নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন—

প্রথম। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা বিবাহ করিয়া যাহাতে আর নিরপরাধিনী রমণীগণের শরীর ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিতে না পারে তাহার কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করিয়া, উহা স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে অপরাধ অনুযায়ী যাহাতে সমান ভাবে প্রযুজ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা, স্ত্রীলোক, পুরোহিত-সম্প্রদায়, শিক্ষক-সম্প্রদায় ও রাজকর্ম্মচারীগণ কোন প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন বা সভাসমিতিতে যোগদান করিতে পারিবে না বলিয়া যে আইন আছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে।

চতুর্থ। স্ত্রীলোকদের জন্যও উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশের চতুর্দ্দিকে অবৈতনিক প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে।

পঞ্চম। শিল্প-বিজ্ঞান ও ভৈষজ্য-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্ত্রীলোকদের নিমিত্ত পৃথক পৃথক স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে। এই কার্য্যে যে ব্যয় হওয়া সম্ভব, তাহা যদি গভর্ণমেণ্ট দিতে অপারগ হ'ন, তবে বালকদের জন্য এই সকল বিভাগে যে-যে বিদ্যালয় আছে, উহাতে স্ত্রীলোকগণকেও পাঠের অধিকার দেওয়া হউক।

কিন্তু বারম্বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট এ সকল বিষয়ে কর্ণপাত করিতেছেন না দেখিয়া, স্ত্রীলোকগণ প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীমতী রাইশো হীরাজুকা এই আন্দোলনের প্রধান নেত্রী। সম্প্রতি রাজবিধি অগ্রাহ্য করিয়া মহিলাগণ এক রাজনৈতিক সভা আহ্বান করিয়াছিলেন; এবং শ্রীমতী হীরাজুকা উহার সভানেত্রী হইয়াছিলেন।

ইয়োরোপের ন্যায় জাপানেও ধনী ও শ্রমজীবীদের মধ্যে বিসম্বাদ বাধিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বড়-বড় শ্রমজীবী-সম্প্রদায় স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাহারা আজ আপনাদের ন্যায্য দাবী কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে জোরের সহিত প্রচার করিতেছে। অথচ, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রমজীবীরা কেহই কারখানার অধ্যক্ষ বা স্বত্বাধিকারীদের সম্মুখীন হইতে সাহস করিত না। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এল উপাধিধারী শ্রীযুক্ত সুজুকী বঞ্জী এই শ্রমজীবী-সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা। শ্রমজীবীদের উপর ইঁহার প্রভাব অসামান্য। কুমারী তুশিনো মমুরা স্ত্রী-শ্রমজীবিনীদের প্রধানা মুখপাত্রী। ইঁহার অসাধারণ অধ্যবসায় ও একান্ত চেষ্টার ফলে, জাপানে স্ত্রী-শ্রমজীবিনীদের মজুরী, আহার ও বাসস্থান প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

পর্দ্দানশীন তুর্কী রমণীরাও আজ বোর্কা খুলিয়া ফেলিয়া, হারেমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; এবং রাজনীতি, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে পুরুষের সহিত সমান অধিকার লাভের জন্য বিপুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীমতী হালিদি এদীব হানুম তুরস্কের এই নব নারী-সঙ্ঘের প্রধানা নেত্রী। ইনি উচ্চশিক্ষিতা এবং সুবক্তা। মিশরের স্বাধীনতা লাভের মূলেও আজ নারী-শক্তির বিজয়-ঘোষণা শুনা যাইতেছে। দেশের উন্নতি-মূলক আন্দোলনসমূহে যতদিন না আমাদের নারী-সমাজ অবাধে আসিয়া যোগ দিবেন, ততদিন আমাদেরও বোধ হয় কোন আশা-ভরসা নাই।

(Literary Digest)

৩। কয়লা-বাছা কল

কয়লার এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে 'কয়লা-বাছা কল' আমাদের দেশের গৃহস্থদের অনেক সাশ্রয় করিতে পারে। প্রতিদিন দুইবেলা রন্ধনাদি চুকিয়া যাইবার পর, উনান পরিষ্কার করিয়া, যে ছাইগুলি আমরা জঞ্জালের সামিল ভাবিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিই, তাহা হইতে যে পুনরায় রন্ধনোপযোগী কয়লা বাহির হইতে পারে, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; কারণ, সকলেই হয় ত দেখিয়াছেন যে, গরীব-দুঃখীর ছেলে-মেয়েরা পথের জঞ্জালের ভিতর হইতে রোজ সেই কয়লা বাছিয়া লইয়া যায়। যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীতে যখন কয়লার অত্যন্ত অভাব হইল, তখন বার্লিনের ডাঃ বেগাস্, পোড়া কয়লার ভিতর হইতে পুনরায় ব্যবহারোপযোগী কয়লাগুলি অল্প আয়াসে যাহাতে বাছিয়া

প্রেম সঙ্গীত

প্রণয় গীতি

মেরিয়ানা

বিয়োগ-সঙ্গীত

ধর্ম্ম সঙ্গীত

লওয়া যাইতে পারে, এই জন্য সর্ব্বপ্রথম এই 'কয়লা-বাছা কল' উদ্ভাবন করেন; এখন ইহা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইতেছে। এই কলটি অনেকটা "আইস্‌ক্রীম" তৈরি করিবার কলের মত খুব সোজা ব্যাপার। উনানের ভিতর হইতে ছাইগুলি বাহির করিয়া এই কলে ফেলিতে হয়। তার পর একটা হাতোল ধরিয়া বারকতক জোরে ঘুরাইলেই, দগ্ধাবশিষ্ট কয়লাগুলি কলে থাকিয়া যায়, এবং ছাইভস্ম সমস্তই কলের তলায় আঁটা জালের ছাঁক্‌নির ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়।

(Scientific American.)

৪। টেলিফোঁর হাত

কাজ করিতে-করিতে টেলিফোঁয় ডাক আসিলে, কাজ বন্ধ করিয়া টেলিফোঁর মুখনলটি কাণের কাছে ধরিয়া বসিয়া

"দূরে - বহু দূরে সেই টিপারারি"

অতীতের বিস্মৃত সুর

"গড সেভ দি কিং"

থাকিতে হয়,— তাহাতে অনেক সময় কাজের ক্ষতি হয়; এবং হাত খালি থাকে না বলিয়া যথেষ্ট সময়ও মিথ্যা অতিবাহিত হইয়া যায়। সম্প্রতি এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য একটী নূতন উপায় বাহির হইয়াছে। টেলিফোঁর কলের সঙ্গে একটী হাতোল লাগাইয়া তাহার সহিত মুখনলটি সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন কাজ করিতে-করিতে টেলিফোঁর ডাক আসিলে, আর মুখনলটি হাতে করিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। হাতোলটি টানিয়া, কাণের কাছে মুখনলটি লাগাইয়া, লোকে টেলিফোঁয় কথা এবং হাতে কাজ এ দুইই একসঙ্গে বসিয়া করিতে পারিবে।

(Scientific American.)

৫। লিপিযন্ত্রের তন্ত্রধার

যাঁহারা লিপিযন্ত্রে (Typewriter) কাজ করেন, পাণ্ডুলিপি লইয়া তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। লেখককে হয় তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে, নয় বামপার্শ্বে

শ্রীমতী রাইশো হীরাচুকা

শ্রীযুক্ত সুদকী বাপী

জাপানী স্ত্রী মহামণ্ডল

কর্তৃপক্ষদের নিকট শ্রমজীবীদের দাবী

পাণ্ডুলিপিখানি রাখিয়া, কল টিপিবার সময় প্রতিবার ফিরিয়া-ফিরিয়া পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া লইতে হয়; এবং পাছে কোন একটা লাইন ছাড়িয়া যান বা ভুলক্রমে দুইবার ছাপিয়া ফেলেন, এই ভয়ে সতত সতর্ক দৃষ্টিতে সন্ত্রস্ত হইয়া কল চালাইতে হয়। অনেক লেখক পাণ্ডুলিপির উপর আর একখানি বাজে কাগজ চাপা দিয়া, এবং ছাপার সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প সরাইয়া, কেবলমাত্র যাহাতে প্রতিবার একটা করিয়া লাইন চোখে পড়ে তাহার ব্যবস্থা করিয়া ল'ন। ইহাতে অনেক সময় নষ্ট হয় এবং কাজেও বিলম্ব হইয়া যায়। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য নিউ-ইয়র্কের মিঃ শেয়ার্ল একটী চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। লিপিযন্ত্রের পশ্চাদ্‌ভাগে পাণ্ডুলিপিখানি

ধর্ম্মঘটকারী মজুরদের মিছিল

কুমারী ফুশিনো নকুরা

শ্রীমতী হালিদি এদীব হানুম

কয়লা বাছা কল

লিপিযন্ত্রের উৎকর্ষ

টেলিফোনের হাত

বেঢ়কি সাইকেল

দ্বিচক্রযানের ক্রমোন্নতি
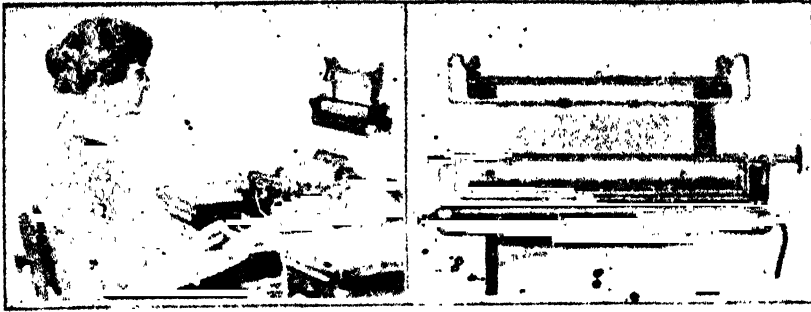
আধুনিক সাইসাইকেল

যাহাতে লেখকের ঠিক চোখের সম্মুখে প্রলম্বিত থাকে, তজ্জন্য একটী বিশেষ আধার নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই আধারের মধ্যভাগে, ছোট-ছোট হাতের লেখার অস্পষ্ট অক্ষরগুলি যাহাতে বড় দেখায়, এমন গুণবিশিষ্ট একখানি আতসী কাচ সংযোজিত আছে। এই কাচের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলোক আসিয়া পড়িবারও ব্যবস্থা হইয়াছে; এবং প্রতিবার লেখক যাহাতে পাণ্ডুলিপির মাত্র একটী করিয়া লাইন দেখিতে পান, সে উপায়ও করা হইয়াছে।

(Scientific American.)

৬। দ্বিচক্রযানের ক্রমোন্নতি

সহরে যখন প্রথম "বাইসাইকেল" চলিতে আরম্ভ হয়, তখন দেখা গিয়াছিল যে, দুইটি চাকা পরস্পরের ঠিক বিপরীত! অর্থাৎ সম্মুখের চাকাটি পশ্চাতের চাকার অপেক্ষা প্রায় বিশগুণ বড়। তার পর ক্রমে সম্মুখের চাকাটি ছোট হইতে আরম্ভ হইল, এবং পশ্চাতের চাকাটি বড় হইতে আরম্ভ করিল; এবং শেষে তাহারা পরস্পর ঠিক সমান আকার ধারণ করিল। এই ভাবেই এতদিন চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু যাঁহারা 'সাইকেল' ব্যবহার করেন, তাঁহারা পা-গাড়ীর চাকা দুইটাকে লইয়া সর্ব্বত্রই বড় বিব্রত হইয়া পড়েন দেখিয়া, মিঃ ক্লার্ক গাড়ীর চাকা-দুটীকে চায়ের ডিশের মত ছোট করিয়া, এক নূতন রকম দ্বিচক্র-যান উদ্ভাবন করিয়াছেন। কোথাও যাইতে হইলে সাধারণ বাইসাইকেলের মত ইহাকে বাহিরে রাখিয়া যাইবার আবশ্যক হয় না। ছড়ি বা ছাতার মত হাতে করিয়া "লিফ্‌ট" কিম্বা সিঁড়ি চড়িয়া উপরে উঠিয়া যাওয়া যায়, এবং ঘরের ভিতরেও হাতে করিয়া ঢুকিয়া, কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিয়া আসা যায়; যে-কোনও গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে হাতে করিয়া ধরিয়া বসিয়া যাওয়া যায়। মিঃ ক্লার্ক একজন আমেরিকান। তাঁহার উদ্ভাবিত এই নূতন ধরণের বাইসাইকেলের এই প্রধান সুবিধাটুকু থাকার জন্য নিউ ইয়র্কের আমেরিকানরা এই গাড়ী অত্যন্ত পছন্দ করিতেছে। কারণ, অনেক স্থলে গাড়ী বাহিরে রাখিয়া যাইবার নানা অসুবিধা হয়। সব সময় গাড়ী ধরিবার লোক পাওয়া যায় না; এবং মধ্যে-মধ্যে বাহিরে গাড়ী রাখিয়া গেলে, ফিরিয়া আসিয়া আর দেখিতে পাওয়া যায় না—গাড়ীখানি চুরি হইয়া যায়।

সাধারণ সাইকেল ব্যবহারের আর একটী অসুবিধা ছিল এই যে, কেবলমাত্র একজন লোককে এ গাড়ী চড়িয়া নিতান্ত একলাটি ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। দু'টো কথা কহিবার বা গল্প করিবার কোনও সঙ্গীকে সঙ্গে লইবার উপায় ছিল না; সুতরাং সঙ্গলিপ্সু, গল্পপ্রিয় ও আড্ডাধারী লোক যারা, তাহাদের সাইকেলখানি প্রায়ই পড়িয়া-পড়িয়া মচে ধরিয়া যাইত। কিছুদিন হইল, জার্ম্মাণরা এই অভাব দূর করিবার জন্য একপ্রকার 'বৈঠকি সাইকেল' বাহির করিয়াছে। ইহাতে দুই বন্ধুতে বসিয়া, বা স্ত্রী-পুরুষে চড়িয়া, বেশ আরামে গল্প করিতে-করিতে ঘুরিয়া আসিতে পারেন।

(Scientific American.)

ডায়েরির ক' পাতা

[শ্রীহেমচন্দ্র বক্সী বি-এ]

২ মাঘ।

এই যে ক' বছর ধরে আমার এই খাতাখানার পাতায়-পাতায় কালো কালি ছড়িয়ে যাচ্ছি, তাতে যে কি লাভ আছে, জানি না। অপর কেউ এর ভিতর দৃষ্টিপাত করবে, সে কথা ভাবতেও যে আমি শিউরে উঠি! তবে দিনের পর দিন, এমন ভয়ঙ্কর জিনিষ আমি কেন সৃষ্টি করে বাক্সবন্দী করে রাখ্‌ছি? একে আমি বাস্তবিকই বড় ভয় করি। কতবার ভেবেছি, একে আর রাখা নয়,—কিন্তু কই, নষ্ট করতেও ত হাত ওঠে না। একে যেমন আমি ভয় করি, তেমনি এর প্রতি একটা স্নেহও আমার জন্মে গেছে। তাই যেদিন মনটাকে ভূতে পেয়ে বসে, সেদিন বাক্সের জামা-কাপড়ের নীচ থেকে একে সন্তর্পণে বের করে,

কলমের আঁচড় কাট্‌তে সুরু করে দিই। লেখা শেষ হলে, আবার তেমনি সন্তর্পণে স্বস্থানে রেখে দিই। কিন্তু অত ভয়ই বা কিসের? যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন এর খোঁজ ত কেউ পাবে না; আর যদি ধীরে-সুস্থে মরবার সুযোগ পাই, তবে এর চিহ্ন কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু যদি তা না ঘটে,—যদি হঠাৎ মরে যাই! বাবা! সে কি ভীষণ হবে! আমার ভাইরা যে আমাকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে ঠাট্টা করে বলে, old maidরা ভয়ঙ্কর স্বার্থপর হয়,—তার denotationটা না মান্‌লেও, connotationটা মনে-মনে না মেনে পারি না। আমি মরে গেলে, অপরে আমার ডায়েরি খুলে পড়্‌বে, আর আমার চিন্তা-ধারার সঠিক সন্ধান পাবে,—সে আমি নরকে থেকেও সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। নিজেকে আমি অতখানি ভালবাসি নিশ্চয়।

এই যা! কি লিখ্‌ব মনে করে খাতা বের করেছিলাম, কিছুই তার লেখা হল না; যা' আগে একটুও ভাবি নি, কোথা থেকে সেই সব কথাই কলমের আগায় আস্‌তে লাগল! বিকাল থেকে মনটা অমলা-দি'র কতকগুলি কথায় বড় ভার হয়েছিল, এবং আমার ডায়েরিতে লিখ্‌বার মত অনেক কথাই মনে জাগ্‌ছিল; কিন্তু এখন আর সে সব লিখ্‌তে ইচ্ছা করছে না, মনটা হাল্কা হয়ে গেছে। সত্যি, আর কিছু না হোক, ডায়েরি লেখা মনের ভূত নামাবার একটা ওষুধ বটে!

৮ মাঘ।

আজ আবার আরেক দফা হয়ে গেল। কত দিনে যে এই প্রহসনের অবসান হবে, জানি না। বড়দা'কে অত করে বল্লেও, তিনি তা কিছুতেই বুঝ্‌বেন না। এত দিন ছিলাম ভাল। বি-এ পাশ করে, বোর্ডিং ছেড়ে এসে, কি যে অপরাধ করেছি, ভগবান জানেন। বড়দার দায়িত্ব-জ্ঞান এমনি উগ্র হয়ে উঠেছে যে, আমার পক্ষে সেটা সহ্য করা যে কতখানি শক্ত, তা তিনি বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না। স্বয়ম্বরা হওয়ার প্রথা উঠে গেছে বটে, কিন্তু বড়দা নানা পত্রিকার matrimonial columnএ বিজ্ঞাপন দিয়ে-দিয়ে আমার অবস্থাটা প্রায় সেই রকমই করে তুলেছেন। বড়দার এই ব্যস্ততার বিরুদ্ধে তর্ক করেও ত পারি না; তিনি গম্ভীর হয়ে, বল্‌তে আরম্ভ করেন, 'তুই কি বুঝ্‌বি, ছেলেমানুষ! যার কর্ত্তব্য যে এখন আমার উপর।' কাজেই দাদার সব আদেশ না মেনে আর উপায় থাকে না,—তা সে আমার পক্ষে যতই কেন শক্ত হোক না।

ঘরে শুয়ে-শুয়ে নিশ্চিন্ত মনে টলষ্টয়ের Resurrection পড়ে যাচ্ছিলাম। রোদ পড়ে এসেছিল; কিন্তু উঠবার কোন তাড়া ছিল না। হঠাৎ দরজায় দ্রুত আঘাত পড়ল; সঙ্গে-সঙ্গে বড়দার স্বর শুনলাম, "দরজা খুল্‌বি নে?" কাজেই উঠে দরজা খুল্‌তে হল। বড়দা ঢুকে পড়েই, কোন ভূমিকা না করে বলে ফেল্লেন, এই অনাদিবাবু চিঠি দিয়েছেন,—সাড়ে পাঁচটাতে তিনি এখানে চা খেতে আসবেন। তাঁর সাথে সুরেশবাবুও আসবেন,—তিনি নূতন ডেপুটি হয়ে এসেছেন এখানে। চা'টা তোকেই ঢেলে দিতে হবে,—তুই একটু ভাল কাপড়-চোপড় পরে থাকিস।" আমার কিছু বল্‌বার আগেই, বড়দা যেমন এসেছিলেন, তেমনি বেরিয়ে গেলেন। আমি যেন খুকী,—তাঁর কথায় উঠব-বস্‌ব;—এর ভিতর যেন আমার কিছু বল্‌বার থাক্‌তেই পারে না। বড়দা আমাকে কি যে মনে করেন! কিন্তু সে যাই হোক, শেষটায় কিন্তু তিনি আমার মতের বিরুদ্ধে কিছু কর্‌তে যান না।

নূতন ডেপুটি বাবুটির কেন যে আগমন, সে অবিশ্যি আমার বুঝ্‌তে বাকী রইল না। এমনি ধারা নূতন ডেপুটি, নূতন প্রফেসার, নূতন উকিল এই ক'মাসের ভিতর দেখবার দুর্ভাগ্য আমার অনেক ঘটেছে। প্রথমটায় কিছুতেই নিজেকে বড়দার আদেশ মত চালাতে পার্‌তুম না,—কি ভীষণ দৈন্য বলে মনে হত; ভারি বিশ্রী লাগত। কিন্তু এখন অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে,—মনে হয়, বড়দা খুসী হলেই হল।..নিজেকে আমি বড্ড ভালবাসি হয় ত, তাই বোধ করি এই সব ভদ্রলোকেদের আমার এমন অদ্ভুত লাগে, যা খুলে বল্‌তে গেলে লোকে ভাববে অহঙ্কারী! মনে-মনে এঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে, একটা বিরক্তির ভাব নিয়ে এঁদের সম্মুখীন হই বলেই বোধ হয় কিছুতেই এঁদের সহ্য কর্‌তে পারি না। এঁরা যে স্থান অধিকার করবার আশা নিয়ে আসেন, সেখানে এক-একজন' করে বসিয়ে ভেবে দেখেছি, মন খেন্নায় তিতিয়ে ওঠে। কিন্তু এমনি আশ্চর্য্যি, এঁদের না কি সকলেরই আমাকে অত্যন্ত পছন্দ হয়ে যায়! শুধু তাই নয়, অনেকের হা-হুতাশ পর্য্যন্ত

বড়দা'র মারফতে আমার কাছে এসে পৌঁছেচে! কি যে মূল্য এর, জানি না।

২০ ফাল্গুন।

তবু ভাল, মাঝে-মাঝে এমন সব মানুষের হাওয়া গায়ে লাগে, যারা ঐ দেওয়ালে-টাঙ্গানো গম্ভীর ঘড়িটার মত নয়,—বৈচিত্র্যে যাদের জীবনের গতি গিরি-নদীর মত ছন্দময়। এই বৈচিত্র্য যে কি জিনিষ, আজ একমাস মাত্র এখানে এসেই তার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারছি। আজ রবিবাবুর একটা বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। সেখানে তরুর সাথে দেখা। অনেকদিন পর ওর সাথে দেখা হল। ম্যাট্রিক পাশ করবার পর তরুর বিয়ে হয়ে যায়; তার পর কোন খবরই আর পাই নি। কি সুন্দর একটী মেয়ে হয়েছে ওর। তরু যেই বল্লে, তোর মাসিমার কাছে যা,—অমনি এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে। সভা ভেঙ্গে গেলে, তরু তার স্বামী বিমলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে। তাঁদের বাড়ী আমাকে নেবার জন্যে তরু ও তার স্বামীর আগ্রহের অন্ত নাই;—খুকীও তাঁদের সাথে যোগ দিয়ে বল্লে, মাসিমা তুমি যাবে? এই কয়দিন মাত্র বোর্ডিংে থেকেই এই সব সজীব মানুষের সংসর্গ লোভনীয় হয়ে উঠেছে। আমি বললাম, বেশ, যাব একদিন। তরু বল্লে, একদিন নয়, কালকেই আমি মোটর পাঠাব, বিকাল পাঁচটায় তৈরী হ'য়ে থেকো।

২১ ফাল্গুন।

সন্ধ্যার তিনটি ঘণ্টা আজ তরুদের বাড়ী কাটিয়ে এলাম। কি আনন্দেই যে কাটল, তা' আর বলা যায় না। শুধু মানুষের সংসর্গে মানুষ অত আনন্দ পায়, তা ত আগে জানতাম না! কি আশ্চর্য্য। শুধু কয়জনে মিলে এক টেবিলে চা খাওয়া, কথা কওয়া আর ছাতে ঘুরে গল্প করা, এই বই ত কিছু নয়! কিন্তু তারই আনন্দ-শিহরণ এখন পর্য্যন্ত আমার থামছে না। রাত্রি এগারটা, তবু চোখে ঘুম আসছে না।

২৮ ফাল্গুন।

আজ তরুর মেয়ের জন্মদিন গেল। তরু চিঠি দিয়ে মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিকালটা তরুদের বাড়ী কাটিয়ে এলাম। তরু কাজ-কর্ম্মে এমনি ব্যস্ত ছিল যে, তার আজ বড় খোঁজ পাই নি। আমি একা-একা বোধ করছি বলেই কি না জানি না, বিমলবাবু আমার কাছে বসে খুব গল্প জুড়ে দিলেন। কত বিষয় নিয়েই যে গল্প চল্লো তার অন্ত নেই। মাঝে-মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, কথা বলবার এঁর কি চমৎকার ক্ষমতা! মুখের কথার সঙ্গে নিজেকে তিনি মোটেই জড়িয়ে তোলেন না। মনে হয়, তিনি থাকেন দূরে,—কিন্তু কথাগুলি এসে অন্তর স্পর্শ করে। এঁর কথাগুলি যেমন সুস্পষ্ট, নিজেকে ততখানি অস্পষ্ট করে রাখেন। ইচ্ছা হয়, এঁর কথার মত এঁকেও খুব স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি। অবাক হ'য়ে এঁর কথা শুনলাম।... বিদায়ের সময় তিনি আমাকে হেসে বল্লেন, companion হিসাবে আপনার তুলনা নাই।

কি আশ্চর্য্য! অথচ ঠিক এই কথাটাই সারাক্ষণ আমার মনে জাগছিল। আমি হেসে বললাম, আমি যে ঠিক এই কথাটাই পাল্টিয়ে বলতে চাই!

তিনি বল্লেন, তা'হলে সত্যের অবমাননা হবে যে!

আমি গাড়ীতে উঠতে-উঠতে ঘাড় বাঁকিয়ে বললাম, ইস্, তা মোটেই নয়।

১ চৈত্র।

তরুর সঙ্গে আজ সমাজে দেখা। তরু বল্লে, কাল ত ভাই তোমাদের ছুটি। কাল আমাদের ওখানে 'ডে স্পেণ্ড' করবে। সেদিন তোমার সঙ্গে একটু কথা বলবার ফুরসৎ পাই নি।

আমি নিজের আগ্রহ দমন করে বললাম, তা তোমাদের যদি অসুবিধা না হয়—আমি ত ভাই বোর্ডিংে সত্যি হাঁপিয়ে উঠেছি। কিন্তু সারাদিন আমাকে সহ্য করতে পারবে কি না জানি না।

সে বল্লে, হাঁ, ন্যাকামো রাখো। কথা রইল, তা'হলে আসবে কিন্তু নিশ্চয়!

২ চৈত্র।

জীবনের কি একটা দিনই আজ কাটল! এ আজ কোন্ সাগরের বন্যা এসে হৃদয় আমার ভাসিয়ে দিলে! তার ঢেউয়ের তলে কি-যে রাগিণী আজ বেজে উঠল! মনের ঢেউ আজ আমার এই দেহটাতে পর্য্যন্ত এসে লেগেছে। কিছুতেই একে সংযত করতে পারছি না। তাই সন্ধ্যার

পর ফিরে এসে অবধি, সেই কাপড়-জামা না বদলিয়েই বারান্দায় অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। মিস্ দত্ত এসে বল্লেন, ও কি, তুমি এখনি বের হচ্ছ না কি কোথাও আবার? তিনি সারাদিন আমার বন্ধুর বাড়ী কাটিয়ে আসাটা সহ্য করতে পারেন নি।

*　　*　　*　　*

বিমলবাবুর বাইরে গান-গল্প হাসি-পরিহাসে-গড়া একটা পর্দ্দা আছে; তার অন্তরালে যে কোন্ দেশের কোন্ নদী ধীরে ব'য়ে যাচ্ছে, আর কখনই-বা কোন্ হাওয়া লেগে সেখানে ঢেউয়ের প্রলয় ঘটাচ্ছে, তা বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো নেই। তাই এতদিন তাঁর গান, গল্প, হাস্য, পরিহাস উপভোগ করে,—এমন কি, হেসে লুটোপুটি খেয়েও, মনে অমনি একটা অসোয়াস্তির ভাব জেগে উঠ্ত,—এঁকে কিছু বুঝলাম না! ইচ্ছা হত, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এঁকে বুঝি,—বুঝ্তে পারাই যেন একটা পরম লাভ।

কিন্তু আজ তিনি তাঁর সেই পর্দ্দা সরিয়ে আমাকে কিছু দেখ্তে দিয়েছেন। তাঁর অতটা বন্ধুত্ব লাভের সৌভাগ্য কেন যে আমার ঘট্‌ল,—হাঁ, জানি বই কি। তাঁর ঐ কাতর অথচ প্রশংসমান দৃষ্টির ভাষা ত আমার কাছে অজ্ঞাত নয়।···

তিনি একবার বল্লেন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের নানা রূপ কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এঁকেছেন; এবং অনেকের জীবনে নানা আকারে তা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমার কাছে যেটা আদর্শ মনে হয়, সেটা হচ্ছে এই যে, একজন আর একজনের দেহমন এমন করে প্রবুদ্ধ করবে, আর এই সম্পর্কিত সকল কামনা এমন করে মিটিয়ে দেবে, যেন উভয়ের মনে হয়, জগতে পুরুষ ও নারী—আর দ্বিতীয় কেউ নেই। যদি দেখ্তে পান, সম্পর্কটা নিতান্তই ঘর-সংসার-চালানো গোছের—নিতান্তই জলভাত,—বুঝ্‌বেন সেটা খাঁটি মিলন হয়নি।··

আজ দেখে এলাম, কি গভীর অতৃপ্তি এঁর মনের ভিতর। তরুর ভিতর এ কিছু পায় নি।...

যাক্, কত কথাই যে মনে উঠছে! আমার এই ডায়েরির পাতায়ও তা লিখতে সাহস হচ্ছে না,—এমন কি ভাবতেও ভয় করছে যেন।

একটা নূতন ব্যাপার দেখলাম্। বিমলবাবুর সাথে, আমার অত গল্প করা তরুর মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। সে আজ গম্ভীর হয়ে আমাকে এড়িয়ে এড়িয়েই কাটালে। সেটা এমনি পরিস্ফুট হয়ে উঠল যে, বিমলবাবু একবার হেসে বল্লেন, দেখছেন, আপনার সঙ্গে গল্প করাটা আপনার বন্ধুর কেমন অসহ্য লাগ্‌ছে! পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বল্লেন, কি আশ্চর্য্যি! স্ত্রী-পুরুষে যে সহজ সরল বন্ধুত্ব হতে পারে, সেটা অনেকে মুখে স্বীকার পেলেও পরের বেলা সইতে পারেন না।

স্তুতিগানে রাঙ্গা হয়ে চঞ্চল-চরণে এসে গাড়ীতে উঠলাম; বোর্ডিঙে এসেও বুকের দপদপানি আমার থামেনি।...

৬ চৈত্র।

এ কয়দিন আমার ডায়েরিতে হাত দিই নি; কেন না, নূতন কিছু লিখবার ছিল না। যা কিছু ছিল, তা লিখবার মত নয়,—কারণ, আমিই তা কিছু বুঝি নি, লিখব কি ছাই। ···আজও কিছু লিখবার নেই। শুধু এইটুকু লিখব যে, আমার জীবনের গতি একটুও এগোচ্ছে না,—কালের ঘড়িটা যেন বন্ধ।···এ কয়দিনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ঘটনা ও কথার চার-পাশে শুধু সহস্র-পাকে ঘুরে মরছি।

৭ই চৈত্র।

রবিবার। ভাবলাম তরুর একটু খোঁজ নিয়ে আসি। আয়নার সামনে বোধ করি আমার একটু বেশি সময়ই কাটল। দরোয়ান দু'তিনবার এসে বলে গেল, গাড়ী এসেছে। তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম। এসে দেখি, অস্ত-রবির রাঙা আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখে আপনা হতেই থম্‌কে দাঁড়ালাম।...বাইরে আজ অত রাঙা-নদীর ঢেউ কেন?

তরুর এক মাসিমা তাদের বাড়ীতে থাকেন। যেতেই তিনি বলে উঠলেন,—তরু ত এখানে নেই, ওর মার কাছে গেছে আজ কয়দিন হল।

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লাম, ওঃ, তাই না কি? কবে আস্‌বে?···বাস্তবিক, অতটা আশ্চর্য্য হওয়ার যে কারণ ছিল না, তা কথাটা বলেই বুঝতে পারলাম; কেন না, তার যে যাওয়ার কথা হচ্ছে, তা আমি আগেই শুনেছিলাম। কিন্তু তবু অমন চম্‌কে উঠলাম কেন?

তিনি বল্লেন, কবে আস্‌বে তার ঠিক নেই। ওপরে যাও—বিমল আছে ওখানে।

উপরে আসতেই বিমলবাবু বলে উঠলেন, আপনার বন্ধু ত নেই এখানে। আমি হেসে বললাম, কে বল্লে নেই? পরক্ষণেই মনে হল, ছি! শেষকালে 'ফ্লার্ট' সুরু করলাম!...

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাঁকে বললাম, আমাকে যেতে হয় এখন তা হলে। উনি এলে আমাকে জানাতে বলবেন।

তিনি বল্লেন, এই মোটে এলেন, এখনিই কি যাবেন? এমন বসন্তের সন্ধ্যায়ও বোর্ডিঙটা আপনার লোভনীয় হয়ে উঠল? আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আপনার সমস্ত দেহ মন বলে উঠছে, 'বাহির করেছে আজি পাগল মোরে।' সত্যি, এমন দিনে স্কুল-টিচারি আর বোর্ডিং-বাস,—সে ভগবানের একটা মস্ত অভিশাপ। কেন ভূতের বেগার খাটতে এসেছেন,—এ আপনার কাজ নয়।

আমি একটু খোঁচা দিয়ে বললাম, আপনার ভিতর যে এত কবিত্ব আছে,—কই, সে সংবাদ ত উনি আমাকে কোন দিন দেয় নি!

তিনি অন্যমনস্ক হয়ে বল্লেন, তাই না কি? তা' হলে আজ থেকে জেনে রাখুন।

তার পর হেসে বল্লেন, আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই,—ভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব? আমি থেমে বল্লাম, নির্ভয়েই বলুন। তিনি বল্লেন আমি বলতে চাই যে, এমন সুন্দর বাসন্তী সন্ধ্যাটা যারা উপভোগ না করে' বাসায় বা বোর্ডিঙে বসে কাটায়, ভগবান তাদের কঠোর অভিশাপ দেন।

আমি বললাম, অর্থাৎ?

তিনি বল্লেন, অর্থাৎ চলুন, মোটরে করে' একটু গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আসি।

রাজি হলুম। অনেকক্ষণ বেড়ানো গেল। পাশেই বসেছিলেন তিনি। আমার বাঁ হাতটা আলগোছে তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে অনেকক্ষণ স্পর্শ করে ছিলেন। সরিয়ে আনতে পারলাম না।

কিছুদিন আগে একজন আমেরিকান ডাক্তারের একটা বই পড়ছিলাম। তিনি তা'তে animal magnetism বলে একটা জিনিসের ব্যাখ্যা করেছেন। তখন কিছু বুঝলাম,—কিন্তু আজ আর বুঝিয়ে বলতে পারি না। বাসায় এসে বারান্দায় অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম,—স্থির হতে পারছিলাম না। মাঝে-মাঝে পেটের ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে, সারা দেহটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠছিল। দেহ-মন আজ আমার অত হাল্কা হয়ে গেল কেন?

১০ চৈত্র।

শুক্লপক্ষের আজ কোন্ তিথি জানি না। চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। আমার এই পাশের জানালাটা দিয়ে বাইরের অনেকখানিই দেখা যায়। সামনে চাইতেই, দৃষ্টিতে পড়ে গোটা-কয়েক দেবদারু গাছ—একরাশ ঘন পাতা নিয়ে তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই এক জায়গায় চাঁদের আলো পড়ে চক্‌চক্ করছে। সেখানটার সরু 'ফ্রিল'-দেওয়া কচি পাতাগুলির পুলক স্পন্দন শুধু চেয়ে দেখতেই ইচ্ছা করে। দার্শনিকতার ভিতর যাব না,—কিন্তু মনে হয়, এদের সাথে যেন আমার কতকালের সন্ধি।

এ কয়দিন বড় বিশ্রী ভাবে কেটেছে। চিন্তায় আনন্দ ছিল অনেক,—কিন্তু তার সাথে সাথে একটা অস্বোয়াস্তিও ছিল। একটা কথা বড় বেশি করে ভাবছি,—স্ত্রী-পুরুষের ভিতর সত্যিকার বন্ধুত্ব হতে পারে কি না। সেদিন বিমলবাবু বলছিলেন, এ আমার সবার চেয়ে বড় সৌভাগ্য যে, আপনার বন্ধুত্ব লাভ করেছি। শুনে মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু তার সাথে তেমন করে সায় দিতে পারছিলাম কি? আজ কয়দিন ধরে সেই বন্ধুত্বের কথাই ভাবছি। জানি না, কেন মনে হয়, এ সম্পর্ক বড় slippery—বড় পিচ্ছিল।

কিন্তু এই পিচ্ছিল কথা আমাকে কে শিখালে? ও কি সত্যি আমার মনের কথা? হয় ত বা। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি যদি নিজের সমস্ত দাবী গ্রাহ্য করে পূর্ণতা পেতে চায়, তবু মানুষেরই গড়া সমাজ-বুদ্ধি কেন সেখানে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে বলবে,—এ পথে যেয়ো না, এ বড় পিচ্ছিল? এ অস্বাভাবিক অধিকার মানব-প্রকৃতি কি করে যে এর হাতে তুলে দিয়ে, নিজেকে কেবলি বঞ্চিত করে কাল কাটাচ্ছে, ভেবে পাই না। মনে পড়ে সেই আদি মানব-জাতি—যারা শুধু আপন প্রকৃতির প্রেরণায় কস্তুরি মৃগের মত আকুল হয়ে ঘুরে বেড়াত। প্রকৃতি ভিন্ন আর কারুর আদেশ তারা মানত না। কি করে যে তেমন মুক্ত মানব-প্রকৃতি নিজের স্বাধীনতা খর্ব্ব করে' নিজেরই-গড়া সমাজ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল, ভাবতে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। অথচ, ইহার

বিরুদ্ধে বর্ত্তমান-কালের মানব-প্রকৃতিরও বিদ্রোহের অন্ত নাই। কিন্তু সমস্ত মন চাইলেও ওতে কঠিন আঘাত করতে সাহস হয় না, পাছে বা শব্দ হয়! এমনি সে নিরুপায়!— এই হাজার-হাজার বছরের ফলেও মানুষ আজো বেশি করে ভয় করে এই শব্দটাকেই। এই অস্বাভাবিক সমাজের সমস্ত বিধানের উপর শ্রদ্ধাহীন হয়ে উঠ্‌লাম।

১১ই চৈত্র।

আজো তেমনি কালকের মতই খাতা নিয়ে বসতে হল, —কিন্তু ঠিক কালকের মানুষটিই যে আমি আর নেই, তা বুঝতে দেরী হল না। পাশের জানালাটা খুলে দিতেই, দেবদারু গাছগুলির উপর দৃষ্টি পড়্‌ল,— জোছনায় কচি পাতাগুলি আনন্দে কেঁপে-কেঁপে কত কথাই জানাচ্ছে। কিন্তু আজ আর এদের দিকে চাইতে পার্‌লাম না,— জানালা বন্ধ করে দিলাম।

বিকাল হতেই ভাব্‌লাম, দেখে আসি, তরু এসেছে কি না; তখন হতেই একটা ভাবনা এসে জুটল, কি পরে' যাব। উপলক্ষ্য-বিশেষে এই পরিচ্ছদ জিনিষটা এমনি ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় যে, সেটা অতীত হয়ে গেলে, অনেক সময়ে ভেবে অবাক হতে হয় যে, এ নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কি দরকার ছিল। যা হোক, সে মীমাংসা হয়ে গেল। আমার কোন ঘীয়ে-রঙের 'স্কোয়ারনেক্ ব্লাউজের' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বিমলবাবুর মুখে কবে শোনা গিয়েছিল, সেকথা ভুল্‌তে পারি নি।

গিয়ে শুন্‌লাম, তরু আসে নি; তবে দু-এক দিনের ভিতরই আসবার কথা।... বিমলবাবুর মুগ্ধ দৃষ্টি আজ অত্যন্ত মূর্ত্তিমান হয়ে উঠ্‌ল।...সেদিনকার মত আজও অনেকক্ষণ মোটরে করে' বেড়িয়ে আসা গেল।...ফিরে এসে মোটর থেকে নাম্‌তেই, মিষ্টি রজনীগন্ধার গন্ধে আকুল করে দিল। কোথা থেকে গন্ধ আসছে, দেখ্‌বার জন্য চারদিকে চাইতেই দেখ্‌তে পেলাম, সিঁড়ির পাশে একটা টবের উপর একরাশ ফুল নিয়ে রজনীগন্ধার একটা ঝাড় ফুটে আছে। বিমলবাবু ক্ষুদ্র একটী 'বাঃ'...বলে সেদিকে অগ্রসর হলেন। তার পরই আবার দু'পা পিছিয়ে এসে, 'শোফারের' কাছ থেকে ছুরি চেয়ে নিয়ে, ঝাড়টা কেটে আনলেন। আমি বলে উঠ্‌লাম, আহা, কাটলেন কেন? তিনি হঠাৎ কোন উত্তর দিলেন না। শোফার সরে গেলে, ঝাড়টা আমার সামনে ধরে বল্লেন, কেটে গাছটাকে কষ্ট দিলুম বটে; কিন্তু ও যখন দেখতে পাবে, ওর উপহার কোথায় এসে পৌঁছেছে, তখন আর ওর কোন দুঃখ থাকবে না।..

ফুলের ঝাড়টা হাতে করে উপরে এসে, সেটাকে টেবিলের উপর রেখে, পাশেই একটা চেয়ারে বসলাম।

মানুষের জীবনে কচিৎ এমন শুভ মুহূর্ত্ত আসে, যখন নিজের ও বাইরের অস্তিত্বটা অত্যন্ত জলজ্যান্ত ভাবে উপলব্ধি করা যায়। তখন মানুষের অন্তর হতে ক্ষরিত আনন্দধারা বাইরের প্রকৃতির রূপ উৎসের সাথে মিলিত হয়ে, উচ্ছ্বসিত আবেগে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে।...উজ্জ্বল ঘর। ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছিল। ঘরের সামনেই দক্ষিণ দিকে বারান্দা; সেখানে নানা ফুলের অনেকগুলি টব সাজানো। দক্ষিণে-বাতাসের সাথে তারই গন্ধের মৃদু স্পর্শ যেন আমার সারা দেহ-মন দিয়ে উপলব্ধি করছিলাম। তিনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছিলেন,— সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কত কিছু নিয়েই যে আলোচনা চল্‌ছিল, তার অন্ত নেই। বায়রণ, টলষ্টয়, ষ্টীনবার্গ—মানব মনের যত কারবারী, কেউ তাঁ'তে বাদ যান্‌নি। তাঁর মুখে যেন খই ফুটছিল,—কথায় আর বিরাম নাই। আমিও কম বকে যাচ্ছিলাম না;—কিন্তু তবু মাঝে-মাঝে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়্‌ছিলাম।...একবার তিনি আমার পিছনে এসে, হঠাৎ তাঁর কয়টি আঙুলের ডগা দিয়ে আমার আলোক-উজ্জ্বল শুভ্র ঘাড় স্পর্শ করে বলে উঠ্‌লেন, সত্যি, 'স্কোয়ারনেক্' যদি কারুর পরবার অধিকার থেকে থাকে, তবে সে আপনার। আমার বুক-পেট সব কেঁপে উঠল। তার পর সামনে এসে বল্লেন, বিমলার সেই কথাটা আপনার মনে আছে? রবিবাবু বড় নূতন এবং চমৎকার একটু ব্যাপার সেখানে উল্লেখ করেছেন। বিমলা একটু উঁচু করে খোঁপা বাঁধত, এবং নিখিলেশ তার সুডোল ঘাড়ে—কেমন মনে নেই আপনার? আমার যখনই আপনার ঘাড়ের উপর দৃষ্টি পড়ে, তখনই সেই কথাটা মনে পড়ে যায়।...আমি কি ভাব্‌ছিলাম ঠিক নেই। সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ, নিঝুম। মনে হচ্ছিল, এই চৈত্রের সন্ধ্যার রূপ মাধুরীতে মণ্ডিত হয়ে আমি আছি অনাদি নারী, আর আমার সামনে ওই অনাদি পুরুষ।

এমন সময়ে নীচে গাড়ী-বারান্দায় ভাড়াটিয়া গাড়ীর শব্দ

হ'ল ; বিমলবাবু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরেই তরুর গলা শুন্‌তে পেলাম, 'বেশ যা'হোক, টেলিগ্রাফ কর্‌লাম দুপুর-বেলা, তবু ষ্টেশনে নিজে ত গেলেই না, কাউকে পর্য্যন্ত পাঠালে না। ভাগ্যিস তবু নৃপেন ছিল ; বেচারাকে আবার এই রাত্রে ভবানীপুরে যেতে হবে।' বিমলবাবু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, 'বাঃ কোন টেলিগ্রাম ত পাই নি।' আমি তখন অবধি-বসেই ছিলাম। এমন সময়ে তরু এসে এই ঘরে ঢুক্‌তে যাচ্ছিল,—কিন্তু আমাকে দেখেই থম্‌কে দাঁড়াল। খুকি, 'বাঃ রে, মাসীমা যে!' বলে দু'হাত তুলে আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল ; কিন্তু তরু তার হাত ধরে টেনে 'এদিকে এস' বলেই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।

একটা বিরাট ছি-ছি আমার মনে জেগে উঠে, আমাকে আচ্ছন্ন করে দিল। কে যেন সজোরে আঘাত করে'-করে' এই কথাগুলি আমার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে,—ঐ কন্যা, ঐ স্ত্রী—আর এই স্বামী—পিতা!......

তবু বেহায়ার মত তরুকে কুশল প্রশ্ন করে, কোন রকমে বিদায় নিয়ে, তাড়াতাড়ি এসে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। গাড়ীতে বসে-বসে ভাব্‌ছিলাম,—কয়দিন পূর্ব্বে সেই হাজার-হাজার বছর আগেকার মানুষের কথা ভেবে মনে হচ্ছিল, কি মুক্ত, স্বাধীন, অনাবিল ছিল তাদের প্রাণ—যারা শু প্রকৃতির আহ্বান ভিন্ন কারুর ডাক শুন্‌ত না। মনে হ'ত বর্ত্তমানের সামাজিক ধারণাগুলির সাথে মানব-প্রকৃতি যোগ বুঝি কিছুই নেই,—তাদের সহজেই মানুষ লঙ্ঘ করতে পারে—শুধু শব্দ হওয়ার ভয়েই বুঝি মানুষ সমাজ শৃঙ্খলে আঘাত করতে সাহস পায় না! কিন্তু আজ দেখ্‌ি তা নয় ; এর বেশি আরও কিছু আছে। এ আমা ভুলবার উপায় নেই যে, হাজার-হাজার বছরের সামাজি মানুষের রক্ত আমার প্রতি ধমনীতে।...তাই আজকে এই বিরাট ছি-ছি! আজ আরও মনে হচ্ছে, বড়দা ে আমার জন্য সামাজিক কারাগারের বন্দোবস্ত করছেন সেটা কারাগার না হয়ে দুর্গও হতে পারে, এবং চাই কি তা'তে মুক্তির বাতাসের অভাবও হয় ত হবে না। কারণ কতকাল ধরে নারীরা যে এই দুর্গেই বাস করে এসেছে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সাধ্য কার? —'সমাজ' যে কবে তা 'প্রকৃতি' হয়ে গেছে!...কিন্তু তবু আশ্চর্য্য এই যে, এ সমাজ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব আজো মিটেনি—এই সামাজিক মানুষের ভিতর দিয়েও কেমন করে অসামাজিক মানুষ মাঝে-মাঝে উঁকি মারে!

বিবিধ প্রসঙ্গ

আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়

[অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত এম্‌-এ, বি টি]

যুক্তরাজ্যের পাঁচ প্রকারের বিদ্যালয়।

সাধারণ শিক্ষা প্রদান উদ্দেশ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পাঁচ প্রকারের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রথম প্রকারের বিদ্যালয় কিণ্ডারগার্টেন নামে পরিচিত। এখানে শিশুগণ সাধারণতঃ ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাঠ করে। দ্বিতীয় প্রকারের বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় বলা হয় (Elementary School)। এই বিদ্যালয়গুলি দুই বিভাগে বিভক্ত—প্রাইমারী বিভাগ ও গ্রামার বিভাগ (Primary and Grammar Grades)। প্রাইমারী বিভাগে সাধারণতঃ ছয় হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত এবং গ্রামার বিভাগে দশ হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়া ছাত্রগণ উচ্চ বিদ্যালয়ে (High School) প্রবেশ করে ; এবং সেখানে চৌদ্দ হইতে আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে। তার পর কলেজ বিভাগ। সেখানে সাধারণতঃ আঠার হইতে বাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যুবকগণ নানা প্রকার গবেষণায় রত হয়।

কুমারকানন বিদ্যালয় (Kindergarten)।

প্রাইমারী বিভাগে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অনেকেই কুমারকানন বিদ্যালয়ে শিক্ষা করে আমেরিকায় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা-প্রণালীর আদর দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই শিক্ষা-প্রণালী কোমলমতি শিশুগণের সম্পূর্ণ উপযোগী—এই বিশ্বাস আমেরিকায় দিন-দিন বদ্ধমূল হইতেছে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা চারি হাজার ছিল। গত দশ বৎসরের মধ্যে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত শিশুদের জন্য এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি না জানি

না। তিন হইতে ছয় বৎসরের শিশুদিগকেও যে, কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে অথবা মণ্টেসরির প্রদর্শিত পথে, বেশ সুন্দর ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা আমাদের দেশে কেহ ভাবিয়াছেন কি? শিশু-জীবনের এই অংশের সদ্ব্যবহার করিলে, আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে সহজ ও সরলভাবে শিশুগণ যে কত বিষয় শিক্ষা করিতে পারে, তাহা ধারণার অতীত।

প্রাথমিক বিদ্যালয় (Elementary Schools)।

আমেরিকায় দুই প্রকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায় —পল্লী-বিদ্যালয় (Rural School) ও নগরের বিদ্যালয় (City School)।

পল্লী-বিদ্যালয়।

পল্লী বিদ্যালয়গুলি বৎসরের ভিতর শুধু শীতকালে ৭০।৮০ দিনের জন্য বসে। শিক্ষাভার কতকগুলি বাজে লোকের (Makeshift teachers) উপর অর্পিত থাকে। তাহারা বৎসরে ঐ কয়দিন মাত্র শিক্ষকতা করে; অবশিষ্ট সময় অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকে। শিক্ষাদান বিষয়ে তাহাদের কোনরূপ আগ্রহ বা ঔৎসুক্য পরিলক্ষিত হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ না যোটে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা বিদ্যালয়ের সংস্রবে থাকে,—সুবিধা পাইলেই অন্য কাজে চলিয়া যায়। পল্লী বিদ্যালয়গুলি আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থার কলঙ্কস্বরূপ। কিন্তু সুখের বিষয়, আমেরিকার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, এবং নানা উপায়ে এই সকল বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধিত হইতেছে। অচিরেই আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থার এই কলঙ্কচিহ্নগুলি অপসারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আমেরিকা যে উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদের পল্লী পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন করিতেছে, তাহা আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী না হইলেও, প্রণিধান যোগ্য। আমাদের দেশে এখন যেরূপ কোন ধনীর গৃহ-কোণে, অথবা শিক্ষকের জীর্ণ শীর্ণ আবাস-গৃহে বিদ্যালয় বসে, আমেরিকার মেসাচুসেট্ (Massachusetts) প্রদেশেও একসময়ে গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির প্রায় তদ্রূপ দুরবস্থা ছিল। এই অভাব দূর করিবার জন্য তথাকার শিক্ষা-কর্ত্তৃপক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাঠশালাগুলি একত্র করিয়া, একটী বৃহৎ পাঠশালার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেখানে বিদ্যালয়ের জন্য বড় বড় গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে গমনাগমনের জন্য যানেরও (covered wagon or motor car) ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে দেশের পল্লীগ্রামে পদব্রজে যাতায়াতের ভাল পথ নাই, সে দেশে মটর গাড়ীতে ছাত্রদের গমনাগমনের কথা অলীক কল্পনামাত্র। যাহা হউক, আমাদের পল্লী পাঠশালাগুলির উন্নতিকল্পে অবস্থানুসারে সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই যে চেষ্টা করা উচিত, এ বিষয়ে কোন রূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

নাগরিক বিদ্যালয়।

নগরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা গ্রাম্য পাঠশালা অপেক্ষা অনেক উন্নত। সেখানে আট বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হয়। সেই বিদ্যালয়গুলিতে আটটি ক্লাশ আছে। আমেরিকায় তাহাদিগকে গ্রেড্ (Grade) বলা হয়। প্রথম চারিটি গ্রেড (Grade) লইয়া প্রাথমিক বিভাগ (Primary Grade) গঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারিটি গ্রেড (Grade) লইয়া যে বিভাগ গঠিত হইয়াছে, আমেরিকায় তাহা গ্রামার (Grammar) বিভাগ বলিয়া অভিহিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমশ্রেণীভুক্ত নয়। আমাদের দেশের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ক্লাশ দুইটি বাদ দিলে যেরূপ বিদ্যালয় দাঁড়ায়, এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি সেই শ্রেণীর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হইলে আমাদের দেশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলি আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আকার ও প্রকার ধারণ করিবে। কারণ, তখন আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের ক্লাশ দুইটি Intermediate College-এর সঙ্গে সংযোজিত হইবে। এরূপ ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত কল্যাণ উৎপাদন করিবে। যাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন-দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং বড়-বড় গ্রামে এরূপ এক একটী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয় শাসন-কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণ উভয়ের সমবেত চেষ্টা ও সাহায্যের প্রয়োজন। মধ্য বাঙ্গালা ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি মিলিত করিয়া এরূপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আসিয়াছে।

নাগরিক বিদ্যালয়ের সাধারণ বিবরণ।

সমগ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সাধারণতঃ একজন অধ্যক্ষের (Principal) কর্ত্তৃত্বাধীন। কোথাও-কোথাও প্রাথমিক (Primary) বিভাগ ও গ্রামার (Grammar) বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ নিয়োজিত হয়। প্রত্যেক ৪০।৫০ জন ছাত্রের জন্য এক-একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয়। ছাত্রসংখ্যা অনুসারে একজন, দুইজন বা তিনজন কেরাণী হিসাবপত্র প্রভৃতি আফিস সংক্রান্ত কাজ করে।

নগরের বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ সকালবেলায় ৯টা হইতে ১২টা ও বিকালবেলায় ১-৩০ হইতে ৩-৩০ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এই সকল বিদ্যালয়ে, কোন-কোনও প্রদেশে, ছাত্রসংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সেখানে স্থানের অসঙ্কুলান হওয়ায় দুইদল ছাত্রকে দুই বেলায় পড়ান হয়। একদল ৮—৩০ হইতে ১২—৪০ পর্য্যন্ত পড়ে, ও আর একদল ১টা হইতে ৪—৫০ পর্য্যন্ত পড়ে।

বিদ্যালয়-গৃহগুলি বিশালকায় ও দেখিতে মনোহর (imposing)। গৃহের সম্মুখ দিয়া একটী সুদীর্ঘ ও উচ্চ বারেন্দা (corridors) চলিয়া গিয়াছে। সেই বারেন্দা হইতে বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করা যায়। কক্ষগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, তাহাতে বায়ু ও আলোক প্রবেশের সুবন্দোবস্ত আছে। প্রকোষ্ঠগুলি বড়-বড়; তাহাতে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ১২ বর্গফুট পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। গৃহের প্রাচীর-গাত্র ব্ল্যাক বোর্ড (Black board) দ্বারা প্রায় আচ্ছাদিত। ব্ল্যাকবোর্ডগুলি দেওয়ালের গায়ে এরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে, ছাত্রগণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া অনায়াসে সেখানে তাহাদের অধিকাংশ লিখনকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই একটী করিয়া বৃহৎ গৃহ

আছে; (*Hall or auditarium*)। সেখানে প্রয়োজন হইলে সমস্ত ছাত্র মিলিত হইতে পারে।

আমেরিকায় এই সকল বিদ্যালয়ে ক্রীড়াক্ষেত্র নাই;—নগরে স্থানাভাব বশতঃ এইরূপ হইয়াছে। এই অভাবের প্রতিকারের জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে ব্যায়ামাগার রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত ছাদের উপর তারের বেড়া দিয়া, ছাত্রগণের বল খেলার (Ball Games) বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কোন কোন নব নির্ম্মিত বিদ্যালয়-গৃহে আহারের ঘর আছে (Dining Hall)। সেখানে কেনা দরে ছাত্রদিগকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। কোথাও-কোথাও সরকারী ব্যয়ে ছাত্রদের জলযোগের বন্দোবস্ত আছে। তবে সাধারণতঃ জলযোগের ব্যয় ছাত্রদিগের পিতামাতাই বহন করে।

পাঠ্য-বিষয় (The Course of Instruction)

আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সাধারণতঃ যে বিষয়গুলি পঠিত হয় এবং সপ্তাহে যে বিষয়ে যত পাঠ প্রদত্ত হয়, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রতি সপ্তাহে যে যে বিষয়ের যত পাঠ প্রদত্ত হয়।

	প্রথম শ্রেণী (1st grade)	দ্বিতীয় শ্রেণী (2nd grade)	তৃতীয় শ্রেণী (3rd grade)	চতুর্থ শ্রেণী (4th grade)	পঞ্চম শ্রেণী (5th grade)	ষষ্ঠ শ্রেণী (6th grade)	সপ্তম শ্রেণী (7th grade)	অষ্টম শ্রেণী (8th grade)
পঠন (Reading)	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
লিখন (Penmanship)	১০	১০	৫	৫	৩	৩	…	…
বানান (Spelling)	…	…	…	৪	৪	৪	…	[illegible]
ব্যাকরণ এবং রচনা (Gram. with Comp.)	Oral ৫	Oral ৫	Oral ৫	Oral ৫	Oral ৫	Text Book ৫	Text Book ৫	…
ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ বা জারমান	…		…	…	…	…	…	৫
গণিত (Arithmetic)	Oral ৫	৫ (মৌখিক)	৫ (পুস্তক)	৫ (পুস্তক)	৫ (পুস্তক)	৫ (পুস্তক)	…	…
বীজগণিত (Algebra)	…	.	…	…	…	…	৫	৫
ভূগোল (Geography)	…	৪ মৌখিক	৪ (মৌখিক)	৪ (পুস্তক)	৪ (পুস্তক)	৩ (পুস্তক)	৪ (পুস্তক)	৩ (পুস্তক)
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science)	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা
যুক্তরাজ্যের ইতিহাস (History of U. S.)	…	…	…	…	…	…	৫	৫
সাধারণ ইতিহাস (General History)	১	১	১	১	১	১	১	১
শারীরিক ব্যায়াম (Physical Culture)	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা	১ ঘণ্টা
সঙ্গীত (Vocal Music)	"	"	"	"	"	"	"	"
চিত্রাঙ্কন (Drawing)	"	"	"	"	"	"	"	"
হস্ত-শিল্প (Manual Training) অথবা সিবন-বিদ্যা (Sewing) রন্ধন-বিদ্যা (Cookery)	…	…	…	…	…	…	অর্দ্ধেক দিন (½ day)	অর্দ্ধেক দিন (one half-day)

লিখন। (Penmanship)

এই পাঠ্য-তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম মান হইতে ষষ্ঠ মান পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরই লিখন শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ইংরাজি লিখন তৃতীয় মান হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং, আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইলে, আমাদিগকেও অষ্টম মান (অর্থাৎ 3rd class) পর্য্যন্ত লিখন শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে 'লিখন' শিক্ষা ষষ্ঠ মানেই (5th class) শেষ হয়। এই জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশে অনেক ছাত্রেরই লিখন পড়া-সোজা (legible) নয়। হস্তাক্ষর বিষয়ে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

বানান। (Spelling)

বানানশিক্ষা এখন আমাদের দেশে রীতিমত প্রদত্ত হয় না বলিলেই চলে। আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখনও আমরা ইংরাজি বিদ্যালয়ের অন্ততঃ প্রথম তিন শ্রেণীতে বানান শিক্ষা করিতাম। অবশ্য তখন যে প্রণালীতে বানান শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা কোন অংশেই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। বানান শিক্ষাদানের প্রণালী যদিও বর্ত্তমান সময়ে উদ্ভাবিত হইয়াছে, তথাপি তাহা এখনও আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে অবলম্বিত হয় নাই। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান প্রণালীর (Direct Method) দোহাই দিয়া অনেক শিক্ষকই "বানান শিক্ষাকে" তাঁহাদের বিদ্যালয়ের সীমা হইতে বিতাড়িত করিয়াছেন। কিন্তু Direct Method যে বানান শিক্ষার বিরোধী নয়, বরং বিজ্ঞানসম্মত বানান-শিক্ষাপ্রণালীর অনুমোদন ও সমর্থন করে, তাহা তাঁহারা অবগত নন। আমেরিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪র্থ মান হইতে ষষ্ঠ মান পর্য্যন্ত বানান শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংরাজি আমাদের মাতৃভাষা নয়। বিশেষতঃ ইহার বর্ণবিন্যাস-প্রণালী ও উচ্চারণ-প্রথা সর্ব্বত্র এক নিয়মানুযায়ী না হওয়ায়, ইহা আমাদের দেশের ছাত্রগণের পক্ষে বড়ই জটিল হইয়া দাঁড়ায়। তাই, আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে বানানশিক্ষার জন্য আমেরিকা অপেক্ষা অধিকতর সময় ও মনোযোগ দেওয়া স্বভাব-বিরুদ্ধ না হইয়া বরং স্বভাবানুমোদিত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, বানান-শিক্ষাদানের নবোদ্ভাবিত বিজ্ঞান-সম্মত প্রকৃষ্ট উপায় সর্ব্বদা অবলম্বনীয়।

ব্যাকরণ ও রচনা।

এই সকল বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ ও রচনা প্রথম গ্রেড্ হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম পাঁচ শ্রেণীতে মুখে মুখে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শুধু উপরের দুই শ্রেণীতে উক্ত বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা দিতে হইলে, পাঠ্য পুস্তকের সাহায্য লইতে হইবে. ইহাই এখনও আমাদের দেশের প্রাচীনপন্থী শিক্ষক ও অভিভাবকগণের ধারণা। পাঠ্য পুস্তক হইতে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দিলে, অনেক অভিভাবক মনে করেন যে. বিদ্যালয়ে কিছুই পড়ান হয় না। অথচ মৌখিক উপায়ে, প্রত্যক্ষ ভাবে (Direct Method) রচনা-বিষয়ক পাঠ প্রদত্ত হইলে, উহা যে কত উপাদেয় হয় তাহা অভিজ্ঞ (Trained) শিক্ষক মাত্রেই অবগত আছেন। ব্যাকরণ সম্বন্ধেও এখন সর্ব্বত্রই 'আরোহ' প্রণালী (Inductive Method) অবলম্বিত হইয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে ছাত্রদের মনের মধ্যে ব্যাকরণের সংজ্ঞাগুলি বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে বিষয়টি বোধগম্য হইলে, তাহারা নিজেই ব্যাকরণের সূত্র প্রস্তুত করিয়া লয়। ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করাইয়া পরে দৃষ্টান্তের অবতারণা করা বিজ্ঞান-সম্মত নয়; কাজেই, নিম্নশ্রেণীতে ব্যাকরণের মৌখিক শিক্ষাই প্রশস্ত।

বৈদেশিক ভাষা।

বিদেশী ভাষা (ল্যাটিন, গ্রীক বা জার্ম্মাণ) আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে মাত্র আরম্ভ হয়। কিন্তু ইংরাজি বিদেশী ভাষা হইলেও, উহা রাজভাষা বলিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এত প্রয়োজনীয় যে, ইংরাজি শিক্ষা আমাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণী হইতেই আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যে মাতৃভাষা পৃথিবীর সমস্ত সুসভ্য দেশে এত আদৃত হইতেছে, সেই মাতৃভাষাকে অবহেলা করা আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সমীচীন নয়। ইংরাজি ভাষার প্রতি অতিরিক্ত সময় ও মনোযোগ দিতে গিয়া, আমরা আমাদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রতি শৈথিল্য প্রকাশ করিতেছি। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানেরও যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী আছে, তাহা যেন আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, ইংরাজের বা আমেরিকানের পক্ষে ইংরাজি ভাষায় উৎকর্ষ সাধন করা যেরূপ গৌরবজনক কার্য্য, বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি বিধান করাও তদ্রূপ বাঙ্গালী মাত্রের পক্ষেই প্রার্থনীয় ও সম্মানকর কার্য্য। তাই আমেরিকা ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ইংরাজি শিক্ষাদানের জন্য যে বিজ্ঞানসম্মত মনোহর প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, আমাদের দেশে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষাদানের জন্য তদ্রূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত।

পাটীগণিত ও বীজগণিত।

আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাটীগণিত ষষ্ঠ গ্রেড (আমাদের পঞ্চম শ্রেণীতে) শেষ হয়; বীজগণিত ৭ম গ্রেডে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু এই পাঠ্য তালিকায় ক্ষেত্রতত্ত্বের (geometry) কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে ক্ষেত্রতত্ত্ব চতুর্থ শ্রেণীতে রীতিমত আরম্ভ হয়। উহা আরও দুই বৎসর পরে আরম্ভ করিলে ভাল হয় কি না, বিশেষজ্ঞগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

বস্তু-বিচার ও প্রকৃতি পাঠ সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা নিম্নশ্রেণীতে প্রদত্ত হয় বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আমাদের দেশে উচ্চ শ্রেণীতে একেবারেই পঠিত হয় না। পক্ষান্তরে আমেরিকায় প্রত্যেক শ্রেণীতে এক ঘণ্টা করিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়ান হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বলেন,—"আমাদের বিবেচনায়, বঙ্গদেশের প্রত্যেক

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞান পাঠ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার এক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত।"

হস্তশিল্প।

আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম ও অষ্টম গ্রেডে সপ্তাহে দিনার্দ্ধকাল হস্তশিল্প শিক্ষায় ব্যয়িত হয়। এই শিল্প শিক্ষা আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে এখনও প্রচলিত হয় নাই। সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগ কয়েকটি বিদ্যালয়ে হস্তশিল্প শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া ইহার উপযোগিতা পরীক্ষা করিতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন হস্তশিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—"কার্য্যকরী শিক্ষা ও হস্তশিল্প শিক্ষার প্রতি সম্প্রতি বঙ্গদেশে তাচ্ছিল্য ভাবই পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে ইহার সূচনা করা যাইতে পারে।"

সঙ্গীত।

আমেরিকার বিদ্যালয়ে সঙ্গীত শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে। সঙ্গীত শিক্ষা ভারতের পক্ষে কিছু নূতন জিনিস নয়। কবি ঠিকই গাহিয়াছেন,—"প্রথম সামরব তব তপোবনে।" অতি প্রাচীনকালে তানলয়-সংযোগে বেদের মন্ত্রসমূহ পাঠ করা হইত। তার পর, বাল্মীকি মুনির শিষ্য লব ও কুশ বীণা সংযোগে রামায়ণ গান করিয়া কিরূপে যজ্ঞক্ষেত্রে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং সঙ্গীত ভারতের নিজস্ব। বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া কিরূপে তাহার প্রচলন করা যায়, তাহা প্রণিধান-যোগ্য।

পাল-রাজগণের মন্ত্রিবংশ

[শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ]

বহু সহস্র বৎসর হইতে বঙ্গদেশে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ (আচার্য্য ব্রাহ্মণ) বাস করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদিগের প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত না থাকায়, অনেক ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণও সময়ে সময়ে ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া থাকেন। এজন্য বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের ঐতিহাসিক তত্ত্ব সাধারণের অবগতির জন্য গৌড়ের অধীশ্বর পাল-রাজগণের মন্ত্রিবংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্ত-বারিধি মহাশয় 'বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস' লিখিবার জন্য বঙ্গদেশের সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগেরই কুল-পঞ্জিকা, সামাজিক ইতিবৃত্তি, নানা দেশ হইতে উৎকীর্ণ প্রস্তর-ফলক, তাম্রলিপি প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ডে' বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয় রাজগণের মিহিরকুল হইতে উৎপন্ন; --পাল-রাজগণ শাকদ্বীপীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং তাঁহাদের মন্ত্রি-বংশও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন।" শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন,—"গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে একখানি বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে,—তাহাতে মানরাজ বংশ ও শাকদ্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শাকদ্বীপী মগ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব নূতন কালিদাস বলিয়া পরিচিত মগধাধিপের সভাপণ্ডিত মনোরথ গৌড়াধিপতির প্রধান মন্ত্রী দেবশর্ম্মার কন্যার এবং তৎপুত্র সকলশাস্ত্রবিৎ গঙ্গাধর গৌড়াধিপতির প্রিয়পাত্র ও ধর্ম্মাধিকারপদে নিযুক্ত মাননীয় জয়পাণির কন্যা পাশলদেবীর পাণি গ্রহণ করেন। মানরাজ মন্ত্রিবংশের সহিত এই যৌন সম্বন্ধ হেতু তাঁহাদিগকে অনায়াসেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাঠকগণের অবগতির জন্য শিলালিপিখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"দেবো জীয়াৎ ত্রিলোকী মণিরয় মরুণো যন্নিবাসেন পুণ্যঃ
শাকদ্বীপঃ সদুগ্ধাম্বুনিধি বলয়িতো যত্র বিপ্রা মগাখ্যাঃ।
বংশস্তত্রদ্বিজানাং ভ্রমিলিখিততনো ভাস্বতঃ স্বাঙ্গ
শাম্বো যানানিনায় স্বয়মিহ মহিতাস্তে জগত্যাং জয়ন্তি॥

* * * *

যস্তু চ মগধেশ্বরো নয়বশান্নীতি প্রয়োগাখিল
প্রাগ্‌ভ্রান্ত ভট্টৈরচুম্বিতমতিঃ সাম্যভিধানং ব্যধাৎ।
রাজা স্থান সরঃ সরোরুহমিতি স্বৈরং পুরঃ স্তাভুতাং
গীতো নূতনকালিদাস ইতি যঃ কালেষু বৈতালিকৈঃ

* * * *

পত্নী তস্য মনোরথস্য কৃতিন শ্চারিত্র্য মুদ্রাপদং
গৌড়ীদেশ নরেশ মুখ্য সচিব শ্রীদেবশর্ম্মাত্মজা।
মূর্ত্তামত্যমরুন্ধতীব জগতাং বন্দ্যা সতীনাং ধুরি
শ্রীমচ্ছঙ্কর আবিরঙ্কুরয়িতুং সৎপুণ্য বীজাঙ্কুরং।
যুদ্ধে বদ্ধোৎসব রিপু ভটশ্রেণি .....সদা লো-
বন্ধুঃ শুদ্ধো বিপদি বিসরৎ কায় নির্যাস সীমা।
শ্রেয়ান্ সভ্যঃ সদস বিশদে বিশ্ববিশ্বাস পাত্রং
পাতুঃ মিত্রং জন্মমিতরৎ তস্য গঙ্গাধরোঽভূৎ।

* * * *

গৌড়রাজ সুহৃদো জয়পাণে
র্ধিকারিক পদোপ পদস্য।
আত্মজা মুদবহৎ সুভগায়াঃ
পেশলাং স কিল পাশলদেবীম্।"

পাঠক এই সুবিস্তৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারিতেছেন যে, মানরাজগণের মন্ত্রিবংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত

বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ গৌড়রাজগণের মন্ত্রিবংশও অবশ্যই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণই হইবেন।

বরেন্দ্রভূমি হইতে উৎকীর্ণ গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে গৌড়দেশের অধিপতি পালরাজগণের মন্ত্রিবংশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুবিশাল গৌড়রাজ্যের পরিচালক গৌরবান্বিত এই ব্রাহ্মণ বংশের বিবরণে, ইঁহারা কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহার উল্লেখ না থাকায়, এই বংশের প্রতি অনেকেরই লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। হাওড়া মাজিষ্ট্রেট-কোর্টের ক্লার্ক মাহিষ্যগাজী ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—পালরাজারা মাহিষ্য জাতি ছিলেন। সুতরাং, তাঁহাদের এই মন্ত্রিবংশও মাহিষ্য ব্রাহ্মণ ছিল। তাঁহাদের কন্যাই মানরাজগণের প্রসিদ্ধ মন্ত্রিবংশ, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি মাহিষ্য-ব্রাহ্মণগণের গৌরব-বৃদ্ধির প্রয়াসী হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, রাজসাহী জেলার উকিল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় মনে করেন, পালরাজগণের মন্ত্রিবংশ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের সহিতই মানরাজগণের মন্ত্রিবংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। নগেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণ নহেন, তাঁহার এ বিষয়ে লাভ-লোকসান কিছুই নাই। সুতরাং, তিনি নিরপেক্ষ ভাবে এই মন্ত্রিবংশকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-বংশই বলিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে অক্ষয়বাবু বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রতি যেরূপ অযথা গ্লানিকর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাই পাঠকগণের নিকট বিচারার্থ উপস্থাপিত করিতেছি।

বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, পাল ও শূরবংশীয় নৃপতিগণ পরস্পর প্রতিযোগী ও শত্রু ছিলেন। মন্ত্রীই রাজ্যরক্ষার প্রধান অবলম্বন। মন্ত্রীর পরিচালনার উপরই রাজ্যের উন্নতি, অবনতি, রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি নির্ভর করে। এরূপ স্থলে শাকদ্বীপী ক্ষত্রিয় পালরাজগণ তাঁহাদের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূরদিগের আনীত রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ, গরুড়-স্তম্ভ-লিপিতে ধর্ম্মপাল হইতে পালবংশের ও তাঁহাদের মন্ত্রিবংশের বর্ণনা আছে। ঐতিহাসিকগণের অনুমান, ৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোপালদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, তৎপুত্র ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইতিহাসের প্রমাণে আদিশূর নামে কোন রাজা ছিলেন না। কেহ জয়ন্তকে, কেহ বা আদিত্যশূরকে আদিশূর বলিয়া কল্পনা করেন। জয়ন্ত ৭৩২—৭৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইহা ধর্ম্মপালের সময় ৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে মাত্র ৬৩—১৩ বৎসর পূর্ব্বে হইতেছে।

গরুড়-স্তম্ভ লিপি হইতে জানা যায়, গর্গ ধর্ম্মপালের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম পাঞ্চাল। পাঞ্চালের পিতা বীরদেব। বীরদেবের পিতা বিষ্ণু হইতে এই মন্ত্রিবংশের বর্ণনা গরুড়-স্তম্ভ লিপিতে পাওয়া যায়। সুতরাং, পাঠক নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিবেন, বিষ্ণুর সময়ে জয়ন্ত জন্মগ্রহণও করেন নাই। কাজেই জয়ন্তের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণই পালরাজগণের মন্ত্রী ছিলেন, ইহা বলা অক্ষয়বাবুর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

আদিত্যশূরের কাল ৮৭১ - ৯০০ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং, যাঁহারা আদিত্যশূরকে আদিশূর বলেন, তাঁহাদিগের মতে ধর্ম্মপালের রাজত্বের বহুকাল পরে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কাহারও মতে ৯৫৪ শাকে (১০৩২ খৃষ্টাব্দে) বিপ্রপঞ্চক বঙ্গে আসিয়াছিলেন — "বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।"

১০৫০—১০৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামপাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে কৌশিক গোত্রীয় এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকগণ অবগত আছেন, কৌশিক গোত্র রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের নাই,— বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের আছে। বিশেষ প্রবরমিশ্র দেবগ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায়। বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 'দেবগ্রামী সমাজ' নামে একটা সমাজও আছে। ইহা এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধও ছিল। এবং তথায় বহুসংখ্যক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ (আচার্য্য ব্রাহ্মণ) বাস করিতেন।

এস্থলে পাঠকগণের বিচারের সুবিধার জন্য গরুড়স্তম্ভ-লিপি উদ্ধৃত হইতেছে,

"(সিদ্ধং) শাণ্ডিল্যবংশে ঽভূদ্ বীরদেব স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥"

শক্রঃ পুরোদিশিপতির্নিতরদিশাস্বপরেষু
তত্রাপি দৈত্যপতিনাভিজিত এব [সখ্যঃ]
ধর্ম্মঃ কৃতস্তদধিপশ্চিদিশামধিক্ক
আসীৎ যশোভি বিহসন্ বৃহস্পতিঃ।

*　　*　　*　　*

আসমাদ্বিন্ধ্যা গাজসূত্রা পিতৃপিতা চপিতি নিনচকবালো
ভূপস্য আর শান্তিঃ যবন পরিণতা দেব বিধা প্রতীহঃ।
তাভ্যাং জন্মপ্রদেশে ত্রিনশঙ্কর মনো-নন্দনঃ যঃ পিপ্লাপিঃ
শ্রীমান্ কেদার মিশ্রো গুহ ইব বিকসজ্জাতরূপ প্রভাবঃ ॥
স্বস্থদন্ন সমর্পিতান চতুর্বিদ্যা পয়োনিধীন্।
জহাসাগস্ত্য — সম্পত্তি মুনিদ্বন্দ্ব বাল এব যঃ।
উৎকীলিতোৎকল কুলঃ হৃত হূণ গর্ব্বঃ
খর্ব্বীকৃত দ্রবিড় গুর্জ্জর নাথ দর্পং।
ভূপীঠমব্ধি রশনাভরণম্বুভোজ
গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং।

*　　*　　*　　*

যজ্ঞেজ্যায় বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বেব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধি মেখলস্য জগতঃ কল্যাণ সক্তঃ চিরং
শ্রদ্ধাম্বুঃপ্লুত মানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতং পয়ঃ।

দেবগ্রামভবাতস্ত পত্নী বব্বাভিধা হভবৎ।
অতুল্যাচলয়া লক্ষ্যা সত্যা চাপ্যানপত্যয়া॥
জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নকক্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবা পরঃ॥
কুশলোগুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষুঃন্ পশু বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরাস্ত কা তস্য॥

মানরাজগণের মন্ত্রিবংশের বর্ণনা ভরদ্বাজ নামক ব্যক্তি হইতে আরম্ভ। এই ভরদ্বাজ গোত্র-প্রবর্ত্তক ভরদ্বাজ নহেন,—ভরদ্বাজ নামক ব্যক্তি-বিশেষ। সেইরূপ এই গরুড়-স্তম্ভের এক স্থানে শাণ্ডিল্য বংশে ও অন্য এক স্থানে জমদগ্নি কুলোৎপন্ন থাকায় নগেন্দ্রবাবুর মত শাণ্ডিল্য নামক ব্যক্তি-বিশেষের বংশ, জমদগ্নিই এই বংশের গোত্র। প্রশস্তিতে বংশের প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিচয়ই প্রধান উদ্দেশ্য। পরশুরামের সহিত উপমার আবশ্যক হওয়ায় প্রাসঙ্গিক গোত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই বংশ জমদগ্নি-গোত্র। তাহা না হইলে পরশুরামের সহিত উপমা চলিতে পারে না। শাণ্ডিল্য গোত্র হইলে "বিষ্ণুঃ শাণ্ডিল্য গোত্রে হভূৎ" এইরূপই লিখিত হইত।

১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রে অক্ষয়বাবু মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কিলহার্ণ সাহেব এই স্তম্ভ লিপির পাঠোদ্ধার করিবার সময়ে যে "বিষ্ণুঃ শাণ্ডিল্য বংশেহভূৎ" লিখিয়াছেন, তাহার বিষ্ণু শব্দের পরিবর্ত্তে সেই স্থানে 'ভৃগু' শব্দটা বসাইয়া দিলেই সুন্দর উপমা চলিবে।

জমদগ্নি গোত্র রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে নাই। বঙ্গীয় শাকদ্বীপী (আচার্য্য ব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আছে। শাণ্ডিল্যগোত্র আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যেও আছে। একজন্য অক্ষয়বাবু এই বংশকে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা করিলেও, আমি পূর্ব্বে রাজত্বের কালনির্দ্দেশ দ্বারা দেখাইয়াছি, আদিশূরানীত ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের কেহ মন্ত্রী হইতে পারেন না। বিশেষ, মানরাজগণের মন্ত্রি বংশের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ হেতু ইঁহারা নিঃসন্দেহে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ।

শাণ্ডিল্য গোত্র বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বিরল নহে। সুতরাং গোত্রের বিচার অনাবশ্যক।

ফেরিস্তা ও রিয়াজউস্‌সালাতিন নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়, শাকলাদীপ খৃঃ পূঃ ৭০০ বৎসরেও পূর্ব্বে পূর্ব্ব-ভারত জয় করিয়া গৌড় নগর প্রতিষ্ঠা করেন।* ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে গৌড়ে শাকদ্বীপী ক্ষত্রিয়গণের আধিপত্য। ক্ষত্রিয়ের উপনিবেশ স্থাপিত হইলেই সে স্থানে ব্রাহ্মণেরও বাস হইবে। শাস্ত্রানুসারে পৌরোহিত্য, গুরুতা, মন্ত্রিত্ব, প্রাড়্‌বিবেকত্ব প্রভৃতি কার্য্য ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত। সুতরাং আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এদেশে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস মিশ্র বিরচিত 'মগব্যক্তি' নামক গ্রন্থে পৌণ্ড্রার্ক সম্প্রদায়ের শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের 'পৌণ্ড্রার্ক' নামক সূর্য্যের নামানুসারে তাঁহারা ভিন্নদেশীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সমাজে পৌণ্ড্রার্ক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত। এইরূপে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ 'কোণার্ক' নামক সূর্য্যের নামানুসারে উড়িষ্যার শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ 'কোণার্ক' নামক খ্যাত। উক্ত মগব্যক্তি নামক গ্রন্থে ভারতের নানা প্রদেশের ৫৫ প্রকার এবং 'দিব্যানন্দ চন্দ্রোদয়' নামক গ্রন্থে ৭২ প্রকার শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পালরাজগণের মুদ্রায় যজ্ঞবেদী, সূর্য্যমূর্ত্তি ও 'ম' অক্ষর পাওয়া যায়। শাকদ্বীপীয়গণ সূর্য্যোপাসক। ("শাকদ্বীপেতু তৈ বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপধরো মুনে!" ইতি মহাভারত) মগ, মাগধ, মানস ও মন্দগ—শাকদ্বীপে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের এই চারি প্রকার সংজ্ঞা। সকল বর্ণের সংজ্ঞার পূর্ব্বে সূর্য্যার্থবোধক 'ম' অক্ষর আছে। যথা,—

"মকারো ভগবান্ দেবো ভাস্করঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মকার ধ্যান যোগাচ্চ মগহেতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের পূর্ব্বে পালরাজগণ সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের পরেও সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণকে তাঁহারা অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং ভূম্যাদি দান করিতেন। পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তর্গত নানা স্থানে পালরাজগণ পরাশর, উপমন্যু, কৌশিক প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণকে যে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহা নানা শিলালিপি হইতে জানা যায়। সেই সকল লিপি উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধের কলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অক্ষয় বাবুর প্রকাশিত 'গৌড়লেখমালা'য় বঙ্গানুবাদের সহিত ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল গোত্র বঙ্গের পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের নাই, বঙ্গের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরই আছে। এই সকল শিলালিপির কোন কোনটীর শ্লোক সুকবি মন্ত্রী গুরবমিশ্রের রচিত। ইহাতেও কতকটা অনুমান করা যায়, যাঁহারা দান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ গুরবমিশ্রের আত্মীয়, না হয় অন্ততঃ একই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইবেন। এই সকল জানিয়াও অক্ষয় বাবু ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রে এই পালরাজগণের মন্ত্রিবংশকে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ না বলার প্রধান কারণ দেখাইয়াছেন,—"সে কালের শাস্ত্রসংগত সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধনের মধ্যে গণক ব্রাহ্মণের পক্ষে এরূপ উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না।"

পাঠকগণ বিচার করুন, ধর্ম্মপালের সময় হইতে এই মন্ত্রি-বংশের বর্ণনা আছে। কাহারও মতে ধর্ম্মপালের কয়েক বর্ষমাত্র পূর্ব্বে পাঁচজন করিয়া ১০ জন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন। কাহারও মতে ধর্ম্মপালের পরে আসিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় সুদৃঢ় সমাজ বন্ধন অক্ষয়বাবু কোথায় পাইলেন? যদি এইরূপ সুদৃঢ় সমাজ-বন্ধন থাকে, তবে মানরাজগণের মন্ত্রিবংশ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত গৌড়-রাজগণের মন্ত্রিবংশের বৈবাহিক

* Vide Riyaz translated by Maulavi Abdus Salam. p. 53-54.

সম্বন্ধ শিলালিপি হইতে জানিয়া তিনি কিরূপে বলিতে পারেন, গৌড়-রাজগণের মন্ত্রিবংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নহে?

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুল-পঞ্জিকা হইতে জানা যায়, বল্লালসেনের সময়েই তাঁহাদের সমাজ বন্ধন ঘটিয়াছে। যে সময় পালরাজদিগের রাজত্বের অবসান হইয়াছে, সেই সময় হইতে বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণেরও প্রভুত্ব (তেহি নো দিবসা গতাঃ) লোপের সূত্রপাত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে অক্ষয় বাবু ইহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ বিকৃত ধারণা করিয়াছেন,—বল্লালের সময়ে এই ব্রাহ্মণ বংশের প্রভুত্বের খর্ব্বতা না হওয়ায়, বল্লাল-চরিতে তাঁহারা নিন্দনীয় হন নাই। বল্লাল চরিতে লিখিত আছে —

"মগাস্তু ব্রাহ্মণাঃ পূর্ব্বং নিঃসৃতাঃ সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
জলদর্ক প্রতীকাশাঃ শাকদ্বীপ মবাতরন্॥"

রাজ্যভ্রষ্ট পালরাজগণ লজ্জাবনত বদন লোক সমাজে দেখান ক্লেশকর বুঝিয়া, স্বকীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, কায়স্থ প্রভৃতি জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন। তাঁহাদের পুরোহিত-বংশও কেহ কেহ সপ্তশতী প্রভৃতি এক একটী কল্পিত নামে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সপ্তশতী ও শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদের প্রাচীন বংশ গাঁই প্রভৃতির ঐক্য দেখাইয়া দিয়াছেন। এস্থলে কয়েকটী মাত্র উল্লিখিত হইল। যথা, —

শাকদ্বীপিপুর	সপ্তশতীয় পুর
[illegible]	[illegible]
কুরেঅরি	[illegible]
পিতিআরক	পিতারি
বাড়আরি	বেড়
চিহিক	চহাড়
সারেআর	সুরাই

ইত্যাদি।

বাস্তবিক, দশশত করধারী ভগবান্ সূর্য্যদেবের দশদিকে দশশত রশ্মির মধ্যে সপ্তদিকের শ্রেষ্ঠ সপ্তরশ্মিই সপ্তগ্রহের জন্মদাতা।* সুতরাং বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সপ্তশতী ব্রাহ্মণ গ্রহবিপ্র হইতে পৃথক নহে। পুনঃ মৎস্য পুরাণে —

"চন্দ্রঋক্ষ গ্রহাঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়াঃ সূর্য্যসম্ভবাঃ।
হরিকেশঃ পুরস্তাত্তু যোবৈ নক্ষত্র যোনিকৃৎ।
দক্ষিণে বিশ্বকর্ম্মাতু রশ্মিরাপ্যায়ৎ বুধং॥
বিশ্বাবসুশ্চ যঃ পশ্চাচ্ছুক্র যোনিশ্চ স স্মৃতঃ।
সংবর্দ্ধনস্তু যো রশ্মি স যোনি লোহিতস্য চ॥
ষষ্ঠস্ত্বশ্বভূরশ্মি র্যোনিঃ স হি বৃহস্পতেঃ।
শনৈশ্চরং পুনশ্চাপি রশ্মিরাপ্যায়তে স্বরাট্॥"

পূর্ব্বস্থ হরিকেশ, নক্ষত্র ও চন্দ্রের জনক। দক্ষিণস্থ বিশ্বকর্ম্মা বুধের, পশ্চিমস্থ বিশ্বাবসু শুক্রের, সংবর্দ্ধন মঙ্গলের, অশ্বভূ বৃহস্পতির এবং স্বরাট নামক রশ্মি শনির প্রকাশক।

এইরূপে ইঁহারা রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করেন নাই, ইঁহারা জ্যোতিষ ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইঁহাদের নিকট অন্য ব্রাহ্মণগণ পুরশ্চরণ স্বধা-পূজার নিদর্শন স্বরূপ কেবল সূর্য্য ও তদানুষঙ্গিক গ্রহগণের পূজায় ইঁহাদিগকে অধিকারী রাখিয়াছেন।*

গ্রহ, তিথি, নক্ষত্র প্রভৃতি বিরুদ্ধ জন্য উৎসর্গীকৃত দানদ্রব্য এবং মাতৃকা বাস্তুদেব ও গণেশ পূজার দ্রব্যও ইঁহারা পাইয়া থাকেন।

আমরা দেখিতে পাই, সুবিশাল বটবৃক্ষে নানাজাতীয় পক্ষিগণ আশ্রয় লইয়া থাকে। বটবৃক্ষ তাহাতে ম্রিয়মাণ না হইয়া, তাহার নানা শাখা প্রশাখা হইতে শিকড় নামাইয়া, ভূমি হইতে রস গ্রহণপূর্ব্বক ক্রমশঃ উন্নত ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বংশ (বাঁশ) অত্যধিক উচ্চ হইলেও, একটী মাত্র পক্ষীর ভারে অবনত হইয়া পড়ে। যতদিন বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ এইরূপ বটবৃক্ষের ন্যায় ছিল,—যতদিন তাঁহারা বাণিজ্য তরণীতে নানা দেশ বিদেশে উপনীত হইয়া, শিল্প দ্রব্যাদির বিনিময়ে প্রচুর অর্থ স্বদেশে আনয়ন করিতে পারিতেন, ততদিন সৌর, শৈব বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই গৃহস্থের কল্যাণার্থ নিজ নিজ উপাস্য দেবতার পূজায় নিযুক্ত হইতেন। গৃহস্থগণও কাহাকেও হেয় জ্ঞান করিতেন না।

---

* "তস্য যে রশ্ময়ো বিপ্রাঃ। সর্ব্বলোক প্রদীপকাঃ।
তেষাং শ্রেষ্ঠাঃ পুনঃ সপ্তরশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ॥" কূর্ম্ম।

* (১) "এতে মৎপূজনে যাগাঃ প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অধিপা ভোজকাঃ সর্ব্বে নান্যে বিপ্রাদয়ো নৃপ॥"
— ভবিষ্যপুরাণে।

(২) "অতস্তং সাধকে নৈব কারয়েৎ গ্রহপূজনং।
অন্যথা গ্রহ পূজায়াং ন কদাচিৎ ফলং ভবেৎ॥" বাণীতন্ত্রে।

(৩) "গ্রহাণাং লোকপালানাং দ্রুমবৃক্ষাদিকস্য চ।
মাতৃকানাং যোগিনীনাং গণেশস্য সুরেশ্বরি!
তিথি নক্ষত্র বারাণাং যোগানাং করণস্য চ।
বাস্তুদেবস্য সর্ব্বেষাং গ্রহবিপ্রায় চাপয়েৎ॥" গ্রহযামলে।

(৪) উপাস্যদেবতা প্রসঙ্গে কূর্ম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে—
গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাচ ব্রহ্মচারিণাম্।

(৫) বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় লিখিয়াছেন—
"বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ স ভস্মদ্বিজান্
মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রাহ্মণঃ।
শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদুঃ
যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া॥"

বিষ্ণুপূজায় বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, সূর্য্যপূজায় মগব্রাহ্মণ, শিব-পূজায় শৈব-ব্রাহ্মণ, মাতৃ-পূজায় জ্যোতির্ব্বিদ ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার পূজায় ব্রাহ্মণমাত্রকেই, বুদ্ধের পূজায় বৌদ্ধগণ ও জিনের পূজায় জৈন ব্রাহ্মণগণকে নিযুক্ত করিবে।

কিন্তু হিন্দু-সমাজ ক্রমশঃ বংশের ন্যায় কৃশ হইয়া পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। তাঁহাদের সে বাণিজ্য-তরণী নাই, সে শিল্পদ্রব্য নাই, সে ধনরত্ন নাই। এক্ষণে একজন গুরু বা পুরোহিতের ভারেই সমাজ নত হইয়া পড়ে। অন্যে আর তাহা হইতে ভাগ লইবার সুযোগ পান না। পুরোহিত ঠাকুরগণও দেখিয়াছেন, সকলকে ভাগ দিতে গেলে নিজের উদর পূর্ত্তি হয় না। সুতরাং (চাচা আপন বাঁচা) অন্য ভাগীদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য অন্য ভাগীদিগের নিন্দা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতেও ভাগ লইতে না পারে, (সমূলঘাতং ঘ্নন্তীদরীংশ্চ) তাহার জন্য শাস্ত্রে নানা-প্রকার নিন্দাসূচক বচন প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। অক্ষয়বাবু শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক বচন তুলিয়াছেন—

> জ্যোতির্ব্বিদো হ্যথর্ব্বাণঃ কীর পৌরাণ পাঠকাঃ।
> শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরনীয়া কদাচন॥"

যে কারণেই হউক, অক্ষয়বাবু জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের কেবল নিন্দাই দেখিতে পাইয়াছেন, প্রশংসা দেখিতে পান নাই। এজন্য আমাকেই বাধ্য হইয়া প্রশংসা-সূচক কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতে হইতেছে— মহর্ষি গর্গ বলিয়াছেন,—

> সগ্রন্থার্থং চৈতৎ কৃৎস্নং জানাতি যো দ্বিজঃ।
> অগ্রভুক্ স ভবেৎ শ্রাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তি পাবনঃ॥

অর্থের সহিত সমগ্র জ্যোতিষ শাস্ত্র যিনি জানেন, তিনি পংক্তিপাবন, তাঁহাকেই শ্রাদ্ধে সর্ব্বাগ্রে ভোজন করান কর্ত্তব্য।

> "জ্যোতিশ্চক্রেতু লোকস্য সর্ব্বস্যোক্তং শুভাশুভং।
> জ্যোতির্জ্ঞানন্ত যো বেদ স যাতি পরমাং গতিং॥" গর্গ।

জ্যোতিষশাস্ত্র সকলের শুভাশুভ নিরূপণ করে, এজন্য যিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্র জানেন, তিনি পরমাগতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।

> "দিব্যং চক্ষু গ্রহাণান্ত দর্শিতং জ্ঞানমুত্তমং
> বিজ্ঞায়ার্কাদি লোকেষু স্থানং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্॥" সূর্য্য সিদ্ধান্ত।

গ্রহদিগের জ্ঞান দিব্যচক্ষু স্বরূপ। গ্রহজ্ঞানী ব্যক্তি সূর্য্যাদি লোকে চিরস্থায়ী স্থান প্রাপ্ত হ'ন।

> "ন সম্বৎসর পাঠী চ নরকে পরিপদ্যতে।
> ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠাঞ্চ লভতে দৈবচিন্তকঃ॥"

সম্বৎসরপাঠী অর্থাৎ জ্যোতির্ব্বিদ্ নরকগামী হয় না। দৈবচিন্তক ব্রহ্মলোকে স্থান প্রাপ্ত হয়।

> "দেবা যত্র চ পূজ্যন্তে সাম্বৎসর পুরোহিতৌ।
> গুরবো গ্রহ নক্ষত্রং তদ্রাজ্যং ভূতি লক্ষণং॥"

দেবতা, জ্যোতির্ব্বিৎ, পুরোহিত, গুরু, গ্রহ, নক্ষত্র ইহাদের যে রাজ্যে পূজা হয়, সে রাজ্যের উন্নতি হইয়া থাকে।

মাণ্ডব্য বলিয়াছেন—

> "এবম্বিধস্য শ্রুতিনেত্র শাস্ত্র
> স্বরূপ ভর্ত্তুঃ খলুদর্শনং বৈ।
> নিহন্তা শেষঃ কলুষং জনানাং
> সম্বৎসরং ধর্ম্ম সুখাস্পদং স্যাৎ॥"

জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের চক্ষু। জ্যোতির্ব্বিদ দর্শনে ছয়বৎসরের সকল পাপ নষ্ট হয় এবং ধর্ম্ম ও সুখলাভ হয়।

রাজমার্ত্তণ্ডকার বলিয়াছেন—

> "পুরোধা গণকো মন্ত্রী বৈদ্যশ্চাপি চতুর্থকঃ।
> প্রাতঃকালেষু দ্রষ্টব্যো নিত্যং হি শ্রিয়মিচ্ছতা॥"

প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরোহিত জ্যোতির্ব্বিৎ, মন্ত্রী ও বৈদ্যের দর্শনে শ্রীলাভ হয়।

> বৈদ্যঃ পুরোহিতো মন্ত্রী দৈবজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ।
> এতে রাজ্ঞা সদা পোষ্যা কৃচ্ছ্রেষ্বাপি প্রিয়ো যথা॥

কৃচ্ছ্র বিপদেতেও বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞ এই চারিজন স্ত্রীর ন্যায় অবশ্য পালনীয়।

গর্গ বলিয়াছেন,—

> কৃৎস্নাঙ্গোপাঙ্গ কুশলং হোরাগণিত নৈষ্ঠিকং।
> যো ন পূজয়তে রাজা স নাশ মুপগচ্ছতি॥

জ্যোতিষের হোরা ও গণিত নামক বিভাগে, এবং অন্যান্য বিভাগে যে কুশল, তাহার পূজা না করিলে রাজা নাশ প্রাপ্ত হয়।

> যস্তু সমগ্ বিজানাতি হোরা-গণিত-সংহিতাং।
> অভ্যর্চ্চ্য স নরেন্দ্রেণ স্ব কর্ত্তব্য জয়ৈষিণা॥

হোরা, গণিত ও সংহিতা এই বিভাগত্রয় পরিজ্ঞাতা জ্যোতির্ব্বিদ্ রাজার অবশ্য পূজনীয়।

> অপ্রদীপা যথারাত্রি রনাদিত্যং যথা নভঃ।
> তথাঽসাম্বৎসরো রাজা ভ্রমত্যন্ধ ইবাধ্বনি॥
> মুহূর্ত্ত তিথিনক্ষত্র মৃতবশ্চায়নে তথা।
> সর্ব্বাণো বাকুলানি স্যু র্ণ স্যাৎ সাম্বৎসরো যদি॥
> তস্মাৎ রাজ্ঞাভিগন্তব্যো বিদ্বান্ সাম্বৎসরোঽগ্রণীঃ।
> জয়ং যশঃ শ্রিয়ং ভোগান্ শ্রেয়শ্চ সমভীপ্সতা॥

বিশেষতঃ রাজকার্য্যে জ্যোতির্ব্বিদের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক। গর্গ বলিয়াছেন;—

গরুড়স্তম্ভ লিপির এই শ্লোকে 'সম্পন্নক্ষত্রচিন্তক' এই পদের অর্থ গুরবমিশ্র পক্ষে 'সম্পৎ' এবং 'নক্ষত্র' উভয়ের চিন্তাকারী—এইরূপ অর্থ সঙ্গত মনে হয়। পরবর্ত্তী শ্লোকে "নিষ্ণাততাং জ্যোতিষ" এই বাক্য থাকায়, গুরবমিশ্র যে জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। নক্ষত্র লইয়াই দ্বাদশরাশি ও রাশিচক্র; সুতরাং নক্ষত্রের চিন্তাই জ্যোতিষ শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। সম্পৎ পাইলেই অধিকাংশ লোক শাস্ত্রচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা সম্পদেরই চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু গুরবমিশ্র একচ্ছত্র রাজার মন্ত্রী, প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর; তথাপি তিনি নক্ষত্রচিন্তা পরিত্যাগ করেন নাই। তাই তিনি জ্যোতিষে নিষ্ণাত ছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবুও তাঁহার সঙ্কলিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র 'রাজন্যকাণ্ডে' এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বিবরণে তাঁহাকে নক্ষত্রচিন্তকই বলিয়াছেন; কিন্তু অক্ষয় বাবু ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রে লিখিয়াছেন,—

সম্পৎ নক্ষত্র একটী পারিভাষিক শব্দ। তাহা প্রতি বৎসরই নূতন পঞ্জিকায় ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন পূর্ব্বে অনুভব করিতে না পারিয়া "গৌড়লেখমালায়" অনুবাদ মধ্যে সম্পৎ নক্ষত্রচিন্তক এইরূপ পদচ্ছেদ করিয়া পাঠ করিবার সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশের পাঠকের পক্ষে এইটুকু ইঙ্গিত যথেষ্ট হইবে মনে হইয়াছিল। এখন দেখিতেছি, সকলের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয় নাই। যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম তাহার পক্ষে সেই নক্ষত্রের নাম 'জন্মনক্ষত্র'। সেই নক্ষত্র ধরিয়া পর-পর নয়টী নক্ষত্র তাহার পক্ষে পৃথক নামে কথিত হয়। এইরূপ পর্য্যায়ে গণনা করিবার সময়ে বালকের দ্বিতীয় নক্ষত্র থাকিতেই তাহাই সম্পৎ নামে কথিত হইয়া থাকে।

নক্ষত্রগুলির নাম এইরূপ—

> জন্ম সম্পৎ বিপৎ ক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
> মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ নবতারা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

জাতকের পক্ষে যে নক্ষত্রটী 'সম্পৎ', এই নক্ষত্রে শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা সুসম্পন্ন হয়। ভট্ট গুরব অনেক শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং কোন সময়ে তাঁহার সম্পৎ নক্ষত্র উদিত হইবে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে জ্যোতিষ গণনা করিতে হইত। ইহা ভট্টগুরবের নিয়ত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের আগ্রহ সূচনার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সম্পৎ শব্দটী ছাড়িয়া দিয়া, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কেবল নক্ষত্রচিন্তকটুকু বাহাল রাখিয়াছেন এবং তাহাকেই নক্ষত্র-পাঠক অর্থে প্রমাণরূপে খাড়া করিয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব শাস্ত্রব্যাখ্যায় বঙ্গসাহিত্যকে এমন করিয়া উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। সুতরাং গত্যন্তর না দেখিয়া বাধ্য হইয়াই বলিতে হয় "গরজ বড় বালাই।"

পাঠকগণ অভিধানপূর্ব্বক দেখিলে, অক্ষয় বাবুর এই ব্যাখ্যা সঙ্গত মনে করিতে পারিবেন না। যদিও অভিধানে নক্ষত্র ও তারা একার্থক শব্দ, তথাপি নবতারা ও নবনক্ষত্র এক কথা নহে। জন্ম নক্ষত্র হইতে ২৭টী নক্ষত্র পর্য্যায়ক্রমে তিনবার আবর্ত্তনে ২৭ ÷ ৩ = ৯ নয়টী তারা হইয়া থাকে। জন্মনক্ষত্র, তাহা হইতে দশম নক্ষত্র, ও উনবিংশতি সংখ্যক নক্ষত্র এই তিনটী জন্মতারা। এইরূপ জন্মনক্ষত্রের পরবর্ত্তী নক্ষত্রটী সম্পৎ তারা। এইরূপে প্রতি তারা হইতে দশম ও উনবিংশতি সংখ্যক নক্ষত্রও সেই তারা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জন্মনক্ষত্র বলিতে যে নক্ষত্রে বালকের জন্ম, কেবল তাহাকেই বুঝায়। জন্মতারার তিনটী নক্ষত্রকে বুঝায় না। এইরূপ জন্মতারা বলিতে তিনটী নক্ষত্রকে বুঝায়, কেবল জন্মনক্ষত্র বুঝায় না। এইরূপ সম্পৎ তারা অর্থেও সম্পন্নক্ষত্র শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। তারাগুলি এখানে পারিবারিক সংজ্ঞাবিশেষ, সুতরাং সম্পৎ নক্ষত্রকে সম্পৎ তারা অর্থে প্রয়োগ করিয়া অক্ষয়বাবু জ্যোতিষশাস্ত্রের রীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। অক্ষয়বাবুর ইহাও মনে করা উচিত ছিল, নয়টী তারার মধ্যে সম্পৎ, ক্ষেম, সাধক, মিত্র ও পরমমিত্র এই কয়টী তারা সকল কার্য্যেই শুভ ফলদায়ক। বিবাহ, নবান্নাদি শ্রাদ্ধ, ঔষধ ব্যবহার, যাত্রা ও ক্ষৌরকর্ম্ম ব্যতীত অন্য কার্য্যে জন্মতারাও শুভ ফলদায়ক। জ্যোতিষে নিষ্ণাত গুরবমিশ্র শুভ ফলদায়ক অন্য তারাগুলির চিন্তা না করিয়া "কেবল সম্পৎ তারাটীর চিন্তা করিতেন" এইরূপ একতর পক্ষ সম্পাতিনী যুক্তির কল্পনা করা অক্ষয়বাবুর সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজের সকল প্রকার শুভকার্য্যে চন্দ্র-তারাশুদ্ধি দেখিবার আবশ্যক হয়। জ্যোতিষী ব্যতীত গৃহস্থগণও বহুলোক চন্দ্র-তারাশুদ্ধি নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাতেই কি তাঁহারা জ্যোতিষে নিষ্ণাত হইবেন?

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক লেখা অনাবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-(আচার্য্য ব্রাহ্মণ)সম্প্রদায় প্রভুত্বহীন হইয়া দুর্ব্বল হইলেও, পূর্ব্বে তাঁহারা সবল ছিলেন না বা তাঁহাদের প্রাধান্য ছিল না, এরূপ দৃঢ় ধারণা করা অক্ষয়বাবুর উচিত হয় নাই। উত্থান-পতন জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে আর্য্যজাতি এক সময়ে জগজ্জয়ী ও জগৎ-বরেণ্য ছিলেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা প্রভুত্বহীন হওয়ায় শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণিত হইয়াছেন। ইহাতে কি মনে করিতে হইবে যে, আর্য্যজাতি চিরকালই এইরূপ ঘৃণিত, পরাধীন, পরের দাস ছিল? মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি হইতে জানা যায়, বঙ্গে পৌরাণিক যুগেও যজ্ঞাদি হইত, এখানে ক্ষত্রিয় রাজগণের বসতি ছিল। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এরূপ পরস্পর সম্বন্ধ যে, এক জাতি অপরকে ছাড়া থাকিতে পারে না। আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ এদেশে বাস করিতেন। সুতরাং, পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে, পালরাজবংশের মন্ত্রিবংশ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ।

ইঙ্গিত

[শ্রীবিশ্বকর্ম্মা]

৺মহাপূজা অন্তে ইঙ্গিতের পাঠক-পাঠিকাগণকে বিজয়া-সম্ভাষণ করিতেছি। প্রার্থনা করি, কর্ম্ম-কুরুক্ষেত্রে, জীবন-যুদ্ধে, শিল্প-বাণিজ্য-প্রতিযোগিতা-সমরে তাঁহারা বিজয় লাভ করুন।

আজ আপনাদের সঙ্গে ছাপার কালি প্রস্তুত করার সম্বন্ধে আলাপ হইবে। ছাপার কালির প্রায় সমুদায় উপকরণই (raw material) এদেশে উৎপন্ন হয়। তাহা অন্য দেশের লোকেরা এদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান, এবং ছাপার কালি প্রস্তুত করিয়া এদেশে আনিয়া বিক্রয় করেন। এই জিনিসটি তৈয়ারী করা একটু কঠিন, অর্থাৎ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। দুই চারিবার নিজ হস্তে প্রস্তুত করিলেই সে অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিতে পারা যায়।

ছাপার কালি প্রস্তুত করিতে হইলে কি কি মসলা চাই দেখুন। (১) মসিনার তৈল (linseed oil), (২) hard soap, (৩) ভুসা (lamp black); (৪) কালো রজন (black resin)। ইহা ছাড়া অন্য অন্য যে সকল আছে, তাহা বিশেষ বিশেষ রকমের ছাপার কালি প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন কোয়ালিটির আলোচনার সময় যে সকল মসলার প্রয়োজন হইবে তাহাদের উল্লেখ করা যাইবে।

যন্ত্রাদি :—(১) একটা লোহার টব বা drum ; যাহাতে কেরোসিন, তাপিণ প্রভৃতি তৈল আমদানী হয় ; (২) একখানি লম্বা হাতলওয়ালা হাতা ; (৩) একখানি ভারি চাড় ; চাড়খানি লোহার টবটির উপর ঢাকা দিলে, যেন উহার বাহিরে দুই-তিন আঙ্গুল বাহির হইয়া থাকে ; (৪) একটা সরু লোহার দণ্ড। এই যন্ত্রগুলি কেবল পরীক্ষার্থ, বা অল্প পরিমাণে ছাপার কালি তৈয়ার করিবার জন্য চাই।

এইবার মসলাগুলির বিচার করিতে হইবে। বাজারে মসিনার তৈল দুই রকম পাওয়া যায় ;—কাঁচা মসিনার তৈল (raw linseed oil) ; আর পাকা বা সিদ্ধ করা মসিনার তৈল (boiled linseed oil)। ছাপার কালির জন্য কাঁচা মসিনার তৈল লইতে হইবে। সাবান দুই জাতের প্রস্তুত হয়, hard ও soft ; অর্থাৎ, সোডা দিয়া যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহাই hard soap। ইহাকে আমরা কড়া সাবান বলিতে পারি। আর পটাশ দিয়া যে সাবান তৈয়ার হয়, তাহাকে soft soap অর্থাৎ নরম সাবান বলা চলে। পটাশ দিয়া hard soap মোটেই যে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু তাহা বিশেষ ভাবে সাবানের কথা ; এখানে সে প্রসঙ্গের বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। Soda দিয়া যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহা hard soap ভিন্ন অন্য কিছু হয় না। সেইজন্য যে সাবান সোডা দিয়া তৈয়ারী এখানে কেবল সেই সাবান লইতে হইবে। বাজারে কাপড় কাচিবার জন্য যে Bar soap পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ সোডা দিয়া তৈয়ারী ; ছাপার কালি প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ সাবান লইলেই চলিবে।

তার পর ভুসা। ভুসা নানা জিনিস হইতে তৈয়ার হয়। এদেশে কেরোসিনই প্রধান ; কারণ, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। কিন্তু কেরোসিনের ভুসা তত কালো হয় না। খুব কালো ভুসার দরকার হইলে কর্পূর পোড়াইয়া ভুসা তৈয়ার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহা খুব দামী জিনিস। আলকাতরা, গালা, কোপাল, রজন এবং অন্যান্য পদার্থ পোড়াইয়াও ভুসা তৈয়ার হইতে পারে। বাজারে যে ভুসা কিনিতে পাওয়া যায় (কেরোসিনের ভুসা) তাহাতেও কাজ চলে। তারপর রজন। রজন যত কালো হইবে, ততই উহা কালি প্রস্তুত করিবার উপযোগী হইবে। কালো রজনকে ইংরাজীতে colophony বলে।

কেরোসিনের টিনের দুইদিকে দুইটি হাতল করাইয়া লইলে ভাল হয়। কারণ, এই পাত্রটিতে উনানের উপর মসিনার তেল ফুটাইতে হইবে এবং উহাকে সময় সময় উনান হইতে নামাইয়া লইতে হইবে। খুব বেশী পরিমাণে কালি তৈয়ারী করিবার জন্য যখন অনেকটা তেল একসঙ্গে ফুটাইতে হইবে, তখন অবশ্য পাত্রটিও তদনুরূপ বড় করিতে হইবে। সে পাত্র হাতে করিয়া ধরিয়া তুলিয়া উনান হইতে নামাইয়া লওয়া সোজা কাজ নহে, বিপজ্জনকও বটে। তখন অবশ্য কোনো কলের ব্যবহার করিতে হইবে, যাহা টানিয়া সরাইয়া লওয়া যায় ; কিম্বা গ্যাস বা ঐরূপ অন্য কোনরূপ চুল্লী ব্যবহার করিতে হইবে, যেন আগুন তৎক্ষণাৎ নিবাইতে বা কমাইতে বাড়াইতে পারা যায়।

পাত্রটিতে যত তৈল ধরিতে পারে, তাহার সিকি ভাগ তেল লইতে হইবে। কেন না, তেল ফুটিয়া উঠিলে, তাহা যখন ফুলিয়া উঠিবে কিম্বা জ্বালাইয়া দিতে হইবে, তখন তেল উথলাইয়া পাত্র হইতে পড়িয়া গিয়া সব লোকসান হইয়া যাইতে পারে।

পাত্রে কাঁচা মসিনার তৈল লইয়া তাহাকে উনানের উপর বসাইয়া দিয়া ফুটাইতে হইবে। তৈল গরম হইয়া ধোঁয়া উঠিতে আরম্ভ করিলে, যদি তাহা আপনিই জ্বলিয়া না উঠে, তবে ঐ যে লম্বা সরু লোহার ডাণ্ডাটি হাতের কাছে রাখিয়াছেন, তাহার একপ্রান্তে একটা কেরোসিন তৈলে ভিজান পলিতা বাঁধিয়া, তাহা জ্বালাইয়া ঐ ধোঁয়ার উপর ধরিলেই উহা জ্বলিয়া উঠিবে। তখন উহা উনান হইতে নামাইয়া লইতে হইবে। ঐ তৈল দুই-চারি মিনিট কি পাঁচ-সাত মিনিট ধরিয়া জ্বলিলে খুব ঘন হইয়া আসিবে। তৈলটিকে কতক্ষণ ধরিয়া পুড়িতে দিতে হইবে, তাহার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যায় না। তৈলের

পরিমাণ বুঝিয়া সময়েরও পরিমাণ আন্দাজ করিয়া লইতে হয়। তৈল যদি ৫ সের লওয়া হয়, তাহা হইলে হয় ত তিন চার মিনিট পুড়িলেই তাহা যথেষ্ট ঘন হইয়া আসিবে। কিন্তু যদি আধমণ বা একমণ তৈল লওয়া হয়, তাহা হইলে হয় ত তাহা পোড়াইতে ১০ মিনিট সময় লাগিতে পারে। এই পোড়ানটি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। এই অভিজ্ঞতা লাভের মূলে একটা কথা আছে। পোড়াইবার অর্থ, ঘন করা। কতখানি ঘন করিতে হইবে, তাহা নির্ণয় করিবার কথা শুনিলেই, কতখানি তৈল কত সময় পোড়াইতে হইবে তাহা বুঝিতে পারিবেন। একটা খুব লম্বা চিমটা (ভেকধারী সন্ন্যাসীদের হাতে যেরূপ চিমটা থাকে, সেইরূপ সরু চিমটা হইলেই ভাল হয়) ঐ জ্বলন্ত তৈলে একবার ডুবাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা তৈলের চট্‌চটে ভাব পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি দেখা যায়, চিমটার মুখের দিকে হাতা দুইটি ফাঁক করিলে, চট্‌চটে তৈল বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে আধ ইঞ্চি পর্য্যন্ত সূত্র প্রস্তুত করিয়াছে, অর্থাৎ চিমটার দণ্ড দুইটি আধ ইঞ্চি ফাঁক হইলেও উহাদের গাত্রলগ্ন তৈল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, তৈলের জ্বলন সম্পূর্ণ হইয়াছে। তখন ঐ ভারী চাটু টবের উপর চাপা দিতে হইবে। তাহা হইলেই আগুন নিবিয়া যাইবে। এই যে জিনিসটি তৈয়ার হইল, ইহার নাম ছাপার কালির বার্ণিস্। ইহার ফেনা মরিয়া আসিলে ইহার সহিত কালো রজন মিশাইতে হইবে। প্রতি তিন পাউণ্ড বার্ণিসে দুই পাউণ্ড রজন মিশাইলে চলিবে। রজনটি চূর্ণ করিয়া গরম তেলের উপর ঢালিয়া দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া দিলে, রজন গলিয়া তেলের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইবে। অতঃপর ইহার সহিত সাবান মিশাইতে হইবে। যে পরিমাণ মসিনার তৈলের বার্ণিস লওয়া হইয়াছে, তাহার পঞ্চমাংশ সাবান লওয়া চাই। সাবান খুব টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া তৈলের সহিত মিশাইতে হইবে। তাহার পর বার্ণিসের অষ্টমাংশের কিছু কম ভুসা মিশাইয়া দিতে হইবে। কালির বর্ণের উজ্জ্বলতা বাড়াইয়া লইবার জন্য সামান্য পরিমাণ প্রুসিয়ান ব্লু চূর্ণ অথবা নালবড়ি চূর্ণ মিশাইতে পারা যায়। তার পর আর একবার আগুনে ফুটাইয়া মিশ্রণ উত্তমরূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

বোধ হয়, ছাপার কালির কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। দুই-চারিবার নিজে তৈয়ার করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া না লইলে, এরকম ধরণের জিনিস কেবল অপরের লেখা পড়িয়া ভাল রকম বুঝিয়া উঠা কঠিন। আমি কেবল একটা idea মাত্র দিতে পারি। কারণ, আমি অনেক দিন পূর্ব্বে কালি তৈয়ার করিয়াছিলাম। তাহা তত ভালও হয় নাই। তখন আমি এই সব উপকরণ যে রকম অবস্থায় পাইয়াছিলাম, এখনকার এই সাধারণ ভেজালের দিনে আপনারাও এই সব জিনিস ঠিক সেই ভাবে পাইবেন কি না তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সুতরাং আমার কথার সঙ্গে আপনাদের পরীক্ষার ফল ঠিক ঠিক না মিলিলে আমাকে দোষী করিবেন না।

সে যাহা হউক, ছাপার কালি প্রস্তুত করিবার সময় তিনটি বিষয়ে খুব মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথম কথা, বার্ণিসটি উত্তমরূপে খুব যত্ন করিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। বার্ণিস যদি ভাল না হয়, বলা বাহুল্য, কালিও তাহা হইলে ভাল হইবে না। বার্ণিসটি ঠিক দরকার মত ফুটাইয়া চট্‌চটে করিয়া না লইলে, উহা যদি বেশী পাতলা থাকিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ কালিতে কাগজ ছাপা হইবার পর, অক্ষরের গায়ে কাগজের সাদা অংশে তৈলের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইবে। অর্থাৎ, কালিতে যে অতিরিক্ত তৈল থাকিবে, শুষ্ক কাগজ তাহা শোষণ করিয়া লইয়া তৈলসিক্ত হইয়া উঠিবে। আর যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘন হইয়া যায়, তাহা হইলেও কালি ভাল হইবে না—টাইপের গায়ে রীতিমত লাগিবে না—কালিতে নানারকম দোষ হইবে। চিটে গুড় একটুখানি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর দ্বারা তুলিয়া লইয়া আঙ্গুল দুইটাকে একটু ফাঁক করিলে দেখিবেন, দুই অঙ্গুলীতে লিপ্ত চট্‌চটে গুড়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সময়ে দুই আঙ্গুলের মধ্যে গুড়ের একটু সরু সূতার মত দেখা যাইতেছে। আঙ্গুল দুইটা যতই ফাঁক করিবেন, সূতাটিও ততই সরু হইয়া অবশেষে বিচ্ছিন্ন হইবে। বার্ণিস পরীক্ষা করিবার এই সঙ্কেতটি খুব ভাল করিয়া মনে রাখিবেন। কারণ, ইহার উপর বার্ণিসের ভাল-মন্দ নির্ভর করিতেছে। গুড়ের বেলা আঙ্গুল ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ফুটন্ত তেলের বেলা ত আর তা চলে না। তাই এখানে চিমটা ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিতেছি। চিমটার মুখে দুই হাতার ব্যবধান সহজ অবস্থায় এক ইঞ্চির বেশী থাকা আবশ্যক। উহাকে বার্ণিসের মধ্যে ডুবাইয়া লইয়া হাতা দুইটির মুখ অবশ্য সংযুক্ত করিবেন। পরে উহাকে ছাড়িয়া দিলে যখন দেখিবেন, বার্ণিসের সূতাটি আধ ইঞ্চি (এটুকু আন্দাজে ঠিক করিয়া লইতে হইবে) পর্য্যন্ত বাড়িয়া ছিঁড়িয়া গেল, তখন বুঝিবেন, বার্ণিস তৈয়ারী হইয়াছে। সূতার দৈর্ঘ্যের কম-বেশী হইলে বার্ণিস ঠিক হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা, উপকরণগুলি যথাসম্ভব ভেজাল-রহিত ভাবে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন। রসায়ন-বিজ্ঞান কখনও মিথ্যা কথা বলে না। কিন্তু বিজ্ঞানের উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াও যখন অভিলষিত ফললাভ হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, উপকরণগুলি বিশুদ্ধ নয়। আর উপকরণের ভাগগুলি যতদূর সম্ভব উপরি-উক্ত তালিকা অনুযায়ী হইলেই ভাল হয়। তবে অভিজ্ঞতার ফলে উপরিউক্ত ভাগের সামান্য ইতর-বিশেষ করিয়া লওয়া দরকার হইতে পারে। কিন্তু বেশী রকম কম-বেশী হইয়া গেলে অবশ্য কালি মোটেই হইবে না, কেবল একটা কিস্তূতকিমাকার তাল্লে পরিণত হইবে।

তৃতীয় কথা, মিশ্রণটি অতি উত্তম রূপে সম্পন্ন হওয়া চাই। হয় ত বার্ণিসটি ঠিক হইয়াছে; জিনিসগুলিও খাঁটি পাওয়া গিয়াছে; ভাগও ঠিক নির্দ্দেশ মত লওয়া হইয়াছে। তথাপি, মিশ্রণের দোষে কালি খারাপ হইতে পারে। আমার মনে হয়, মিশ্রণের জন্য যত্ন না হইলে মোটে চলিবে না। আর মিশ্রণ কার্য্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া আবশ্যক।

বরং এ ক্ষেত্রে অধিকন্তু ন দোষায়; কিন্তু কম হইলে সর্ব্বনাশ! সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় একেবারে মাটী।

ব্যবসায়ের জন্ত যদি বেশী পরিমাণে কালি তৈয়ার করিতে হয়, তাহা হইলে যন্ত্র চাই-ই চাই। আর, সেজন্ত লোকও রাখিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের মজুরদের একটা মস্ত দোষ এই দেখিতে পাই যে, সাধারণতঃ তাহারা ফাঁকি দিতে পারিলে ছাড়ে না। তাহাদের কাজের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখিলে তাহারা ফাঁকি দিবেই। ইহার ফল কখনই ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। সেইজন্ত মিশ্রণ যন্ত্র চালাইবার ভার যাহাদের উপর দেওয়া হইবে, তাহাদের কার্য্যের উপর খুব কড়া নজর রাখিতে হইবে।

মিশ্রণ যন্ত্রটি তৈয়ার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। দুইটা বা তিনটা লোহার রোলার গায়ে গায়ে রাখিয়া তাহাদের ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিলে, এবং তৎসাহায্যে মিশ্রণের বন্দোবস্ত করিলে চলিতে পারে। অথবা, সাইকেলে যে সকল অংশে ball-bearing থাকে, সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করিয়া লইলে, অর্থাৎ, একটা চাকা ঘুরাইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা আবৃত আধারের ভিতর কতকগুলি একই মাপের লোহার বল পরস্পরের গাত্র স্পর্শ করিয়া ঘুরিতে থাকিলে, তদ্দ্বারা মিশ্রণ কার্য্য বেশ উত্তম রূপে সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। তা ছাড়া, বাজারে যে mixing machine পাওয়া যায়, তাহার সাহায্যে ছাপার কালির মত জিনিসের উপকরণগুলি উত্তমরূপে মিশাইবার কোন সুবিধা হইতে পারে কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। মোট কথা, মিশ্রণটি খুব ভাল হওয়া চাই। মিশ্রণের দোষে রাসায়নিক পদার্থ কি রকম খারাপ হইয়া যায়, এবং সে পক্ষে আমাদের দেশী মজুরদিগের ফাঁকি দিবার চেষ্টা কতখানি দায়ী, তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বঙ্গভঙ্গের পর দেশে যে স্বদেশীর সৃষ্টি হইয়াছিল, শ্রীবিশ্বকর্ম্মা তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ঘোর স্বদেশী ছিলেন; কিন্তু তাহাতে বিলাতী জিনিসের প্রতি বিদ্বেষের নাম-গন্ধও ছিল না; তাহা খাঁটি honest স্বদেশী। মনে পড়ে, কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের প্রস্তর-মূর্ত্তির পিছনে একখানি নবনির্ম্মিত ত্রিতল বাটীর সর্ব্ব-নিম্নতলে একটা বড় ঘরে সর্ব্ব-প্রথম কেবলমাত্র স্বদেশজাত দ্রব্যাদির একটী দোকান স্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্ব হইতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহে স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহারের জন্ত ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। সে প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন হইতে আমাদের স্বদেশী জিনিস ব্যবহারে ঘোর উৎসাহ। আমরা কলেজ হইতে বাহির হইয়াই সেই দোকানে যাইতাম, এবং নানা রকম স্বদেশী জিনিস কিনিয়া লইয়া গিয়া, নিজেরাও ব্যবহার করিতাম, বন্ধুবান্ধবদেরও ব্যবহার করাইবার জন্ত উৎপীড়ন করিতাম। প্রায় সেই সময়েই একে একে সালকিয়া ও উল্টাডিঙ্গীতে এক-একটী দেশালাইয়ের কল বসে। আমরা স্বদেশীর উৎসাহে গ্রোস-গ্রোস সেই দেশ-লাই কিনিয়া আনিতাম; 'এবং তাহা নিজেদের বাড়ীতে, পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ীতে এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে চালাইতাম। সে জন্ত কত যে তিরস্কার, উপহাস, বিদ্রূপ, এমন কি মন্দ কথা পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইত,—সে সব কথা এখন থাক। কিন্তু স্বদেশী দেশালাই ব্যবহারের সময়ে ঐ সকল উপদ্রবের উপর একটা ফাউও ছিল। অর্থাৎ, দেশালাই জ্বালিতে গিয়া প্রায়ই হাত পা পুড়িয়া যাইত। আমাদের আনাড়িত্বের দরুণই যে এই কর্ম্মভোগ বা শাস্তি ভোগ করিতে হইত, তাহা কেহ যেন মনে না করেন। দুইটা কারখানার দেশালাইতেই, বাক্সের গায়ের বারুদ এবং কাঠির মুখের বারুদের মিশ্রণ ভাল হইত না। মিশ্রণের দোষে কাঠি ঠিক মত জ্বলিত না। প্রায়ই একটা কাঠি জ্বালিতে গিয়া বাক্স শুদ্ধ জ্বলিয়া যাইত। তথাপি, আমরা এতই গোঁড়া স্বদেশী হইয়া উঠিয়াছিলাম, যে, বারবার হাত পা পোড়াইয়াও, যতদিন দেশী দেশালাই বাজারে পাওয়া গিয়াছিল, ততদিন সে দেশালাই ব্যবহারে বিরত হই নাই,—বিলাতী দেশালাই আদৌ ব্যবহার করি নাই। সেই দেশালাইয়ের এই দোষটি কেবলমাত্র মিশ্রণের দোষে ঘটিত; এবং আমার মনে হয় মিশ্রণ যন্ত্রের দোষ তত ছিল না, যত ছিল মিশ্রণ যন্ত্রের চালক মজুরদের ফাঁকি দিবার চেষ্টা। ঐ দেশী দেশালাইয়ের বাক্স, লেবেল, কাঠি প্রভৃতি বেশ সুন্দরই হইত। এমন কি, বেঙ্গল সেফটি ম্যাচের লেবেল এত সুন্দর হইয়াছিল যে, তৎকালে যে ভলকান ম্যাচের খুব প্রচলন ছিল, তাহার বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায় তাঁহাদের লেবেলের নকল করা হইয়াছে, এই মর্ম্মের একটা অভিযোগও তাঁহারা দেশী কারখানার উপর উপস্থাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া যেন মনে হয়।

যাক, এক মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তার কথায় এতগুলা বাজে বকিলাম বলিয়া, আশা করি, পাঠকেরা আমার উপর বিরক্ত হইবেন না। কারণ, এ বাজে বকুনীও নিতান্ত নিরর্থক নয়। একটা নিষ্ফলতার দৃষ্টান্ত অনেক সফলতার পথ প্রদর্শক। কি কারণে একটা কাজ নিষ্ফল হইল, তাহা জানা থাকিলে, সে ভুল আর সহজে দ্বিতীয় বার ঘটিবে না। দেশালাইয়ের কারখানায় নিষ্ফলতার দৃষ্টান্তে কালির কারখানা যেন সতর্ক হইতে পারে ইহাই আমার বক্তব্য।

খবরের কাগজাদি ছাপিবার জন্ত আলকাতরা হইতে খুব সস্তায় এক রকম ছাপার কালি তৈয়ার হইতে পারে কিন্তু তাহাতে আলকাতরা ও কেরোসিনের বড় দুর্গন্ধ থাকে। এই দুর্গন্ধ দূর করা বড় কঠিন ও মেহনতের কাজ। সেজন্ত এবার তাহার আলোচনায় বিরত থাকিলাম। উপরে যে কালির কথা বলিলাম, তাহার দ্বারা সাধারণ বই ছাপার কাজ বেশ চলিবে। খুব fine ছাপার কাজের জন্ত উপকরণও খুব উঁচু দরের লইতে হয়। সাধারণ রঙীন কালি তৈয়ার করিতে হইলে উপরের উপকরণের মধ্যে ভূষা বাদ দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে, যে রঙের কালি প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা, সেই রং যথোপযুক্ত পরিমাণে মিশাইতে হয়। ব্রোঞ্জ ব্লু কালিতে ভূষার পরিমাণ কিছু কমাইয়া, প্রুসিয়ান ব্লু রং কিছু বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়।

ছাপার কালি প্রস্তুত করিবার সময়ে আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; অভিভাবক ও

অপরাপর আপনার জনের নিকট হইতে অনেক তিরস্কার ও তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিছু অর্থব্যয়ও যে না হইয়াছিল, এমন নহে। কিন্তু হাতে হেতেরে কাজ করিয়া, (বিপদ মাথায় করিয়াও, কারণ, তৈল হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বিপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল; অভিভাবকগণের তিরস্কার তাড়নায় ইহাই প্রধান কারণ) যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতে ঐ সমস্তই পোষাইয়া গিয়াছিল।

ছাপার কালির সম্বন্ধে বলিবার এখনও আরও অনেক কথাই বাকী আছে। পাঠকগণের আগ্রহ দেখিলে তবেই সে সকল কথা বলিবার ইচ্ছা হইবে। আজ শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; বিশেষতঃ, আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে; অতএব, ছাপার কালির প্রসঙ্গের আজ এইখানেই ইতি করিলাম।

মাস দুই-তিন পূর্ব্বে চিনির সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, তাহাতে কিছু ফল ফলিয়াছে। মাহোরা টি এষ্টেট হইতে উহার ম্যানেজিং পার্টনার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র গোস্বামী বি-এ মহাশয় আমাকে সংবাদ দেন যে, তাহার পিতা শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামী মহাশয়ের আখের চাষ আছে, এবং চিনির কারখানাও আছে। এই কারখানায় মিঃ হাদির প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হয়। (মিঃ হাদির পুস্তক আমি অন্য সূত্রেও সংগ্রহ করিয়াছি।) শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামী মহাশয় ঢাকা হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ সম্পাদিত "কৃষিসম্পদ" নামক কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রে (ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩২৭; ৭ম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা) "আমার ইক্ষু চাষ" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধে তিনি মি. হাদির চিনি প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। যাঁহারা চিনি প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে চান তাঁহারা একবার এ প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে পারেন। কিন্তু প্রবন্ধ পড়িয়া চিনি তৈয়ার কার্য্যে কতদূর শিখিতে পারিবেন বলিতে পারি না। যাঁহাদের সুবিধা হয়, তাঁহারা আসামে গোস্বামী মহাশয়ের আখের ক্ষেত ও গুড়-চিনির কারখানা দেখিয়া আসিলে ভাল হয়। গোস্বামী মহাশয়ের ঠিকানা Barpathar Sugar-cane Farm, P. O. Badlipur, Assam। গোস্বামী মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িলে কিন্তু আপনারা বুঝিতে পারিবেন, বড় রকমে করিতে না পারিলে চিনির ছোট কারখানা তেমন সুবিধাজনক নহে। আর গোস্বামী মহাশয় যেটুকু সুবিধা করিতে পারিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে ইক্ষুর চাষের বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন বলিয়া। বাজার হইতে ইক্ষু কিম্বা খেজুর রস কিম্বা গুড় কিনিয়া হাদি মহাশয়ের প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করিতে হইলে তিনিও তেমন সুবিধা করিতে পারিতেন বলিয়া মনে হয় না। সে যাহাই হৌক, ছোট-খাট চিনির কারখানা খুলিতে গেলেও ৩০।৩৫ হাজার টাকার কমে হইবে না। এবং সময় অসময়ের জন্য reserve fund স্বরূপ কিছু হাতে থাকাও আবশ্যক; অতএব চিনির কারখানা খুলিতে হইলে অন্ততঃ ৫০০০০ টাকা হাতে লইয়া তবে এ কাজে হাত দেওয়া উচিত।

চিনির প্রসঙ্গে ফরিদপুর, লোনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেন এম-এ মহাশয় লিখিয়াছেন—"ভাদ্রের 'ভারতবর্ষে' চিনি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হাদির উদ্ভাবিত প্রণালীর সবিস্তার বর্ণনা ৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কৃষিবিষয়ক গ্রন্থে (Handbook of Agriculture, published by Thacker, Spink & Co) আছে। এই প্রণালীতে চারিটি প্রক্রিয়ার আবশ্যক। (১) ইক্ষুরস পরিষ্কার করা। সদ্যধৃত আখের রস চেপ্টা পাত্রে জ্বাল দেওয়া হয়। ফেনাগুলি সরের আকার ধারণ করিয়া পরে যখন ফাটিতে থাকে, তখন সাজিমাটির জল ছিটাইয়া দেওয়া হয় ও অনবরত ফেনা তুলিয়া ফেলা হয়। রস পরিষ্কৃত ও স্বচ্ছ হইলে, উহার সঙ্গে সাজি-মিশ্রিত চূণের জল মেশান হয়। (২) রস ঘন করা। প্রবল উত্তাপে জ্বাল দিয়া ঘন করা হয়। উত্‌লাইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিলে সামান্য একটু ঘী অথবা সাজির জল মেশানো রেড়ির তেল ঢালিয়া দিতে হয়। (৩) হাওয়া লাগান। রস এইবারে বড় গামলা বা নাদে ঢালিয়া রাখা হয়, এবং বড় বড় হাতা দিয়া নাড়িয়া দেওয়া হয়। (৪) রাব হইতে চিনি পৃথক করণ। হাদির উদ্ভাবিত ইংলণ্ডে প্রস্তুত কলে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। মিশ্রিত তরল পদার্থের মধ্যে একটা দণ্ড রাখিয়া জোরে ঘুরাইতে থাকিলে ভারি দ্রব্য দূরে ছিটকাইয়া পড়ে, এবং লঘু পদার্থ নিকটে সঞ্চিত হইতে থাকে। মাখন তোলা কল এবং মন্থনদণ্ড উভয়ই এই নিয়ম অনুসারে নির্ম্মিত। হাদির চিনি পৃথক করিবার কলও এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া নির্ম্মিত। কলিকাতা ম্যাকিন্যাথ কোম্পানীতে নাকি এই কল পাওয়া যায়। মূল্য পাঁচশ টাকার কাছাকাছি।

রস কতটা ঘন হইলে নামাইতে হয়, তাহার কোন মাপকাঠি নাই। হাতে হেতেড়ে কাজ করিতে করিতে শিক্ষা হয়। কল চালাইবার পূর্ব্বে পাতলা গুড়ের সঙ্গে সামান্য সোডা বাই কার্ব্বনেট মিশাইয়া ঢালিয়া দিতে হয়, পরে রীঠা ভিজান জল একটু একটু ছিটাইয়া দিতে হয়। বিলাতী মতে সাজিমাটি, রীঠা প্রভৃতি ব্যবহার না করিয়া হাড় পোড়া কয়লার ভিতর দিয়া ইক্ষুরস ছাঁকিয়া লওয়া হয়। হাদি যুক্তপ্রদেশের আসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর অব এগ্রিকাল্‌চার ছিলেন। ঐ প্রদেশে তাঁহার প্রণালীতে কোন কারবার চলিতেছে কিনা জানা আবশ্যক। কাশীর চিনি কি পদার্থ তাহারও খোঁজ করা উচিত। চলতি কলে কাজ দেখিলেই ঘোঁৎ-ঘাঁৎ শেখার সুবিধা হয়।

চিনির ব্যবসায়ের জন্য ইক্ষু চাষ হইতে সুরু না করিলেও বোধ হয় চলিতে পারে। যেখানে চাষীরা নিজেরাই প্রচুর আখ জন্মায় সেরূপ স্থলে কল বসাইলেই চলিতে পারে। কলের সঙ্গে পরীক্ষা ক্ষেত্র থাকা আবশ্যক, এবং চাষীদের মধ্যে সার, বীজ এবং উন্নত প্রণালীর চাষ প্রচলনের জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা করা উচিত। দৈনিক কাগজে দেখিলাম বম্বাইএর কয়েকজন সওদাগর ত্রিশ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটী চিনির কারবার খুলিতেছেন। ইঁহারা চাষের ভার নিজেদের হাতে লইবেন না। তবে, চিনির কলের সঙ্গে সঙ্গে একটি তেলের কল বসাইবেন। উদ্দেশ্য—চাষীদিগকে সস্তায় খৈল সরবরাহ করা। ইক্ষু, চাষে সারের যত প্রয়োজন, অন্য কোন চাষে তত নয়। খৈল আখের

ভাল সার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সার হিসাবে সকল খৈল সমান নয়। রেড়ির খৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উক্ত কোম্পানি রেড়ির তেলের কল বসাইবেন কিনা জানি না। যেখানে আকের কল চলিতে পারে ঠিক সেখানে রেড়ির তেলের কল চালান সম্ভবপর নাও বা হইতে পারে।

অল্প কিম্বা বেশী মূলধনে চিনির কারবার চলিবে কি না বলা সহজ নয়। জানিতে হইবে বিদেশী চিনি আবার মাথা তুলিবে কি না; যদি বা তোলে, গবর্মেণ্ট দেশী কারবার রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন কি না। অতীত কালের কথা বলিতে গেলে, বঙ্গদেশের সাহেবদের পরিচালিত কল ভাল চলে নাই। আমাদের মতে লাখে-লাখে টাকা কলে পুতিয়া না রাখিয়া অল্পে অল্পে সুরু করা ভাল। কতকটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভিতরেও যদি পবিত্র চিনি বলিয়া ধারণা জন্মান যায়, তাহা হইলে, আমদানী চিনি আবার যখন বাজার মাটি করিয়া দিবে, তখনও ব্যবসায় চলিতে পারিবে। হাদির প্রণালীতে গোড়ায় কয়েক হাজারের উপরে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

অল্প মূলধনে চিনির ব্যবসায় এখনো চলিতেছে যশোর জেলায়। সেটা কিন্তু খেজুর চিনি, এবং ব্যবসায়ীরা সামান্য গৃহস্থ। ইহারা দুই রকমের চিনি তৈয়ার করে দোলো চিনি আর পাকা চিনি। শীতের সময় টাট্‌কা খেজুর গুড় কিনিয়া ধামা কিম্বা বোরায় পুরিয়া পিটাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কতকটা গুড় তরল হইয়া ঝরিয়া পড়ে। দোলো চিনি প্রস্তুতের জন্য শক্ত গুড় ধামায় পিটাইয়া ইঞ্চি আটেক পুরু করিয়া রাখা হয়। গুড়ের উপরে শেওলা বিছাইয়া আট দিন রাখা হয়। আট দিনে পাতলা গুড় ঝরিয়া নীচে পড়িতে থাকে, উপরে দোলো চিনি তৈয়ারি হয়। আট দিন পরে শেওলা তুলিয়া ফেলিয়া ৪।৫ ইঞ্চি চিনি উপর হইতে তুলিয়া লইলে, দেখা যায় নীচে শক্ত গুড় রহিয়াছে। তখন আবার শেওলা চাপা দিয়া ৮ দিন রাখা হয়। এইরূপে ৩।৪ বার শেওলার দরকার হইতে পারে। শেওলা দেওয়ার পূর্ব্বে এবং প্রথম বার শেওলা দেওয়ার পরে যে ঝরা গুড় পাওয়া যায়, তাহা জ্বাল দিয়া আবার শক্ত গুড় করা যায়। শেওলার সাহায্যে এই শক্ত গুড় হইতেও চিনি হয়। যে ঝরা হইতে চিনি হয় না, তাহা জ্বাল দিয়া হাড়িতে পুরিয়া বিক্রী করা হয়।

পাকা চিনি করিতে হইলে, গুড় পিটাইয়া লইয়া, পরে জ্বাল দিয়া ফেনা তুলিয়া ফেলিতে হয়। তার পর ঠাণ্ডা হইলে শেওলা চাপাইয়া চিনি বাহির করা হয়। প্রথমবারের ঝরাগুড় হইতেও পূর্ব্বের ন্যায় চিনি বাহির করা যায়।

জ্বাল দিয়া ফেনা তুলিবার পর বায়ুহীন পাত্রে ফুটাইতে পারিলে, অতি সুন্দর দানাদার চিনি হইবে। যে পাত্রে জ্বাল দেওয়া হয়, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত রাখিয়া,—তাহা হইতে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা মাঝে মাঝে বায়ু বাহির করিয়া দিতে পারিলে অতি সহজে এই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এই কারখানার জন্য যদি চ অনেক মাল্‌মশ্‌লার প্রয়োজন, ঘরোয়া ব্যবসায়ের জন্য যন্ত্র তৈয়ার করা বড় বেশী আয়াস সাধ্য হইবে না।"

শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামী মহাশয় প্রথমে কাশী হইতে কারিগর আনাইয়া কাশীর চিনি প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করেন এবং তাহার প্রণালীও তিনি তাঁহার প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উহাতে সুবিধা হয় নাই। চিনি ভাল হয় বটে, কিন্তু পড়্‌তা এত বেশী পড়ে যে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না। খাস কাশীর কারখানাগুলিও এই কারণে বন্ধ হইয়া যাইতেছে; কিন্তু আমার মনে হয়, কাশীর চিনি ভাল জিনিস। কেবল খাঁটি স্বদেশী পবিত্র বলিয়া নহে, উহার এমন কয়েকটি গুণ আছে, যাহা এখানকার কলের বা যাভা হইতে আমদানী সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিনিতেও নাই। কাশীর চিনি ধবধবে সাদাও নয়, দানাদারও নয়—উহা দেখিতে বাটা চিনিরই মত, এবং উহার রংও একটু ময়লা; কিন্তু তাহারই মধ্যে উহার এমন একটী সুন্দর শ্রী আছে, যাহা অতি লোভনীয়, সর্ব্বোৎকৃষ্ট দানাদার দোবরা চিনিতে যাহার একান্ত অভাব। কাশীর চিনির স্বাদও অতি চমৎকার—সে স্বাদও দোবরা চিনিতে নাই। বাটা চিনির অপেক্ষা দোবরা চিনির দাম বেশী। এখন একসের বাটা চিনির দাম ৸০ আনা, আর একসের দোবরার দাম ১৲ টাকা। তবু ও দোবরার খরিদদারের অভাব নাই। সুতরাং কিছু মূল্যাধিক্যই কোন জিনিসের কাটতি কম হইবার একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান কারণ হইতে পারে না। তবে দাম অসম্ভব রকম বেশী হইলে, অবশ্য খরিদদারকে পিছাইয়া যাইতে হয়। আমার মনে হয়, কাশীর চিনির দাম অন্যান্য চিনি হইতে অসম্ভব রকম বেশী বলিয়াই এমন ভাল জিনিসটার সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। কাশীর চিনির গুণ, বর্ণ, স্বাদ ঠিক মত বজায় রাখিয়া উহার পড়্‌তা কমাইবার কোন উপায় যদি বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কাশীর চিনি আবার চলিতে পারে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি যখন বলিয়াছিলাম যে, চিনির কারখানা খুলিবার পূর্ব্বে বা সঙ্গে-সঙ্গে আখের চাষের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তাহার অর্থ ইহা নয় যে, চিনির কারখানাওয়ালাদিগকেই ইক্ষুর চাষ করিতেই হইবে,—যদিও তাহা করিতে পারিলে ভালই হয়; তাহার প্রমাণ দেবেশ্বর গোস্বামী মহাশয়ের ইক্ষু চাষ ও চিনির কারখানা। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কারখানায় যোগান দিবার মত, প্রচুর কাঁচা মালের যোগাড় থাকা চাই। এখানে আমার আরও একটা কথা আছে। শুধু প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর যোগান থাকিলেই চলিবে না,—ঐ ইক্ষুতে চিনির পরিমাণও বেশী থাকা চাই। কারণ, সকল জাতীয় ইক্ষুতে সমান পরিমাণে চিনি থাকে না। চিনির কারখানায় এই রাসায়নিক অংশটুকু উপেক্ষা করিলে চলিবে না। পূর্ব্ব প্রবন্ধে এই কথাগুলিই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। সরকারী পরীক্ষা-ক্ষেত্রে নানাজাতীয় ইক্ষুর চাষ ও ফলন পরীক্ষা করিবার কারণই ইহাই। আমাদের দেশের চিনির কারখানা মাটী হইবার একটা কারণও ইহাই। ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয় ইক্ষুর চাষ করিয়া প্রথমে তাহাদের ফলন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়; তার পর যে যে জাতীয় ইক্ষুর ফলন বেশী, সেই-সেই জাতীয় ইক্ষুতে

চিনির পরিমাণ কিরূপ তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। চিনির ভাগ বেশী অথচ ফলনও বেশী এরূপ ইক্ষুই চিনির কারখানায় দরকার। জাভা প্রভৃতি স্থানে এইরূপ নানা পরীক্ষা করিবার পর সুনির্ব্বাচিত ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করা হইতেছে। তাই আজ জাভার চিনি জাহাজ ভাড়া দিয়াও এদেশে আসিয়া দেশী চিনির অপেক্ষা সস্তা দরে বিকাইতেছে। মনে করুন, কোন এক জাতীয় ইক্ষু এখানকার চাষারা খুব বেশী পরিমাণে জন্মাইতেছে, কিন্তু তাহাতে চিনির ভাগ যদি কম থাকে, তাহা হইলে ইক্ষুর যোগান বেশী থাকিলেও চিনির কারখানা চলিবে না, তাহাতে প্রতিযোগিতা করিয়া লাভ বাহির করিতে পারা যাইবে না। আরও মনে করুন, এক টন বাঙ্গলার ইক্ষু হইতে যে পরিমাণে চিনি পাওয়া যাইবে, এক টন জাভার ইক্ষু হইতে যদি তদপেক্ষা বেশী চিনি পাওয়া যায়, তাহা হইলে খুব মোটা বুদ্ধিতেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাঙ্গলার ইক্ষুজাত চিনি জাভার চিনির সঙ্গে লড়াই করিতে পারিবে না। কারণ, এক টন চিনি প্রস্তুত করিতে যে পরিমাণ জাভার ইক্ষুর দরকার হইবে, এক টন চিনি প্রস্তুত করিতে তদপেক্ষা কেবল যে বেশী ইক্ষুর দরকার হইবে তাহা নয় ইক্ষু হইতে রস বাহির করিবার, তাহা জ্বাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করিবার এবং তদানুসঙ্গিক অন্যান্য অনুষ্ঠানের মজুরীও খুব বেশী পড়িয়া যাইবে।

এই কারণেই বাঙ্গলায় চিনি প্রস্তুত কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে গেলে, আগে আখের চাষের উন্নতি সাধনে মনোযোগ দিতে হইবে। বাঙ্গলায় জল হাওয়া সহ্য হইবে এমন ভাল জাতীয় ইক্ষু যাহার ফলন বেশী এবং যাহাতে চিনির পরিমাণও বেশী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে। গোড়ায় এইটী হইলে তবে সম্ভবতঃ মিঃ হাদির প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গলায় নিজস্ব চিনির অভাব কতকটা মিটাইতে পারা যাইবে। আর অনেক টাকা মূলধন লইয়া বড় কলকারখানা স্থাপন করিতে পারিলে তখন হয় ত বাহিরে চিনির কিছু কিছু চালানও দিতে পারা যাইবে।

ভুল-ভাঙ্গা

[শ্রীসন্তোষকুমার দে]

(১)

তখন সকাল আটটা। কলিকাতার আপার সারকুলার রোডের উপর একটা সুদৃশ্য অট্টালিকার একখানি সুসজ্জিত কক্ষে গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত অনিলকুমার মিত্র প্রবেশ করিলেন। গৃহমধ্যস্থিত টেবিলের সন্নিকটে গিয়া কোটের পকেট হইতে একটা ফাউনটেন্ পেন, একখানি 'মেডিক্যাল কলেজ ফার্মাকোপিয়া' ও ষ্টেথস্কোপটা ক্লান্ত ভাবে ধীরে-ধীরে রাখিয়া দিয়া, অবশ ভাবে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচণ্ড উত্তাপ তাঁহাকে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দিল না। মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখা ছিল; তাহার প্রতি অলস অবসাদ-ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া, ঘরের এক কোণে সুইচের দিকে চাহিলেন; কিন্তু অতটা উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি কিংবা শক্তির অভাববশতঃ, অনিচ্ছা সত্বেও চীৎকার করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে হইল, "রঘুয়া, ও রঘুয়া!" তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠের ডাক বাতাসের সহিত মিলাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই, তথায় একটী পশ্চিমদেশীয় বৃদ্ধের আবির্ভাব হইল। অত্যন্ত ব্যস্ত ও লজ্জিত ভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অনিলকুমারের ক্লান্ত দেহের প্রতি চাহিয়া সে বলিল, "দাদাবাবু, কখন এলে তুমি? আমরা কেউ ত' জানতে পারি নি! কাল সমস্ত রাত্তির একটুও ঘুমুতে পাও নি বুঝি?—মুখ চোখ সব ব'সে গেছে যে!"

ক্লান্তির মধ্যেও অনিলকুমারের হাসি আসিল। ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, "ঐ জন্যেই তোমায় ডাকছিলুম না! জানি, 'নাইট ডিউটি'র পর তোমাকে উদ্বিগ্ন করবার মত উপকরণ আমার শরীরে যথেষ্ট পাওয়া যায়। চোখ-মুখ ব'সে যাওয়ার কথাটা পরে হ'লেও হতে পারে; কিন্তু পাখাটা যদি এর মধ্যে চ'লতে আরম্ভ না করে, তা হ'লে একটু পরেই তোমাকে ডাক ছেড়ে কাঁদতে হবে যে রঘুয়া!"

অনিলকুমারের মুখের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পাখা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া রঘুয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়াছিল; কারণ, সে জানিত, সমস্ত রাত্রি ডিউটি করিয়া আসার পর, তাহার দাদাবাবুর কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ বিশ্রাম প্রয়োজন।

পাখার স্নিগ্ধ হাওয়ায় ধীরে-ধীরে অনিলকুমারের ক্লান্তি অপনোদিত হইতেছিল। সুযোগ পাইয়া তাহার মন,

স্কুলের ছুটীর পর দুরন্ত বালকের মত, গণ্ডী ছাড়িয়া লাফাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। কখন এবং কেমন করিয়া যে তাহার চিন্তার ধারা অতীতের সহিত মিশাইয়া গিয়াছিল, সে জানিতেও পারে নাই।

এই ত সে দিনের কথা। মাতৃহীন অনিলকুমারের মনেও পড়ে না, কবে সে মাতৃহীন হইয়াছিল। মাতার তৈল-চিত্রের প্রতি চাহিয়া-চাহিয়া তাঁহার সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছিল। তাহা না হইলে, সে মনে ক'রিয়া লইলেও লইতে পারিত যে, মাতা বলিয়া তাহার কেহ কোনও দিন ছিলেন না; এবং যদি মাতা বিনা জীবের পৃথিবীতে আগমন সম্ভব হইত, তাহা হইলে সে নিজেকে উক্ত শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ করিত না। তাহার ভ্রাতা-ভগিনী কেহ ছিল না। মাতার মৃত্যুর পর পিতাও পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন নাই। অপর্যাপ্ত পিতৃস্নেহের অধিকারী বালক অনিল পিতা ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না,—জানিতেও চাহিত না। তাহার পিতা তাহার নিকট একাধারে মাতা, শিক্ষক ও গুরু ছিলেন। দৈনিক জীবনের প্রতি কর্ম্মটীর মধ্যে দৃঢ়চিত্ত পিতার সাহচর্য্য তাহার শিশু চিত্তকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল। অনিলের পিতা স্বাবলম্বী পুরুষ; বহু বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া অধ্যবসায়বলে শেষ জীবনে অতুল বিভবের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজ বৈচিত্র্যময় জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে অনেক কথা শিখাইয়াছিল; এবং একমাত্র পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ন্যায় দুরূহ কর্ম্মে তাঁহাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। পুত্র পাছে ধনী-পুত্রের ন্যায় বিলাসপ্রিয় ও শ্রমবিমুখ হইয়া পড়ে, সেদিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাহারই ফলে, লক্ষপতি অনিলের পটলডাঙ্গায় কলেজ করিয়া সার্কুলার রোডের বাটীতে হাঁটিয়া ফিরিতে লজ্জা বোধ হয় না। সেই পিতার কথা অনিলকুমারের মনে পড়িতেই, তাহার চক্ষু জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। স্নেহময় পিতার তৈলচিত্রের প্রতি সজল চক্ষে চাহিয়া সে বারবার মস্তক নত করিল। অনিল চিরকালই পড়াশুনায় ভাল; প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিল। পিতা উৎসাহ প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন, "অনু, তুমি ত' জান না বাবা, যে, চেষ্টা ক'রলে এর চেয়েও ভাল তুমি ক'রতে পার। আমি জানি, তোমার শক্তি অন্য কোনও ভাল ছেলের চেয়ে কম নয়।" পিতার উৎসাহদানের মধ্যে যে ইঙ্গিতটুকু অনিল পাইল, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। দুই বৎসর পরে, যখন আই, এস্‌সি পরীক্ষার খবর বাহির হইল, তখন দেখা গেল, অনিলকুমার মিত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু, তখন তাহার স্নেহময় পিতা কোথায়? আর অনিল ভাবিতে পারিল না। দুই চক্ষু দিয়া হুহু করিয়া জল বাহির হইয়া, তাহার সুগৌর মুখখানিকে আরও রক্তিম করিয়া তুলিল। সে বাধা দিল না, নিজেকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল না; দুই হস্তের মধ্যে মুখ লুকাইয়া দিয়া, সে এই শোকাশ্রুর অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিটুকু উপভোগ করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার মনে পড়িল, পিতার মৃত্যুশয্যার কথা। সেই চিরবিদায়ের শেষ মুহূর্ত্তটা! অগাধ ঐশ্বর্য্য ও বহু কালের পুরাতন ভৃত্য রঘুয়ার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার চিরপ্রস্থান! আকস্মিক বজ্রপাতের ন্যায় পিতার এই চলিয়া যাওয়াটা অনিল প্রথমে ভাল করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাহার স্তম্ভিত চেতনা যেন এই নিদারুণ সত্যকে উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত ভাবে সরিয়া দাঁড়াইল! তাহাকেই আশ্রয়চ্যুত করিয়া যে বিধাতার অভিশাপ সগর্ব্বে ফিরিয়া গেল, সে কথা তাহার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হইল না। যখন সে নিজের অবস্থা উপলব্ধি করিল, তখন সে কি করিবে ঠিক পাইল না,—কিছু করিবার আছে কি না, তাহাও তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত ভাবিয়া পাইল না। উৎকট শোকে আচ্ছন্ন অনিলের নিকট দিবস এবং রাত্রির মধ্যে কোনও পার্থক্য রহিল না। রঘুয়াও শোকে, দুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায়,—কে কাহাকে দেখে? শোক চিরস্থায়ী নয়; কালের প্রলেপে ক্রমে-ক্রমে অনিলের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তখন, নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া সে একটু সতর্ক, একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। কে এ? কাহার স্নেহ-কোমল হস্ত এমন করিয়া তাহার বিশৃঙ্খল সংসারকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে? তাহার সুনিপুণ হস্তের চিহ্ন যে প্রতি গৃহদ্রব্যটী বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে! কে এ মালাকর, যাহার হস্ত যাদুমন্ত্রবলে তাহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গৃহসজ্জাকে এমন শৃঙ্খলার সূত্রে দ্বারা গ্রথিত করিল?

বিস্মিত অনিল রঘুয়াকে ডাক দিল; প্রশ্ন করিয়া জানিল, ও-বাড়ীর বৌ-দিদি ক'দিন ধরিয়া এখানে আসিতেছেন। অনিলের তখন ধীরে-ধীরে মনে পড়িল,—তাই বটে; সে যখন শোকে অচেতন, তখন তাঁহারই সেবা-নিপুণ হস্ত তাহাকে জাগাইয়া তুলিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়াছিল। খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে, প্রত্যুত্তরে অনিলের মুখ হইতে রূঢ় বাক্য তাঁহারই উদ্দেশে বাহির হইত। অথচ, কি আশ্চর্য্য, একবারও তাহার মনে হয় নাই,—জানিবার ইচ্ছা হয় নাই,—স্ত্রীলোকটী কে? নিজের উপর সে একটু বিরক্ত হইল; ভাবিল, 'তিনি আসিলেন দয়া করিয়া,—আর আমি বিদায় দিলাম রূঢ় বাক্য বলিয়া। পিতা যাইতে না যাইতে পুত্রের গুণ বাড়িতেছে দেখিতেছি। রঘুয়ার প্রতি অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া অনিল বলিল, "আচ্ছা রঘুয়া, আমিই না হয় শোকে ইতর, চামার, হ'য়ে গেছলুম; তুমি কেন আমাকে সচেতন ক'রে দাও নি? ছিঃ, ছিঃ, বৌদি কি যে ভাবছেন তার ঠিক নেই।"

রঘুয়াকে উত্তর দিতে হইল না; উত্তর দিলেন বৌদিদি স্বয়ং। সহাস্য মুখে ভিতরে আসিয়া তিনি বলিলেন, "না অনিল, তোমার বৌদি এমন কিছু ভাবে না, যার ঠিক নেই। ওঠ এখন, লক্ষীটী, নাইতে যাও; আমি ততক্ষণ তোমার খাবারের বন্দোবস্ত করি গে।" বিস্মিত অনিলের মুখে সহসা কোন উত্তর জোগাইল না। এই বৌদিদিটীকে সে যে ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই তাহা নহে। ইনি অনিলের পিতার জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্নী; বয়সে অনিলের সমান কিংবা একটু ছোট হইবেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কখনও অনিলের সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। তাঁহার মধ্যবিত্ত স্বামী চিরকালই তাঁহার ধনী খুড়াকে দূরে রাখিয়া চলিতেন; সেই জন্য মেলামিশি তেমন ছিল না। কিন্তু, বিপদের সময় আত্মীয়তা সঙ্কোচ মানে নাই,—তাই সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি পত্নীকে অনিলের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন;—রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "অনিলাকে অনিলের কাছে পাঠাচ্ছি।"

অনিলকে নিরুত্তর দেখিয়া অনিলা বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ রে, আমি বুঝি এ রকম ক'রে দাঁড়িয়ে থাকব? এই যে খানিকক্ষণ আগে নিজেকে 'ইতর', 'চামার' বলা হ'চ্ছিল, —আর এখন?"

লজ্জিত অনিল ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; অনিলার স্নিগ্ধ, শ্যামবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "যাচ্ছি বৌদি, আপনি যান।"

"দেরী ক'রো না যেন" বলিয়া অনিলা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। কিন্তু, কৈ, তাহা ত' মনে হইতেছে না! অনিল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। পিতার মৃত্যুতে ডাক্তারগণের অক্ষমতা দেখিয়া অনিলের মনে ডাক্তারী পড়িবার প্রবল বাসনা জন্মিয়াছিল। সত্য-সত্যই রোগগ্রস্ত মানুষ বাঁচে কি না, তাহা যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। বৌদিদি উৎসাহ দিলেন। আর পায় কে! আজ অনিলকুমার মেডিক্যাল কলেজের অসামান্য প্রতিভাশালী ছাত্র। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, সব স্বর্ণপদকগুলিতেই সে তাহার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিল। আজ, পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর অনিলকে চিনে না কে? টেনিস্ খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাপক লভ্ অনিলের সহিত খেলিবার সময় ভয় পান। বাৎসরিক ক্রীড়া-নৈপুণ্যে (Sports) পুরুষদিগের প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার (Best man's Prize) অনিল ছাড়া আর কেহ পায় না। ভগবান তাহাকে অপরিমিত দেহ-সৌন্দর্য্যের অধিকারী করিয়াছিলেন। পিতা তাহাকে ননীর পুত্তলিকা করিয়া রাখেন নাই। বৌদিদির উৎসাহ তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। সেই সুগৌর, বলিষ্ঠ, উন্নত দেহের প্রতি পথিক হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজ-সংশ্লিষ্ট সকলেরই প্রশংসমান লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইত। রুক্ষ-স্বভাবা ইংরাজ ধাত্রীগণ তাহার নিকট হইতে অভিবাদন পাইলে, কৃতার্থ হইয়া, প্রয়োজনের অতিরিক্ত হাসি মাখাইয়া প্রত্যভিবাদন করিত।

(২)

ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রঘুয়া হাঁকিল, "দাদাবাবু, এইবার ওঠ, অনেকক্ষণ জিরোন হয়েছে।"

ঘাড় ফিরাইয়া অনিল রঘুয়াকে একবার দেখিয়া লইল; হস্তের মণিবন্ধের উপর সুবর্ণ ঘটিকার দিকে ক্ষণেক দৃষ্টিপাত করিল; তৎপরে মৃদুস্বরে কহিল "হ্যাঁ, এই উঠি।"

কাল সমস্ত রাত্রি জাগরণ গিয়াছে। ক্লিষ্ট দেহ-মনকে

শীঘ্র বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন,—সেই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অনিলকুমার বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার জন্য উঠিল ; এবং তাহার পর, স্নানাগারের দিকে গমন করিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে, স্নান সমাপন করিয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল যে, অনিলা ইতিমধ্যে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। প্রশ্ন করিল "তোমাকে আন্‌তে মোটার গেছল বুঝি ?"

অনিলা বলিলেন "তা' না হ'লে জানলুম কি ক'রে যে, হুজুরের দরবারে হাজির হ'তে হবে! রঘুয়ার দাদাবাবুর সম্বন্ধে একটু ভুল হবার যো কি আছে!"

সে অনিলও নাই, সে অনিলাও নাই। পিতার মৃত্যুর পর শোকে সান্ত্বনা দিবার উপলক্ষ করিয়া, এই দুটা পরিবারের মধ্যে ব্যবধান অজ্ঞাত ভাবে সরিয়া গিয়াছিল। অনিলার স্বামী সরোজবাবু প্রত্যহই প্রায় ভ্রাতার খবর লইতে আসেন ; এবং অনিলাও অনিলের মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় এ বাটীতে আসেন। অনিলের কলেজ হইতে ফিরিতে কোনও দিন ১১৷৷০টা, কোনও দিন বা ১২টা হয় ; এবং সঙ্গে-সঙ্গেই অনিলাকে আনিতে অনিলের মোটার যায়। অনিলা উপস্থিত না থাকিলে অনিলের খাওয়া হয় না ; এবং বোধ হয় অনিলাও এ সময়টার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকেন।

ঘনিষ্ঠতা পর-করা 'আপনি' পছন্দ করে না,—তাই 'তুমি' উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিল।

একটা ঢিলা কোট্ গায়ে দিয়া অনিল খাইতে গেল। অনিলা সেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন ; বলিলেন, "এ আবার কার কোট্? তোমার মত দুটো যে ওর ভেতর ঢুকতে পারে!"

বিস্ময়ের ভান করিয়া অনিল বলিল, "সত্যি! তা হ'লে, আমার দোষ নয় বৌদি,—দর্জ্জি বেটার দোষ। তাকে ব'ল্লুম, 'ওহে, কোট্টা বড্ড বড় যে করে ফেলেছ?' সে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠ্‌ল 'না বাবু, এর চেয়ে টাইট ক'রলে গেঞ্জি হ'ত, কোট হ'ত না।' বল্লুম, 'গলাটা? এটা একটু ছোট ক'রলেই পারতে।' সপ্রতিভ ভাবে সে উত্তর দিলে, 'ছোট ক'রতে বলেন, ক'রে দিচ্ছি বাবু ; কিন্তু শেষকালে দম আটকে গেলে, আমার দোষ দিতে পারবেন না।'

অনিলা উচ্ছ্বসিত হাস্য বহু কষ্টে দমন করিয়া বলিলেন, "এটা ত গেল গল্প ; কিন্তু সত্যিটা এবার শুনতে পাব কি ?"

হাসি মুখে অনিল বলিল "ঢিলা কোটই বাড়ীতে পরবার পক্ষে ভাল,—দর্জ্জিকে সেই কথা বলেছিলুম। তোমাদের যদি ভাল না লাগে, এবার থেকে অন্য ব্যবস্থা হবে।"

অনিলা গম্ভীরভাবে কহিলেন "হুঁ, বুঝলুম। খেতে ব'সবে এবার, না, ভাতটা ঠাণ্ডা জল হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রবে ?"

অনিল বলিল "বস্‌ছি ; কিন্তু এত ভাত ত খেতে পারব না। বৌদি, আমাকে রাক্ষস মনে কর—না? আচ্ছা, বামুণটারও কি একটু আক্কেল হ'ল না! এত ভাত দিলে কি বলে ?"

অনিলা বলিলেন, "দিতে ব'লেছিলুম ব'লে। খেতে পারব না পারব না যে ক'রছ—নিজের চেহারাটা আরসিতে দেখেছ কি? তোমাদের বাবু এই 'নাইট ডিউটি' ফিউটি আমার ভাল লাগে না। এক একটা ডিউটি আসে, আর শরীরটাকে আধমারা ক'রে রেখে যায়।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া অনিল বলিল, "এ কথাটা তোমার মুখেই শুনি, আর রঘুয়াটা কখন-কখনও বলে শুনেছি ; বিশ্বশুদ্ধ আর কেউ ত বলে না। অতএব, হে বৌদি—হার স্বীকার করিয়া চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর কর যে, ও কথা পুনরুত্থাপন করিবে না ; ও বাবা, করেছ কি বৌদি এতগুলো মাছ কে খাবে? আমি কক্ষন ত' খাব না।"

অনিলা গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন, হাঁ কিংবা না কোনটাই বলিলেন না।

অনিল বুঝিল বৌদিদির রাগ হইয়াছে ; বলিল "বেশ, তুমি যে রাগ ক'রলে বড় ; কিন্তু তুমিই বল না—মানুষে কি এগুলো সব খেতে পারে ?"

অনিলা বলিলেন, "বেশ ত, না খেতে পার ফেলে রেখে যেও। কাল থেকে আমাকে আন্‌তে মোটার পাঠিও না।"

ইহার পর বাধ্য হইয়া অনিলকে সেই ভূরি-ভোজন সমাধা করিতে হইল।

(৩)

সেদিন বৈকালে বেড়াইতে-বেড়াইতে অনিল পাথি-বাগানে দাদার বাড়ী আসিয়া দেখিল যে, অনিলা কলতলায় নিকটে একটী বৃদ্ধ ভিখারীর গাত্র হইতে মল-মূত্রাদি পরিষ্কার

করিতেছেন ; তাঁহার ঝি তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে ; এবং বৃদ্ধটী সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অনিলার কটিদেশ বেরিয়া অঞ্চল জড়ানো,—মস্তকের কাপড় খুলিয়া গিয়া স্কন্ধদেশে আসিয়া পড়িয়াছে ; এবং ভিজা চুলের গোছা পিঠ বাহিয়া হাঁটুর নিকট যাইবার চেষ্টা করিতেছে। অনিলা পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন,—অনিলের আগমন দেখিতে পাইলেন না। ঝি দেখিতে পাইল ; মৃদুস্বরে বলিল "মা, দাদাবাবু এসেছেন।"

অনিলা বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হইয়া, ঝিকে ইঙ্গিতে মাথার কাপড় ঠিক করিয়া দিতে বলিলেন। ঝি হাত ভাল নয় বলিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল ; অনিলার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে ঈপ্সিত কার্য্যটা করাইতে বাধ্য করিল। তাহার পর মৃদু হাস্যের সহিত, পিছন না ফিরিয়াই, অনিলা বলিলেন, "এসো অনিল, এসো। তোমাকে এক্ষনি ডাকৃতে পাঠাতে হ'ত ; এসে প'ড়েছ, ভালই হ'য়েছে।"

বৌদিদির অনেক কার্য্যই অনিলের নিকট নূতন। পথ হইতে ভিক্ষুক ধরিয়া আনিয়া খাওয়ান তাঁহার ত নিত্য ব্যবসায়! কিন্তু এ আবার কি? বিস্মিত অনিলকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ না দিয়া অনিলা বলিলেন, "ঝি এসে ব'ললে 'মা, বাড়ীর সামনে একটা বুড়ো ভেগে মুতে প'ড়ে র'য়েছে।' ভাবলুম, আমাদের অনিলবাবু কেমন ডাক্তার হ'চ্ছেন, একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখা যাক্। ইউনিভার্সিটি ত' মেডেল দেয় ;—এইবার বৌদির কাছে মেডেল পাও কি না, চেষ্টা ক'রে দেখ।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, "কেউ কি ভেতরে আনতে চায়? কেউ না। অথচ, চার পাশে ভীড় জমে গেছে। ঝিকে দিয়ে কত বলালুম, কেউ রাজী হ'ল না। ভাবলুম, তোমাকে খবর দিই—রুগী পালায়, ডাক্তার শীগ্‌গির এসো, নইলে মেডেল পাবে না। ইতিমধ্যে দুটো কলেজের ছোকরা যাচ্ছিল—ও ঝি, যা না মা ; একবার যা না দৌড়ে। বেচারি ভিজে গায়ে প'ড়ে র'য়েছে ;—বাবুর ঘরের জানালায় একখানা শুক্‌নো তোয়ালে আছে ; আর আল্‌না থেকে একখানা কাপড় ছুটে নিয়ে আয়। হাঁা, তার পর সেই দুটো ছেলে ধরাধরি ক'রে বাড়ীর ভেতর দিয়ে গেল। তারা বলে, 'আমরা ধুয়ে দিচ্ছি।' আমি বললুম 'না।' ভাবলুম, অনিলবাবু তা হ'লে কি রক্ষা রাখবেন? ডাক্তার মানুষ, ভারি শরীর ; যদি শোনেন, বৌদি' বাইরের লোককে দিয়ে ধুইয়ে-পুঁছিয়ে নিয়েছে,—নিজে কিছু করে নি,—তা হ'লে রেগে আমার সঙ্গে কথাই কইবেন না,—রুগীর চিকিৎসা ত দূরের কথা। এইবার ব্যবস্থা কর, কি কি ক'রতে হবে।"

মুগ্ধ অনিলের মুখ দিয়া ভাল-মন্দ কোন কথাই বাহির হইল না ; মূঢ়ের মত কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তোমার হাতে যখন ও এসে প'ড়েছে, তখন সবচেয়ে বড় ডাক্তারের কাছে আশ্রয় পেয়েছে বৌদি। ওর দরকার সেবা-যত্ন পাওয়া,—তা' এখানে সেটা প্রচুর পরিমাণেই পাবে। আমি চ'ললুম।"

অনিলাকে দ্বিতীয় কথা বলিবার সুযোগমাত্র না দিয়া অনিল প্রস্থান করিল।

বাটী আসিয়া অনিল ভাবিতে বসিল, কিরূপে এই পরমাশ্চর্য্য জিনিষ সম্ভব হয়? হিন্দুর চিরকালের সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ঐ যে তাহারই সমবয়স্কা মেয়ে পথের ভিখারীকে কোলে টানিয়া লইল, সে কিসের প্রেরণায়? তাহার শিক্ষা চিরকালই তাহাকে উল্টা কথা শিখাইয়াছে। যে আবেষ্টনের মধ্যে সে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেও ইহার স্বপক্ষে কোনও কথা শুনিতে পায় নাই। তাহার স্বামীকে অনিল ভাল করিয়াই জানিত। স্ত্রীর কোনও কথায় কিংবা কার্য্যে আপত্তি করা তাঁহার সাধ্যাতীত। সাংসারিক ভাল-মন্দের ভার স্ত্রীর উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। তাঁহার নিকট হইতে সে এ সম্বন্ধে যে কোনও শিক্ষা পায় নাই, তাহা নিশ্চিত। তবে? গত পাঁচ বৎসর হইতে অনিল তাহাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহার প্রতি কার্য্যটা যে সাধারণের মত নহে সে সম্বন্ধে তাহার সংশয় নাই।

বেশী দিনের কথা নয়। দশহরা উপলক্ষে হিন্দু স্ত্রীলোকমাত্রেই গঙ্গাস্নান করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। সেই কথা মনে করিয়া অনিল অনিলাকে গিয়া বলিল "বৌদি, মোটারে ক'রে নেয়ে এস না।"

অনিলা বলিলেন "কি হবে গিয়ে? তার চেয়ে যদি তোমার ছুটী থাকে, চল 'জু'তে (Zoo) যাই।"

অনিল বলিল "না,—না, সকলে যাচ্ছে,—তুমিও কেন যাও না?"

উচ্চ হাস্যের সহিত অনিলা বলিলেন, "তুমি যে আমাকে যুক্তির দোহাই দিয়ে বড় ঠাট্টা কর। মশায়ের এখন যে চমৎকার যুক্তি বেরুচ্ছে! সকলে যাচ্ছে, অতএব আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু কেন, শুনতে পাব কি?"

অনিল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "ঐ যে ওরা বলে, দশহরার দিন গঙ্গা নাইলে পুণ্য হয়—তুমি এ সব মান না?"

অনিলা বলিলেন, "ওরা কারা, শুনি? শাস্ত্রকারেরা, না তাঁদের উপাসকেরা? তার পর, আমি মানি কি না উত্তর দেবার আগে, তোমায় জিজ্ঞেস করি—তুমি মান কি না! কেমন, তুমি মান ত'? লেখাপড়া শিখেছ, অনেক কথা ভাবতে শিখেছ, তোমার উত্তরটা কি শুনি?"

অনিল বলিল, দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াই বলিল "বোধ হয় বৌদি মানি না। এ সব কথা কোনও দিন ভেবে দেখি নি, দেখবার প্রয়োজনও হয় নি; কারণ, পুরুষদের বেলায় শাস্ত্রকারেরা অনুশাসনগুলো একটু নরম ক'রে গেছেন। এই পর্য্যন্ত ব'লতে পারি, গঙ্গা নাইতে ভাল লাগে। আচ্ছা, তুমি যখন কোমর বেঁধে তর্ক সুরু ক'রে দিয়েছ, নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে তোমার একটা নির্দ্দিষ্ট মতামত আছে। তুমিই বল না বৌদি।"

অনিলা বলিলেন, "আমার মত? মেয়েমানুষের মতামত? ভাল লাগবে ঠাকুরপো? তুমি আমার লক্ষ্মী ভাইটী; তোমার মন্দ না লাগতেও পারে। তা বলে, কলেজে গিয়ে বৌদির মতামত ঢাক পিটিয়ে বেড়িও না—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। শাস্ত্র কোনও দিন প'ড়ে দেখি নি, সে রকম বিদ্যেও নেই। সহজবুদ্ধি যা' শেখায়, তার ওপর বাধ্য হ'য়ে আমাদের আস্থা স্থাপন করতে হয়। অবগাহন-স্নানটা মন্দ ব'লে মনে করি না। কিন্তু, অমুক তিথিতে গঙ্গায় নাইলে সশরীরে স্বর্গ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, কি ক'রে বিশ্বাস করি, বল ত? সেই তিথিতে কি ক'লকাতার ময়লাজল গঙ্গায় গিয়ে পড়ে না? গ্রহ-উপগ্রহের জলের ওপর প্রভাব আছে মানি; তিথিবিশেষে প্রভাবটা বাড়তে কিংবা ক'মতে পারে,—সেটা বিশ্বাস ক'রে নেওয়াও শক্ত নয়; কিন্তু একচোখোমি দোষটা গ্রহ-উপগ্রহের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে যে প্রবৃত্তি হয় না! তুমিই বল না ঠাকুরপো, কি অপরাধে অন্য নদনদীকে বঞ্চিত ক'রে কৃপার ধারাটা গঙ্গার ওপরেই এসে প'ড়বে? অথচ, আবহমান কাল থেকে এই স্নান ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করবার লিপ্সাটা আমাদের দেশে চ'লে এসেছে; উত্তরাধিকার সূত্রে আমরাও বেশ ভাল ক'রেই এ জিনিষটাকে রক্ত-মাংসের সঙ্গে মিশিয়ে নিজের ক'রে নিয়েছি। আমি ত' ভেবে পাই না, কি ক'রে এই সব সংস্কারের ভারী মোট আমরা মাথায় প্রাণপণে চেপে ধ'রে থাকি। একটু নাবিয়ে চোখের সামনে ধ'রতে সুদ্ধ ইচ্ছে হয় না—যেন কি একটা ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। এমন কথা ব'লছি না যে, প্রথাটা নিছক ভুল; সে পাণ্ডিত্যও আমার নেই যে, এ সম্বন্ধে যদি কোনও গূঢ় তত্ত্ব থাকে, তার উদ্ঘাটন করি। আমি ব'লতে চাই, আমাদের এ হীন দাসত্ব-বৃত্তি কেন? না বুঝে, সত্য তথ্য না অনুসন্ধান ক'রে, অন্ধের মত পুরান যা-কিছুকে এই যে আঁকড়ে ধ'রে থাকা—তাতে আমাদের লাভ কি হ'চ্ছে শুনি? কিছু না। বরং, ধ্বংসের দিকেই একটু-একটু ক'রে অগ্রসর হ'চ্ছি। মনুষ্যত্বকে এমন ক'রে পাথর-চাপা দিয়ে রাখতে আমার ত বুকে বাজে ভাই! যাক্, অনেকক্ষণ ব'কেছি, কৈ জুতো যাবার কি হ'ল?"

অনিলের কেবল মনে হইতে লাগিল,—আশ্চর্য্য, পথের অস্পৃশ্যকে বক্ষে তুলিয়া লইতে ঘৃণা নাই; আবার, সনাতন গঙ্গাস্নানের উপরও বিতৃষ্ণার অন্ত নাই! কেন? সে সমস্যা কে পূরণ ক'রবে? যুক্তি দিয়া মুখ বন্ধ করিবার শক্তি অনিলের নাই; যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই বা কি করিতে পারেন? চিরকালের নির্দ্দিষ্ট পথ রেখাকে যে প্রচণ্ড শক্তি লেপিয়া, মুছিয়া একাকার করিয়া দিতে পারে, তাহাকে যুক্তি দিয়া ঠেকাইবে কে?

(৪)

সে দিন সন্ধ্যাবেলা অনিলার বাটীতে অনিলের খাইবার কথা ছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া বহু যত্নে অনিলা তাঁহার প্রিয় দেবরটীর জন্য নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কোন্‌টা সে ভালবাসে, কোন্‌টার উপর তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোভ—এ সব অনিলার নখাগ্রে; তজ্জন্য, আয়োজনের ত্রুটী হয় নাই। গোল হইল অনিলকে লইয়া। কলেজ হইতে ফিরিবার পথে একদল সহপাঠীর হস্তে সে পড়িল। তাহারা তাহার সহস্র যুক্তি-তর্ক উপেক্ষা করিয়া একটা গান-বাজনার বৈঠকে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

সুগায়ক বলিয়া অনিলের খ্যাতি ছিল,—সঙ্গীতের উপর আকর্ষণও তাহার যথেষ্ট। কাজেই সভা শীঘ্র জমিয়া উঠিল এবং টং টং করিয়া বারটা বাজিবার পূর্ব্বে অনিলের হুঁস রহিল না যে, তাহাকে আজ অনিলার নিকট নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে। ঘড়ির শব্দে অনিল সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং একটা সাধাসিধা নমস্কারের পালা সারিয়া লইয়া একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। মন তাহার তখন উধাও হইয়া পার্শি-বাগানের বাটীতে হাজির হইয়াছে। একখানা ট্যাক্সি যাইতেছিল; ইঙ্গিত করিয়া অনিল তাহাকে ডাকিল এবং ভাল করিয়া থামিবার পূর্ব্বে তাহাতে উঠিয়া বসিয়া চালককে ঠিকানা বলিয়া দিল। ট্যাক্সি ছুটিল; কিন্তু জীবনে আজ অনিলের প্রথম মনে হইল যে ট্যাক্সিগুলো মোটেই দ্রুত চলে না।

দরজা বন্ধ ছিল। কড়ার শব্দ করিতেই ঝি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল; এবং অনিলের প্রশ্নোত্তরে বলিল, "মা খাবার নিয়ে আপনার জন্য ব'সে আছেন।" লজ্জিত অনিল লাফাইতে-লাফাইতে উপরে উঠিয়া দেখিল, থালা সাজান রহিয়াছে, কিন্তু অনিলা নাই,—তাঁহার ঘরের দরজা বন্ধ। বিস্মিত ভাবে ইতস্ততঃ চাহিয়া অনিল কাহাকেও দেখিতে পাইল না; ভাবিল, 'তবে কি আমি ভুল শুনিলাম? ঝি ত' বৌদির কথাই বলিল!' দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পিছন ফিরিতেই সে দেখিতে পাইল যে, ঝি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিতেছে। অনিল তাহাকে প্রশ্ন করিল, "কৈ বৌদি ত এখানে নেই; তুমি যে ব'ললে, ওপরে ব'সে আছেন।"

ঝি বলিল, "হাঁ, তাই তো ছিলেন। এই খানিকক্ষণ আগে আপনার নাম করে আমাকে বলছিলেন, 'কেন এত দেরী হচ্ছে বলতে পারিস্? তার ত' কখনও এমন হয় না!' বাইরে কড়ার আওয়াজ হতে তিনিই বললেন, 'ঐ বুঝি সে এল; যা—যা, দরজা খুলে দিয়ে আয়।'"

অনিল বুঝিল, বৌদিদির অভিমান হইয়াছে,—কিছু পরিশ্রম অনিবার্য্য। প্রথমে ক্ষমা চাহিয়া সে বৌদিদির বহিরাগমন প্রার্থনা করিল; ভিতর হইতে সাড়া আসিল না, —কেহ শুনিতে পাইল কি না, তাহাও বুঝা গেল না। তাহার পর সে অনুনয়-বিনয় সুরু করিল; তাহাতেও সুবিধা হইল না। অবশেষে অনিল আর এক পথ অবলম্বন করিল; বলিল "বেশ ত', তুমি যদি না বেরোও,—আমিও খাব না।" ইহাতেও যখন কোনও ফল হইল না, অনিল হতাশ হইয়া পড়িল। মনে-মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া সে ভাবিল, আর সে কি করিতে পারে? এত তোষামোদেও যখন অভিমান গেল না, কাজ নাই তাঁহার বাহিরে আসিয়া! ঝি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল; হাসিবার চেষ্টা করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া অনিল বলিল, "বৌদিকে বলো যে, আমি সমস্ত দিন উপোসের পর না খেয়ে ফিরে গেলুম।"

ঝি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কেন দাদাবাবু, খাবার ত রয়েছে, আপনি খেতে বসুন না!"

একটা ক্ষুদ্র "না" বলিয়া অনিল দ্রুতপদে সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, উপরে অনিলার গলা শুনা যাইতেছে। একটু দাঁড়াইল, আবার কি ভাবিল, তাহার পর দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া পড়িল।

অনিল চিরকালই স্থিরবুদ্ধি; সহসা চঞ্চল হইয়া উঠা তাহার স্বভাব নয়। কিছু করিবার পূর্ব্বে, সে ভাবিয়া দেখে, এবং করা হইয়া গেলে পুনরায় ভাবিবার জন্য বসিয়া যায়। ট্যাক্সিতে আসিতে-আসিতে তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না, ক্ষোভেরও সীমা ছিল না। এ সে কি করিয়া বসিল! তাহার চিরস্নেহময়ী বৌদিকে সে ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তিনি যে তাহার জন্য সন্ধ্যা হইতে কি আকুল আগ্রহ ও ব্যাকুল প্রতীক্ষা লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন, সে কথা তাহার নিকট অবিদিত ছিল না। ইচ্ছা ছিল, ঘণ্টাখানেক বৈঠকে থাকিয়া সে বৌদিদির নিকট যাইবে; কিন্তু কার্য্যগতিকে সমস্তই উল্টাইয়া গেল। অপরিসীম বিরক্তির সহিত সে নিজেকে ধিক্কার দিল,— বন্ধুদিগের উপরও ক্রোধ হইল। তাহারাই ত' এই সর্ব্বনাশের মূল! যদি না তাহারা অমন করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে এসব কিছুই হইতে পারিত না,—এত বিভ্রাটেরও সৃষ্টি হইত না। পর মুহূর্ত্তে হাসি পাইল। ভাবিল, 'বেশ, পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়া নিজেকে বাঁচান, এই চির-পুরাতন আত্মরক্ষা করিবার প্রণালীটা দেখিতেছি আমিও কায়মনোবাক্যে আয়ত্ত করিয়াছি। করিলাম দোষ নিজে, দোষী করিতেছি সঙ্গে যাহারা ছিল তাহাদিগকে।' তৎপরে, ঝি দরজা খুলিয়া যখন তাহাকে জানাইল যে, অনিলা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া

আছেন, তখন তাহার লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল—নিরতিশয় ব্যথার সহিত বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, তাহার এ অন্যায়ের বুঝি শেষ নাই, বুঝি ক্ষমাও নাই।

চিন্তার ধারা স্রোতের উল্টা মুখ ধরিল যখন অনিলা শত উপরোধ-অনুরোধেও বাহির হইলেন না। পথ চলিতে-চলিতে অনিল ভাবিতেছিল, কেন, এতই কি তাহার অপরাধ যে অভুক্ত অবস্থায় এমন করিয়া তাহাকে তিনি বিদায় করিলেন? একবার বাহিরে আসিয়া দেরী হইবার কারণটাও ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন! তাহাও ত' করিলেন না! সে ত অস্বীকার করিতেছে না যে তিনি বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন; কিন্তু, সে ত' ইচ্ছা করিয়া দেরী করে নাই। এতদিন যে অনিলাকে অনিল সাধারণের বাহিরে বলিয়া মনে করিত, আজ তাঁহাকে সব স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে বসাইয়া ছাড়িল। সে বলিল, ইহা আর কিছু নয়,—স্ত্রীলোকমাত্রেই যেমন কারণ নির্ণয়ের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, মান অভিমানের হস্তে আত্মসমর্পণ করে, ইহাও তাহাই। এ চিন্তা কিন্তু তাহাকে না দিল সুখ, না দিল স্বস্তি। কোথায় কি যেন অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া তাহার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

বাটী পৌঁছিয়া অনিল শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। রঘুয়ার প্রশ্নের উত্তরে "খাইয়া আসিয়াছি" বলিয়া শয্যার দিকে চলিল। সে এখন শুইয়া পড়িতে পারিলেই বাঁচে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা তাহার অন্তর্হিত হইয়াছিল। শয্যায় শুইয়া তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। কেন, কিসের জন্য বৌদিদি তাহাকে না খাইতে দিয়া ফিরাইয়া দিলেন? তিনি যদি তাহার সম্বন্ধে এত নির্লিপ্ত হইতে পারেন, সেও কাল হইতে তাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিবে না। আবার চক্ষু ছাপাইয়া, কপোল ভিজাইয়া অশ্রুর প্রবাহ বহিল; মস্তকের উপাধান ভিজিল; কোঁচার প্রান্তভাগ সিক্ত হইল; তথাপি অশ্রু থামিল না। অবশেষে, অনিল ঘুমাইল।

(৫)

অনিলার বিরক্তিপূর্ণ স্বরে হতবুদ্ধি ঝির সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। অনিলা বলিতেছিলেন, "হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছ, কেন? দরজাটা বন্ধ ক'রতে হবে না? অনিল ত' অনেকক্ষণ চ'লে গেছে!"

ঝির সাহস হইল না এ কথা বলে যে, দাদাবাবু এইমাত্র চলিয়া গেলেন,—তাঁহার পদশব্দ সিঁড়িতে এখনও মিলায় নাই। সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

এইবার অভুক্ত থালার সম্মুখে অনিলা ধীর ভাবে আসিয়া বসিলেন। স্বামী সুপ্ত; বাটীতে আগুন লাগিলেও তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা ছিল না। উপযুক্ত অবসর দেখিয়া আকাশ-পাতাল-জোড়া চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। দেওয়ালের গায়ে ঈষৎ হেলান দিয়া তিনি বসিয়া ছিলেন। মাঝে-মাঝে সমস্ত চিত্ত মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া বাহিরের গুমোট বাতাসের সহিত মিলাইয়া যাইতেছিল। ক্রমে-ক্রমে তাহাও বন্ধ হইল। প্রস্তর-মূর্ত্তির মত তাঁহার স্থির ভাব; স্পন্দন আছে কি না বুঝা যায় না; চক্ষের পলক পড়িতেছে কি না তাহারও স্থিরতা নাই। বড় ঘড়িটা টং টং শব্দে গৃহস্বামিনীকে সচেতন করিবার বৃথা চেষ্টা ক'রিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিল; বাড়ীর বিড়ালটা মিউ মিউ শব্দে করুণ প্রার্থনা জানাইল; এবং 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' জানিয়া, সম্মুখস্থিত রোহিত মৎস্যের মুড়াটার প্রতি মনোযোগ দিল। অনিলার সাড়াও নাই, শব্দও নাই।

চৈতন্য হইল ঝির ডাকে। সে বলিতেছিল "অমন ক'রে ব'সে র'য়েছ কেন মা? অসুখ ক'রেছে বুঝি? ইস, কি বিশ্রী মুখ-চোখের চেহারা হ'য়ে গেছে!"

অনিলা চোখ তুলিয়া দেখিলেন যে, ভোরের আলো সম্মুখের একতলা ছাদটার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। অসংযত বস্ত্র ঈষৎ গুছাইয়া লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কৈ, কিছু হয় নি ত! রাত্তিরে ঘুম হয়নি ব'লে বোধ হয় অমন দেখাচ্ছে।"

ঝি সন্দিগ্ধভাবে বলিল "তাই হবে। আজ তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে নিয়ে শুয়ে প'ড়—দাদাবাবুর ওখানে গিয়ে কাজ নেই।"

"দেখা যাবে" বলিয়া অনিলা কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন।

(৬)

পরদিন অনেক বেলায় অনিলের ঘুম ভাঙ্গিল। তখন প্রাতঃসূর্য্যের প্রচুর আলো উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া সারা গৃহ ভরিয়া দিয়াছে। চোখ চাহিতেই সেই প্রখর আলো ছুটিয়া আসিয়া অনিলের চক্ষে ধাক্কা মারিল। সে তেজ অনিল সহিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি হস্ত দ্বারা নয়ন আবৃত করিয়া ফেলিল। তাহার চিরকালের অভ্যাস, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা। আজ এত বিলম্ব হওয়াতে সে মনে-মনে বিলক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইল; এবং তাহার হেতু অনুসন্ধান করিতে গিয়া, গতরাত্রের কথা তাহার মানসপথে ভারবাহী যাত্রীর মত সমস্ত দেহ মনে বিশ্বের ক্লান্তি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অনুভূতি অনিলের শ্রান্ত মনটাকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকে ধীরে-ধীরে শক্তিহীন করিয়া ফেলিল। একটু পূর্ব্বেই সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল, পুনর্ব্বার শুইয়া পড়িল। পাঠানুরাগী অনিলের কলেজ যাইবার কথা মনে হইল; কিন্তু, গভীর বিতৃষ্ণার সহিত সে চিন্তাকে মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিতে তাহার বিলম্ব হইল না। বিছানা আঁকড়াইয়া অভিভূতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ পড়িয়া থাকিবার পর, একটু-একটু করিয়া তাহার ভাবিবার শক্তি যেন ফিরিয়া আসিতে লাগিল। প্রথম কথা, তাহার ত' কিছুই করিবার নাই! তাহার শোক করিবারও কিছু নাই, উল্লসিত হইবার মতও কিছু নাই! তাহার সুখ নাই, দুঃখ নাই—শান্তি নাই, অশান্তি নাই! এই বিরাট 'নাই'-এর মধ্যে তাহারও বুঝি স্থান নাই! তাহার পর, তাহার মন তাহাকে অন্য পথে টানিয়া লইল। সে তখন ভাবিল অনিলার কথা। প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরিয়া একে-একে পুরাতন স্মৃতি বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় তাহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইল। অসীম আগ্রহের সহিত সে প্রত্যেকটীকে প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে লাগিল;—যেন এক অপরিসীম আনন্দের প্রকাণ্ড ঢেউ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! 'বর্ত্তমান' চিন্তার স্থান হৃদয়ে নাই; 'অতীত' বক্ষের প্রতি কোণটা জুড়িয়া!

চিন্তাস্রোত বাধা পাইল রঘুয়ার হাঁকাহাঁকিতে।

তাহার উদ্বিগ্ন, ভীত কণ্ঠস্বর অনিলকে বহির্জগতে ফিরাইয়া আনিল। লজ্জিত হইয়া সে উঠিয়া পড়িল, এবং সত্বর দরজা খুলিয়া দিল। সম্মুখেই ব্যগ্র-ব্যাকুল ও ভয়-বিবর্ণ মুখে রঘুয়া দাঁড়াইয়া। অনুতপ্ত অনিল মিনতির সহিত কহিল, "সত্যি, ভারী অন্যায় হয়ে গেছে আমার। শরীরটা একটু খারাপ মনে হ'চ্ছিল, তাই বিছানায় পড়ে ছিলুম। তোমাদের বড় ভাবনা হ'য়েছিল—না?"

শরীর ভাল নয় শুনিয়া রঘুয়ার উদ্বেগ কমা দূরে থাকুক্ বাড়িয়া উঠিল। সে প্রশ্ন করিল, "শরীর খারাপ হল কেন?"

অনিল দেখিল, সে এক বিপদ সামলাইতে গিয়া আর এক বিপদে পড়িয়াছে। বুদ্ধিমানের মত অধিক কথা না বলিয়া, সে কোনও মতে রঘুয়াকে আশ্বস্ত করিয়া স্নানাগারের দিকে গমন করিল; এবং যাইবার সময় বলিল, "রঘুয়া, দেরী হয়ে গেছে, কলেজ যাব না আজ। শরীরটাও তত সুবিধে নেই, বামুন ঠাকুরকে বলে দিও যে, এ বেলা আর ভাত খাব না।"

তাহার পর, আবার ফিরিয়া আসিয়া, একটু ভাবিয়া, একটু কাসিয়া, রঘুয়ার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে নিজের আরক্ত মুখখানাকে যথাসম্ভব গোপন করিয়া বলিল, "হাঁ দেখ, ভাত যখন আজ খাব না, বৌদিকে আনতে মোটার পাঠিও না; কেন শুধু শুধু তাঁকে কষ্ট দেওয়া!"

অনিল ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক্ করিয়াছিল, 'বেশ ত', বৌদি, তুমি যখন আমাকে চাও না, তোমাকে আর বিরক্ত করব না। কিন্তু তুমি আমাকে যা' দিয়েছ, তা ত' আর কেড়ে নিতে পারবে না।'

অতীতের স্মৃতি যে কত সুখের, তাহা তাহার নবলব্ধ জ্ঞান এইমাত্র তাহাকে ভাল করিয়াই জানাইয়া গিয়াছে। সে আর কাহারও কৃপাপ্রার্থী নহে।

কিন্তু এ কি? মন যে প্রবোধ মানে না! সে দিনটা কোনও মতে কাটিল; কিন্তু আর যে দিন কাটে না! নিয়মিত দিবস-যাত্রার পথে কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। পূর্ব্বের মতই প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ, যথানিয়মে কলেজে গমন, বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর পুনরায় কলেজ, বন্ধুবর্গের সহিত বৈকালিক ভ্রমণ এবং রাত্রের আহার সমাধা করিয়া শয়ন—সব কর্ত্তব্যগুলিই ত একটার পর একটা করিয়া সে পূর্ব্বের মত করিয়া যায়! তবে, স্বস্তি পায় না কেন? মন যেন তাহার অনুক্ষণ কি খুঁজিয়া

ফিরিতেছে। হারাইয়া-যাওয়া জিনিষটা যেমন সকল কর্ম্মের ভিতরে মনকে তাহার দিকে ক্রমাগত টানিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়াই অনিলার অনুপস্থিতি তাহার সমস্ত চিত্তকে সেদিকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত দিবসের মধ্যে এক ঘণ্টা, বড় জোর দেড় ঘণ্টা, অনিলা অনিলের গৃহে থাকিতেন। সে আর এমন বেশী কি? অনিল তাই ভাবিয়া পাইত না, কি করিয়া সেই একটা লোকের এক ঘণ্টার অদর্শন তাহার জীবনকে এরূপ বিস্বাদ, এরূপ দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। সে সময়ে-সময়ে নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। এ মানসিক অবনতির জন্য নিজেকে সহস্র দিক্ দিয়া লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টায় থাকিত। যে তাহাকে চায় না, তাহার জন্য এ ব্যাকুলতা কেন! পূর্ব্বে কলেজ হইতে ১১৷৷০টার পূর্ব্বে ফিরিত না; এখন ১০টা বাজিলেই ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। তাহার চিরকালের অভ্যাস পদব্রজে বাটী ফিরিয়া আসা। কাল হঠাৎ কি ভাবিয়া সে ট্যাক্সি করিয়া ফিরিয়াছিল। বাটী আসিয়া দ্বারবানকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া, পরমুহূর্ত্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া, দ্রুত পাদক্ষেপে উপরে উঠিয়া আসিয়াছিল; রঘুয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। অথচ, প্রতি মুহূর্ত্তে এই রঘুয়ার নিকট হইতে যে খবরটা পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিতেছিল, সে সংবাদ আর যাহার নিকট গোপন থাকে থাকুক, নিজের নিকট যে ছিল না, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

রঘুয়ার এ সব ভাল লাগিতেছিল না। দাদাবাবুর সর্ব্ববিষয়ে অকারণ অনাসক্তি, বৌদিদির তিনদিন অদর্শন— গত পাঁচ বৎসরের ভিতর নূতন ব্যাপার। সে মনে-মনে বুঝিতেছিল, কি একটা গোলযোগ হইয়াছে; এবং জানি না কেন, সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিত যে, বৌদিদি আসিলেই সব গোলমালের নিষ্পত্তি হইবে। মোটার পাঠাইবার কথা দু-একবার যে উত্থাপন করে নাই তাহা নহে; কিন্তু অনিলের সে বিষয়ে ঘোরতর অনিচ্ছা দেখিয়া বেচারী অধিক অগ্রসর হইতে পারিত না।

আজ চতুর্থ দিন। প্রাতঃকালে শয্যায় বসিয়া অনিল ভাবিতেছিল, না, এরূপ করিয়া কিছুতেই চলিবে না, শেষে কি পাগল হইয়া যাইব? হঠাৎ তাহার মনে এক সঙ্কল্পের উদয় হইল। রঘুয়াকে ডাকিয়া বলিল, "রঘুয়া, শরীরটা ত' সারছে না—চল, দিনকয়েকের জন্যে দার্জ্জিলিঙটা ঘুরে আসি। আজই বেরোন যাক্—কি বল? মিছিমিছি দেরী করে কি হবে?" বিস্মিত রঘুয়া কেবলমাত্র বলিল, "আজই?" একটু জোর দিয়া অনিল বলিল, "হাঁ, আজই। বাড়ীটা ত' খালি আছে, মাতাজীকে খবর না দিলেও চ'লতে পারে।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

স্বর্গাশ্রম

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ]

লছমনঝোলার পথে দেখা যায় ওই স্বর্গাশ্রম,
দূর হতে পথিকের জন্মায় যা তুষারের ভ্রম।
'কেদার' কি 'বদরীর' যেথাকার যাত্রী হও তুমি,
ভুলনা ভুলনা যেন দেখে যেতে সেই পুণ্যভূমি।
আশ্রমের নৌকা যবে লাগিবেক স্বর্গাশ্রম ঘাটে,
চুপি চুপি কথা কয়ো সুপ্রশস্ত সোপানের পাটে
ওই যে রয়েছে কক্ষ গৈরিক বসন দিয়ে ঢাকা,
হোথা এক মৌনী বাবা মহাযোগে মগ্ন রন একা।
ভক্তিভরে বন্দি' তাঁরে, চলে যেয়ো কিছুই না বলি,
নীরব সে আশীর্ব্বাদ, নীহারের মত পড়ে ঢলি।

আহ্বানিবে যবে তোমা "আইয়ে মেরি নারায়ণ" বলে,
পুণ্য করি লয়ো শির নমিয়া তাঁদের পদতলে।
ঘুরিয়া আশ্রম দেখি' হবে দেরী না হয় কিঞ্চিৎ,
সাধু 'আত্মপ্রকাশে'র দরশনে হয়ো না বঞ্চিত।
উত্তরখণ্ডের যাত্রি! তোমরা কি শোন নাই নাম
"বাবা কালী কম্‌লীয়ালা" সমভাবে বহে অবিরাম
যাঁর প্রেম মন্দাকিনী নিত্য সত্যনারায়ণ হ'তে,
কেদার বদরী হয়ে হিমময় গোমুখীর পথে,
সদাব্রত রূপ ধরি, অমৃত বিতরি দিশি দিশি
মরতের পথ দরি স্বরগের সাথে গেছে মিশি।

ধর্ম্ম সম যাঁর স্নেহ স্বর্গ-পথে সাথে সাথে যায়,
ভক্তি-ভরে প্রণমিতে ভুলনা ভুলনা যেন তায়।
তাঁরি শিষ্য প্রিয় শিষ্য আশ্রমের সে 'আত্মপ্রকাশ'
স্থির হয়ে শুনো যেন তাঁহার অপূর্ব্ব ইতিহাস।
শৈশবে দুর্দ্দান্ত ছিল, ভক্তি-কথা উড়াইত হাসি,
চাহিয়া শ্রীমূর্ত্তি পানে নিক্ষেপিত উপেক্ষার রাশি।
"পাথরে ঠাকুর র'ন অমূর্ত্তের হয় কভু কায়া,
বাতুলের কথা এ যে 'এ সব অবিদ্যা ঘোর মায়া'।
ছিল দম্ভী শূন্যগর্ভ দার্শনিক তার্কিক কেবল,
কেমনে পড়িল শোনো বক্ষে স্বাতি নক্ষত্রের জল।
অকালে মরিয়া গেল, স্নেহময়ী জননী তা'হার,
উদ্‌ভ্রান্ত যুবক ভ্রমে, ধারে না ধরার কোন ধার।
গুঞ্জরিয়া ফেরে শুধু, পায় নাক ভকতির মধু,
রঙ দেখে, গন্ধ পায়, প্রাণ তার রিক্ত থাকে শুধু।
একদিন শুভদিনে, জীবনের সুমঙ্গল প্রাতে,
আসিল হেথায় যুবা, ক্লান্ত-দেহ কমণ্ডলু হাতে।
হিমাদ্রির বক্ষভেদি, যেথা ওই অৰ্দ্ধচন্দ্রাকারে
নামিছেন মন্দাকিনী স্নিগ্ধ ক্ষীণ রজতের ধারে।
অকস্মাৎ সেইখানে, হেরিল যে মূরতি মধুর,
অব্যক্ত পুলকাবেগে হৃদয় হইল ভরপুর।
শূন্যবাদী প্রাণে এলো আকারের প্রথম ইঙ্গিত,
বাজিল মায়ার কাণে কায়ার সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত।
নিমেষের দরশনে ব্যর্থ হ'ল দর্শনের জ্ঞান,
জন্মান্ধ পাইল নেত্র, কল্পনা-রহস্য অবসান।

বসি যুবা তরুমূলে আশ্রম গড়িল মনে মনে
মণিকূট পাদদেশে ওই সেই সুগভীর বনে।
পরদিন প্রত্যুষেতে শেঠ এক আসিয়া সেথায়
লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা লয়ে চরণে ঢালিয়া দিতে চায়।
বলিল যুবক সাধু "জান বাপু, আমি উদাসীন;
কি করিব অর্থ লয়ে; যদি তুমি বোঝো সমীচীন
গড়ে দাও পান্থশালা, খুলে দাও সদাব্রত তুমি।"
'তথাস্তু' বলিয়া শ্রেষ্ঠী আনন্দেতে লয় পদ চুমি।
কাল যাহা স্বপ্ন ছিল সত্য আজি; কহিল সন্ন্যাসী,
"হে ঠাকুর পাষণ্ডেরে একেবারে করিলে বিশ্বাসী।"
যাদুকর-মন্ত্রে যেন উঠিল আশ্রম মনোহর,
চারিদিকে শান্তিময় সন্ন্যাসীর কুটীর-নিকর।
একদিন নিশাকালে গুরুরে হেরিয়া তন্দ্রালোকে
কাঁদিল সাধক যুবা ভরা হৃদি বিস্ময়ে পুলকে।
প্রশান্ত নয়ন মেলি হাস্য মুখে সিদ্ধ গুরু কন,
"শ্রীহরির কৃপা বৎস হওনা হওনা বিস্মরণ।
আকাশ দেউল দেখ পেয়ে তব আকাঙ্ক্ষার টান
নেমে আসি ধরা গায়ে হয়েছে আশ্রম সুমহান।
ভক্তের প্রণয়ে যদি স্বপ্ন সেও সৌধ হয়ে রয়,
মৃণ্ময়ে চিন্ময় রবে, তাতে আর আছে কি সংশয়।
অমূর্ত্তেরও মূর্ত্তি আছে ভক্ত-দৃষ্টি পর-পারে যায়,
জ্যোতির পরিধি লঙ্ঘি শ্রীমূর্ত্তিরে দেখিবারে পায়।"

নির্ব্বাক্ নল

[শ্রীভিক্ষু সুদর্শন]

কান্দি নগরে বুদ্ধের দন্ত-মন্দিরের অনতিদূরে একজন বণিক্ বাস করিতেন। রাজপথে তাঁহার যে দোকান ছিল, তাহারই আয়ে তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। সাধারণ বণিকের ন্যায় তিনি প্রবঞ্চক ছিলেন না— সাধুতাই তাঁহার পথ-প্রদর্শক ছিল।

মৃত্যু সন্নিকট দেখিয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "নল! তোমার মাতৃদেবী ও ভগিনীদের দেহান্তর হইয়াছে—তাঁহারা ভিন্ন দেহ গ্রহণ করিয়াছেন। আমার দেহেরও লয় প্রাপ্ত হইবার সময় আসিয়াছে; আমার নির্ব্বাণের দেরী থাকিলেও, দেহান্তর পরিগ্রহণের সময় আসিয়াছে। আমার ধনরাশি দন্ত-মন্দিরে দান করিব, কি তোমার জন্য রাখিয়া যাইব, সে সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়াছি। কয়েকদিন পূর্ব্বে তোমার মতামত জিজ্ঞাসা করাতে, তুমি আমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছ।

আমি এই সদুত্তরে প্রীতি লাভ করিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, দানে তুমি কৃপণতা করিবে না। অধিকন্তু, তুমি চিন্তাশীল। আমার সর্ব্বস্ব আমি তোমার হস্তেই ন্যস্ত করিব; ইহাতে তোমার অভাব থাকিবে না—তুমি ভগবানের ধ্যানে সময়াতিপাত করিতে পারিবে। অর্থাভাব হইলে ভগবানের চিন্তা আইসে না। কিন্তু, আমার নিকট তোমাকে দুইটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। প্রথম, 'যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে'—সর্ব্বদা তুমি বুদ্ধের এই কথা স্মরণ রাখিবে এবং দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রশ্ন করিবে না।"

পুত্র জীবনব্যাপী এই দুই আজ্ঞা প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

পিতা বলিতে লাগিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব মন্দিরে দান করিলে, পুনর্জ্জন্মে আমার সুবিধা হইত; কিন্তু, তাহা না করিয়া তোমাকে দান করিলাম বলিয়া, তোমাকে এই দুইটী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইল। তুমি অবগত আছ যে, মৃত্যুতে পিতাপুত্র বিভিন্ন হয় এবং আমাদের সঙ্গে কেবল আমাদের কর্ম্মফলই যাইয়া থাকে। তোমাকে যে উপদেশ দিলাম, তাহা তুমি প্রতিপালন করিতে পার, অথবা অবহেলাও করিতে পার। আমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া আছি, তাহা তুমি পরিত্যাগ করিও। কর্ম্মফলেই আমি বিবাহ করিয়া সন্তানাদি লাভ করিয়াছিলাম; এবং তাহাদিগকে প্রতিপালনার্থই এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলাম। কিন্তু, কৃষিকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কৃষিতেই লোকে সাধুতা অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারে।"

পুত্র এই পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

কিয়দ্দিবস পরে বৃদ্ধ মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। পুত্র মৃতার পারত্রিক কার্য্য যথোচিত সম্পন্ন করিলেন। জীবন অনিত্য জ্ঞানে পুত্র পিতার জন্য অধিক শোক করিলেন না। তৎপরে পিতার কারবার বিক্রয় করিয়া ক্ষুদ্র একটী গৃহ ও তৎসংলগ্ন ভূমি ক্রয় করিয়া একাকী বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। একাকী থাকিয়া তিনি মনে করিতে লাগিলেন, 'কি সুন্দর জীবন'। যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে।"

একদিন নল স্বীয় উদ্যানে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী দেখিতে পাইলেন—পক্ষীটীর অর্দ্ধেক সাদা, অর্দ্ধেক কালো। মনের আনন্দে সে নাচিতে লাগিল। নল তাহার আনন্দে আনন্দিত হইলেন, তাহার নৃত্যে প্রীতিলাভ করিলেন, তাহাকে বিরক্ত করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে পক্ষীটী উদ্যানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া-ফিরিয়া আহার সন্ধান করিতে লাগিল। মধ্যে-মধ্যে সে থাকিয়া-থাকিয়া নলের দিকে নির্ভীক হৃদয়ে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কখনও বা সে ক্ষুদ্র শাখায় উপবেশন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। ওষ্ঠ দ্বারা, নিজের শরীরের যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর চুলকাইতে লাগিল। কোন সময়ে দক্ষিণ পক্ষ বিস্তৃত করিতে লাগিল, কোন সময় বাম পক্ষ বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে সে একবার তাহার ডা'ন পা, একবার বাঁ পা উঁচু করিয়া নিজের মস্তক আঁচড়াইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সে উদ্যান ত্যাগ করিয়া উড়িয়া গেল।

পরদিন প্রাতে নল প্রশান্ত মনে নিজ গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিনের ক্ষুদ্র পক্ষীটী আবার আসিয়া পূর্ব্ব দিনেরই ন্যায় নৃত্য ও আহারান্বেষণ করিতে লাগিল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া সেই পক্ষীটী প্রাতঃকালে আসিয়া তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল। নলও প্রত্যহ উদ্যানে আসিয়া প্রথমেই পক্ষীটীর অনুসন্ধান করিতেন। পক্ষীটী উদ্যানের যে পার্শ্বে থাকিত, সে পার্শ্ব হইতে তিনি দূরে থাকিতেন; অথবা, যতক্ষণ সে থাকিত, ততক্ষণ তিনি গৃহেই থাকিতেন—তাহাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেন না। পক্ষী অনেক সময় তাঁহার নিকটে গেলে, তিনি বলিতেন "দেখ! ইহার কি সাহস।" অনেক সময়, তাহাকে বিরক্ত না করিবার জন্য তিনি গৃহে বসিয়া থাকিতেন।

এই প্রকারে বহু সপ্তাহ অতীত হইল। একদিন পক্ষীটী আসিল না। নল অনেকক্ষণ তাহার জন্য বৃথা অপেক্ষা করিলেন। পরদিনও পক্ষীটী আসিল না—তৎপরদিনও সে আসিল না। তখন নল বিমর্ষ হইলেন; আহারে আর তাঁহার রুচি থাকিল না। তাঁহার কি হইয়াছে? সে কি অধিকতর সুন্দর উদ্যান পাইয়াছে

বলিয়া এখানকার কথা বিস্মৃত হইয়াছে? কোন বাজ কি সর্প তাহাকে বিনাশ করিয়াছে? সে কি জালবদ্ধ হইয়াছে? পাখীর এক বিপদের কথা ভাবিতে অন্য বিপদের কথা তাঁহার মনে হইতে লাগিল—সবই ক্লেশকর! তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, তিনি তাহাকে ভালবাসিয়াছেন,—তাই তিনি এই ক্লেশ বোধ করিতেছেন।

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই জন্যই পরম পূজ্য বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে।' আমাকে সাবধান হইতে হইবে। তথাপি তিনি সেই পক্ষীটার জন্য প্রত্যহ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যে পক্ষীই তাঁহার উদ্যানে আসিত, তিনি তাহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন—যদি তাঁহার সেই পাখীটী আইসে!

নল একদিন দেখিলেন যে, একটী চটক পক্ষিণী তাহার শাবককে আহার দিতেছে। শাবকটী একটী ক্ষুদ্র শাখায় উপবিষ্ট—মাতা সন্নিকটে উপবিষ্টা থাকিয়া শাবকের আহার গ্রহণ লক্ষ্য করিতেছে। ধীরে-ধীরে তাহার কণ্ঠে আহার্য্য প্রবেশ করিতেছে. আর মাতা শঙ্কিত চিত্তে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। পুনঃপুনঃ শাবক মাতৃদত্ত আহার গলাধঃকরণ করিতেছে—আর মাতা গলদেশে তাহা দিয়া দিতেছে।

নল চিন্তা করিতে লাগিলেন। "কি আশ্চর্য্য! মা নিজে আহার গ্রহণে বিরত থাকিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেছে না—সে শাবককে আহার উঠাইয়া দিতেছে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে যাহাতে শাবক নির্ব্বিঘ্নে আহার গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য শঙ্কিত চিত্তে লক্ষ্য করিতেছে। সে শাবককে বলিতেছে না, 'দুষ্ট শাবক! ওরূপ করিস না! কি আশ্চর্য্য! সত্যই আশ্চর্য্য!' এই দৃশ্যে তিনি চিন্তাকুল হইলেন—তাঁহার অন্তঃকরণ স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইল।

প্রাতঃকালের এই দৃশ্য দর্শন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি চিন্তা করিতে থাকিলেন। রাত্রিতেও তাঁহার সুনিদ্রা হইল না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন, 'বিবাহ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। স্বভাবের বিরুদ্ধে কার্য্য করা অবৈধ। বিবাহ করিলেও আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি। স্ত্রীকে স্নেহ ও সম্মান করা নিষিদ্ধ নহে; এবং আমি তাহাকে প্রশ্ন করিতে বিরত থাকিব।"

মন স্থির করিয়া তিনি পথিপার্শ্বস্থ নিজ গৃহের দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অভিলষিত ভাবী পত্নী সেই পথেই গমন করিবে। কিন্তু, সে নির্জ্জন পথে হয় ত কোন বৃদ্ধা অথবা কোন বৃদ্ধ বা বালক যাতায়াত করিতেছিল। তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নিজ-নিজ গন্তব্য পথে গমন করিল।

তিনি দেখিলেন যে, দ্বারদেশে উপবিষ্ট থাকিয়া পত্নীলাভ সুদূর-পরাহত। তাই তিনি নগরাভ্যন্তরে গমন করিলেন। স্বভাবতঃই তিনি লাজুক ছিলেন—কোন স্ত্রীলোকের দিকে চাহিতেই তিনি সাহসী হইতেছিলেন না—কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ত দূরের কথা!

নগরের প্রান্তদেশে নির্জ্জনে তিনি একখানি কুটীর দেখিলেন। কুটীরের বহির্দ্দেশে একটী বিবাহযোগ্যা বালিকা উপবিষ্টা ছিল। তাহার সম্মুখে একটু চিনি, খানিকটা মহিষশৃঙ্গ এবং এক খণ্ড হস্তিদন্ত রহিয়াছে দেখিলেন।

নল বালিকা ও তাহার সম্মুখস্থ দ্রব্যগুলি দেখিলেন। তিনি এইগুলির অর্থ-গ্রহণের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেও, প্রশ্ন করিতে সাহসী হইলেন না। কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিলে, বালিকা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ওরূপ ভাবে দাঁড়াইবার কারণ কি?"

নল উত্তর করিলেন, "আমি প্রশ্ন করিতে অসমর্থ!"

বালিকা হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"আমি পিতার নিকট প্রতিশ্রুত।"

বালিকা এবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল "ওঃ, তাহা হইলে তুমিই নির্ব্বাক নল।" বালিকা এবার তাহার হাস্যের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার কুন্দ দন্তপাতি দেখাইল।

নল তাহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইলেও, জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। বালিকা বলিতে লাগিল, "লোকে বলে যে, তুমি স্ত্রীলোককে কোন প্রশ্ন করিতে পার না! কিন্তু, তাহা হইলে তুমি বিবাহ করিবে কি প্রকারে? কোন স্ত্রীলোক তোমাকে গ্রহণ করিবে কি না, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিবে?"

নল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। বাস্তবিকই কি তাই? তিনি ত পূর্ব্বে এ বিষয়ে কোন দিন চিন্তা করেন নাই!

তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বালিকার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বালিকা বলিতে লাগিল, "অত ভাবনার কারণ নাই। ঠিক মত স্থানে অনুসন্ধান করিলেই মনের মত স্ত্রী পাইবে। যাহা হউক, যখন তুমি কোন স্ত্রীলোককেই প্রশ্ন করিবে না, তখন আমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উত্তর দিতেছি। আমার সম্মুখে যে দ্রব্যগুলি দেখিতেছ, তাহাদের অর্থ এই:—আমার যিনি স্বামী হইবেন তাঁহাকে চিনির ন্যায় মিষ্ট হইতে হইবে, মহিষ-শৃঙ্গের ন্যায় বলবান হইতে হইবে, এবং হস্তির ন্যায় মহৎ হইতে হইবে।"

সর্ব্বনাশ! নল ভাবিলেন, সকল স্ত্রীলোকই যদি উপরিউক্ত রূপ স্বামী চাহে তাহা হইলে ত কোন পুরুষেরই ভাগ্যে স্ত্রী জুটিবে না। না, দেখিতেছি, নিকটে স্ত্রী পাওয়া যাইবে না। আমি বিবাহার্থিনী সকল বালিকার নিকটই হাস্যাস্পদ হইবে। দূর হৌক, দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়াই স্ত্রীর অনুসন্ধান করিব।

অত্যন্ত চিন্তিত মনে নল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যতদিন পত্নী লাভ না ঘটে, ততদিনই তিনি এইরূপ ভ্রমণ করিবেন স্থির করিলেন।

পর্য্যটন করিতে-করিতে এক দিবস তিনি রাজপথ হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী একটী সুন্দর হ্রদ দেখিতে পাইলেন। হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে ফলবান বৃক্ষসমূহ রহিয়াছে। তিনি হ্রদের নিকটে যাইয়া বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় একটা আর্ত্তনাদ শুনিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন যে, একটী বয়স্কা কুমারী বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। নল তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্যার্থ যাইয়া দেখিলেন যে, তাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু, তথাপি পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে নল তাহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। বেদনাবোধের সঙ্গে-সঙ্গে বালিকার নিকট উহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। তাই সে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না "তুমি কথা কহিতেছ না কেন? কি করিয়া আমি গাছে চড়িয়াছি জান কি?"

"না।"

"জিজ্ঞাসা করিতেছ না কেন?"

"আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,—তাই কোন প্রশ্ন করিতে পারি না।"

"আশ্চর্য্য! যদি তুমি কোনখানে পথ হারাইয়া যাও, তবে কি কর?"

"আমি কোন স্ত্রীলোককেই প্রশ্ন করিতে পারি না।"

"ওঃ, তাই বল! আচ্ছা তুমি যখন জিজ্ঞাসা করিবে না, তখন আমিই বলিতেছি। আচ্ছা, তোমার নাম কি?"

"লোকে আমাকে নল বলিয়া ডাকে।"

"আর আমার নাম কথা। কথা আমার ঠিক নাম নহে উহা ডাক-নাম। প্রবাদ এই যে দিবাভাগে কোন কুমারী কোন বৃক্ষারোহণ করিয়া, যদি সেই বৃক্ষের সকল ফল খাইতে পারে, অথচ তাহাকে কোন পুরুষই দেখিতে পাইবে না—দেখিতেছ ত পুকুরে কত লোক স্নান করিতেছে—তাহা হইলে ফল ভোজনের পরেই যে পুরুষের সহিত তাহার দেখা হয়, তাহার সহিতই তাহার বিবাহ হয়। যদি কোন লোক তাহাকে দেখিতে পায়, তবে আর উহাতে কোন ফল হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে আমি শেষ ফলটী তুলিয়াছি—পেটে আর স্থান নাই—ঠিক সেই সময়ে তোমাকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই ভীত হইয়া আমি গাছ হইতে পড়িয়া গেলাম।"

"ভারী দুঃখের বিষয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমি ত তোমাকে গাছের উপর থাকা অবস্থায় দেখি নাই—তুমি পড়িয়া গেলে আমি তোমাকে দেখিয়াছি।"

"ঠিক! তোমার কোন ভুল হয় নাই ত।"

"না ভুল হয় নাই। আমি ঠিক বলিতেছি।"

"আচ্ছা নল! পড়িবার সময় আমার মাথা কি নীচের দিকে ছিল?"

"খুব সম্ভব তাহাই হইয়াছিল, কথা!"

"আচ্ছা, আমি কি নির্ব্বোধের ন্যায় পড়িয়া ছিলাম। মনে করিয়া দেখ।"

"আমার মনে নাই। তুমি হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছিলে।"

"আচ্ছা, ইতিপূর্ব্বে কোন বালিকাকে কি গাছ হইতে পড়িতে দেখিয়াছিলে?"

"না জীবনে কোন দিন দেখি নাই।"

"আচ্ছা, যখন তুমি আমাকে দেখিয়াছিলে, তাহার

পূর্ব্বেই যদি আমি গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া থাকি, তবে এখনও সব ঠিক হইতে পারে। কিন্তু আমি কি বোকা! যদি তুমি আমাকে গাছের উপরে নাই দেখিয়া থাক, তবে—।" কথার সেই কিংবদন্তীর কথা হঠাৎ মনে আসিল।

নল বলিলেন, "ঠিক, তাই ত।"

"আমি বাড়ী যাইব" বলিয়া কথা যেমন উঠিতে যাইবে, অমনিই তাহার পায়ে অত্যন্ত বেদনা বোধ হইল। "সর্ব্বনাশ! আমি কি করিয়া বাড়ী যাইব।"

নল উত্তর করিলেন, "আমি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইব।"

কথা হাসিয়া ফেলিল, "আমাদের বাড়ী অনেক দূরে। আচ্ছা, এক কাজ কর। রাস্তা পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া যাও; সেখানে যাইয়া আমি কোন গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিব।"

নল তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইলেন—কথা ঝুলিয়া পড়িল। "আমার গলা জড়াইয়া ধর—নতুবা আমি তোমাকে ত বহিতে পারিব না—" নলের এই কথা শুনিয়া কথা সেইরূপই করিল—এবং কি ভাবিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি।" নলও বলিয়া ফেলিলেন, "তাহা হইলে, কথা, তুমি আমাকে বিবাহ কর।" কিন্তু, এবার কথা নিজ কথা ঘুরাইয়া বলিল, "আমাকে কত লোকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, তাহা কি তুমি জান?"

নল বিমর্ষ চিত্তে উত্তর করিলেন, "আমি সেই কিংবদন্তীর কথা ভাবিতেছিলাম।"

সেও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "উহা বালিকার খেলা মাত্র। গ্রামের সকল বালিকাই ঐরূপ করে। আমাকে গাছ হইতে পড়িতে দেখিয়াছ বলিয়া মনে করিও না যে, সব ঠিক হইয়া গিয়াছে।"

"যাহাই হোক, আমিই তোমার স্বামী হইব।"

"হাঁ! আমি যদি গ্রহণ করি।"

"কিন্তু, তুমি ত বলিলে যে তুমি আমাকে ভালবাস।"

"বেশ! আমাকে জিজ্ঞাসা না করিলে, আমি কেমন করিয়া তোমাকে বিবাহ করিব?"

"কিন্তু, কথা, আমি ত কোন স্ত্রীলোককেই কোন প্রশ্ন করিতে পারি না।"

"আচ্ছা, তোমার বিবাহ হইলে, তোমার স্ত্রী তোমাকে ভালবাসে কি না, তাহাও জিজ্ঞাসা করিবে না?"

"না কথা! তাহা ত জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না!"

কথা নলকে আর একটু দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতক্ষণে বোধ হয় তুমি ক্লান্ত হইয়াছ?"

নল উল্লাসের সহিত প্রত্যুত্তর করিলেন, "একটুও না, কথা!"

এবার কথাও সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি যখন আমাকে কোন প্রশ্ন করিবে না, তখন তোমার দ্বারা আমি অন্য কাজ করাইয়া লইব। এই স্থান হইতে যদি তুমি আমাকে আমার গ্রাম পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পার, তাহা হইলে কোন প্রশ্ন না করিলেও, আমি তোমাকে বিবাহ করিব, এবং সেখানে পৌঁছিলে, আমি প্রীতিভরে তোমাকে চুম্বন করিব। কিন্তু, পথিমধ্যে যদি তুমি আমাকে একবারও নামাও, তাহা হইলে আর তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না। যদি তোমার নিকট আমি ভারী বোধ হই, আর তুমি আমাকে বিবাহ করিবে কিনা জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে সব গোল মিটিয়া যাইবে।"

পুকুর পাড় হইতে এতক্ষণে তাহারা রাজপথে পৌঁছিয়াছে। নল বলবান যুবক। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "অনায়াসেই আমি কথাকে ক্রোড়ে করিয়া লইতে পারিব। যদি এই সামান্য কার্য্যটুকুই না করিতে পারি, তবে জীবনব্যাপী পর্য্যটনেও আমি পত্নী-লাভ করিতে পারিব না। তাই তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "বেশ কথা! তোমাকে গ্রাম পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে?"

"না—না! ঐ বুদ্ধ-মূর্ত্তি পর্য্যন্ত লইয়া গেলেই হইবে। আমি তোমাকে দেখাইয়া দিব। গ্রামে মাত্র একটী বুদ্ধ-মূর্ত্তিই আছে।"

"বেশ! কিন্তু, আমারও কয়েকটী সর্ত্ত আছে।"

"কি, কি?"

"প্রথমতঃ, তোমাকে একবার এখানে নামাইয়া রাখি।"

"বেশ!"

নল ধীরে-ধীরে কথাকে সেইখানে নামাইয়া দিলেন।

"দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে অধিক ভার বোধ না হয়, তজ্জন্য তুমি আমাকে বেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিবে।"

"আচ্ছা, নল! আমি ইহাতেও স্বীকৃত হইলাম।"

"তৃতীয়তঃ, রাস্তায় তুমি আমার সহিত একটী কথাও কহিতে পারিবে না। তুমি যদি 'টু' শব্দও কর, তৎক্ষণাৎ আমি তোমাকে নামাইয়া দিব।"

"বেশ! আমি এ প্রতিজ্ঞাও করিতেছি।"

নল মনে করিলেন, সব সর্ত্তগুলিই তিনি ঠিকমত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একটী ভুল করিয়াছিলেন—রাস্তা হইতে গ্রাম কত দূর, তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই।

নল সম্পূর্ণ রূপে বিশ্রাম করিয়া কথাকে কোলে লইলেন। এবার কথা তাঁহাকে উত্তম করিয়া বেষ্টন করিল। নলের বক্ষের সহিত কথার বক্ষ সম্মিলিত হইল। কথা জিজ্ঞাসা করিল, "এবার ঠিক হইয়াছে ত? অবশ্য, এখনও তুমি হাঁটিতে আরম্ভ কর নাই, তাই আমি এই—এই প্রশ্ন করিলাম।"

"বেশ কথা! এক্ষণে আমি রওনা হই।"

নল এই বলিয়া কথাকে কোলে লইয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, জীবন ভরিয়া তিনি যেন এইরূপ ভারই বহন করিতে পারেন। তাঁহার বক্ষের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কথার বক্ষেরও স্পন্দন হইতে লাগিল। কথার প্রশ্বাস তাঁহার গণ্ডদেশে অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যে, জীবনে তিনি আর কখনও এত সুখী হন নাই। নির্ব্বাক হইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, বুদ্ধের শাসনের—"যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে"—কোন মূল্য নাই। বৃথাই ভগবান এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। 'এরূপ ভার বহনে কি সুখ! ইহা হইতে কি ক্লেশ জন্মিতে পারে?'—নলের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের বুঝি আর দেরী রহিল না।

দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে—রৌদ্রের তাপ বড় প্রখর। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই নলের অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ হইতে লাগিল। তিনি ক্লান্ত হইলেন, তথাপি তিনি দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কথা নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার বক্ষ সংলগ্ন রহিল। তাঁহার গতি মন্থর হইতে লাগিল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া কথাকে সেই কথাটী জিজ্ঞাসা করেন।

নল মনে করিতে লাগিলেন, 'কথা কি কোন কথা কহিবে না? সে কি অদূরের পক্ষীটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না? পথিমধ্যস্থ প্রস্তরে লাগিয়া যাহাতে পদস্খলন না হয়, তজ্জন্য কি কথা তাঁহাকে সতর্ক করিবে না? তাঁহার ক্লেশে দুঃখিত হইয়া কি সে তাঁহাকে ছায়া-শীতল স্থানে যাইতে অনুরোধ করিবে না? কিন্তু, কথা কিছুই কহিল না, সে কোন কথাই বলিল না। সে প্রস্তরের ন্যায় নির্ব্বাক রহিল। এদিকে নল অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রথমে তাঁহার কপাল হইতে, পরে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনর্গল ঘাম বহিতে লাগিল। তাঁহার ক্রোড়স্থ ভার—এতক্ষণ যে ভার-বহনকে তিনি স্বর্গসুখ মনে করিতেছিলেন—আর তাঁহার নিকট প্রীতিদায়ক রহিল না। থাকিয়া-থাকিয়া, তিনি কথাকে নিজ বক্ষ হইতে একটু-একটু করিয়া দূরে রাখিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলেন। নল মনে মনে বলিতে লাগিলেন, 'কি একগুঁয়ে স্ত্রীলোক!'

কথার কিন্তু খুব ভালই বোধ হইতেছিল। সে মনে-মনে ভাবিতেছিল, 'এ লোকটী কি একগুঁয়ে! ক্লান্তিতে সে মরমর হইয়াছে, তথাপি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না! সময়ে আমি ইহার একগুঁয়েমি ভাঙ্গিয়া দিবই দিব! কিন্তু, আজ যদি আমি পরাজয় স্বীকার করি, তবে আমাকে বিবাহিত জীবনে প্রত্যহই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। যদি দুরমুষ্টি পর্যন্তই আমাকে লইয়া যাইতে পারে—ভালই —আমার ত কোন লোকসান নাই।" নির্ব্বিবাদে সে নলের বক্ষ-সংলগ্ন হইয়া থাকিল;—নলের ক্লান্তি সে উপভোগ করিতেই লাগিল;—শ্রান্তিজনিত নলের নিঃশ্বাসে সে কোনরূপ অশান্তি বোধ করিল না।

কিন্তু এদিকে নল আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না; গতি এবার বড় মন্থর হইয়া পড়িল; নিঃশ্বাস দীর্ঘনিঃশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। কথা নলের দিকে চাহিয়া দেখিল যে, তিনি বিবর্ণ হইয়াছেন, চক্ষুদুটী যেন কোটর হইতে উঠিয়া পড়িতেছে।

নলও, কথা যে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন। যাহা হউক; এতক্ষণে কথা নিশ্চয়ই তাঁহাকে থামিতে বলিবে। প্রকৃত পক্ষেই কথা নলের মুখের দিকে ভীতি-বিহ্বল চিত্তে চাহিতেছিল; কিন্তু তথাপি

সে মনে করিল, 'নল যদি তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ নাই করেন, তবে আমিই বা কেন ভঙ্গ করিব?'

নল মনে করিলেন, "এ কি নৃশংস ব্যবহার!" তিনি আর পারিয়া উঠিতেছিলেন না। বুদ্ধমূর্ত্তির পদতলে যখন তিনি কথাকে নামাইয়া দিলেন তখন তাঁহার পা কাঁপিতেছিল। তাঁহার মনে হইল, তিনি আর এক পাও অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

কথা সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া দিল,- সঙ্গে-সঙ্গে চুম্বনের প্রত্যাশীও হইল। সে দেশের এই রীতি। নল দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন,"একটু অপেক্ষা কর, কথা।"

হাত দিয়া তিনি ঘাম মুছিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, সে ঘর্ম্ম-প্রবাহ হাতে কুলাইল না; তাই তিনি তাঁহার উত্তরীয় ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেন। এ ঘাম মুছিতে নল বড় দেরী করিতে লাগিলেন—ধীরে-ধীরে এ ব্যাপার চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, বুদ্ধমূর্ত্তি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। কথা তাঁহার কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছিল কিন্তু কোন কথা বলিল না।

নলের ঘাম মুছা শেষ হইলে, ধীরে-ধীরে তিনি কথাকে বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর। আমার মনে হইতেছে যে, যখন আমি তোমাকে দেখি, তখন তোমার পা রক্ষ সংলগ্ন ছিল। সুতরাং পুনর্ব্বার তোমাকে বৃক্ষে চড়িয়া ফল ভোজন করিতে হইবে।" এই বলিয়াই তিনি দ্রুতবেগে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গৃহে পৌছিয়া তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার গৃহ-সন্নিকটস্থ সুবৃহৎ উপত্যকার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। উপত্যকার দূরস্থিত পর্ব্বতগুলি তাঁহার নিকট সমুদ্রমধ্যস্থ জাহাজের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। প্রত্যহ তিনি সূর্য্যের উদয় ও অস্তাচল-গমন দেখিতে লাগিলেন। বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। একাকী নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে সাধু আখ্যা প্রদান করিল। আর কেহ যদি দুঃখ পাইয়া তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "হে ঠাকুর! আপনি কিরূপে এই নির্ব্বিকার চিত্ত লাভ করিয়াছেন?" তাহা হইলে তিনি কেবল একই উত্তর দিতেন "যাহার নিকট কিছুই প্রিয় নহে, তাহার নিকট কিছুই ক্লেশকর নহে।" আর তাঁহার প্রশ্নকর্ত্তা পুরুষ হইলে তিনি বলিতেন, "কদাপি স্ত্রীলোককে কোন প্রশ্ন করিও না।"

এবম্প্রকারে বিজ্ঞতা ও সাধুতার জন্য নলের খ্যাতি দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর কাহারও যদি শোক-তাপের জন্য জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তবে তিনি যেন নলের উপদেশ গ্রহণ করেন; কারণ, নলের এই দুইটী উপদেশ অমূল্য।

নব নিরঞ্জন

(মধুপুরে বিজয়া-সম্মিলনে)

[শ্রীদেবদত্ত]

বিজয়ার বৈজয়ন্তী শারদ-গগনে
ছড়াইয়ে নানা ভিতে রঙ্গিল মদিরা
বাড়াইছে দূর-দিগন্তের প্রীতি।

নিম্নে তার:—

পূতিগন্ধময়, প্রধূমিত, হীনতেজ-সলাজ-পাবক—
মহাশ্মশানের লীলা করে অভিনয়,
দুঃখ, দৈন্য, দ্বেষ, ক্লেশ, দ্বন্দ্বের হুল্লোড়।

প্রীতি-আলিঙ্গন জ্ঞান বান্ধবের বুকে,
আমূল প্রোথিত করে বিষাক্ত ছুরিকা,—
বিষ হ'তে হেয় গ্লানি, ছড়ায় চৌদিকে।

সুজলা শ্যামলা বঙ্গ কত কাল আর
হেন প্রহেলিকাচ্ছায়ে রবে আবরিত?

হুহুঙ্কারে এ বৈষম্য করি তিরোধান,
শান্তিময়ী, শক্তিময়ী, স্নেহময়ী মা,
আন পুনঃ পুণ্য বঙ্গে আদর্শ অতীত।

অতীত আনন্দ ধারা আবার বহাও,
ক'রে দূর, অকারণ ভেদাভেদ—অনর্থক দ্বেষ
ভাই ভাই একঠাঁই বাঁধ পুনরায়।

প্লাবন দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি আত্মীয় বিগ্রহ,
জীবনের যত বাধা দিয়ে বলিদান,
পূর্ণাহুতি শেষে দক্ষিণান্ত পরে,—

নিরঞ্জন কৃপাবলে নব নিরঞ্জন
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অম্লক আবার।

বাঙ্গালায় - বঙ্গের বাহিরে —
রক্ষা হোক বাঙ্গালীর প্রাণ;
বাঙ্গালীর মান, বল বাড়ুক সতত—।
সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতি, অধ্যাত্ম-গৌরবে
বিশ্বজয়ী কর বঙ্গে, আজ বিশ্বেশ্বর!

রেলপথে

[শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ]

তলটা দেখেই চমকে উঠ্‌লে ভায়া—তবুত এখনো টে পড়েনি।.........আর যাই কর, ভুরুটা অমন ক'রে কে থেক না।.........কি জান, আমি তোমাদের র্তাটা ঠিক হজম ক'রতে পারিনি এখনো।—বয়সটা হাৎ কম হয়নি, তবু ওই 'আপনি' বলাটা সব সময় সে না। হাজার হোক, তুমি বয়সে অনেক ছোট, র জানইত ভায়া, মাতালদের দিলটা একটু খোলা-খালা য়ই থাকে।..... ...হাঁা, ওই বাঁ-দিকের পর্দাটা একটু চর দিকে টেনে—বাস্‌। এইবার একটু ভদ্রস্থ হয়ে গেল। সর্দ্দির ধাত—বৃষ্টি-টিষ্টি বড় সহ্য হয় না। ই দেখ না সোডার মাত্রাটাও কত কম।......না, দাদা, ক'রলে; ওটা পাকা মাতালের লক্ষণই নয়—নেহাৎ চিরাই একেবারে raw টানে। তবে কি জান, গেরস্তর ার—একটু ব'সে-ব'সে হাতে রেখে খরচটা করা ন।......আঃ দয়াময়ী......না আর একটু সোডা বে দেখ্‌ছি—মালটা বড় সুবিধের নয়।.........তবুও কেন? সেটা বুঝতে গেলে দরদী হওয়া চাই, া। টিটির দলের নওত?.........বাঁচলুম। তোমার র আশা আছে। ওই মাদক-নিবারণী দলে ঢুকেছ ম'রেছ। যত নামজাদা মাতাল দেখ্‌ছ—সব ছিল সময়ে টিটির দলে। হাঁা, লিভার টিভার হয়, তখন ও দলে নাম লেখাও, আপত্তি নেই। কিন্তু গোড়া ক গেছ কি মরেছ।......আর একটা গ্লাস বার করি?

. ...এ জিনিসটা চ'লবে না? কি ক'রব ভাই, নেহাৎ গরীব - নিজের খরচে এ মাকাটার উপর আর উঠ্‌তে পারি না। তবে হাঁ, ক'লকাতায় এর চেয়ে ভাল খাই বটে,—সেটা পরস্মৈপদী কিনা। হাঃ হাঃ হাঃ। জানইত, যাঁদের বাড়ীতে থাকি, ইঁারা হ'লেন বড় লোক, আত্মীয় কুটুম্বরাও সব পদস্থ খারাপ খেলে তাঁদের বেখাতির হবে যে। - বিশেষ খরচটা যখন তাঁরাই যোগান। তাঁদেরই একজনকে বল্লুম - চল হে, দার্জিলিংটা ঘুরে আসি। তিনি কানেই তুল্‌লেন না। কাজেই বোতলটা নিজের খরচে চালাতে হ'ল। না চালিয়ে আর উপায় কি? এই পাহাড়ি বৃষ্টির দেশে একটু আধটু না টান্‌লে কি চলে? আর ওই গুজরাটী বেনেটা - কি দরই না চড়িয়ে রেখেছে।.......না, দাদা দার্জ্জিলিংএর পরে নগুবং। এই ঠাণ্ডা বৃষ্টি, তার ওপর বোতল মাগ্যির দেশে কেউ সখ করে আসে আবার!.........নিজের খরচে বোতল চালানো—তা' সত্যি কথা ব'লতে কি ভায়া—ও ভাল মন্দ আমি বিশেষ বুঝি না। নেশা নিয়ে কথারে ভাই —যাহোক একটা হ'লেই হ'ল।......হাঁা, কি বল্‌ছিলুম? আমিও ছিলুম মাদক নিবারণীর দলে। শুধু দলে? পাড়ায় যে ছোট খাট সভাটা ছিল, আমি ছিলুম তার সভাপতি।.........হাস্‌ছ না'ক, ভায়া? হাসবার কথাই বটে! তবে সব খুলে বলি শোন।......দাঁড়াও, আগে চুরুটটা ধরিয়ে নি। একটা চুরুট ধরাতে পাঁচটা কাটি...

...না, দাদা, তেমন পেঁচিই নই যে দু'চার পেগে হাত কাঁপবে। কি জান, সস্তার মাল মেহনতে যায়।......... বাড়ীর কেউ খান হ্যাভানা। তাঁর সঙ্গে আমিও খাই হ্যাভানা। লাগেও ভাল। মেসো ম'শায় খান্ ত্রিচনোপলি। বলেন—এ-গুলো হ্যাভানার চেয়ে ভাল। তাঁর সঙ্গে আমিও বলি ভাল। যখন বাড়ীর গণ্ডির বাইরে গিয়ে পড়ি—তখন খাই পানের দোকানের পয়সায় দুটো কড়া চুরুট। তাও মন্দ লাগে না। আসল কথা কি জান—ওই যা' বলেছি—নেশার জিনিস একটা হ'লেই হ'ল।......কি বল্লে? সখের জিনিসটা সব চাইতে সেরা হওয়া দরকার?—ও সব লক্ষ্মীছাড়া চালিয়ে লোকের কথা শুনো না।......আরে ভায়া, তাই যদি হ'ত তা' হ'লে কি আজ এই দু'পয়সার সংস্থান ক'রে নিতে পারতুম? আমি বলি—নেশাটা কর, ক্ষতি নেই—কিন্তু তার সঙ্গে চোখকান বুঝে খরচটা বাড়িও না। যত পার পরের ঘাড়ে চালাও। নেহাৎ না চলে......ও: সেই গোড়ার কথাটা ভুলেই গেছি! কেমন ক'রে মাতাল হ'লুম—শোন।

ছিলুম গরীবের ছেলে। ক'রতুম মুন্সেফী আদালতের আমলাগিরি। চেহারাটা নেহাৎ মন্দ ছিল না—এখনকার মত নয়! সে দিন আর আছে কি ভায়া, যে দিন এই চেহারার জোরেই। যাক্ সে কথা। বংশটাও ছিল ভাল। আর টাকার অভাব থাকলেও কৌলীন্যের অভাব কোন কালে হয় নি। গ্রামের যিনি জমাদার—তিনি ছিলেন আমার মাতুলের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়—অতএব আমারও বটে। তিনি যে অসমর্থ মাতুলের হাত থেকে আমাকে নিজের আশ্রয়ে সরিয়ে নিলেন একদিন, তাতে আমি আশ্চর্য্য হইনি। মানুষের বরাত এমনি ক'রেই খোলে—ওই আসল কথাটাই কিন্তু ভুলে গিছলুন তখন। আত্মীয় বাড়ী যে জেলখানা হ'য়ে উঠ্‌বে সেটাও ভাবিনি কখনো। কলেজের ছুটীর সময় ছোট বাবুরা বাড়ী আসতেন -থাকতেন নিজেদের গণ্ডীর ভিতর—আমাকে আমলই দিতেন না। আত্মীয় সম্পর্কীয়রাও তথৈবচ। অন্দরে আমার ডাক প'ড়ত শুধু তখন, যখন তাঁদের আমোদের উপকরণ প্রায় ফুরিয়ে আসত। আমলা-জন্মে সখের থিয়েটারে সখী সাজতুম। সেই সময়ের কতকগুলো গান ভাবভঙ্গী দিয়ে গেয়ে তাঁদের মন জোগাতে হ'ত। কিন্তু তাতেও তাঁদের তাচ্ছিল্যের হাত থেকে রক্ষা পেতুম না।...

যাই হোক, মোটের উপর মন্দ ছিলুম না। খাওয়া-পরাটা চ'লত ভাল। আর নেশাভাংটাও যে না চ'লত—তা' নয়। কাছারি ঘরে নায়েব গোমস্তাদের সঙ্গে সিদ্ধি খেতুম। আর তাদের যখন কাজ থাকত, তখন দেউড়িতে দরওয়ানের সঙ্গে বসে গাঁজা টানতুম। এক রকম মজগুল হ'য়ে ছিলুম মন্দ না। তবে ওই অন্দরে গিয়ে খেতে হ'ত—এই যা এক হ্যাঙ্গাম ছিল। খাবার সময় বাড়ীর গিন্নী মাতাঠাকুরাণী কাছে এসে ব'সতেন—আর আমি ঘাড় হেঁট ক'রে খেয়ে যেতুম। তিনি আমার নাম করে ব'ল্‌তেন—যে ছেলেটী বড় লাজুক। মেয়ের দল ব'ল্‌ত—লাজুক না ছাই—একটা জবু-থবু জানোয়ার। শুনতে শুনতে একদিন হ'য়ে গেল রাগ। সে দিন গাজায় দোক্তার ভাগটা একটু কম পড়েছিল—আর খেতেও দেরী হ'য়ে গিছ্‌ল। রাগবার কথা নয়? জানোয়ার বটে? সে দিন যা' মুখ ছোটালুম তাতে আমার তথা-কথিত আত্মীয়বৃন্দের মুখ লুকিয়ে পালাবার পথ রইল না। সে দিন তাঁদের চমক ভাঙ্গল। আমার লুকিয়ে নেশা করবার কথা সব বেরিয়ে প'ড়ল; আর তার ফলে আমার ক'লকাতায় নির্ব্বাসন আজ্ঞা হ'ল।........হাজার হোক তাঁদের আত্মীয় ব'লে পরিচয়টা তো বটে—তাঁদেরই নাম খারাপ হবে—আমার আর কি;—অতএব ক'লকাতায় আমার সভ্য করবার আয়োজন রীতিমত সুরু হ'ল। সকালে মাষ্টার এসে পড়াবে, দু'পরে মার্কার বিলিয়ার্ড খেলা শেখাবে, বিকালে শোফেয়ার বেড়িয়ে নিয়ে আস্‌বে, আর রাত্তিরে খাবার পর ছোট বাবুদের কাছে সভ্যতার এগ্‌জামিন দিতে হবে। দেখলুম গতিক মন্দ। শিকলি কাটবারও উপায় নেই—না খেতে পেয়ে ম'রতে হবে। অতএব একেবারে পোষ মেনে গেলুম। এবং তার ফলে দিনকতকের মধ্যেই শিক্ষার বাঁধুনিটা আলগা হ'য়ে এল। মাষ্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রলুম—তাঁকে আস্‌তে হবে না; তাঁর মাইনের অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তাঁর। শোফেয়ারটা ছিল একগুঁয়ে—সে ঠিক ধরাবাঁধা রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেই—আমার হুকুমের তোয়াক্কা রাখত না। তখনকার মত চেপে গেলুম। কিন্তু পরে বাছাধনের চাকরীটি খেয়ে ছেড়েছিলুম। চোখ ক্রমশঃ খুল্‌তে লাগল।

লুম এঁদের প্রভুত্ব-প্রিয়তাটা খুব বেশী। সেইটী বুঝলে জুগিয়ে চ'ল্‌তে আর কতক্ষণ ভায়া? মাস কতকের ই হাতের মুঠোর ভিতর এল সব। তখন আমি না ল আর চলে না। আমাকে ছেঁটে ফেলে এমন কি দের সঙ্গে দেখা করবার যো-টি আর রইল না কারুর— বাইরের লোকই কি আর ভিতরের লোকই কি। ার হোক্, ওঁরা হ'লেন বড় লোক—দিল্-দ'রিয়া মেজাজ াইরের লোক এসে দু'পয়সা ঠকিয়ে নিয়ে যাবে আমি তে? নিমকের তো একটা কদর আছে।......ক্রমশঃ জর বাজার থেকে বাড়ীর ভিতরকার ফাই ফরমাস মায় া গড়ান, মাসকাবারি পাওনা চুকোনো—সবই আমার এসে পড়্‌ল। তাতে আমার দু'পয়সার সাশ্রয়ও । যাই বল ভায়া, পেটের জন্যই ত সব। সেই টা না ভরালে চ'লবে কেন? হাত দিয়ে পয়সার -দেন হবে—আর হাতে কিছু থেকে যাবে না—তা' হয়? এ পয়সা তেমন গন্ধও নয়।...... চাকর বাকরও বেজায় অনুগত হ'য়ে উঠ্‌ল—আগের মত আর চোরা- ুরী পেজমো ক'রতে সাহস ক'রত না—মাইনে আর রি দুই যে তখন আমার হাতে। কাজে কাজেই ভাংটাও চ'লত—কিন্তু খুব লুকিয়ে। তবে মদের টাও তখনো পাইনি,—গন্ধ বেরোবার ভয়ে। তাও ঃ হ'ল—কি ক'রে তাই ব'লব এইবার।......আরে, য় কার্শিয়াং। এর মধ্যেই?......না, তুমিই যাও । এক বাটী চা খেয়ে আমার এত দামের নেশাটা করতে পারব না। নেমন্তন্ন বাড়ীতে দই খাই না ভয়ে! কি জান—গেরস্তর ছেলে, ট্যাঁকের পয়সা খরচ নেশা করতে হয়। সেটা নষ্ট ক'রব তোমার াইভস্ম খেয়ে? তেমন পাত্তরই নই হে ভায়া ......কি —এক টাকা? ওই কাঁচের মালাটা? বেটী খুব ুন পাকড়েছিস্ দেখছি। ট্যাঁক আলগা হবে এমন ই করিনারে বাপু।......এস হে, গাড়ী ছাড়ল ব'লে। সাহেবদের মত একবার পায়চারি না করলে চলে ওরা হ'ল গো-খাদকের জাত।......হ্যাঁ, পর্দাটা াই থাক। বৃষ্টি তো আর নেই, আর হাওয়াটাও জমাট গোছের।......

া বলছিলুম। বাড়ীর লোকেরা ত আমায় দিলেন পাড়ার মাদক-নিবারণী সভার সভাপতি ক'রে। হাজার হোক্ তাঁদেরই আত্মীয় বলে তো পরিচয় দিতে হবে। একটা কিছু ওই রকম পোষ্টা না থাকলে চ'লবে কেন? আমার পক্ষেও হল ভাল... ..বাঃ এর মধ্যে ভণ্ডামিটা এল কোথায়? মদটা তো ধ'রিনি এখনও। আর মাদক নিবারণীরা মদের ওপর একটা ঝোঁক দিত যে বাজারে মদ ছাড়াও যে একচল্লিশ রকমের নেশা আছে তার খবরই রাখত না। কাজেই মাদক নিবারণীর সভাপতি হ'তে আর আপত্তি কোথায়?... .....যাই হোক, বক্তৃতা দিতে তো আর খরচ লাগে না। আর মাষ্টারও একটা ছিল হাতের কাছে। সেই সব লিখে প'ড়ে দিত। তবে এই যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান—এর মজুরী পোষান চাই ত—তাই সভার তহবিলটা নিজের হাতে নিলুম। তাতেও দু'পয়সার সংস্থান হতে লাগল।.. .কি বল্‌লে— conscience? ওই তোমাদের একটা রোগ। আগে ত ছিল না ওটা এদেশে। শুনেছি মাটিনো ব'লে কে একজন ওই রোগটার বীজ কেতাবের ভিতর ক'রে পাঠিয়ে দেয়। ......না ভায়া, আমি ও রোগে কখন ভুগিনি।.... যাই হোক, নামটা একটু জাহির হবার সঙ্গে-সঙ্গে সভার ছোট ঘরটা ছেড়ে কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা সুরু ক'রলুম।...... এইবার আসল কথাটা শোন।--একদিন ওই রকম বক্তৃতা দিচ্ছি—এক কলেজের ছোকরা আমার দিকে চেয়ে হাসতে আরম্ভ ক'রে দিলে। যত মনে করি তার দিকে চাইবনা, ততই তার দিকে চোখ পড়ে, আর অমনি তার হাসির ফোয়ারা ছুটতে থাকে। শেষকালে আর থাক্‌তে পারলুম না। বল্লুম—কি হে ছোকরা, মতলবটা কি বল দিকিন্? উত্তর দেবার আগে সে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার ক'রে ধরালে। তারপর আমার মুখের উপর ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললে—খুব তো বক্তৃতা দিলেন মশায়। কিন্তু নেশা না করে থাক্‌তে পারেন?—ব'লে সে নিজেই এক বক্তৃতা জুড়ে দিলে। ব'ল্‌তে লাগল--"নেশা না করে কে? দেবতারা করেন না? হেড্ দেবতা যিনি— দেবাদিদেব মহাদেব—তাঁর ত আবকারি এক-চেটে। স্বয়ং ভগবান যাঁর মহাদেবের চেয়েও উঁচু পায়া, তিনিও যে পয়লা-নম্বরের নেশাখোর তার অকাট্য প্রমাণ হ'চ্ছে তাঁর এই সৃষ্টি। নেশা না ক'রে ঠাণ্ডা মাথায় কি কেউ

এমন এলোমেলো বেখাপ্পা সৃষ্টি তৈরি ক'রতে পারে? নেশা? নেশা ত ছোট কথা—একেবারে delirium tremens অবস্থার রচনা এই সৃষ্টি।" তারপর আমার দিকে চেয়ে ব'ললে—"নেশার খরচটা যদি নেহাৎ বাড়ীতে না জোটে তো আমরাই না হয় এবারটা চাঁদা ক'রে দি। একবার স্বাদ পেয়ে এসে তারপর বক্তৃতা দিও।"—এই শুনে তো তার দলের ছেলেরা হেসেই অস্থির, আর আমার দলের ছোকরারা চ'টেই লাল। মারামারি হবার উপক্রম হয় দেখে আমি আস্তে আস্তে স'রে পড়লুম। গেটের কাছে গাড়ী ছিল। দেখি গুণধর চালক ইতিমধ্যে একবার মির্জাপুরের তাড়িখানায় পায়ের ধুলো দিয়ে এসেছেন। মেজাজের আর দোষ কি বল? একেবারেই বিগড়ে গেল। নিজেই গাড়ী চালিয়ে বাড়ী এলুম। তাই কি বিপদ ছাড়ে মশায়? দরজায় পা দিতে না দিতেই দেখি একটা ছোকরা দেয়ালের গায়ে কি একটা বিজ্ঞাপন আঁটছে। ডাকলুম—মধো, ছোড়াটার কান দুটো ধ'রে নিয়ে আয় ত—ওই কাগজগুলো শুদ্ধ। কাগজগুলো কেড়ে নেবার সময় ছোকরাটা মধোর হাত ছিনিয়ে পালাল। একটু দূরে গিয়ে ব'ললে—বাবু, মালটা ভাল, খেয়ে দেখবেন।.........কাগজগুলো টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে দেখি যে সেগুলো একটা ইংরাজী দোকানের একটা বিশেষ মদের বিজ্ঞাপন। মধোকে বল্লুম ফেলে দে এ জঞ্জালগুলো। কিন্তু সে ফেলবে কি? ফেলবার আগেই নজরে প'ড়ল বিজ্ঞাপনে আঁকা এক ফরাসী সুন্দরীর মুখ। কি আকর্ষণী সে মুখের! বল্লুম—আপাততঃ থাক্ ওগুলো এখানে। সুন্দরী পেয়ালাটা মুখে তুলছে আর পেয়ালার কাচের ভিতর দিয়ে তার কুঙ্কুম-মাখা চাউনিটা ফুটে বেরিয়েছে। যে দিক্ দিয়ে দেখি সে যে আমারই দিকে চেয়ে হাসছে! বল্লুম—মধো, নিয়ে যা এগুলো সামনে থেকে। তার চাউনিটা আমায় পাগল ক'রে তুলছিল আর কি! মধো বুদ্ধি খরচ ক'রে সেগুলো পিছনে নিয়ে গিয়ে রাখলে। খানিক পরে মুখ তুলে দেখি—সুন্দরী আর্শির ভিতর দিয়ে সেই রকম ক'রেই হাসছে। বল্লুম—মধো, বিদেয় কর্—বিদেয় কর্—এ যে আমাকে মাতাল করে তুলবে, মধো সেগুলো নিয়ে চলে গেল এবং পরক্ষণেই একটা বোতল হাতে ক'রে ফিরে এল। ব'ললে—হুজুর, জিনিসটা সত্যিই ভাল। বড় বাবু এই জিনিস ছাড়া আর কিছু খান্না। একবার দেখবেন কি?......আরে এরা বলে কি? সমস্ত দুনিয়া আজ ষড়যন্ত্র করেছে আমায় মাতাল ক'রবে ব'লে?......সিদ্ধিটা-আস্‌টা খাওয়া যায়—কিন্তু এ যে মদ!......হ'লই বা মদ! কুচ্ পরোয়া নেই।......বল্লুম—ঢাল্।......কাঁচের গ্লাস মুখে তুললুম......আঃ মেজাজটা একেবারে জল হ'য়ে গেল। কি অম্ল কষায় মধুর স্বাদ সে!......বোতলের উপরেও আঁকা রয়েছে আমার সেই ফরাসী সুন্দরী ..আরো একপাত্র নিঃশেষ করলুম। এবার সুন্দরীর মুখ ফুটল। বললে—"আর ক'টা দিনই বা? একটু ফুর্ত্তি ক'রে নাও। এই সুঠাম দেহ বিলোল নেত্র, অধরে আঙুরের স্বাদ দু'দিনেই চলে যাবে—তীরে ব'সে গুলিখোরের মত ভেবোনা—ঝাঁপ দাও, বন্ধু, ঝাঁপ দাও।".....আর এক পাত্র—তারপর আরও একপাত্র।......এত মধু যে ছিপি-আঁটা কাঁচের বোতলে সঞ্চিত থাকে তা কে জান্ত? তা' হ'লে কি গাঁজা-ভাং খেয়ে সময় নষ্ট করি?........হাঃ, ওরা আমায় রিফর্ম ক'রবে মদের খোরাক জুগিয়ে!...আরো একপাত্র..দেওয়ালের ছবিগুলো বলে কি? এ বাড়ীর পূর্ব্ব-পুরুষদের ছবি—নামাবলী গায়ে, হাতে হরিনামের ঝুলি, মাথায় টিকি, কপালে চন্দন, গলায় মালা, গোঁপ কামান আমার দাদা প্র-দাদা-মহাশয়ের দল—তাঁরাও আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি হাসি আরম্ভ করলেন। ভাবখানা যেন তাঁরাও এ-বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁদের মুচ্‌কি হাসির অর্থ—"ভায়া, আমরাও জানতুম কিছু-কিছু—শুধু হরিনামের মালা ঠুকেই জীবন কাটাইনি। সুখী হলুম—বড় সুখী হলুম, আমাদের বংশাচার তোমার হাতে ক্ষুণ্ণ হবে না। এই তো চাই রে ভাই—নইলে পুরুষবাচ্ছা কিসের?"......তাঁরা ক্রমশঃ সোনালী ফ্রেমের গণ্ডি ছাড়িয়ে নেবে এলেন। পিঠ চাপড়ে বল্লেন—বহুৎ আচ্ছা। তারপর হরিনামের ঝুলি ঈষৎ ফাঁক ক'রে দেখালেন—দেখি, তার ভিতর এক একটী বোতল দাঁড় করান রয়েছে। চোখ টিপে বল্লেন—"ভায়া, সব দিক বজায় রেখে সবই চালাতে পারা যায়।—আজ তোমার পুনর্জ্জন্ম হ'ল—আমরা তোমায় আশীর্ব্বাদ করি। পূর্ব্বজন্মের তুমি—যে গাঁজা-ভাং খেত—তার শ্রাদ্ধ ওই উঠোনে হচ্ছে দেখবে

এস্।......বোতলটুকু নিঃশেষ ক'রে উঠে পড়লুম।...... কি স্ফূর্ত্তি! সমস্ত জগতে কি প্রাণের স্পন্দন!... সৃষ্টি? সে তো আমারই হাতে।......জীবনের এই স্পন্দন, এই আনন্দ—ইতর লোকে যাকে বলে নেশা—এই ত সৃষ্টির পূর্ব্ব সূচনা .....আমিই তো আনন্দ-স্বরূপ—আমিই সৃষ্টি-কর্ত্তা।......বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালুম।...উঠোনে সে কি কীর্ত্তন রব! আমার সেই বোতলের সুন্দরীই যে দেখি সভার প্রধানা গায়িকা!......কি বিলোল ভঙ্গী! গাইছে —'রূপের সঙ্গে তীব্র মদিরা'—আর আমার দাদা-প্রদাদা-মহাশয়েরা ধুয়ো ধ'রছেন—'ঢালো, আরো ঢালো।' তাঁদের হরিনামের ঝুলি থেকে বোতলের মুখটা একটু বেরিয়ে র'য়েছে। তাই থেকে গলাটা মাঝে মাঝে ভিজিয়ে নিয়ে সুন্দরীর সুরে ধুয়া ধ'রছেন—'ঢালো, আরো ঢালো।' ......আমায় তাঁরা ইসারা ক'রে ডাকলেন—ভায়া, এস—এই ত সময়।......আমার ফরাসী সুন্দরীও সুগোল সুন্দর বাহু প্রসারিত ক'রে গাইলে'—"এস, এস, বঁধু এস।"... কি আকুল আহ্বান সে! বিশ্বের প্রথম নারী পুরুষকে বোধ হয় এইরকম ক'রেই ডেকেছিল!......সে ডাক কি প্রত্যাখ্যান করা যায়? .....সিঁড়ি দিয়ে নাবুতে তর সইল না—বারাণ্ডা থেকে ঝাঁপ দিলুম।......

জ্ঞানও হয় নি অথচ অজ্ঞানের ঘোরটাও কেটে গেছে—এমন অবস্থায় শুনলুম—ডাক্তার ব'লছেন—ভয়ের কিছু কারণ নেই, ভিতরটা ঠিক আছে। কে একজন ব'ললেন—গাঁজা ভাংই খেত, শ্যাম্পেনের নেশাটা যে একেবারে মাথায় চ'ড়ে যাবে আশ্চর্য্য কি! কে-একজন শালা ব'ললেন—'যাই হোক্ এবারকার নেশার জিনিষটা একটু ভদ্রলোকের মতন।'.. বাঃ এ যে শিলিগুড়ি! কখন্ যে তিনধরিয়া পেরিয়ে এলুম জানতেই পারিনি।......বুঝলে ভায়া—ওই থেকেই সুরু—তারপর সরকারী বৈঠকখানায় গিয়ে জমলুম আর কি! থাম্ না, কাড়াকাড়ি করিস্ কেনরে বাপু?... কি বল্'লি? এই তিনটে বাক্সর জন্যে তিন আনা? আমায় ঠাউরেচিস কি? বাড়ী থেকে নয় গাড়ী-ভাড়াই দিয়েছে; মুটে ভাড়াটা যে নিজের ট্যাঁক থেকে দিতে হ'বে...নে—নে —চল্—চল্।

রেলের বাবু

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

আমরা রেলের বাবু
নহি কেউ কেটা হাবু জাবু
এসো না ঘরের বাহিরে, দেখিবে,—
করে দি' কেমন কাবু!

মোদের রাত জেগে চোখ লাল;
যদিও তুব্ড়ে গিয়াছে গাল;—
তবু, অনিয়ম আর অত্যাচারেতে
কাটে বেশ চিরকাল।

ওগো তবু তারি মাঝে মাঝে
মোদের পরাণে সেতার বাজে
দেখ'না এই কোট এই প্যাণ্ট, ও শিরে
টেরির শোভা কি রাজে!

মোদের পানওলা মালিনী মাসী—
ওগো তারে বড় ভালবাসি!
যেহেতু জোগায় সে নিতি পান-সিগারেট,
এটা সেটা দিবানিশি!

মোদের বিদ্যা নাই ক' মোটেই;
কিন্তু পয়সা তবু ত' জোটেই।
আর কামাই যা' তার দুনো বাবুগিরি
করে যাই খুব চোটেই!

একবার বুক্ করে দেখ মাল,—
কি করি তাহার হাল!
সে যে আমাদের নিজ পৈতৃক-ভাবা
অভ্যাস চিরকাল!

ফল-ভরা ঝুড়ি নিয়ে
কত জনে বলে "কি এ?"
মনে-মনে হেসে বলি মোরা শুধু
"যাও প্রতিফল নিয়ে।"

যত কনেষ্টবল সিপাই
হেঁ হেঁ তাদেরো আমরা শিখাই।
পয়সা কামাতে হয় কোন্ মতে!
দেয় কি মানুষ মিছাই?
যাত্রী গাড়ীটী এলে,
সরু পা'দুটি লম্বা ফেলে,—
ঘন ঘন এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করি
প্লাট্‌ফরমটি চেলে'।
অই জেনানা গাড়ীর পানে
শুধু কেন যে নয়ন টানে,
কেন যে চরণ থেমে হয়ে পড়ে'
সেথা গেলে—কে বা জানে?
হেথা দেশীয় যেমনি হোক্ না
মোরা দিতে ছাড়ি না ক' ঠোক্‌না;
আর বাগে পাইলেই টাকাটা সিকেটা
আদায় না-করা লোক না!
কিন্তু সাহেব দেখিলে অমনি
খুব ভাল করে আঁটি কপ্‌নি
আর 'বাবা' বলে পথ ছেড়ে দিয়ে কই
"সার্ সার্ গুড মর্ণি!"
কারেও সহজে দিইনে জবাব
মোদের এমনি কেমন স্বভাব;
আর তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কাছে
আমরা হচ্চি নবাব।
মোরা প্যাঁচ কাটা যেন ঘুড়ি—
শুধু বন্ধনহীন উড়ি;
শেষে একদিন শিকেটি ছুঁকিয়া
শেষ করি ঘোরা-ঘুরি!

মোরা সাহেবী কায়দা পালি
সদা মুখে ইংরাজী গালি
বাপ-মার রাখা নাম লোপ করি
উপাধিতে রটি খালি!
রেলে ইয়ুরোপীয়ান্ ও দেশী
সব একই কাযে মেশামেশি—
তবে বেতনের বেলা মোরা যত পাই
ওরা পায় তার বেশি!
তোমরা তবে যদি বল' কেন,
মোদের কি করে হইল হেন?
তার উত্তর দিতে গেলে ভাই,
চাক্‌রীটি যাবে জেনো!
মোদের ছুটি নেওয়া লোকসান,
শুধু বেতনে বাঁচে কি প্রাণ?
মোদের চিলে-কোঠা হ'তে খিড়্‌কি শুদ্ধ
আছে সকলেরি হাত টান্।
মোদের ভিটে বহুদিন মাটি—
যেহেতু যাই না বাটী।
দেশ ভাষা, জাতি সকলি ছাড়িয়া
লোহার বাঁধনে খাটি!
ফলে ছেলের শিক্ষা নাই,—
সদা ইস্কুল কোথা পাই?
তাই নামটি লিখিতে শিখিলেই ছেলে
রেল ছাড়া নাহি যাই!
কাযেই বংশ পরম্পরা,
বনেদী রেলের বাবুই মোরা;
মোদের রেলেতে জন্ম, রেলেতে মৃত্যু,
চির— রেলেতেই ঘর-করা।

শোক-সংবাদ

৺রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর

রায় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর আর ইহলোকে নাই। তিনি একজন কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। তিনি এক সময়ে আলিপুর জজ আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন। তাহার পর ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া এই সুদীর্ঘকাল দেশহিতকর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; আমাদের দেশের কল্যাণ-কল্পে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছে, কি রাজনীতিক, কি সামাজিক, সমস্ত কার্য্যেই তিনি অগ্রণীবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। উপযুক্ত পুত্রগণের উপর বিষয়-কর্ম্মের ভার দিয়া

তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাননীয় বারিষ্টার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি; দ্বিতীয় পুত্রও হাইকোর্টে বারিষ্টারী করিতেছেন। তাঁহার পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ ছিল। পূজার পূর্ব্বে তিনি সপরিবারে সিমলা-ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেইখানেই অল্প কয়েকদিনের অসুখে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। আমরা তাঁহার সন্তপ্ত পরিবারের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

বিগত ১৮ই আশ্বিন সোমবার দিবা দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ দারুণ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া বৈদ্যনাথের প্রবাস-ভবনে, সাধু, কর্ম্মী, উদারচেতা, মনস্বী, তেজস্বী, প্রবীণ সাহিত্য-সেবক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। যৌবনের প্রথম উন্মেষ সময় হইতে আমরা দেবী বাবুর বন্ধুত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী, অকুতোভয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মহাত্মাকে আমরা এতকাল পরে হারাইলাম। আজ আটত্রিশ বৎসর তিনি একই ভাবে 'নব্যভারত' সম্পাদন করিয়াছেন; একাকী সমস্ত কাজ করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসাবলি, তাঁহার প্রবন্ধ সকল কত জনকে ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহা আমরা জানি। পরের দুঃখ কষ্টে এমন প্রাণপণে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার লোক ক্রমেই বিরল হইতেছে। দেবী বাবুর এই সুদীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত কাহিনী শুনিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত-মস্তক হইতে হয়। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বারিষ্টার প্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথকুসুম রায় চৌধুরী মহাশয়ের এই গভীর শোকে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী

তিনি দেবপ্রতিম পিতৃহীন হইয়াছেন, আমরা জ্যেষ্ঠসোদর-প্রতিম অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছি।

পুস্তক-পরিচয়

নাটক ও নাটকের অভিনয়

৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য [illegible]

৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক সময়ে 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক ছিলেন। সে অনেকদিন পূর্ব্বের কথা। সেই সময় তিনি উক্ত পত্রে অনেকগুলি সন্দর্ভ প্রকাশ করেন। এতকাল পরে তাঁহার উপযুক্ত ও কৃতী পুত্র শ্রীযুক্ত অবনীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই সকল প্রবন্ধের কয়েকটি [illegible] পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধ কয়েকটি সমালোচনা কিন্তু এতদিনে সমালোচনা যে ভাবের হওয়া আবশ্যক, এ গ্রন্থ সে ভাবের নহে। এই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক অংশ [illegible]

করিতে হয়। মানব-প্রকৃতির বিশ্লেষণ এবং তাহা প্রদর্শন করিতে হইলে, কতকগুলি চিরন্তন সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়, এবং দৃশ্য ও পাঠ্য কাব্য ভেদে প্রদর্শনের নিয়মও বিভিন্ন হয়। এই দিক হইতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে বিষয়টির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশে অভিনব ত বটেই, উপরন্তু আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। তিনি এই গ্রন্থে পাঁচখানি নাটক সম্বন্ধে অল্পাধিক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সে সকলের স্থায়ী মূল্য অধিক না হইলেও, তিনি যেখানে চিরন্তন বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইখানেই উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

মহাভারত

শ্রীগিরিধর বিদ্যারত্ন বিরচিত, মূল্য প্রতি খণ্ড চারি আনা

শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তিনি খণ্ডে খণ্ডে মহাভারতের পদ্যানুবাদ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছেন। আদিপর্ব্বের তিনখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুবাদ যেমন সরল ও সুন্দর তেমনিই মূলানুগত; আমরা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। এই বহুব্যয়সাধ্য কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্য সত্যসত্যই ঐশ্বর্য্যশালী হইবে। আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চেষ্টার সাফল্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

ষড়-অবতার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য বার আনা

এই পুস্তকখানিতে ছয়টী ছোট গল্প আছে; সুপ্রসিদ্ধ চিত্র শিল্পী শ্রীমান যতীন্দ্রকুমার সেন অঙ্কিত ছয়খানি ছবি আছে, গ্রন্থের কলেবরও ছোকথা। বোধ হয় মুদ্রণের বাজার পূর্ব্বের মত থাকিলে, মূল্যও ছয় আনা হইত। ছয়টী গল্পেরই নায়ক এক-একটী অবতার বিশেষ বলিয়া, গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে 'ষড় অবতার'। আমরাও বলিতেছি, সকল ছয়ই ভাল হইয়াছে বেশ বই—বেশ ঝরঝরে লেখা—বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। অতএব ছয়টি দু'আনী বা ছয় দুগুণে বার আনা পয়সা, এই বইখানির জন্য ব্যয় করা যাইতে পারে।

কলির কালনিমে

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য সাত সিকা

বহুদিন পরে পল্লীজীবনের অদ্বিতীয় চিত্রকর শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের একখানি পল্লীকাহিনীর পরিচয় দিতে পারিয়া আমরা অতীব সুখী হইলাম। বাঙ্গালীর পল্লীজীবনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি-অবনতি এবং পল্লীবাসীর গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র অঙ্কনে দীনেন্দ্র বাবুর সমকক্ষ কেহই নাই; এমন করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে আর কেহই পারেন না। সেই দীনেন্দ্র বাবু এতকাল পরে এই 'কলির কালনিমে' পাঠকগণকে উপহার দিলেন। কলির এই কালনিমে মামার অস্তিত্ব এখনও দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই; অনেক মামাবাবু, অনেক শ্যালকপ্রবর এখনও পল্লীতে বিরাজ করিতেছেন; এবং সে সম্বন্ধে দীনেন্দ্র বাবুর অভিজ্ঞতাও বড় কম নহে। সেই অভিজ্ঞতা, সেই ভূয়োদর্শনের ফল এই কলির কালনিমে। সবগুলি চরিত্র যেন জ্বল জ্বল করিতেছে; কোনখানে সামান্য একটুও খুঁত নাই। প্রবীণ চিত্রকর প্রাণ ঢালিয়া দিয়া এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সুতরাং এই উপন্যাসখানির যে বিশেষ আদর হইবে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

প্রেমের কথা

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম এ প্রণীত; মূল্য আট আনা

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্বি-পঞ্চাশৎ গ্রন্থ। এই প্রেমের কথা ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং আমাদের গ্রাহকগণও বিশেষ আগ্রহের সহিত এই প্রেমের কথা পাঠ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা-ক্ষেত্রে অধ্যাপক ললিতকুমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহার এই প্রেমের কথার প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণ এই 'কথা' পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিবেন।

গৃহদেবী

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত, মূল্য আট আনা

'গৃহদেবী' আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ষটপঞ্চাশৎ গ্রন্থ। শ্রীমান বিজয়রত্ন বয়সে নবীন হইলেও তাঁহার লেখায় বেশ ওস্তাদী হাত আছে। নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার ছোট গল্পগুলি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার এই গৃহদেবী উপন্যাসেও সে যশঃ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আমরা এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।

বেইমান

শ্রীব্রজমোহন দাস প্রণীত, মূল্য আট আনা

শ্রীমান ব্রজমোহন তাঁহার এই ক্ষুদ্র উপন্যাস 'বেইমানে' যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র অঙ্কন ও বর্ণনাভঙ্গী অতীব প্রশংসনীয়। তিনি অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর না করিয়া বক্তব্য বিষয়টী বেশ গোছাইয়া বলিয়াছেন। বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও চিত্রগুলি বেশ ফুটিয়াছে। আমরা এই যুবক লেখকের অভিনন্দন করিতেছি।

কি অপরাধ আমার ?

[শ্রীগোকুলচন্দ্র নাগ]

আকাশের আর কোথাও ফাঁক নেই,—মেঘে ভ'রে গিয়েছে। পুকুর-ধারের গুপারি গাছগুলি কালো জলের ওপর ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি দোয়েল-পাখী আম-বন হ'তে উড়ে এসে ঘাসের ওপর বসল; তার পর একবার চারিদিকে তাকিয়ে, যেন ভয় পেয়ে, বড় ব্যাকুল হ'য়ে ডেকে উঠল। তার সে ডাক নির্জ্জনতার বুকের ওপর যেন অনেক-খানি বিষাদ মাখিয়ে দিল।

মণিমালা অন্ধকার ঘরের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর মাথা রেখে আস্তে-আস্তে বলে উঠল—"কি আমার অপরাধ?" তার চোখ-দুটি হ'তে খানিকটা জল ঝরে পড়ছিল।

পশ্চিম দিক হ'তে খানিকটা দমকা হাওয়া এসে ঘরের জানালাগুলির ওপর ধাক্কা দিয়ে ছুটে চলে গেল। গাছের পাতাগুলি পরস্পরের গায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে যেন কি কানাকাণি সুরু করে দিল! আকাশের অনেক দূর হ'তে একটা গুরু গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছে। পথে কোন একটা দুষ্টু ছেলে মনের আনন্দে চীৎকার করছে—"আয় বিষ্টি হেনে...।"

মণিমালা বাঁ-হাতের আঙ্গুলগুলি ডান-হাত দিয়ে চেপে ধ'রে বল্ল—"কেন ওরা আমায় এমন ক'রে শাস্তি দিচ্ছে—ওগো কি আমার অপরাধ?" তার এই দুঃখ আর অভিমানের কান্না অন্ধকার ঘরের ভিতর স্তব্ধ হ'য়ে রইল! এ কান্না যেন ভেসে যাবারও নয়, রুদ্ধ থাকবারও নয়। বৃষ্টির ছাট্ জানালার ওপর আছাড়ে পড়ছে। হাওয়ার বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠছে। মণিমালা কেঁদে বলল—"আমি মেয়ে মানুষ একথা সত্যি, কিন্তু আমারও যে প্রাণ আছে, সে কথা কি সত্যি নয়?"

মা যেদিন মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,—"সর্ব্বনাশী", অবাক হ'য়ে সে তার বাপের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু মেয়েকে কোন কথা না ব'লে, তিনি তার কাছ থেকে সরে গেলেন। তখন মণিমালার বয়স চোদ্দ। তার পর হ'তে তার সমস্ত কাজের ওপর সবার নজর পড়ল। তার সকল কাজই তাঁদের চোখে বিশ্রী ঠেকতে লাগল। এর পূর্ব্বে সে ছিল, সবার চোখের-মণি।

পিসিমা বল্লেন, "পোড়ার মুখীর গোদা দেখ না! লাজের মাথা কি! আমাদের ঘরে ছোট লোকদের স্বভাব নিয়ে অমন মেয়ে কি ক'রে যে জন্মাল, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাই!" ইত্যাদি। তার পর সে শুনল তার বিয়ে। আরো শুনল, তার এই বিয়েতে তার বাপের মাথায় যে অবশিষ্ট কয় গাছি চুল আছে, তা সবই বিকী হয়ে যাবে। ভয় পেয়ে একদিন সে মা'র কাছে বলে ফেলল—"আমি বিয়ে করব না।" মুখ বিকৃত ক'রে মা শুধু বললেন "নেকি!" মণিমালার দিক থেকে আর কোনই আপত্তি শোনা গেল না; কিন্তু অপর পক্ষের অক্ষয় তূণ হ'তে বাক্যবাণ সমান ভাবেই ছুটতে লাগল।

মনের স্ফূর্ত্তি একা চলে যায় না,—দেহের লাবণ্যও অনেকখানি তার সঙ্গে চলে যায়। এই রকম ব্যবহার পেয়ে মণিমালা দিনে দিনে শুকিয়ে এল। সকলের কাছে তার আর একটা অমার্জ্জনীয় অপরাধ ধরা পড়ল—"ছিরি হ'চ্ছে দেখ না, যেন পোড়াকাঠ!" এই নূতন অভিযোগ শুনে, লুকিয়ে মণিমালা চোখের জল মুছল। তার পর একদিন সত্য সত্যই মণিমালার বাপের মাথার চুলগুলি বিকী হ'য়ে গেল,—আর তার আজন্মের পরিচিত ঘরে ঠাঁই হ'ল না।

ফুলশয্যার রাতে স্বামী যখন তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—"মুখখানি ত খাসা!" তখন তার মুখে একটা অতি বিশ্রী গন্ধ পেয়ে, মণিমালার বুকের রক্ত শুকিয়ে এল। তার মুখ হ'তে আপনা আপনি ভয়ের কান্না বেরিয়ে এল—"মাতাল!" তার পর যেমন ক'রেই হোক চার বছর কেটে গেছে।

ঘরের দরজায় কে জোরে জোরে ধাক্কা দিল। সঙ্গে-সঙ্গে মণিমালার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সে আকুল হয়ে কেঁদে বলল—"মাগো, এ কি শাস্তি!"

দরজার ওপর আঘাত ক্রমেই বেড়ে উঠছে। একটা পৈশাচিক ক্রোধের চীৎকার ঝড় বৃষ্টির শব্দকেও ডুবিয়ে দিল। মণিমালা সংযত হ'য়ে উঠে বসে, ঠোঁটের ওপর দাঁত চেপে বলল—"কিন্তু আর নয়; এ আমি সইব না।" সে উঠে এসে ঘরের দরজা খুলে দিল।

সুরেশ ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসে বল্‌ল—"কি বাবা, বাদ্‌লা পেয়ে দিব্য ঘুম মাচ্ছিলে যে!" একটা জানালা খুলে দিয়ে মণিমালা বল্‌ল—"ঘুমাইনি; কিন্তু একটা কথা ভাবছিলাম।" বিদ্রূপের হাসি হেসে সুরেশ বল্‌ল—"ভাবনার কি জোর! হাজার ডাকেও কাণে শব্দ এসে পৌঁছায় না! বলি, ভাবনাটা কিসের?"

মণিমালা বল্‌ল—"আমি ভাবছিলাম—'কি আমার অপরাধ!' শুধু এই,—আর কিছু না। আমি জানতে চাই, কি আমার অপরাধ।"

সিগারেটের পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে, একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সুরেশ বল্‌ল—"বাহা কি বাহা! এই যে মণি-বিবি দিব্যি গাইতে শিখেছে দেখ্‌ছি! ভারি মিষ্টি শোনাচ্ছে কিন্তু!—কি আমার অপরাধ? থামলে কেন বাবা? মুখখানি ত আজকের আকাশের সঙ্গে এক ছাঁচে ঢালাই করেছ দেখ্‌ছি! দিব্যি গুমোট ক'রে আছে; কিন্তু আর পচিয়ে মার কেন বাবা? জল ঝড়ের একটা কিছু হয়ে যাক।" তার পর মণিমালার দিকে হাত আর মাথা নেড়ে, একটা কাফি সুর নিজের ইচ্ছামত ঠোঁটে সাজিয়ে গেয়ে উঠ্‌ল—"কি দোষ করেছি তব পায়।" সুর না বেরুলেও, মুখ দিয়ে অনেকখানি মদের গন্ধ বেরিয়ে গেল। মণিমালা কপালের ওপর হ'তে একগোছা চুল সরিয়ে, তার জলে ভরা অথচ দৃপ্ত চোখ দু'টি সুরেশের মুখের ওপর তুলে, তার একখানা হাত শক্ত ক'রে চেপে ধরে বল্‌ল—"আমি আবার বল্‌ছি,—আমি জানতে চাই, কি আমার অপরাধ!"

মণিমালার এই কথাগুলি সুরেশের কাণে যে সুরে বেজে উঠ্‌ল, তা শোনা তার জীবনে এর পূর্ব্বে কখনও ঘটে ওঠে নি। ঐ কথাগুলি শুনে অনেকখানি ভয়, অনেক-খানি রাগ তার বুকে জমা হয়ে উঠ্‌ল। সে নেশার ঝোঁকেও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌ল। ঘরের স্তব্ধতা তার অসহ্য বোধ হ'ল। সে কতকটা আপনার মনেই যেন বলে উঠ্‌ল—"নাঃ, জ্বালালে দেখ্‌ছি। রাতদিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্। অপরাধ নয় ত কি? দিব্যি উড়ে এসে জুড়ে ব'সে চুলো মজা লুটছ। আমার বাড়ী, তোমার শ্বশুর-বাড়ী, তবুও সমস্তটাই তোমার বখ্‌রায় পড়েছে। আমি বাইরের এক কোণে পড়ে থাকি, কোন দিন ভাগ বসাতে আসি না—তবুও মন ওঠে না?—এ-ইঃ গাড়ী জোত্। আবি হম্ বাহার যায়েগা।"

মণিমালা কতকটা তাচ্ছিল্যভাবে বল্‌ল—"বাইরে যাবে?" সুরেশ বল্‌ল—"আল্‌বৎ যাবো। আমি কি কাকেও কেয়ার করি? আর তা ছাড়া বুঝ্‌লে কি না, এই বাদ্‌লার দিনে মজলিসটা মজে ভাল। আর কাঁহাতক ঘরে ব'সে দেশলাই বাক্সের মত মিইয়ে থাকি? একটু-খানি -নরম-গরম……" আকাশের এক প্রান্ত হ'তে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সাপের মত এঁকে বেঁকে চলে গেল। সুরেশ দুই কাণে হাত চাপা দিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। ভীষণ শব্দে নিকটেই কোথাও বাজ পড়্‌ল। সুরেশ বল্‌ল—"রাম, রাম। ঐঃ ঐটেকে একটু কেয়ার করি বাবা।" তার পর সে দরজার দিকে এগিয়ে এল। মণিমালা তার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে বল্‌ল—"শুধু বলে যাও কি আমার অপরাধ?"

ভয়ানক মুখ বিকৃত ক'রে সুরেশ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"তুমি আমার স্ত্রী, এই তোমার অপরাধ। শুন্‌লে ত সোণারচাঁদ, এখন পথটা একটু কষ্ট ক'রে ছেড়ে দাও, আমি ছাতিটা মাথায় দিয়ে সুপ্ ক'রে গাড়ীতে গিয়ে বসি। আর অত ঘাব্‌ড়ো না, একটুখানি বৃষ্টিতে ভিজ্‌লে আমি নিউমোনিয়া ক'রে তোমার মাছের ঝোল ভাতের মৌরশি-পত্তন এত শিগ্‌গির ঘুচিয়ে দেব না।"

কপালের ওপর একটা আঙ্গুল চেপে ধরে মণিমালা বল্‌ল—"যাও তুমি, আর কোন দিন তোমায় বিরক্ত করব না।" সুরেশ কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। তার পর বিড়বিড় ক'রে বক্‌তে বক্‌তে গাড়ীতে এসে বস্‌ল—"মনু চলে গেল। দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল। অর্থাৎ নো এড্‌মিশন্। বোয়ে গেল।" কিন্তু যমের পিয়াদা এদিকে নরকের দরজাগুলি ভাল ক'রে খুলে দিল! বাঃ কি রং-বেরংএর ফুর্ত্তি! আসর বেশ জমে উঠেছে দেখ্‌ছি! বিদ্যাধরীদের চোখে সুরমা, ঠোঁটে কুম্‌কুম্, পায়ে আল্‌তা! বহুত আচ্ছা। নূপুরগুলি পায়ে-পায়ে ঝুমঝুম্ ক'রে বেজে উঠ্‌ছে। তাদের আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। সব দেবতাই স্বশরীরে সভয়ে অধিষ্ঠান করছেন, শুধু সুরেশ আসেন নি।—"নাঃ আর ত

দেরি করা চলে না। এ-ই: গাড়ী জোরসে হাঁকাও। দরজাটা বন্ধ। মনু কাঁদছে—বোয়ে গেল।"

ঝিলমিলির ভিতর দিয়ে একটু শব্দ ক'রে খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া সুরেশের মুখে লাগ্ল। তার চোখের সামনে একখানি মুখ ফুটে উঠ্ল। তার কাণের ভিতর কান্নার মত শব্দ হ'ল—"কি আমার অপরাধ?"

সুরেশ সাম্নের বস্বার জায়গাটিতে লাথি মেরে চীৎকার ক'রে উঠ্ল—"অপরাধ নয় ত কি? আমায় বিয়ে কর্লে, কিন্তু আমি কি তোমার যোগ্য? সতেরো বছর বয়সের সময় সুরা প্রেয়সীর মুখচুম্বন করি, তার পর হ'তে বাইজি মহলে আমার খ্যাতি রটে গেল—যে, এমন ক'রে কোন শালা মদের গ্লাস ওড়াতে পারে না! সুরেশের কলজে মজবুত্ আছে। কানাই ভট্‌চাজ্জি আমার কদর বোঝে। সে সেদিন বল্ল—জহ্নু মুনি গঙ্গাকে খেয়ে, তাকে জাহ্নবী নাম দিয়েছিল বটে, কিন্তু তাকে হজম করতে হয় নি বাবা, ওগ্‌রাতে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সুরেশ, সুরাদেবীকে শোষণ ক'রে সুরেশ নাম সার্থক করেছে। আরে, জোরে হাঁকা। এই সবে কলুটোলার মোড় পার হ'ল! যেতে হবে দমদম। ইস্, এতক্ষণ কি চুপ ক'রে থাকা যায়? আমার কি অপরাধ? অপরাধ নয় ত কি? বাবা নিলেন ঝক্‌ঝকে দশটি হাজার গুণে, আর আমার গলায় পরিয়ে দিলেন মণিমালা, সে মালা ফাঁসি হ'য়ে আমার গলায় আট্‌কে রইল। এখন দম বন্ধ হ'য়ে মরি। সতেরো বছর বয়সে বাইজিদের পদসেবায় এই হাত উৎসর্গ ক'রেছি—ঠোঁট দুটোর কথা আর বল্‌ব না—ফু: সহিস্, কেওয়াড়ী খোল, বহুৎ গরম।

"মনু সেদিন তার ছোট হাত দুটি আমার মুখের ওপর চেপে বল্ল—'তোমার মুখখানি ভারি মিষ্টি!' থু—থু, মিষ্টি! আরে রে মূর্খ মেয়ে মানুষ, মিষ্টি কাকে বলে? ছো:, তোমার টেষ্টকে বলিহারি যাই বাবা! কিন্তু তার হাত কি ঠাণ্ডা ছিল! তবু মনে হ'ল যেন কে আমার মুখের ওপর আগুন জেলে দিল। তার হাতটা টেনে ফেলে দিলাম। সে ভাব্‌ল তাকে আমি অনাদর করলাম। মেয়েরা কিছু বোঝে না। তাকে অনাদর কর্‌ব কেন? আমি নিজেকেই যে সইতে পারি না। এই কলুষিত দেহটাকে নিয়ে ওর পাশে দাঁড়াতে ভয় ক'রে, ওকে দেখ্‌লে চোখের পাতা আপনা হ'তে বন্ধ হ'য়ে আসে। বুকের ভিতর শয়তান পাথর ভাঙতে থাকে। চীৎকার ক'রে উঠি—মনু ভাবে—ডাকে ব'কে। না:, পথ আর ফুরোবে না দেখ্‌ছি। সব গোল্লা হ'য়ে গেল। সেই কখন এক গ্লাস খেয়ে বেরিয়েছি! তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছে। —এই কোচম্যান, বাঁয়ে হাত রাখো—এই যে শ্যামলাল চন্দ্র সাহা! আহা কি মিষ্টি নাম!" সুরেশ গাড়ী হ'তে নেমে দোকানে ঢুকে বল্ল "কি মামা, ব'ল আছে কেমন? বেশ একটুখানি কড়া গোছের চাল দেখি বাবা—আর ও কি? বিয়ার? রামচন্দ্র! আর কিছু নেই? দোর! আচ্ছা, তাই দাও, আর একটা গাড়ীতে পাঠিয়ে দাও, পাথেয় কিছু নিই, অনেক দূর যেতে হ'বে।"

একটা টেবিলের ওপর বোতল রেখে মদের গ্লাসটা হাতে নিয়ে সুরেশ আপনার মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—"কি আমার অপরাধ? ফু:।" তার পর মুখের কাছে গ্লাসটী তুলে ধরে হঠাৎ সেটা টেবিলের ওপর রেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল। শুঁড়ি জিজ্ঞেস করল—"কি হ'ল কর্তা?" সুরেশ গ্লাস থেকে চোখ না তুলেই বল্ল "কি হ'ল কর্তা? শালা গেলাসের ভেতর মেয়েমানুষের মুখ এঁকে রেখেছ, আবার বলা হচ্ছে কি হ'ল কর্তা।" শুঁড়ি কিছু বুঝ্‌তে না পেরে বল্ল—"সে কি?" তার চোখের সামনে ফেনা-ভরা গ্লাসটি তুলে ধ'রে সুরেশ বল্ল—"বাহ'ব, দিব্যি মুখ-খানি! ভিজে চোখ দেখ।" গ্লাসভরা মদ পড়ে রইল; সুরেশ খেল না। সে গাড়ীতে এসে বস্‌ল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে, চৌমাথা পার হয়েই একটা সরু গলির কাছে গাড়ীখানা আসতেই একটা দোতলা বাড়ী হ'তে হাসি, গান, নাচের শব্দ এসে সুরেশের বুকে যেন আগুন জেলে দিল। একটা গজল সুর তখন বল্‌ছিল। আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সুরেশ তারই সঙ্গে যোগ দিল—"নয়নামে নয়না মিলাও।" তার পর বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্ল। প্রায় ফটকের কাছে এসে তার পা আর কিছুতেই চল্ল না। তার চার পাশে অন্ধকার জমাট হয়ে রয়েছে, যেন কিছুতেই তাকে ঐ আলোর দিকে এগিয়ে যেতে পথ ছেড়ে দেবে না! পথে খানিকটা জল জমে রয়েছে; তারই ওপর আলো এসে পড়েছে। সেই দিকে তাকাতেই সুরেশের চোখের সামনে দুখানি টল্‌টলে বেদনা-ভরা

দেখা দিল! কাণের কাছে আবার সেই সুর বাজল "কি আমার অপরাধ ?" সুরেশ পাগলের মত ছুটে গাড়িতে এসে বসে বল্ল —"হাঁকাও।"

কোচম্যান্ তখন ঘোড়ার জোৎ খুলে দিচ্ছিল। সে অবাক্ হ'য়ে বল্ল—"আপ্ ভিতরমে নেহি জায়েঙ্গে হুজুর?" সুরেশ চীৎকার ক'রে বল্ল—"জাহান্নামমে যায়েগা, হাঁকাও জল্দি।" কোচম্যান্ বল্ল—"ঘোড়া ত একদম্ থক্ গিয়া, ঘোড়া দম্ নেহি লেনেসে......।" তার কথা শেষ না হ'তেই সুরেশ গাড়ী হ'তে লাফিয়ে নীচে নেমে এসে বল্ল, "ঠাহ্‌রো তব, পিছে গাড়ি ঘরমে লে আও।" আর কোন কথা না বলে সে এক রকম ছুটেই অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

গাড়ী যখন বাড়ী ফিরে এল, মণিমালা জিগেস্ করল— "বাবু কি ওখানেই আজ রইলেন?" কোচম্যান্ বল্ল— "নেহি জী হুজুর, বাবু সাব্ ত ফাটক্ তক্ যা কর্ পয়দল লওট্ আয়া।" অবাক্ হ'য়ে মণিমালা বল্ল—"সে কি রে? তোরা কেউ সঙ্গে গেল না কেন?" কোচম্যান্ বল্ল— "আঁধিয়ারামে কুচ্ মালুম্ নেহি হুয়া কি বাবুজী কিধার গিয়া! হম্ জানি কি উন্‌কো শয়তান নজর লাগায়া মাজী। ঔড়িখানেমে গিয়া, সরাপ ভি লিয়া, লেকেন পিয়া নেহি! এয়সা ছোড়্ কর্ চলা আয়া!"

তখন গভীর রাত্রি। মণিমালা ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার মনে হ'ল যেন দরজার বাইরে কে তাকে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ডাকছে। তাড়াতাড়ি ঘর হ'তে বেরিয়ে এসে দেখ্‌ল সুরেশ চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে পড়ে আছে! মণিমালা তার মাথাটি কোলে তুলে নিল। সুরেশ তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্ল "ওগো, ধ'রে রাখতে পারবে কি?"

মণিমালা কোন কথা না ব'লে চুপ করে রইল। তার কথা বল্‌বার শক্তি ছিল না। চারিধার স্তব্ধ। গাছের পাতাটিও নড়ে না! সুরেশ তার মাথাটাকে মণিমালার হাতের ওপর চেপে ধরে আবার বল্ল—"আশা আছে কি মণি?" মণিমালা তাকিয়ে ছিল কালো আকাশের গায়ে ছোট্ট একটি তারার দিকে; হঠাৎ তার মনে হ'ল, ঐ জ্যোতিকণাটুকু যেন ইসারায় তাকে জানাচ্ছে—'অন্ধকারের পরপারে আলো আছে।' নিঃশব্দে তার চোখ দিয়ে কয়েক বিন্দু জল গ'ড়িয়ে সুরেশের মুখের ওপর পড়ল।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত "তরুবালা"র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "কলির কালনিমে" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য সাত সিকা।

দীনেন্দ্র বাবুর "লেডী ডাক্তারের লেড়কা"র মূল্যও বার আনা।

শ্রীযুক্ত মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছয় আনায় "খোস-খবর" দিতেছেন। ঝুটা নহে।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয়ের "অঙ্গহীনা"র মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ এক টাকা মূল্যে সকলকে "রসালে"র স্বাদ গ্রহণ করাইতেছেন।

শ্রীযুক্ত কলিমুদ্দীন আহম্মদ প্রণীত "লায়লী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র বাবুর আর একখানি গ্রন্থ "হীরা" বাহির হইয়াছে। বার আনায় হীরা বিকায়।

আগামী ১লা ফাল্গুন রবিবার বাসন্তী-পঞ্চমী দিবসে মহাকবি মধুসূদনের স্মরণার্থ মাইকেল লাইব্রেরীর অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বার্ষিক "মধু-মিলন" উৎসব সম্পাদিত হইবে। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দুইটা বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গলা প্রবন্ধ ও কবিতা লেখকদ্বয়কে দুইটি রৌপ্যপদক প্রদত্ত হইবে।

১। প্রবন্ধ :—"ভারতীয় শিল্পের অভ্যুদয় ও ভবিষ্যৎ।"

২। কবিতা :—"মেঘনাদে প্রমীলা।"

প্রথম প্রবন্ধ ফুলস্কেপের ১২ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় ৬ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না এবং আগামী ৭ই মাঘ ১৩২৭, তারিখের মধ্যে উক্ত লাইব্রেরীর সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। ঠিকানা মাইকেল লাইব্রেরী খিদিরপুর, কলিকাতা।

গ্রাহকগণের প্রতি—অগ্রহায়ণের ২০শের মধ্যেও যাঁহারা যাণ্মাসিক মূল্য পাঠাইবেন না, তাঁহাদের পৌষ সংখ্যা আমরা পোষ্ট অফিসের নূতন নিয়ম অনুসারে রেজেষ্ট্রী করিয়া ভিপিতে ৩৶৶ পাঠাইব। গ্রাহকের ভিপি রাখিতে ৩৶৹ আনা লাগিবে। মনিঅর্ডারে গ্রাহক নং সহ টাকা পাঠানই সুবিধাজনক; কারণ মণিঅর্ডার করিলে ৩/৹ মাত্র লাগিবে। পৌষের ঠিকানা পরিবর্ত্তনের কথাও ২০শে অগ্রহায়ণের মধ্যে জানাইবেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works.